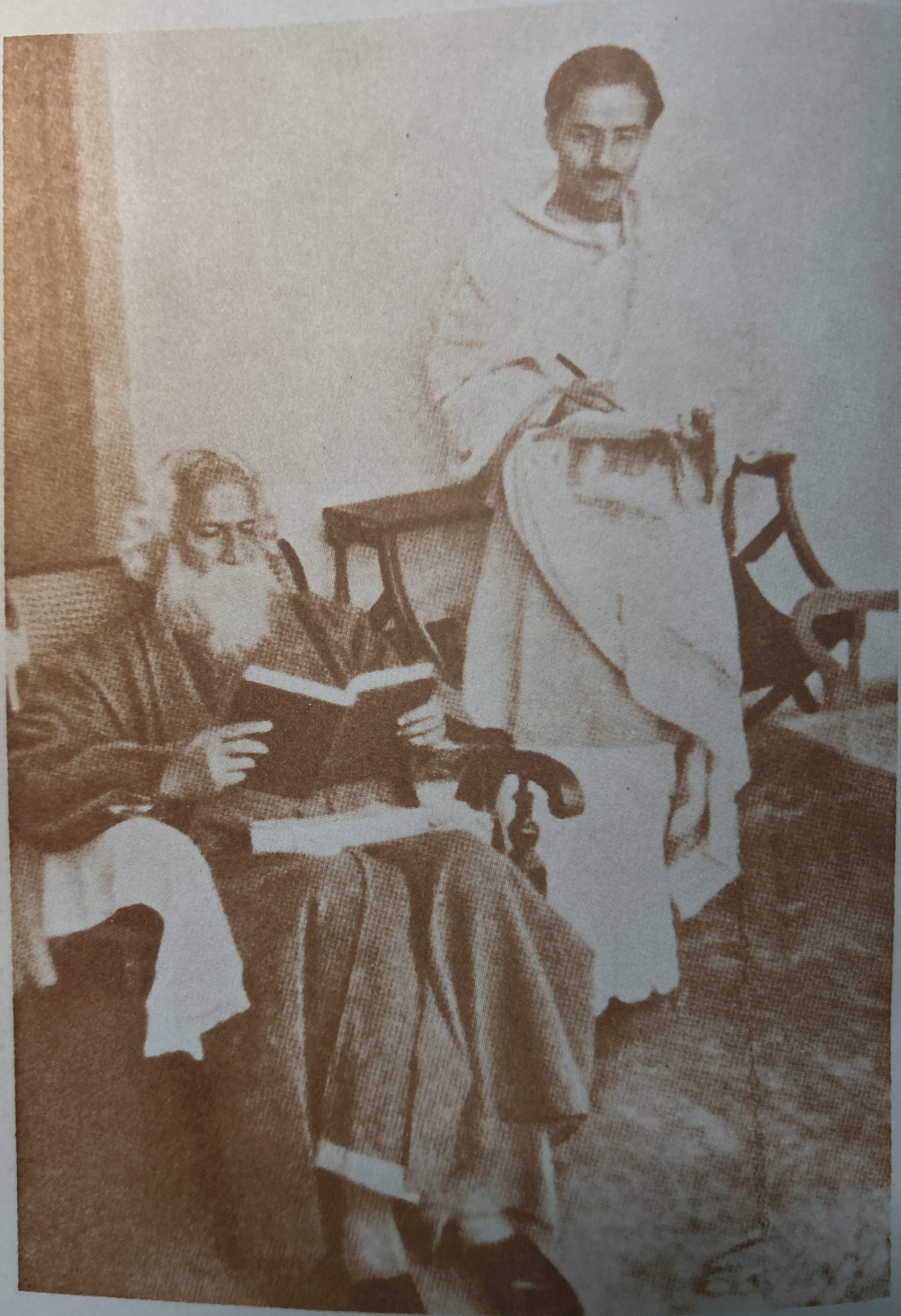
ভূমিকা • টীকা • সম্পাদনা

নরেশ গুহ

# কবির চিঠি কবিকে

রবীন্দ্রনাথকে অমিয় চক্রবর্তী ১৯১৬-১৯৪১



রবীন্দ্রনাথ ও অমিয় চক্রবর্তী

# কবির চিঠি কবিকে

রবীন্দ্রনাথকে অমিয় চক্রবর্তী

১৯১৬-১৯৪১

ভূমিকা টীকা সম্পাদনা

**নরেশ গুহ**

প্যাপিরাস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০০০৪

প্রকাশ: জানুয়ারি ১৯৯৫

প্রচ্ছদ: দেবব্রত ঘোষ

একশো কুড়ি টাকা

প্রকাশক: অরিজিৎ কুমার। প্যাপিরাস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন। কলকাতা ৭০০ ০০৪

মুদ্রক: সঞ্জয় সাউ। অ্যাস্ট্রাগ্রাফিয়া
৪০বি প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০১২

## সম্পাদকের নিবেদন

ভূমিকা ও টীকা সহ এই মূল্যবান চিঠিগুলি দীর্ঘ ছ'মাস ধ'রে 'দেশ' পত্রিকায় ( নবেম্বর ১৯৯১—এপ্রিল ১৯৯২) ছাপিয়েছিলেন সম্পাদক শ্রী সাগরময় ঘোষ। তাঁর সহৃদয় উৎসাহ না থাকলে কাজটা শীঘ্র শেষ হ'তো কিনা সন্দেহ। মূল চিঠিগুলি রক্ষিত আছে শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে। আলোকচিত্রগুলিও সেই সংগ্রহের অন্তর্গত। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য শ্রী সুরজিৎ সিংহ এক সময় এই চিঠিগুলি আমার দ্বারা সম্পাদিত হ'য়ে প্রকাশের ব্যাপারে আনুকূল্য করেছিলেন। বর্তমান উপাচার্য শ্রী সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও অমিয় চক্রবর্তীর কন্যা শ্রীমতী সেমন্তী ভট্টাচার্যের সাগ্রহ সম্মতি পেয়ে সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হ'লো। পাণ্ডুলিপির দোষমার্জনে সহায়তা করেছেন আমার স্ত্রী শ্রীমতী অর্চনা।

টীকা অংশের জন্য তথ্যসংগ্রহে সহায় হয়েছেন : বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবন ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, প্রয়াত কিউরেটর সনৎকুমার বাগচী, বর্তমান কিউরেটর শ্রীগৌরচন্দ্র সাহা, গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী সুপ্রিয়া রায়, পাঠভবনের অধ্যাপক শ্রী পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের শ্রী সুবিমল লাহিড়ী; যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রী দিলীপ মুখোপাধ্যায়; রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রী প্রশান্তকুমার পাল, শিল্পী কে. জি. সুব্রহ্মণ্যম; নিউজার্সিবাসিনী শ্রীমতী প্রতিমা রাও, ন্যু ইয়র্ক পাব্লিক লাইব্রেরি, এবং আমার কন্যা শ্রীমতী সুচরিতা। এঁদের প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। 'দেশ' পত্রিকায়, এবং ব্যক্তিগতভাবে আমাকে, চিঠিপত্র লিখে টীকা অংশের দোষত্রুটির প্রতি অনেক মহানুভব পাঠক আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গ্রন্থের কোথাও-কোথাও তাঁদের কিছু পরামর্শ আমি স্বীকার ক'রে নিয়েছি। তাঁদের প্রতি আমার বিনীত নমস্কার জানাই।

রচনাসৌষ্ঠব ও সাহিত্যরস উপভোগের জন্য চিঠিতে উল্লিখিত প্রতিটি প্রসঙ্গের অনুপুঙ্খ জানার হয়তো দরকার করে না। কিন্তু পাঠকের শ্রমলাঘবের উদ্দেশ্যে পাদটীকা যোগ করতে হ'লে তথ্যের কার্পণ্য না-রাখাই বোধ হয় সমীচীন। হয়তো এর কোনো সামান্য তথ্যও পরে কোনো কৌতূহলী পাঠকের কাজে লেগে যেতে পারে। পত্রপরিচিতি স্থলবিশেষে দীর্ঘ করার এই কৈফিয়ত।

বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'চিঠিপত্র' পর্যায়ের ১১শ খণ্ডে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের যে অসাধারণ চিঠিগুলি সংকলিত আছে তার সঙ্গে বর্তমান গ্রন্থভুক্ত পত্রাবলী, তারিখ মিলিয়ে, একত্র পড়া প্রয়োজন ব'লে মনে করি। টীকা অংশে বার-বার আমি সে-বিষয়ের উল্লেখ করেছি।

**নরেশ গুহ**

শান্তিনিকেতন

# ভূমিকা

সৃষ্টির কাজ একলার কাজ, সঙ্গী লাগে না, থাকলে বরং ক্ষতির সম্ভাবনা। কিন্তু চিঠি লিখতে হ'লে দুজন দরকার। যাকে লেখা সে হয়তো অনেক সময় উপলক্ষ মাত্র, লিখতে ভালো লাগছে ব'লেই লেখা, উত্তর-প্রত্যুত্তরে সমকক্ষতার প্রমাণ দেবার দরকার নেই, আদানপ্রদানের প্রশ্ন অবান্তর। যেমন 'ভানুসিংহের পত্রাবলী', যেমন 'ছিন্নপত্র' বা 'ছিন্নপত্রাবলী'। প্রথমটির মুখবন্ধে পত্রলেখক বলেছিলেন : 'এগুলিতে মোটা সংবাদ কিছু নেই, হাসিতামাসায় মিশিয়ে আছে সেখানকার [শান্তিনিকেতনের] আবহাওয়া, জড়িয়ে আছে সাংসারিক ব্যাপারে আনাড়ি মেয়েটির ছেলেমানুষির আভাস, আর তারই সঙ্গে লেখকের সকৌতুক স্নেহ।' স্নেহের স্বভাব নিম্নগামী, তাই এ-ধরনের অসাধারণ সাহিত্যগুণসম্পন্ন চিঠি পাওয়ার জন্যে প্রাপককেও সুলেখক হওয়ার কোনো আবশ্যকতা নেই। তার কাজ লেখককে শুধু তার অস্তিত্বের মাধুরী দিয়ে যথোচিতভাবে প্ররোচিত করা। 'ছিন্নপত্রাবলী'-র মুখবন্ধ হিশেবে ব্যবহৃত, ইন্দিরা দেবীকেই লেখা সমসাময়িক এক চিঠিতে কথাটা একটু ভিন্নভাবে বলা হ'য়েছে : 'যদি কোনো লেখকের সব চেয়ে ভালো লেখা তার চিঠিতেই দেখা দেয় তাহলে এই বুঝতে হবে যে যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে তারও একটি চিঠি লেখাবার ক্ষমতা আছে। আমি তো আরও অনেক লোককে চিঠি লিখেছি, কিন্তু কেউ আমার সমস্ত লেখাটা আকর্ষণ ক'রে নিতে পারেনি।' চিঠির শেষ কথা : 'যে শোনে এবং যে বলে এই দুজনে মিলে তবে রচনা হয়।' (১১ অক্টোবর ১৮৯৪)

ডাকপিওনের ঝোলায় ঢুকে লক্ষ কোটি যে-পদার্থ 'চিঠি' নামে বিশ্বের ঘরে-ঘরে বিলি হ'য়ে আসছে, যা সব সময় আবর্জনার টুকরিতে ফেলতেও মায়া হয়, আবার জমিয়ে রাখাও অর্থহীন, তা যে কারো-কারো কলমে অনুপম ও সাদরে-রক্ষণযোগ্য সাহিত্য হ'য়ে উঠতে পারে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের চিঠিপত্রে তার প্রমাণ রেখেই ক্ষান্ত হননি, ব্যক্তিভেদে চিঠির চরিত্র কেমন বদলায় সে-বিষয়েও ভেবেছেন এবং অপরকে ভাবিয়েছেন। স্বাভাবিক কারণেই এ-বিষয়ে তাঁর ভাবনার মধ্যেও তাই একটা গতি লক্ষ করা যায়। কোনো এক সময় যা ভেবেছেন, পরে তার সংশোধন করা অনিবার্য হ'য়ে উঠেছে, যেমন 'ছিন্নপত্রাবলী'-র এই উক্তিটি। এ-উক্তির সবটা আজ মানা কঠিন। প্রথম কারণ, চিঠিপত্রই যে রবীন্দ্রনাথের 'সব চাইতে ভালো লেখা' তা নয়। তিনি মহাশিল্পী, এবং শিল্পের বহুরূপী জগতে তিনি সর্বত্রগামী। দ্বিতীয় কারণ,—বলা যায় প্রধান কারণ,—আরো এক শ্রেণীর পত্রপ্রাপকের কথা এখানে ভাবা হয়নি, হয়তো তেমন কেউ ছিলেনও না সে সময়, পরে এসেছেন, যাঁরা শুধু লেখককে দিয়ে লিখিয়ে নিতে পারার ক্ষমতা রাখেন তাই নয়, যাঁদের

নিজেদেরও সেই সূত্রে স্বাধীন ভাবে-ভঙ্গিতে এমন অনেক কথা বলার ক্ষমতা থাকে যা উপেক্ষা করার মতো নয়। সেই সঙ্গে তাঁদের মধ্যে যদি থাকে উন্মেষমুখী সৃষ্টিশীলতার শক্তি, যা ক্রমেই বিকাশের দিকে উন্মুখ, তাহ'লে তাঁদের পত্রালাপ আর স্বগতোক্তি পর্যায়ে থাকে না, হ'য়ে ওঠে দ্বিরালাপ। দুজনেই সেখানে শ্রোতা, দুজনেই লেখক অর্থাৎ কথক। রবীন্দ্রনাথ আর অমিয় চক্রবর্তীর চিঠিপত্র এই বিশেষ শ্রেণীতে পড়ে। পত্ররচনার এ এক সম্পূর্ণ নতুন দস্তুর। বিশ্বের প্রথম শ্লোকটি আচমকা উচ্চারণ ক'রে প্রাচীন এক মহাকবি যেমন সবিস্ময়ে নিজেকেই প্রশ্ন করছিলেন —এ আমি কী বললাম, কেন তা উচ্চারিত হ'লো, কী এর পরিচয়,— অমিয় চক্রবর্তীকে চিঠি লিখতে-লিখতে রবীন্দ্রনাথকেও এক সময় তাই করতে হয়েছিলো। সময়টা ১৯৩৯-এর মার্চ মাস— 'ভাঁটার সময় এল পৃথিবী জুড়ে'—আর একটা বিশ্বযুদ্ধ যখন ঘনিয়ে উঠেছে। অথচ তার মধ্যেই বাংলা দেশের 'সকাল বেলায় জমেছে ঘন মেঘের ছায়া।' অমিয় চক্রবর্তীকে কবি লিখছেন : 'যাদের সঙ্গে সম্বন্ধটা স্বভাবতই মধুর অর্থাৎ লিরিক-জাতীয় তুমি যদি তাই হ'তে তাহ'লে আজকের এই চিঠিতে মেঘমল্লারের সুর লাগত। লিরিকের পর্ব শেষ হ'য়ে গেছে, ঠিক মনের দিক থেকে যে তা নয়, বাইরের দিক থেকে। অর্থাৎ অবকাশের দেবতা এই অকেজো সকালে যে-সুরেই তাঁর বীণার তার বাঁধুন আমার এ চিঠি সুরালো হবে না, কেননা আধুনিকতার যুগ-লক্ষ্মীর সভায় মাধুরী-মদের পেয়ালায় টানাটানি। সাকীই বা কোথায়?' এরপরে একে-একে তাঁর এই চিঠির মধ্যে চ'লে আসে বিবিধ প্রসঙ্গ, কবি যাকে বলছেন 'থট্'-এর চালনা, পাশ্চাত্য সভ্যতায় হাওয়া বদলের কথা, য়ুরোপে তামসিক মনোবৃত্তির সম্প্রসারণের বিবরণ, কংগ্রেসের মঞ্চ থেকেও হিটলারী নীতির নিঃসঙ্কোচ জয় ঘোষণার বৃত্তান্ত। তারপরে একটা জটিল বাক্যের আধখানা লিখেই হঠাৎ ব'লে ওঠেন— 'থাকগে ওসব কথা, আমরা অন্য কালের লোক। বাঁধা পথ নেই চিঠির ; ও রেলগাড়ি নয়, ও চলে খোলা মাঠের মধ্যে। একটা সাহিত্যের তর্ক তুলব তোমার সঙ্গে, এই কথা মনে করেই তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছিলুম। কিন্তু ভূমিকাটাই—' ইত্যাদি। ('চিঠিপত্র' ১১শ, ১১০)। জাত মিলিয়ে একেও ঠিক চিঠি বলা যায় কিনা তা নিয়ে কবির নিজের মনের দ্বিধা ঘুচলো না, তাই পরের চিঠিতে (১১১ সংখ্যক) আবার লিখলেন : 'বয়স যখন অল্প ছিল... চিঠিগুলো উঠত অজস্র ফেনিয়ে বাইরের দিকের চলাচলের মন্থন বেগে। ছিন্নপত্রে তার পরিচয় পেয়েছ।... এখন লিখি লিখতে যদি মন যায়।... লেখাটার পরিমাণ থাকে দুটি মনের মাপে।' এ-চিঠির প্রধান বিষয় ছিলো সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র মননপ্রধান প্রবন্ধের বই 'স্বগত'। রিভিউ জাতীয় প্রবন্ধ বললেও ক্ষতি নেই। 'প্রবাসী'-তে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬) চিঠিটি ছাপা হ'লে পাঠকরাও সেই ভাবেই নিয়েছিলেন। কিন্তু রূপটি চিঠির, 'আপন লোকের পাশাপাশি পায়চারি করতে-করতে আলাপ করার ধরণে।' অমিয় চক্রবর্তী উৎসাহভরে সায় দিয়ে বলছেন : 'চিঠির আকারে সাহিত্যের এমন একটা রূপ সৃজিত হ'য়ে উঠেছে তার তুলনা কোথাও নেই। কাব্য, ডায়েরি এবং গদ্যপ্রবন্ধের আলো এসে পড়ে অথচ চিঠির বিশেষত্ব একটুও কমেনি



লণ্ডনে সোমনাথ মৈত্রের বাসভবনে য়োহান বয়ার। পেছনে অমিয় চক্রবর্তী। ১৯৩৪



অক্সফোর্ড প্রবাসী গবেষক অমিয় চক্রবর্তী



শান্তিনিকেতনে হৈমন্তী দেবী ও অমিয় চক্রবর্তী : আনুমানিক ১৯২৮



রবীন্দ্রনাথকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধিদানের
অনুষ্ঠানে শান্তিনিকেতনে সিংহসদন মঞ্চে স্যার মরিস গয়্যার,
বিচারপতি হেণ্ডারসন ও অমিয় চক্রবর্তী। ১৯৪০

—যাঁরা বলেন এই জাতীয় রচনা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হলেও চিঠি নয় তাঁদের সঙ্গে কিছুতেই একমত হতে পারি না।' (চিঠি ৭৪) আমরাও আজকাল পারি না, চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত দেখে ভিন্নরকম ভাবার সাহস বেড়েছে।

পরস্পরকে লেখা সব চিঠি অবশ্য এক জাতের নয়। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধ'রে লেখা সব চিঠির আকার প্রকার তা হ'তেও পারে না। তবে বিষয়গুণের সঙ্গে অনিবার্য প্রকাশভঙ্গির গৌরব মিলে প্রতিটি চিঠিই নিবিষ্টচিত্ত সাহিত্য পাঠকের পক্ষে অতি সমাদরযোগ্য হ'য়ে উঠেছে তাতে ভুল নেই। যা হ'তে পারতো নিতান্ত ব্যক্তিগত তাও যে আমাদের সজীব উৎসাহকে সমভাবে জাগিয়ে রাখতে পারে তার একটাই কারণ —এই পত্রালাপ উভয়ের সাহিত্যিক ও মানসিক জীবনবৃত্তান্তের অপরিহার্য উপাদান, যার সঙ্গে তুলনীয় রবীন্দ্রনাথেরই কিছু চিঠি আছে একমাত্র প্রমথ চৌধুরী, বুদ্ধদেব বসু এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তর, হয়তো প্রিয়নাথ সেনের, সঙ্গে। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর লেখা সব চিঠি রক্ষা পেয়েছে কিনা সন্দেহ। তাছাড়া এঁদের কারো সঙ্গেই কবি ধারাবাহিকভাবে সুদীর্ঘ কাল ধ'রে পত্রব্যবহার করেননি। রবীন্দ্রনাথ-অমিয় চক্রবর্তীর পত্রালাপের স্বাদসৌরভ তাই একেবারেই আলাদা। বাংলা সাহিত্যে এরকম কিছুই নেই যা তুলনীয়। কনিষ্ঠ কবিকে কোনো-কোনো জগজ্জয়ী য়ুরোপীয় কবির লেখা পত্রগুচ্ছের কথা আমরা জানি। বিশেষ ক'রে মনে পড়বে রিল্‌কে-র *Letters to a Young Poet* বইটির কথা, কিন্তু সেও তো স্বগতোক্তি। কনিষ্ঠের চিঠিপত্র কোথাও মর্যাদা বা গুরুত্ব পায়নি। মানুষের ইতিহাসে কালেভদ্রে ঘটে এমন এক বিরল যোগাযোগের ফলে বর্তমান পত্রগুচ্ছ রচিত হয়েছিলো।

রবীন্দ্রনাথের নিবিড় সংসর্গে কী ক'রে পৌঁছেছিলেন আসাম-গৌরীপুরের বড়ুয়া রাজাদের দেওয়ানপুত্র, সেটা সংক্ষেপে ব'লে নেওয়া দরকার। পিতা দ্বিজেশচন্দ্র ছিলেন পুরোপুরি ভিক্টোরিয় মনোভাবের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। আদর্শে পুত্রদের নিষ্ঠা থাকবে, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হ'য়ে পরিশ্রমী বিদ্যাচর্চার মধ্য দিয়ে সমাজে তারা সফলতা ও যশ অর্জন করবে এই ছিলো তাঁর আকাঙ্ক্ষা। নারীপ্রগতি বা কাব্যে রাবীন্দ্রিক ব্যাপারটা তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারতেন না, কবিতা জিনিসটাই বোধ করি তাঁর মনোযোগের এলাকার বাইরে ছিলো, যদিও পারিবারিক সান্ধ্যবাসরে মাঝে-মাঝে 'রবীন্দ্রবাবু'র ছোটোগল্প তিনি উৎসাহভরে পুত্রকন্যাদের প'ড়ে শোনাতেন। পারিবারিক আর একটা উৎসাহ ছিলো Psychical Research বিষয়ে— উনিশ শতকের শেষ দিকে ইংলণ্ডের বহু প্রখ্যাত ব্যক্তিরা যা-নিয়ে হঠাৎ মেতে উঠেছিলেন। আত্মা কী, পরলোক কী, মৃত্যুর পরে বিদেহী আত্মার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করা সম্ভব কিনা— এইসব ছিলো বিলিতি রিসার্চ সোসাইটির গবেষণার বিষয়। Oliver Lodge, William James, Myers, এমনকি Conan Doyle-এর অতিবিশ্বাসী শেষ পর্যায়ের বহু রচনা গৌরীপুরের বাড়িতে ছিলো। পুত্রেরাও সে-বিষয়ে ক্রমে কৌতূহলী হ'য়ে উঠেছিলেন তা বলাই বাহুল্য।

মেধাবী জ্যেষ্ঠপুত্র অরুণকে দ্বিজেশচন্দ্র বিজ্ঞান পড়তে পাঠিয়েছিলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অরুণ ইংরেজিতে প্রথম হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় পুত্র অমিয়র প্রতি পিতার বিশেষ ভরসা ছিলো না। রুগ্‌ণ, নিঃসঙ্গ, মনমরা ছেলেটি কবিতা লেখে, দেশবিদেশের বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকে, লাউখাওয়া বিলের ধারে চুপচাপ ব'সে কীসব ভাবে, এবং বিশ্বের খ্যাতিমান সব লেখকদের সঙ্গে তার ঘনঘন পত্রালাপ চলে— এই পুত্রটিকে তিনি ঠিক রকম বুঝে উঠতে পারতেন না। তাকেও অবশ্য প্রেসিডেন্সি কলেজের চত্বরে হেয়ার স্কুলেই পাঠানো হ'লো, ঠিক করা থাকলো সেও ইশকুল পাশ ক'রে সেই কলেজেই সাহিত্যের ছাত্র হবে।

হঠাৎ এক নিদারুণ দুর্ঘটনায় পরিবারের সব পরিকল্পনা কেমন এলোমেলো হ'য়ে গেলো। তাকে দুর্ঘটনাই জেনেছিলেন সবাই, যদিও ঠিক তা নয়,—কোনো রহস্যময় কারণে অরুণ আত্মহত্যা করলেন (৯ এপ্রিল ১৯১৭)। তরুণ বয়সে যেসব কারণ থাকতে পারতো সেসব কিছুই ছিলো না এই দুর্ঘটনার পিছনে। অমিয় চক্রবর্তী নিজে বর্তমান লেখককে জানিয়েছিলেন : 'যে ভয়ানক শোক পেয়েছিলাম তা আমার দাদার মৃত্যুজনিত ; আমার চেয়ে দেড় বছর বেশি বয়স, উজ্জ্বল সুন্দরশ্রী যুবা, সাহিত্যের দেশীবিদেশী প্রাঙ্গণে তাঁর স্বচ্ছন্দ যাতায়াত ছিল— আমাকেও সাহিত্যে তিনিই প্রবিষ্ট করেন। তিনি আত্মহত্যা করেন। কোনো কারণ ছিল না। পরলোকের ইঙ্গিত পাবার ব্যাকুলতা তাঁকে পেয়ে বসেছিল, সেই ইঙ্গিতই হল সম্পূর্ণ শেষ, এই জীবনের শেষ। ভরা পূর্ণিমায় পদ্মানদী নীচে বয়ে চলেছে, ঈশ্বরদি স্টেশানের কাছে ব্রিজের উপর রেল লাইনে শুয়ে জ্যোৎস্নায় নিমগ্ন ছিলেন— দার্জিলিং মেল তাঁর উপর দিয়ে চলে গেল।'

প্রেসিডেন্সি কলেজের উপর থেকে পিতার মন তাই উঠে গেলো, পরিবর্তে হাজারিবাগের নিরিবিলিতে আইরিশ মিশন পরিচালিত সেণ্ট কোলাম্বা-স্‌ কলেজের কথা ভাবলেন। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের মনে দাদার মৃত্যু যে-রকম অপরিসীম বিষাদের সৃষ্টি করলো তা নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তার অবধি ছিলো না। 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যায় (১৩৯৭) পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত চিঠিপত্রে দেখা যায় যে এ-বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং প্রমথ চৌধুরী। ছেলেটির মধ্যে কোনো ভাবী সম্ভাবনার আভাস তাঁরা নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন, খুবই স্নেহ করতেন তাকে। 'সবুজ পত্রে'র সম্পাদক মাত্র বছরখানেক আগেই এই বালককে, তার কবিতার খাতা সমেত, শান্তিনিকেতনে কবির সমীপে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাঁর এখন মনে হ'লো, কেউ যদি পারেন তো একমাত্র রবীন্দ্রনাথই এই উদ্‌ভ্রান্ত তরুণকে আত্মহননের হঠাৎ প্রবৃত্তি থেকে রক্ষা করতে পারবেন। রবীন্দ্রনাথকে সেকথা জানিয়ে তিনি চিঠি লিখলেন। এসব ঘটনার বহুকাল পরে অমিয় চক্রবর্তী বর্তমান লেখককে জানিয়েছিলেন যে তাঁর এই প্রবৃত্তির পিছনে কোনো 'romantic agony' ছিলো না, ছিলো তাই যাকে জর্মান ভাষায় বলা হয় 'Weltschmerz' বা বিশ্ববিষাদ। এ-প্রসঙ্গ পরে আবার আসবে।

অথচ রবীন্দ্রনাথের হৃদয়মনও তো সে সময়ে ছিলো অন্য এক রকমের বিষাদে আচ্ছন্ন, 'ভয়ানক একটা সঙ্গহীনতা' পীড়িত করছিলো তাঁকে। প্রমথ চৌধুরীকে লিখছেন :

'জীবনটাকে তো ত্যাগ করতেই হবে... সেই ত্যাগটা যাতে নিছক লোকসান না হয় সেদিকে ভিতর থেকে বার বার তাগিদ আসে।... যে-জীবনটা এতদিন বহন করে এসেছি সেটাকে আর খাতির করতে পারিনে— তার বোঝা এইবার নামাব। তোমার কাছে সমস্তটাই খোলসা করেই বল্লুম।' ('চিঠিপত্র' ৫ম, পৃ. ২১৬-১৭)। এ-অবস্থায় মানসভারে পীড়িত এই তরুণের দায়িত্ব নেওয়া কি সম্ভব? প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে-পত্রগুচ্ছ 'চিঠিপত্র' ৫ম খণ্ড ও পূর্বোক্ত সাহিত্য সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ তারিখ মিলিয়ে তুলে নিলে এইরকম দাঁড়ায় :

রবীন্দ্রনাথ (৩০ অক্টোবর ১৯১৭) : 'আমি ওকে [ অমিয় চক্রবর্তীকে ] এখানে আমার কাছে আসতে বলেছি। কিন্তু আমি কি ওর এই এক-ঝোঁকা পাগলামিকে শুধরে তুলতে পারব? যদি বা কিছুদিনের জন্য ওর মনটাকে সুস্থ করতে পারি কিন্তু আবার একদিন কল বিগড়ে যাবে। এইসব জিনিসের একটা পালা আছে, এইজন্যে আমার ভয় হয় ওর এই মনোবিকার থেকে শেষ পর্যন্ত ওকে বাঁচানো শক্ত হবে।'

প্রমথ চৌধুরীর উত্তর (১ নবেম্বর ১৯১৭) : 'আজ মাসখানেক আগে অমিয় আমাকে তার সংকল্পের কথা বলে। আমি তাকে নিরস্ত করার ঢের চেষ্টা করেছি। আমি যতই তাকে বোঝাই পড়াই তার উত্তর এক—"আপনার সব কথা সত্য, তবু—"। ...অমিয়র "অশেষ দুঃখ" সব কাল্পনিক, এক তার ভাইয়ের মৃত্যুযন্ত্রণা ছাড়া। আসল কথা তার ভাইয়ের আত্মহত্যা তার মনের উপর hypnotic suggestion-এর কাজ করছে। কি করে তাকে de-hypnotise করা যায় সেইটেই হচ্ছে সমস্যা। ...তার এই সংকল্পটাকে ক্রমান্বয়ে মুলতুবি করিয়ে তাকে বাঁচানো যাবে যে-উপায়ে শুক ['শুক সপ্তসতী'-র ] বণিকপত্নীর সতীত্ব রক্ষা করেছিল।'

রবীন্দ্রনাথ (৩ নবেম্বর ১৯১৭) : 'ইতিমধ্যে অমিয়র আর কোনো চিঠিপত্র না পেয়ে উদ্বিগ্ন আছি। তুমি কোনো খবর পেয়েছ কি? এখানে আমার কাছে এলে আমি তাকে কী উপায়ে বল দেব তাই ভাবছি। আমার নিজের জীবনের যেটুকু সম্বল সে এত ভিতরের দিকে যে, সে তো কারো হাতে তুলে দিতে সহজে পারিনে। জীবনকে ছাড়িয়ে যে কথা যায় সেই কথা নিয়ে আমি বেঁচে আছি কিন্তু অমিয়র মত ছেলেমানুষকে সেখানকার খোরাক দিতে চাইলে সে তা নিতে পারবে না— তার কাছে এ সমস্ত খুবই ফাঁকা ঠেকবে। আমি সন্ধ্যার সময় ছাতের উপর একলা ব'সে কাটাই— ওর কাছে আমার নিস্তব্ধতা আরো বেশি বিষাদের ভার বাড়িয়ে তুলবে। এই জন্যে ওর এই দায়িত্ব নিতে আমার ভারি ভাবনা হচ্ছে। ওর সম্বন্ধে তুমিই বা কী ভাবছ আমাকে লিখো।'

প্রমথ চৌধুরী (৬ নবেম্বর ১৯১৭) : 'সে এখন হাজারিবাগে। সেখানকার St. Columbus (sic) কলেজে সে ভর্তি হয়েছে। হাজারিবাগ গিয়ে তার মন ভাল হয়ে গিয়েছে। জায়গাটা তার এত ভাল লেগেছে যে সে লিখেছে যে ওখানে থাকলে তার মনের অশান্তি সব

ঘুচে যাবে। তার চিঠির ভাবে মনে হল এ যাত্রা তার আত্মহত্যার ফাঁড়া কেটে গেল। ... অমিয় ছোকরা, তার মন যে শুধু কাঁচা তাই নয় তার উপর আবার রুগ্‌ণ, ও মনকে সুস্থ করতে হলে সসীমের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখাই দরকার। ওর মনের যথার্থ চিকিৎসা সংসারের মায়া বাড়ানো, কাটানো নয়।'

আশ্বস্ত হয়ে একই দিনে (৯ নবেম্বর) রবীন্দ্রনাথ উভয়কে লিখছেন—

প্রমথ চৌধুরীকে : 'অমিয়র সম্বন্ধে খুব নিশ্চিন্ত হয়েছি।'

অমিয় চক্রবর্তীকে : 'যখন তুমি জীবনের উৎসাহরসে তোমার পেয়ালা ভরে নেবার জন্যে আমার কাছে আসতে চেয়েছিলে তখন আমার বড় ভাবনা হয়েছিল। কেননা উৎসের কাছে গিয়ে দেখি তার ধারা ভিতরের দিকেই চলে গেছে, বাইরের দিকে আর উছলে ওঠে না। সেই আমার অন্তর্হিত প্রবাহের শুষ্কতা তোমাকে হয়তো আরো ক্লিষ্ট করবে এই আমার ভয় ছিল। তুমি ঠিক জায়গাতেই [ হাজারিবাগে ] গেছ —প্রকৃতি জীবনের ক্ষতস্থানে হাসপাতালের মত ব্যাণ্ডেজ বাঁধাবাঁধির উৎপাত করে না ; সে মন্ত্র পড়ে চুম্বন করে দেয়। তার আদরের অ্যান্টিসেপটিকে না আছে জ্বালা, না আছে কড়াগন্ধ।'

এর পর থেকে অমিয় চক্রবর্তী যতদিন না মনের দিক থেকে সুস্থ হলেন, তাঁকে কড়া শাসনে রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ, কখনো প্রশ্রয় দেননি। অসুখ হয়েছে লিখলে বলতেন অসুখটা তার দেহের নয়, মনের। এবং সেই মন যাতে বৃহৎ বিশ্বের বিচিত্র কাজের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে, 'আত্মগুহান্ধকারশায়ী ব্যর্থতার মোহাবরণ থেকে' উদ্ধার পায়, তার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করেননি। 'চিঠিপত্র' ১১শ খণ্ডে প্রথম দিককার চিঠিগুলোর এই হচ্ছে পশ্চাৎপট।

বিশ্বপ্রকৃতি জীবনের ক্ষতস্থানে হাসপাতালের মতো ব্যাণ্ডেজ বাঁধাবাঁধির উৎপাত করে না— কবির এই কথাগুলি অমিয় চক্রবর্তী ভুলতে পারেননি, বহুকাল পরে 'খসড়া'-র "হাসপাতাল" কবিতাটি নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি অবলম্বনেই লেখা হয়েছিলো—

'ফুলগুলো ঝরে বিনা খরচায়
বিনা ব্যাণ্ডেজে পাতা নাবে।'

কবিতাটি বিশেষ ভালো লেগেছিলো রবীন্দ্রনাথের, 'নবযুগের কাব্য' প্রবন্ধে লিখেছিলেন : 'খসড়া' বইটিতে "হাসপাতাল" বলে যে-কবিতা বেরিয়েছে তার লেখার ছাঁদ একেবারেই আমাদের ধরনে নয়। কিন্তু তার মধ্যে যে একটি অনুভূতির রহস্যময় ছবি দেখা দিয়েছে তাকে আদর করে মেনে নিতে হবে। কেননা ঠিক এই ছবির বিশেষ রসটা অন্য কোনো ভঙ্গির মধ্যে প্রকাশ পেতে পারত না।' তিনি নিশ্চয়ই ভাবতেও পারেননি যে এ-কবিতার পিছনে রয়েছে প্রায় কুড়ি বছর আগে তাঁরই লেখা কোনো একটি চিঠি। সব কবিতাই অল্পবিস্তর স্বয়ংসম্পূর্ণ ব'লে জানি আমরা, কিন্তু বাস্তব জীবনে তার উৎস খোঁজা নিরর্থক

একথা সব সময় মেনে নেওয়া কঠিন।

কাজেই, তরুণ অমিয় চক্রবর্তী সেই থেকে হাজারিবাগের কলেজ হস্টেলে বাস ক'রে কলেজ করতে থাকলেন। কিন্তু বিপ্লবীরা যাই বলুন, লৌকিক ছাড়া অন্য ধরনের কাব্যে-সাহিত্যে-শিল্পে জনগণেশ চিরকালই নিরুৎসুক। জনতার সেই পৃথিবীর সঙ্গে বনিবনা রাখা তরুণ কবির পক্ষে কঠিন হ'য়ে উঠেছিলো। হাজারিবাগে হস্টেলের একলা ঘরে বিজনে ব'সে তিনি কাব্যচর্চা করেন, ওস্তাদ রেখে যন্ত্র বাজানো শেখেন, সাইকেলে লোকালয় ছেড়ে দূরের বনে গিয়ে গাছের ডালে ব'সে ভারি-ভারি বই পড়েন, বা চিঠি লেখেন, গুল্মোরের পুষ্পিত পল্লবে চক্রযানটিকে সজ্জিত ক'রে বিকেলে হস্টেলে ফেরেন —অর্থাৎ নির্ভেজাল একটি বিশুদ্ধ 'কবি'র জীবনযাপন করতে চান। বেহারী ছেলেরা তা নিয়ে শুধু হাসাহাসি করে না, উপদ্রবও করে। তাছাড়া, যেটা তিনি কখনো আশা করেননি, কবি রবীন্দ্রনাথও কিনা ক্রমাগত তাঁকে এই 'কবিজীবনে'র চর্চা থেকে নিবৃত্ত করতে চান! প্রত্যহের সংসারে হাজার বিসদৃশ সমস্যায় বিজড়িত থেকেও একই সঙ্গে নিজস্ব গোপন কবিসত্তাকে কী ক'রে লালন করা যায় তা নিয়ে তরুণ অমিয় চক্রবর্তীর তাই অন্তর্দ্বন্দ্বের সীমা ছিলো না। মিশনের কর্মীদের সঙ্গে হতদরিদ্র গ্রামে গিয়ে কলেরারোগীর সেবা করার পাশাপাশি কাব্যচর্চাও বজায় রাখা সহজ মনে হয় না। অথচ কবি তাকে লেখেন, 'আমার লেখাতে তোমার মন যে নিজের দিক থেকে সংসারের দিকে ফিরেচে— যে-অস্ত্রে সে নিজেকে হনন করছিল সেই অস্ত্রকে মিথ্যার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে উদ্যত হয়েছে এতে আমি বড় আনন্দ পেয়েছি। আশীর্বাদ করি তুমি জয়ী হও, তুমি সার্থক হও, এবং দুর্গমপথে তিনিই তোমার চিরসঙ্গী হোন যাঁর অভয় সিংহাসন মানুষের অমর আত্মায়।' ('চিঠিপত্র' ১১শ, ১২)। বর্তমান লেখককে অমিয় চক্রবর্তী লিখে জানিয়েছিলেন: 'প্লেটো বলেছিলেন আমরা গুহার ভিতরে আছি, অথচ জানি এই গুহাটা সব নয়। অপার্থিব অলোক আলোক চতুর্দিকে। "আত্মগুহান্ধকারশায়ী" আমার বিশেষ অবস্থার বাহিরে রবীন্দ্রনাথ আমাকে আহ্বান করেছিলেন। যদি সাড়া দিয়ে থাকি তার প্রবর্তনা অবশ্য আত্মনিহিত।' কাব্য এবং জগতের সম্পর্ক বিষয়ে বোঝাপড়া ক'রে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে তাঁকে তাই বিশ্বভারতীর কবির কাছেই ফিরতে হয়েছিলো।

প্রথম হ'য়ে পাটনায় বি. এ. পাশ করলেন কিন্তু প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা মেনে তক্ষুনি আর এম.এ. ক্লাসে ভর্তি হ'তে ইচ্ছে করলো না। সেটা ছিলো বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার বছর, একে-একে বিদেশের মহাপণ্ডিতেরা কবির আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছচ্ছেন। পারিবারিক ইচ্ছা অমান্য ক'রেই, কবির পরামর্শে তিনিও শান্তিনিকেতনে যোগ দিলেন (সেপ্টেম্বর ১৯২১)। ছাত্র বা শিক্ষক কোনো হিশেবেই নয়, কবির সদাসান্নিধ্যে দেহের মনের শুশ্রূষার আশায়, স্বাধীনভাবে ভিতরকার সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে। তার ফলে এম.এ. পাশ করার বয়সটা অবশ্য পিছিয়ে গেলো (১৯২৬), ডক্টরেট করতে লাগলো আরও এগারো বছর (১৯৩৭)। ভাগ্যিস বিলম্ব করেছিলেন, জীবনের ধারা নয়তো কোন পথে চ'লে যেতো বলা যায় না।

কী তাঁর কাজ ছিলো তখনকার (১৯২১-২৫) সেই স্বর্ণযুগের শান্তিনিকেতনে? তাঁর বিশেষ দায়িত্ব ছিলো— য়ুরোপীয় প্রসিদ্ধ জ্ঞানী যাঁরা এলেন তাঁদের সহায়তা করা, দেশবিদেশ থেকে সমাগত অতিথিদের পরিচর্যা করা। এবং সে-কাজের জন্যে যোগ্যতর ব্যক্তি আর কেউ ছিলেন না বললে অত্যুক্তি করা হয় না। রবীন্দ্রনাথ পরে (১৯৩৩) তাঁকেই মনে করিয়ে দিয়েছেন : 'তুমি এখানে অতিথিশালার দ্বারে বাস করতে—দূরদেশ থেকে আগন্তুকরা আসত— তুমি ছিলে সেই প্রবাসীদের বন্ধু।... তুমি জান আমরা বেদ থেকে যে বাক্যটি মন্ত্ররূপ গ্রহণ করেচি : "যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ং"— শান্তিনিকেতনের সেই বিশ্বনীড়ে তুমিই অভ্যর্থনার ভার নিয়েছিলে।' ('চিঠিপত্র' ১১শ, ২৯)। সেই সঙ্গে দু-চারটে ক্লাসও নিতে হ'তো, বিশেষ ক'রে ইংরেজি কাব্য সাহিত্যের প্রসঙ্গে। (কবি বলতেন— 'অমিয়র ইণ্টারন্যাশনাল ক্লাস'।) ক্লাস পড়ানোর সঙ্গে নিজেও শিখতেন সংস্কৃত, কিছু জর্মান, কিছু ফরাসি। গানও শিখতেন একটু আধটু। তা ছাড়া বিদেশীদের অনুবাদ-চর্চার কাজেও সহায়তা করতে হ'তো। (এই ভাবেই তৈরি হয়েছিলো শিল্পী আঁদ্রে কার্পেলেস-এর করা 'নালক' এবং 'ক্ষীরের পুতুল'-এর ফরাসি তর্জমা। প্যারিস থেকে উৎকৃষ্ট সংস্করণ বেরিয়েছিলো, এখন দুর্লভ, রবীন্দ্রভবনে কপি আছে। দুই গ্রন্থেই অমিয় চক্রবর্তীর নাম ছাপা আছে যুগ্ম-অনুবাদক বা সহায়ক হিশেবে।) বাকি সময়টা ছিলো পুরোপুরি কাব্যচর্চার জন্যে নির্দিষ্ট। 'মহর্ষির তৈরি বড় বাড়িতে একটি সবুজ-দরজা-অলা ছোট ঘর ছিল, আমলকী বীথির কাছেই, ঘরটিতে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই ঘরে ব'সে পড়া এবং লেখা চলত।... শান্তিনিকেতনে তখন যেন হাওয়ায় ভেসে বেড়াতাম। এত উৎসাহ, এত বিচিত্র আনন্দ, কবির সান্নিধ্যই সব আনন্দের সঙ্গে যুক্ত।' (বর্তমান লেখককে লেখা চিঠি থেকে)

কলাকৈবল্যবাদীর জীবনচর্চা তখনো চলছে। জয় নামে তাঁর ব্যক্তিগত ভৃত্য, মারা গেছে, সেদিনও বলতো সেই সব দিনের কথা। ছাতা হাতে অমিয় চক্রবর্তীকে বেরোতে দেখলেই, জয় দূর থেকে অলক্ষ্যে তাঁর পিছু নিতো, জানতো যে রোদের তাপ একটু মোলায়েম হ'লেই ছাতাখানি তিনি, আর কী দরকার ভেবে, অবলীলায় পাশের কোনো ঝোপঝাড়ে ফেলে দেবেন! জয় সেটি কুড়িয়ে নিতো। এই 'বাজে' জগৎটাকে তুচ্ছ করতে না পারলে কী ক'রে কবি হওয়া যায়, এই রকমই ছিলো তখনকার তাঁর মনের ভাব। কাজেই চিঠি লিখে এক সময় কবিকে সে-বিষয়ে সতর্ক করতে হয়েছিলো তাঁকে : 'এই বাজে জগৎটা জগতের পনেরো আনা অংশ। বাকি জগৎটাতে আর্টিস্টের দল নির্বাসিত। তারা মাঝে মাঝে তুলি চালায়, গান গায়, আর বাকি সময়টা হায় হায় করে, কি-জানি-কি খোঁজে আর তাদের এই এক-আনী জগতের বন্ধ দরজায় মাথা ঠুকে মরতে থাকে। তোমাকে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়তে হবে— তাতে তুমি যে ঘষটানি পাবে তাতে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না— ভালই হবে— মজবুৎ হয়ে উঠবে।' ('চিঠিপত্র' ১১শ, ২০) সেই থেকে সারাটা জীবন অমিয় চক্রবর্তী ঐ মজবুত হ'য়ে ওঠার চেষ্টা ছাড়েননি, তাঁর পরিণত কবিতার মধ্যেও মসৃণ পেলবতাকে ঢুকতে দেননি কোথাও, যা ছিলো

শান্তিনিকেতন পর্বের শেষ পর্যন্ত তাঁর লেখা কবিতার প্রধান লক্ষণ:

'নিরালা, ফুলের মালা, কিছু নয় মিছে
চাঁদের আলোতে রাতি স্বপনে চলিছে।'

('কাব্যসংগ্রহ' ১, পরিশিষ্ট)

এই রকম কোমল এবং কান্ত কবিতাই তো তিনি লিখতেন একসময়।

কিন্তু তাঁর সাহিত্য-শিল্পের চর্চায় কোনো খাদ ছিলো না। উনিশশো বাইশ-তেইশ সালের শান্তিনিকেতন পল্লীতে ব'সে তাবৎ বিশ্বের শিল্পজগতে কোথায় ভালোমন্দ কী ঘটছে তার খোঁজ রাখতেন, এবং ঐ বয়স থেকেই সে-সব সংবাদ স্বয়ং কবির মানসগোচরে আনার চেষ্টা করতেন। ওখানেই হঠাৎ তাঁর হাতে আসে রোম থেকে প্রকাশিত *Broom* নামে মাসিকপত্রের কয়েকটি সংখ্যা। পত্রিকাটি ছিলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর য়ুরোপীয় আধুনিকতার অন্যতম প্রধান মুখপত্র। খুবই বৈপ্লবিক তার মতামত ও ধরনধারণ। অনুমান করি ঐ সুদুর্লভ এবং নাক তোলা পত্রিকাটির দ্বিতীয় কোনো সেট ভারতবর্ষে আর কেউ দেখেনি। শান্তিনিকেতনে এনেছিলেন য়ুরোপীয় অতিথিদেরই কেউ, মনে হয় ফরাসি শিল্পী আঁদ্রে কার্পেলেস, যাঁর সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর বন্ধুতা গ'ড়ে উঠতে দেরি হয়নি, একত্রে দুজনে অনুবাদচর্চাও করেছেন। পুরাতনকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করার স্পর্ধিত সম্মার্জনীস্বরূপ এই আন্তর্জাতিক শিল্পমাসিকটির সম্পাদক ছিলেন লোয়েব, Harold Loeb। প্রথম বেরোয় ১৯২১ সালের জানুয়ারি মাসে। বছর শেষ না হ'তেই পত্রিকার মূল অপিস মুসোলিনির রোম থেকে তড়িঘড়ি বার্লিনে স'রে যায়, বার্লিনও তেতে উঠছে দেখে অপিস চ'লে যায় ন্যুইয়র্কে। পত্রিকাটি মোট বছর ছয়েক চলেছিলো। লেখক এবং শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন—পিরানদেল্লো (এঁর 'নাট্যকারের সন্ধানে' নাটকের তর্জমা 'ব্রুম'-এ বেরিয়েছিলো ১৯২২ সালেই), ভার্জিনিয়া উলফ, ইলায়া এরেনবুর্গ, আর্নস্ট টোলার, লুই আরাগঁ, পল এলুয়ার, হুয়ান গ্রীস, এডুইন মূর, আপোলিনেয়ার, ই. ই. কামিংস, পিকাসো, পাউল ক্লে, হান্স আর্প, আঁদ্রে দেরাইয়াঁ, আঁরি মাতিস এবং আরো অনেকে, পরে যাঁদের অনেকেই জগদ্‌বিখ্যাত হয়েছিলেন। পত্রিকাটির উপর বিশেষ প্রভাব ছিলো 'Constructionist' শিল্পীলেখকদের। ১৯২২-এর অক্টোবর সংখ্যায় 'The Aesthetic of the Machine and Mechanical Introspection in Art' নামে প্রবন্ধ লিখেছিলেন ইতালীয় 'কনস্ট্রাকশনিস্ট' লেখক Enrico Prampolini। প্রবন্ধের প্রধান বক্তব্য ছিলো: '...the process of the construction of a machine is analogous to the constructive process of a work of art'। প্রবন্ধে ইনি দাবি করেছিলেন যে শিল্পে সাহিত্যে এই বিপ্লবী আন্দোলনের উদ্ভব হয় প্রথমে ইতালিতে, এবং পরে তা রাশিয়া, হল্যাণ্ড, জর্মানি ও স্পেইনে ছড়িয়ে পড়ে। Prampolini-র এই প্রবন্ধ থেকে দীর্ঘ একটি উদ্ধৃতি রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে তুলে দিয়ে অমিয় চক্রবর্তী কী মন্তব্য জুড়েছিলেন তা এই গ্রন্থের ৩-সংখ্যক চিঠিতে দ্রষ্টব্য। আমার বিশ্বাস, বিশ্বভারতীর কলাভবনে 'ব্রুম' পত্রিকার যে-তিনটি সংখ্যা এখনো সযত্নে রাখা আছে সেগুলি রবীন্দ্রনাথেরও নিজের পড়া। এমন-

কি চিত্রকলার চর্চা করার সময় Constructionist-দের রীতিপদ্ধতি নিয়ে তিনিও যে একটু-আধটু খেলা করেননি তা জোর ক'রে বলা যায় না। এর বছর কয়েক পরে রবীন্দ্রনাথ যখন রাশিয়ায় গেলেন তখনকার একটি ক্ষুদ্র ঘটনা এই সূত্রে মনে পড়ে। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এই ভ্রমণের তথ্যসম্বলিত যে-পুস্তিকাটি বিশ্বভারতীর জন্যে লিখে দিয়েছিলেন তাতে তিনি, আপাতদৃষ্টিতে অকারণে, কিন্তু নিশ্চয়ই তার গুরুত্ব বুঝেই, উল্লেখ করেছিলেন যে মস্কো রেলস্টেশনে কবিকে যাঁরা স্বাগত জানাতে আসেন তাঁদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন একটি রুশ 'কনস্ট্রাকশনিস্ট' শিল্পী। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর নিশ্চয়ই দেখা হয়েছিলো, কিন্তু আর কিছু জানা যায় না। মনে হয় সেই ১৯৩০ সালেও এই অত্যাধুনিক শিল্পীগোষ্ঠীকে দূর-দূর ক'রে খেদিয়ে দেননি মহামতি স্টালিন। আধুনিক-পন্থী সেই শিল্পীরা নিজেরা অবশ্য বিশ্বাস করতেন যে তাঁদের শিল্পকর্ম ছিলো রুশ-বিপ্লবেরই সহায়ক। অনতিকাল পরেই অবশ্য বাধ্য হ'য়ে এঁরা দেশত্যাগী হন। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা প্রসঙ্গে সঙ্গত কারণেই জর্মান 'এক্সপ্রেশনিস্ট'-দের উল্লেখ করা হয়। 'কনস্ট্রাকশনিস্ট'-দের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সমর্থন বা অনুকম্পা না-থাকাই সম্ভব, কিন্তু যোগাযোগ একটা যে ছিলো তার অন্তত উল্লেখ থাকা বোধকরি মন্দ নয়। প্রাম্পোলিনি সম্প্রদায়ের উপর অমিয় চক্রবর্তীর তখনকার বিরাগ পরে বোধকরি কিঞ্চিৎ হ্রাস পেয়েছিলো, কিন্তু ১৯২২ সালের বাংলা দেশে ব'সে তাঁদের সম্পর্কে চিঠিতে তিনি যে আলোচনা করেছিলেন সেটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

এই পর্বের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা ডাক্তার-সহিত্যিক হ্যাভেলক্ এলিস্-এর একটি চিঠি। তরুণ বয়স থেকেই সাহিত্যিক এলিস-এর সঙ্গে, যেমন অন্য অনেকের সঙ্গে, অমিয় চক্রবর্তীর পত্রালাপ ছিলো। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও এলিস্-এর পরিচয় হয়েছিলো কিনা জানা যায় না, তবে কবির ইংরেজি রচনার সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় হয়েছিলো। এলিস্ তাঁকে আধুনিক বিশ্বের এক শ্রেষ্ঠকবি ব'লেই মান্য করতেন। রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে *The Golden Book of Tagore* (১৯৩১) নামে যে-গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় তাতে কবিকে নমস্কার জানিয়ে হ্যাভেলক এলিস-এরও লেখা আছে। এই হ্যাভেলক্ এলিস্ ১৯২৫ সালে তরুণ অমিয় চক্রবর্তীকে তাঁর একটি বিশেষ অতৃপ্তির কথা জানিয়েছিলেন : একালের এই মহাকবির কাব্যে শুধুই কেন চিরায়ত গ্রামজীবনের চিত্রকল্পের ব্যবহার— নদী, নৌকো, খেয়াপারাপার, হাটের পথ? জাহাজ ট্রেন এরোপ্লেন প্রভৃতি বিজ্ঞানের দানও তো মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তার কোনো স্বীকৃতি কেন নেই। এই ছিলো হ্যাভেলক এলিস্-এর জিজ্ঞাস্য। পূর্বে এ-ধরনের প্রশ্ন আর কেউ তুলেছিলেন ব'লে জানি না। এলিস্-এর মূল চিঠিটা ছাপা হ'য়ে থাকলেও আমি দেখিনি, কিন্তু তাঁর সে-চিঠির বিষয়-বস্তু সম্পর্কে অমিয় চক্রবর্তীর ২ সংখ্যক চিঠি পড়লেই ধারণা করা যায়। রবীন্দ্রনাথকে এলিস-এর চিঠি পাঠিয়ে দিলে তিনি তাঁর অনুপম ভাষায় ভঙ্গিতে অমিয় চক্রবর্তীকে যা লিখেছিলেন 'চিঠিপত্র' ১১শ খণ্ডের ৪১ পৃষ্ঠা খুলে তার সবটা একবার প'ড়ে দেখা

দরকার। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানমনস্কতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোনো বিরাগ ছিলো না সে-কথা বলাই বাহুল্য। গদ্যরচনায় তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের ফলাফল বিষয়ে কবির মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিলো। এমনকি রেল গাড়িকেও তিনি দেখেছেন বিজ্ঞানের 'বাহাদুরী' হিশেবে : 'সেখানে স্থূলকে দেখি অনির্ব্বচনীয়কে দেখিনে ত। তাই বাহবা দিই, কিন্তু সে বাহবায় ছন্দ আসে না।' সত্যিই জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছবার আগে পর্যন্ত সে-সব 'স্থূল' জিনিসকে তিনি নিজের কবিতায় প্রবেশ করতেই দেননি। খুবই সুন্দর ক'রে, খুবই জোরের সঙ্গে এই বিরোধিতার কথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন অমিয় চক্রবর্তীকে। তিনিও আপাতত সানন্দেই মেনে নিয়েছিলেন কবির সেই বক্তব্য। কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন থেকেই গেলো, নয়তো কবির এই মনোভাবের সম্পূর্ণ বিরোধী একটি প্রবন্ধ— 'দুটি ইংরিজি কবিতা'— অক্সফোর্ড থেকে তিনি সুধীন্দ্রনাথের 'পরিচয়' (বৈশাখ ১৩৪২) পত্রিকার জন্যে উৎসাহ ভরে লিখে পাঠাতেন না। অনুবাদ সমেত দুটি সাম্প্রতিক ইংরেজি কবিতা ছিলো এই প্রবন্ধের আলোচ্য। দুটি কবিতাই রেলগাড়ি অবলম্বনে রচিত : স্পেণ্ডারের "এক্সপ্রেস ট্রেন", উইনিফ্রেড হোল্টবি-র "ফ্রান্সের ট্রেন"। রবীন্দ্রনাথকে চিঠিতে লিখেও দিলেন প্রবন্ধটির কথা, তাঁর যাতে দৃষ্টি এড়িয়ে না যায়। পাদটীকায় রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতারও উল্লেখ ছিলো। পরে অক্সফোর্ড থেকে ফিরে এসে, অনেক বেশি বয়সে যখন তাঁর প্রথম কবিতার বই 'খসড়া' (১৯৩৮) বার করলেন, তাতে দেখা গেলো প্রায় প্রতিটি কবিতার প্রসঙ্গ বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি-বিজ্ঞান : 'ট্রেন চ'ড়ে কালের জগৎ/মধ্য-এশিয়ায় ছোটে', 'চাঁপার কলিতে, কবি, ধরো অনুবীক্ষণ যন্ত্র'— এইরকম পাতায়-পাতায়। তাঁর কবিতায় সমুদ্র হ'য়ে ওঠে 'নীল কল', মর্চে-পড়া যার লক্ষ লক্ষ চাকা, শব্দের ভিড়ে পুরনো কোনো ফ্যাক্টরিতে! অকাশভরা তারা হ'য়ে ওঠে 'রেডিয়ম জ্বালা সময়', শূন্য জুড়ে দপ্ দপ্ করছে! রবীন্দ্রনাথের কি ভালো লাগবে? ভয় এবং কৌতূহল ছিলো। এই সব কবিতায় আরো মিশে আছে অবচেতন মনের কারিগরি, তাই বা কবির কেমন লাগবে? 'খসড়া'-র কপি পাঠিয়ে কবিকে লিখলেন : 'বিজ্ঞান-জ্বালা অধ্যাত্মশক্তিও কাব্যে দেখা দিতে বাধা নেই এই নিয়ে আপনার দুচার কথা পেলে আমাদের নতুন একটি কল্পনার দ্বার খুলবে। আপনার আশীর্বাদ আমি চাই ; জানি বইয়ে যা বলতে চেয়েও পারিনি শক্তির অভাবে, তা আপনি আমাদের বোঝাবেন।' (চিঠি ৬৭, ২১ ডিসেম্বর ১৯৩৮)। শক্ত আবেদন। এর সঙ্গে ১৯২৫ সালে লেখা অমিয় চক্রবর্তীর ৩ সংখ্যক চিঠি মিলিয়ে পড়লেই বোঝা যাবে কতটা তিনি দূরে স'রে এসেছেন। একটা যেন জন্মান্তর ঘ'টে গেছে এই কয় বছরে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ উত্তরে কী লিখবেন? ঝাঁঝালো নতুন কবিতাগুলি তাঁর ভালো লাগছে না তা তো নয়, আবার সন্দেহও আছে কিছু কবিতার সার্থকতা বিষয়ে। শেষে লিখলেন : 'খসড়া সম্বন্ধে লিখব ঠিক করেছিলুম— এখন একটু সময় ছিলো— ভয় হোলো পাছে বাংলার আধুনিকরা মনে করে আমি তাদেরই জয়ধ্বনি করছি।' ('চিঠিপত্র' ১১শ, ১১০)। অমিয় চক্রবর্তীর আবেদনের কোনো সরাসরি উত্তর নেই এ-চিঠিতে। উত্তর

দিয়েছিলেন একটি ছড়া লিখে, 'অবচেতনার অবদান' শিরোনাম দিয়ে সেটি ছাপা হ'লো, আধুনিকতার ঘোষিত বৈরী মাসিকপত্র 'শনিবারের চিঠি'তে (অগ্রহায়ণ ১৩৪৬) : 'গলদা চিংড়ি তিংড়িমিংড়ি, লম্বা দাঁড়ার করতাল'। সঙ্গে ছিলো নুন ছিটোনো খানিকটা গদ্য ভূমিকা : 'অবচেতন মনের কাব্যরচনা অভ্যাস করছি। সচেতন বুদ্ধির পক্ষে বচনের অসংলগ্নতা দুঃসাধ্য। ভাবীযুগের সাহিত্যের প্রতি লক্ষ ক'রে হাত পাকাতে প্রবৃত্ত হলেম। ...কেউ কিছুই বুঝতে যদি না পারেন, তাহলেই আশাজনক হবে।'

আধুনিক কবিতা বিষয়ে এটাই রবীন্দ্রনাথের পুরো বক্তব্য হ'তেই পারে না। তাঁর বক্তব্যের বাকি অংশ আছে 'ছড়া'র মুখবন্ধে :

'বাঁধনটাকেই অর্থ বলি
বাঁধন ছিড়লে তারা
কেবল পাগল বস্তুর দল
শূন্যেতে দিকহারা।'

অর্থাৎ অবচেতন থেকে উঠে আসা চিত্রগুলি একটা বাঁধনে গ্রথিত না হ'লে শিল্প হ'য়ে ওঠে না। সে-কথা সর্বথা মান্য। কিন্তু 'শনিবারের চিঠি'-তে তাঁর চুটকিতে শুধু ঠাট্টাটাই ছিলো, আর কিছু নয়। তাই গভীর দুঃখ পেয়েছিলেন অমিয় চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথকে তীব্র ভাষায় লিখেছিলেন যে পরিহাস তখনই প্রাপ্য হয় যখন 'অন্তরের গভীর সামঞ্জস্যবোধের' অভাবে রচনা পর্যবসিত হয় ব্যর্থতায়। 'কিন্তু এর থেকে কেউ যদি বলে অবচেতনার রঙে একটু নতুন ধরনে রঞ্জিত কাব্যের স্থান কোথাও নেই এইটে আপনার বক্তব্য তাহলে কখনোই তা মানব না।' (৯৫ সংখ্যক চিঠি) কবি হিশেবে এই আত্মপ্রত্যয় লাভ করার জন্যেই আশ্রম ছেড়ে দূরে চ'লে যাওয়ার প্রয়োজন হ'য়েছিলো তাঁর, প্রথমে অক্সফোর্ডে, পরে ফিরে এসে লাহোরে। চিঠি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ অসন্তুষ্ট হননি। অমিয় চক্রবর্তীর প্রথম দুখানি কাব্যগ্রন্থের আলোচনা হিশেবে চার মাস পরেই 'প্রবাসী'-তে (চৈত্র ১৩৪৬) যখন তাঁর 'নবযুগের কাব্য' প্রবন্ধটি বেরুলো, দেখা গেলো 'শনিবারের চিঠি'-তে প্রকাশিত ঐ 'সহাস্য'কবিতার লক্ষ্য আসলে অমিয় চক্রবর্তী নন, কেননা কবি তাঁর কবিতায় কোনো 'যথেচ্ছ শৈথিল্যের ভঙ্গি' দেখতে পাননি। 'বেশের বদল ক'রেও যদি কাব্যই আবির্ভূত হয় তাকে অভ্যর্থনা করতে' তিনি কোনো কুণ্ঠা দেখালেন না। 'খসড়া'য়, 'একমুঠো'-তে আধুনিকের যে-চেহারা তিনি দেখলেন তা তাঁর প্রকাশ্য অনুমোদন এবং প্রশংসা লাভ করলো। তবে বিজ্ঞান ও কাব্যের সম্পর্ক নিয়ে দীর্ঘকাল ধ'রে চলা তর্কের কোনো আশু মীমাংসার লক্ষণ দেখা গেলো না। যে-সব জিনিশকে কবি এতকাল কাব্যে অপাংক্তেয় ক'রে রেখেছিলেন, সেই ট্রেন জাহাজ এরোপ্লেন প্রভৃতি তাঁর নিজের কবিতাতেও ক্রমে অল্পবিস্তর ঢুকে পড়লো বটে, কিন্তু 'বিজ্ঞানী বুদ্ধি'র দ্বারাই আধুনিকরা অধিক চালিত হন— তাঁর এই অভিযোগ তিনি একেবারে খারিজ ক'রে দিতেও পারলেন না, লিখলেন : 'আর্টের মধ্যে আছে সম্ভোগের দাবি, আর সায়ান্স সব কিছুকে নির্বিচারে টেনে আনে। আধুনিক যুগের প্রকাশতত্ত্বে আছে এই দুয়ের মিল। তার নমুনা এই দুই

বইয়ের মধ্যে অনেক পাওয়া যায়।' 'নমুনা'-র মধ্যে অনেকগুলি কবিতাই অবশ্য তাঁর নিজেরই মনে ধরেছিলো— ঐ প্রবন্ধেই তারও প্রমাণ আছে।

হ্যাভেলক এলিস তর্কটা তুলে দিয়ে নিজে স'রে গিয়েছিলেন। জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ দুই বাঙালি কবির রচনা এবং পত্রালাপের মধ্য দিয়ে দেড় যুগ ধ'রে সেই তর্কের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি অনুসরণ করা যায়।

## দু ই

প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে পাটনা থেকে প্রথম হ'য়ে অমিয় চক্রবর্তী এম. এ. পাশ করেন ১৯২৬ সালে, এবং পরের বছরের গোড়া থেকেই কবির সাহিত্যসচিব হ'য়ে বিশ্বভারতীতে ফেরেন। সাহিত্যসচিবের সঙ্গে কবির পত্রালাপ বেশ ভিন্ন ধরনের, নানা দায়িত্বের বিবরণে ঠাসা। পরের তিন বছরেও কেন কবির সঙ্গে তাঁর বিদেশ ভ্রমণের কোনো সুযোগ আসেনি এটা বিস্ময়কর। মাঝে-মাঝে অমিয় চক্রবর্তী ভাবতেন যে এই কর্ম ত্যাগ ক'রে জর্মানি বা ইংলণ্ডের কোনো প্রাচীন বিদ্যায়তনে ব'সে খানিকটা বিদ্যার চর্চা ক'রে আসবেন। তারও সুযোগ হয়নি, কারণ অর্থের জন্যে পিতার উপরে নির্ভর করতে চাননি। বিদেশ যাত্রার প্রথম সুযোগ এলো ১৯৩০ সালে, ইংরেজ কোয়েকারদের আগ্রহে। হরেস আলেকজাণ্ডারের উদ্যোগে তাঁদের উডব্রুক কলেজে ধারাবাহিক বক্তৃতার আমন্ত্রণ এসেছিলো, বক্তৃতার বিষয় ছিলো 'আধুনিক আন্তর্জাতিকতা'। সস্ত্রীক যে-জাহাজের যাত্রী হলেন সেই একই জাহাজে হিবার্ট বক্তৃতা লিখতে-লিখতে রবীন্দ্রনাথও শেষবারের মতো য়ুরোপে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর চিত্রকলার প্রথম প্রদর্শনী করতে ফ্রান্সে নেমে যান, অমিয় চক্রবর্তীরা চ'লে যান ইংলণ্ডে। তবে উডব্রুক কলেজে পৌঁছে নির্ধারিত বক্তৃতামালা তিনি শেষ করতে পারেননি। পূর্বে কিছু স্থির না থাকলেও, কবির সঙ্গিদলের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে হঠাৎই তাঁকে চ'লে যেতে হ'লো য়ুরোপে, রাশিয়ায় এবং রাশিয়া থেকে আমেরিকায়। এক মহাকবির সঙ্গী হ'য়ে প্রায় অর্ধেক পৃথিবী জোড়া সেই ভ্রমণ অমিয় চক্রবর্তীর জীবনের এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। এক সঙ্গেই ছিলেন ব'লে এ-সময়কার চিঠিপত্র থাকার কথা নয়। দেশে ফিরে, দু বছর পরে, রবীন্দ্রনাথের পারস্য ভ্রমণেরও তিনি সঙ্গী হ'য়েছিলেন। অভাবনীয় অভিজ্ঞতায় ভরা এই ক'টি বছর। অবশেষে তবু কেমন তাঁর নিশ্চিত ধারণা হ'লো—শান্তিনিকেতন ছেড়ে দূরে যাবার সময় উপস্থিত হয়েছে, আশ্রম ছেড়ে গিয়ে কবি রবীন্দ্রনাথের আরো কাছে আসাই ছিলো উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথের লেখা এই সময়কার দুটি চিঠি ('চিঠিপত্র' ১১শ, ৬৩ ও ৬৪) নিদারুণ ভাবে মর্মস্পর্শী। ছাঁটকাট ক'রে তুলে দিতে চাইনে, সবটা পড়া দরকার।

শান্তিনিকেতন থেকে ১৯৩৩-এর অক্টোবরে তিনি যে বিদায় নিলেন সেটা শুধু অক্সফোর্ড থেকে ডিগ্রি করার জন্যে—তা হ'তেই পারে না। ডিগ্রির কাজটা ছিলো প্রায় আনুষঙ্গিক। বর্তমান লেখককে এ-বিষয়ে তিনি লিখেছিলেন : 'মহাপুরুষের ছত্রতলে বিরাজ করার মধ্যে একটা অলীকতা আছে—ঐ রকম আশ্রয় মানুষের সত্তার পক্ষে

ক্ষতিকর, যদিও প্রেরণার দিক থেকে যা পেয়েছি তাও অসীম। আমার ধারণা ছিলো (এবং এখনো তাই) সব রকম "গুরুবাদের" উল্টো। আত্মজীবন, আধ্যাত্মিক জীবন মহাপুরুষের আশ্রয়ে অবসন্ন হয়, নির্ভরশীলতা চারিত্রশক্তির পরিপন্থী। যে-সংসর্গ মহিমা বিরাট রবীন্দ্রনাথের কাছে অজস্র ধারায় পেয়েছি তা বাড়তির অঙ্ক—তিনি একদিন সরে গেলে আমি কি সূর্যচন্দ্রহীন হয়ে যাবো ? মন বলত, চলো, চলে যাই—মধ্যে-মধ্যে ফিরে আসব। কিন্তু একই জায়গায়, একই মুক্ত উজ্জ্বল মানুষের কাছে বসে, ধার করা প্রতিফলিত মহত্ত্বের অভিলাষী যেন না হই। রবীন্দ্রনাথ তা বুঝতেন, তাঁর চিঠিতে তার প্রমাণ আছে'। ব'লে গেলেন, রবীন্দ্রনাথের 'বাণী প্রকাশ করবার ভার' নিয়ে এবং 'য়ুরোপের সঙ্গে [বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রনাথের] সম্বন্ধ রাখবার জন্যে' তাঁর অক্সফোর্ডে পড়তে যাওয়া। ('চিঠিপত্র' ১১শ, ৬৬ ও ৬৭)। ইংলণ্ডে পৌঁছেই যে-বিচিত্র কর্মজালে তিনি জড়িয়ে পড়লেন তা একেবারেই বিস্ময়কর। এ-সময়কার লেখা চিঠিগুলি পড়লে একবারও মনে হয় না যে কিছুদিন পূর্বেই (নৈনিতাল থেকে লেখা ৯-সংখ্যক চিঠি দ্রষ্টব্য) সাততালের ব্রিটিশ ডাক্তার এঁরই অন্ত্রে ক্ষয়রোগের সূচনা দেখতে পেয়ে অচিরাৎ তাঁকে ভিয়েনার কোনো বিশেষজ্ঞকে দিয়ে চিকিৎসার পরামর্শ দিয়েছিলেন! বোঝা যায় কেন সেই সংবাদ শুনেও রবীন্দ্রনাথ বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করেননি! (দ্রষ্টব্য 'চিঠিপত্র' ১১শ খণ্ডের ৬২-সংখ্যক চিঠি)।

কবির 'বাণী প্রকাশ করবার' জন্যে ইংলণ্ডে পৌঁছে অমিয় চক্রবর্তীর প্রথম কাজ হ'লো, রবীন্দ্রনাথ যে কোনো মরমী কবির মতো বিশ্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে আত্মমগ্ন হ'য়ে ব'সে থাকার লোক নন বিশ্বকে সে-বিষয়ে অবহিত করা। লীগ অব নেশন্সের 'Committee on Intellectual Co-operation'-এর তখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন Gilbert Murray। এই কমিটির উদ্যোগে প্রকাশিত সিরিজে কিছুদিন আগেই (১৯৩২) *Why War* নামে একটি পুস্তিকা বেরিয়েছিলো, ফ্রয়েড আর আইনস্টাইনের দুটি পত্র-প্রবন্ধ নিয়ে। গিলবার্ট মারের সঙ্গে কথা ব'লে ব্যবস্থা করা হ'লো প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে সম্পর্কের জটিলতা এবং তার নিরসন বিষয়ে মারে এবং রবীন্দ্রনাথও পত্রাকারে দুটি প্রবন্ধ লিখবেন। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথকে বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়ে রাজি করিয়ে তাঁর লেখা প্রবন্ধটি হাতে-হাতে সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যেই অক্সফোর্ডে যাওয়ার মাত্র ন' মাসের মধ্যেই অমিয় চক্রবর্তী একবার দেশে ফেরেন। পরে লণ্ডনে গিলবার্ট মারের সঙ্গে একত্র ব'সে অমিয় চক্রবর্তী সেই প্রস্তাবিত পুস্তিকার প্রুফও সংশোধন করেছিলেন, রবীন্দ্রভবনে সব কাগজপত্র আছে। *East and West* নামে বহুকাল দুষ্প্রাপ্য এই পুস্তিকাটি প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৩৫ সালে। এই সেদিন ফ্রয়েড এবং আইনস্টাইনের কাটাকুটি সমেত সিরিজের প্রথম পুস্তিকা *Why War*-এর আঠেরো পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপিটি ন্যুইয়র্কের Sotheby-রা বোধ করি দু লক্ষ ডলারে নিলামে বেচে দিলেন। অথচ রবীন্দ্রনাথ ও গিলবার্ট মারে-র পুস্তিকাটি নিয়ে এ-দেশে আজ পর্যন্ত কোনো সাড়াশব্দ শুনিনি।

অমিয় চক্রবর্তী দ্বিতীয় কাজ বাছলেন—আর একবার যাতে লণ্ডনে রবীন্দ্রনাথের

চিত্রকলার প্রদর্শনী করা যায়। সেখানে এর কিছু দিন আগেই আফ্রিকা এবং কিছু পূর্বদেশীয় চিত্রকলার প্রদর্শনীতে লোকের বিশেষ আগ্রহ লক্ষ্য করা গিয়েছিলো, চড়া দামে বিক্রিও হয়েছিলো অনেক ছবি। রবীন্দ্রনাথের ছবিতেও নিশ্চয়ই আগ্রহ হবে লোকদের, আর তা হ'লে ছবির টাকাতেই বিশ্বভারতীর ক্রমাগত আর্থিক সমস্যারও খানিকটা লাঘব হবে, এই ভেবেছিলেন অমিয় চক্রবর্তী, এবং এ-বিষয়ে তাঁর প্রধান সহায় হয়েছিলেন স্যর মাইকেল স্যাড্‌লার। ভিন্ন সভ্যতা-সংস্কৃতির চরিত্রগুণসম্পন্ন চিত্রকলায় স্যর মাইকেলের গভীর আগ্রহ ছিলো, আফ্রিকার নতুন চিত্রকলা বিষয়ে নিজে একটি বইয়ের সম্পাদনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবিও ছিলো তাঁর নিজের সংগ্রহে, এবং তা নিয়ে তিনি বিশেষ গৌরব করতেন। স্যর মাইকেল এবং রটেনস্টাইন মিলে লণ্ডনের বিখ্যাত লিস্টার গ্যালারিতে যাতে প্রদর্শনীটি করা যায় তার চেষ্টা করতে থাকলেন। জানা যায় না কেন তাঁদের চেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি।

সফলতা এলো অন্য একটা ব্যাপারে। ও-দেশের বয়স্ক কবি-সাহিত্যিক যাঁরা খুবই একদিন হইচই করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তাঁদের উপর অমিয় চক্রবর্তীর বিশেষ কোনো আস্থা বা শ্রদ্ধা ছিলো না, কবিকেও তিনি চিঠিতে সে-কথা স্পষ্ট ক'রেই লিখেছিলেন। তাঁর নিজের লক্ষ্য ছিলো সমসাময়িক যুবক কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের দিকে। তাঁদের সঙ্গে কথা ব'লে বুঝেছিলেন যে শান্তিতে এবং সর্বমানবের পার্থিব কল্যাণে আগ্রহী সত্যিকারের রবীন্দ্রনাথকে তাঁরাই হয়তো বুঝবেন। কিন্তু মোটামুটি আর সবাই যাঁকে পূর্বদেশাগত সন্ত কবি ব'লেই ধ'রে নিয়েছেন সেই বর্ষীয়ান প্রাচ্য কবি এবং হালের য়ুরোপীয় নবীনদের মধ্যে সেতু বাঁধা বড়ো সহজ ব্যাপার নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও মনে-মনে স'রে গিয়েছিলেন নবীনদের থেকে। য়ুরোপীয়, বিশেষ ক'রে ইংরেজি, আধুনিক সাহিত্যের প্রতি তাঁর যে-বিতৃষ্ণা জ'মে উঠেছিলো সেটা দূর করতে না পারলে কিছুই হবার নয়। য়ুরোপের কুটিল রাষ্ট্রনীতি তাঁর পক্ষে অসহ্য হ'য়ে উঠেছিলো, ক্রমে য়ুরোপের সাহিত্য থেকেও, অংশত সেই একই কারণে, তাঁর মন উঠে যায়। প্রবাসী অমিয় চক্রবর্তীকে কবি লিখেছিলেন : 'আজ দ্বাররুদ্ধ য়ুরোপের দুর্গমতা অনুভব করচি আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে। তার কঠোরতা আমার কাছে অনুদার বলে ঠেকে, বিদ্রূপপরায়ণ বিশ্বাসহীনতার কঠিন জমিতে তার উৎপত্তি, তার মধ্যে এমন উদ্বৃত্ত দেখা যায় না ঘরের বাইরে যার অকৃপণ আহ্বান। এ-সাহিত্য বিশ্ব থেকে আপন হৃদয় প্রত্যাহরণ করে নিয়েছে। ...বারে বারে এই কথা আমার মনে হয়েছে বর্তমান ইংরেজি কাব্য উদ্ধত ভাবে নূতন, পুরাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ভাবে নূতন।' ('চিঠিপত্র' ১১শ, ৭৩)। চিঠির উত্তরে অমিয় চক্রবর্তীকে কঠোর ভাবেই কবির কথার প্রতিবাদ করতে হয়েছিলো যা তিনি আগে কখনো করেননি। তাঁর নিজের চিন্তার ধারা তখন অক্সফোর্ডে অডেনগোষ্ঠীর নবীন কবিদের সাহচর্যে যথেষ্ট পরিমাণে বাম ঘেঁষা হ'য়ে উঠেছিলো। কবিকে লিখছেন : 'আজ ইটালী, জর্ম্মণী, রাশিয়ার মোহবশত হোক, সত্য বিশ্বাসের জোরে হোক, নূতন কালের মানুষ সর্ব্ব দুঃখ সহ্য করবে ব'লে দাঁড়িয়েছে এই সাম্যের ভিত্তি গাঁথবার আশায়।' পুরোপুরি

সাম্যবাদী নিজে তিনি অবশ্য কখনোই হ'তে পারেননি, কিন্তু জীবনের এই পর্বে অমিয় চক্রবর্তীর দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট রক্তিম হয়েছিলো। ফলত কবির বিক্ষুব্ধ নিরাশার সুর তিনি মানতে পারেননি। প্রতিবাদে লিখেছিলেন : 'সাহিত্যে শিল্পে সমাজে মানুষ যে শ্রেষ্ঠ গরিমাকে প্রকাশ করেচে তা যে যেতে বসেচে এমন কোনো চিহ্ন দেখি না। সাময়িক মত্ততায় এখানে-ওখানে যে-সুরই বাজুক, আজ য়ুরোপে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত, শিল্প, মহাচিত্তের বিচিত্র সৃষ্টি জ্ঞান ভাবনার প্রতি যেমন সমাদর তেমন কোনোদিন ছিল না। এ বিষয়ে য়ুরোপে সর্ব্বত্র যে রকম সত্যকার উঁচু standard দেখতে পাই তাতে চমকিত হই।' (চিঠি ২১)। আত্মপ্রত্যয়ের এই স্পষ্ট কণ্ঠস্বর তাঁর মধ্যে আগে কখনো দেখা যায়নি। য়ুরোপে গিয়ে তাঁর এই একটা বড়ো লাভ হয়েছিলো। তখন থেকে তিনি বাছাইকরা নতুন বই পাঠিয়ে, ভালো কবিতা চিঠিতে কপি ক'রে তুলে দিয়ে, উৎকর্ষমণ্ডিত আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্য এবং চিন্তার সঙ্গে কবিকে পরিচিত করানোর কাজে ব্রতী হলেন। জানতেন, মনের দরজায় আগল দিয়ে রাখার মতো মানুষ ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ। উপযুক্ত বিদেশীয় রচনাদি তাঁর হাতে পৌঁছে দিতে পারলেই হ'লো, গুণ থাকলে তিনি ঠিক চিনে নেবেন। এই আশা ব্যর্থ হয়নি। চিঠিতে পাঠানো ইয়েটস, অডেন, ডে লুইস, স্পেণ্ডার, ম্যাকনিস, হোলটবি—কারো লেখাই অবজ্ঞা করতে পারেননি কবি, কাউকেই মনে হয়নি অনুদার, বিদ্রূপপরায়ণ, বিশ্বাসহীন বা উদ্ধত ভাবে নূতন। এলিয়ট-এর 'ফ্যামিলি রিইউনিয়ন' নাটকটিও তাঁর 'গভীর ভাবে ভালো' লেগেছিলো। নিজে থেকেই বলেছিলেন সে-নাটকের উপরে কিছু লিখবেন। ('চিঠিপত্র' ১১শ, ১১৩)। দুর্ভাগ্য আমাদের, তিনি এ-বয়সে তার আর সময় পাননি।

আধুনিক ইংরেজ কবিদের ভালো লাগিয়েই ক্ষান্ত হননি অমিয় চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে আধুনিকদের ধরনে ভিন্ন ছাঁদের কবিতা লেখানো যায় কি না তারও একটা বিস্ময়কর পরীক্ষার সাহস করেছিলেন। প্রস্তাবটা যেন 'তরুণ কবি' স্টিফেন স্পেণ্ডারের মাথা থেকে বেরিয়েছে এইভাবে ৪৩-সংখ্যক চিঠিটি লেখা। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে স্পেণ্ডারের কোনো খাঁটি কৌতূহল ছিলো ব'লে জানি না। কথায়-কথায় হয়তো জিজ্ঞেস ক'রে থাকবেন যে শেষ দিকের ইয়েটস-এর মতো সংহত, মিলান্ত, ভাবের ঘনমাধুর্যে ভরা ছোটো 'intellectual' 'poetry of wit' রবীন্দ্রনাথও লিখছেন কি না। বোঝা যায়, উৎসাহটা আসলে অমিয় চক্রবর্তীর নিজস্ব। ৪৩-সংখ্যক চিঠির পরেও, মনে হয়, কবির কাছে এ-বিষয়ে তিনি অনুনয় ক'রে থাকবেন। সে-চিঠি রক্ষা পায়নি। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৯-এর ফেব্রুয়ারিতে ('চিঠিপত্র' ১১শ, ১০৭) কবি তাঁকে যে-চিঠিটি লিখলেন, তাঁর জীবনের অন্তিম পর্বে কবিতার নবজন্মের দিক থেকে দেখলে তার মূল্য অপরিসীম। লিখলেন : 'আমার বিশ্বাস আমার মধ্যে আধুনিক দেখা দিয়েছে পুরাতন বাসাতেই, আমি বাসা বদল করিনি—বোধ হচ্ছে না-করার কারণ এই যে আমার বাসায় জায়গা ছিল যথেষ্ট।... আমার মানসিক চালচলনে বিজ্ঞানের ঝোঁক ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠচে। আমার হালের লেখার মধ্যে তার প্রভাব প্রবেশ করেছে বলে সন্দেহ হয়, সেই প্রভাবটা যদি

ভিতরকার জিনিস হয় তা হলেই সেটা অকৃত্রিম হতে পারে।... আগাগোড়া রূপবদল দেখলেই বুঝি সেটা আদর্শকে গ্রহণ করা নয়, সেটা আদর্শকে নকল করা। এই জিনিসটাকে আমি বিশ্বাস করতে পারিনে।' কবিতার দেহরূপের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অভিব্যক্তিতে বিশ্বাসী, বিপ্লবে নয়। রচনার আন্তর স্বভাব যাই হোক, তাঁর বিশ্বাস ছিলো যে 'সে কখনোই এলিয়েটের বা অডিনের (sic) বা এজরা পাউণ্ডের ছাঁচে ঢালাই করা হতেই পারে না।... যে কবির কবিত্ব পরের চেহারা ধার করে বেড়ায় সত্যকার আধুনিক হওয়া কি তার কর্ম?' তবে এ-কথা কবুল করতে তিনি রাজি ছিলেন যে 'তুমি এখনকার ইংরেজ কবিদের যে সব নমুনা কপি করে পাঠাচ্ছ পড়ে আমার খুব ভালো লাগচে, —সংশয় ছিল আমি বুঝি দূরে পড়ে গেছি, আধুনিকদের নাগাল পাবো না—এই কবিতাগুলি পড়ে বুঝতে পারলুম আমার অবস্থা অত্যন্ত বেশি শোচনীয় হয়নি।' এ এক অন্য রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর শুনছি আমরা, যিনি কবিতার দেহগত চরিত্র নিজস্ব ধরনে বজায় রেখেও হাল আমলের কবিতার চিত্তলোকে প্রবেশ করতে আগ্রহবান। এ-চিঠির দু সপ্তাহের মধ্যেই ('চিঠিপত্র' ১১শ, ১০৮) রবীন্দ্রনাথ একটি নতুন কবিতার খসড়া তৈরি ক'রে অমিয় চক্রবর্তীকে পাঠান, বেশ কিছু পরিমার্জনার পর "প্রজাপতি" নামে যেটি দেখা দেয়, পরে যায় 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থে। ('সকালে উঠেই দেখি / প্রজাপতি একি')। সঙ্গের চিঠির চেহারাও গদ্য কবিতার মতো পঙক্তি ভেঙে সাজানো :

'জিনিষটা কি বেশি শুকনো
এবং মেটাফিজিক্যাল হয়েছে।...'

পরে এটির একটি মার্জিত 'সংস্করণ' পাঠিয়ে আবার লিখলেন : 'এর দ্বিতীয় সংস্করণটাকে কি বাহুল্যদোষে পেয়ে বসেছে হয়তো এসব জিনিষ একটু কম বোঝানোই ভালো—কারণ এর ধর্মই হচ্ছে স্পষ্ট না বোঝানো।' অতি আশ্চর্য ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের মতো প্রবল আত্মপ্রত্যয়ী জ্যেষ্ঠ কবি কনিষ্ঠের কাছে কবিতার খসড়া পাঠিয়ে জানতে চাইছেন সেটি ঠিক মতো হ'য়ে উঠেছে কি না!

এ-বিষয়ে বিস্তর আলোচনার স্থান এই ভূমিকা নয়। শুধু একটি সূত্রের কিছু সন্ধান করা গেলো। যোগ করতে হয় যে পরে তিনি তার নবীন সুরের কবিতাগুলিকে পরখ ক'রে দেখে, ভিন্ন সুরের কবিতা থেকে পৃথক ক'রে সরিয়ে নিয়ে, স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ তৈরি করার ভার দিয়েছিলেন অমিয় চক্রবর্তীকেই। পূর্বেই মাসিকপত্রে ছাপা হওয়া এ-ধরনের কবিতা নিয়ে কনিষ্ঠ কবি যে-ভাবে পরিতোষ প্রকাশ করেছিলেন, ১৯৩৯ সালে কবিকে লেখা অনেক চিঠিতে তার উল্লেখ আছে। অমিয় চক্রবর্তীর হাতে বাছাই করা এই ধরনের কবিতা নিয়ে ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'নবজাতক', বাকি কবিতা যায় 'সানাই' গ্রন্থে। সমকালীন একটি কবিতা কেন 'নবজাতক'-এ, অন্যটি কেন 'সানাই'-তে গিয়েছিলো তাও আলোচ্য ব'লে মনে হয়। একদিন কেউ হয়তো করবেন।

গ্রন্থের নাম 'নবজাতক' কে রেখেছিলেন, কবি স্বয়ং কি না, তা আমার জানা নেই। নামটি কবির নিজের দেওয়া হ'লে তো আরোই ভালো, নিজের কবিতার নবজন্ম তাহ'লে

তাঁর নিজের কাছেও ঘোষণাযোগ্য ব'লে মনে হয়েছিলো।

এ-ছাড়া অন্য একটি বিষয়েও অমিয় চক্রবর্তীর চেষ্টা সফল হয়েছিলো। পৃথিবীর যে-মহাদেশটি তখন পর্যন্ত আমাদের, এমন-কি রবীন্দ্রনাথেরও, চেতনায় ছায়াচ্ছন্ন ছিলো—সেই পরাভূত আফ্রিকার আদি এবং আদিম সভ্যতা সংস্কৃতির সঙ্গে তিনি পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের, যিনি কিনা নিজে ছিলেন বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা আচার্য। গান্ধীজি অবশ্য তাঁর মহাকর্মযজ্ঞের সূচনাই করেছিলেন সেই কৃষ্ণ মহাদেশের দক্ষিণ প্রান্তে। তবু আমরা তখন পর্যন্ত চিনতাম না আফ্রিকাকে, আমাদের চেতনার ভূগোলে তার কোনো স্পষ্ট স্থান ছিলো না। অথচ নতুন প্রজন্মের কল্যাণব্রতী, বলিষ্ঠ হৃদয় কিছু য়ুরোপীয়ের চোখে দেখা ভিন্ন এক আফ্রিকা তখন জেগে উঠছিলো। ভাগ্যক্রমে শিক্ষাব্রতী, সৃষ্টিশীল সেই ধরনের কিছু মানুষের সঙ্গে ইংলণ্ডে গিয়ে অমিয় চক্রবর্তীর বন্ধুতা হয়েছিলো। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ফ্রেজার, হোলটবি, লর্ড লোথিয়ান। মুসোলিনির থাবার তলায় তখন পিষ্ট হচ্ছে আবিসিনিয়া। সম্রাট হাইলে সেলাসি স্বেচ্ছানির্বাসনে আছেন। নির্বাসিত উগাণ্ডার রাজপুত্র, হিজ হাইনেস প্রিন্স নিয়াবঙ্গো—'a gentleman scholar'—অক্সফোর্ডের কুইন্স কলেজে ব'সে গবেষণা করার সঙ্গে-সঙ্গে আফ্রিকা বিষয়ে গ্রন্থ লিখছেন। ৪৪-সংখ্যক এবং তার পরেকার কয়েকটি চিঠি পড়লে দেখা যাবে আফ্রিকা বিষয়ে কবিকে দিয়ে একটি কবিতা লেখানোর জন্য অমিয় চক্রবর্তীকে কতটা খাটতে হয়েছিলো। সাময়িক বিষাদে-অবসাদে আচ্ছন্ন কবির প্রথমে উৎসাহ হয়নি। তবুও শেষ পর্যন্ত আফ্রিকার লাঞ্ছিত অপমানিত ইতিহাস বিষয়ে উদাসীন থাকতেও পারেননি, গদ্যে একটি বেদনার্ত কবিতা লিখেছিলেন, 'পত্রপুট' গ্রন্থের পরিশিষ্টে আছে, যে-কবিতায় সমগ্র মানুষের হ'য়ে আফ্রিকার কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন কবি :

'এসো যুগান্তের কবি,
আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে
দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে,
বলো, 'ক্ষমা করো'—
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।'

প্রিন্স নিয়াবঙ্গো কবিকে দিয়ে এ-কবিতার তর্জমাও করিয়ে নিয়েছিলেন। হাইলে সেলাসি সোয়াহিলি ভাষায় আবার সে তর্জমার তর্জমা করিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন কৃষ্ণ আফ্রিকায়। ধাক্কা লেগেছিলো বাংলা কবিতাতেও। কয়েক মাসের মধ্যেই এ-বিষয়ে বুদ্ধদেব বসু আর একটি কবিতা রচনা করলেন—"ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা", 'দময়ন্তী'-তে আছে। এই ভাবে বাংলা কবিতায় প্রবেশ ক'রে, আফ্রিকা আমাদের বিবেক-চেতনার অন্তর্গত হ'য়ে গেলো। প্রিন্স নিয়াবঙ্গো এবং ফ্রেজার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কবিকে চিঠি লিখেছিলেন, রবীন্দ্রভবনে আছে। অমিয় চক্রবর্তীর নিজের কবিতায় আফ্রিকার অনুষঙ্গের শেষ নেই। তিনিই শুরু

করিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে।

পূর্বে বলেছি, য়ুরোপে রবীন্দ্রনাথের 'বাণী প্রকাশ করবার' স্বেচ্ছাআরোপিত দায়িত্ব নিয়ে অমিয় চক্রবর্তী অক্সফোর্ডে গিয়েছিলেন। তার জন্যে প্রধান প্রয়োজন ছিলো অনূদিত কাব্যগ্রন্থাদি আবার যাতে বেশি ক'রে প্রচারিত হয় তার ব্যবস্থা করা। অথচ নতুন কবিতার বই বা পুরনো বইয়ের নতুন সংস্করণ ছাপার বিষয়ে ম্যাকমিলানের তখন আর চাড় নেই। প্রবীণ ইংরেজ কবি সাহিত্যিক—স্টার্জ মূর, আর্নেস্ট রীজ, এডোয়ার্ড টমসন—যাঁদের প্রতি কবির শ্রদ্ধা ভালোবাসা অটুট ছিলো তখনো, যদিও অমিয় চক্রবর্তীর ছিলো না, তাঁরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। ইয়েটস-এর সঙ্গে বহুকাল যোগ নেই। অণুকবিতার সংকলন *Fireflies*-কে বাদ দিলে ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথের শেষ কবিতার বই *The Fugitive* ছাপা হয়েছিলো বারো বছর আগে, ১৯২১ সালে। লোকে নেয়নি। ১৯৩২ সালে আনউইনরা একটা কবিতার বই তবু ছেপেছিলেন, *The Golden Boat*, তাও ভবানী ভট্টাচার্যের করা ঐ এক ধরনের খুচরো অনুবাদ নিয়ে। ১৯৩৫ সালে ম্যাকমিলানরা রাজি হলেন, বললেন ঝাড়াই বাছাই ক'রে, দরকার মতো পরিমার্জনার পরে, সব কবিতার বই একত্র ক'রে তাঁরা একখণ্ডে collected poems ছাপবেন। ঝাড়াই বাছাই মার্জনা করার ইচ্ছে সব চাইতে বেশি ছিলো রবীন্দ্রনাথের। 'ওতে বিস্তর কাঁচা জিনিষ আছে—হয়তো কাঁচা লাইনগুলোও ঝালাই করা দরকার।' ('চিঠিপত্র' ১১শ, ৬৯)—এইভাবে আপত্তি শুরু ক'রে ক্রমেই তাঁর আত্মবিরোধিতার সুর চড়তে লাগলো :

১. 'আমার কবিতার ইংরেজি তর্জমা পড়ে দেখলুম। *Fruit Gathering* এবং *Lover's Gift*-এর অধিকাংশ কবিতাই একেবারে অচল। পড়তে অত্যন্ত লজ্জা বোধ হলো। কী রকম কাঁচা হাতে অবহেলা করে লিখেচি। এগুলো বরাবরকার মতো বাদ দিতে হবে।... অমনিতেই বিক্রি হয় না সুতরাং লোকসানের আশঙ্কা নেই।' ('চিঠিপত্র' ১১শ, ৭১)

২. 'বাছুর মরে গেলে তার অভাবে গাভী যখন দুধ দিতে চায় না, তখন মরা বাছুরের চামড়াটা ছাড়িয়ে নিয়ে তার মধ্যে খড় ভর্তি করে একটা কৃত্রিম মূর্তি তৈরি করা হয়, তারি গন্ধে এবং চেহারার সাদৃশ্যে গাভীর স্তনে দুগ্ধক্ষরণ হতে থাকে। তর্জমা সেই রকম মরা বাছুরের মূর্তি—তার আহ্বান নেই, ছলনা আছে। এ নিয়ে আমার মনে লজ্জা ও অনুতাপ জন্মায়।' (ঐ, ৭৩)

৩. 'বইগুলো পেয়েছ—তাতে আমার উচ্ছেদ চিহ্ন দেখেছ। কিন্তু মনে কোরো না তাতেই আছে আমার চরম বিচার।... যে কোনো আমার ইংরেজি কবিবন্ধু যেরকম করেই ওগুলো নিয়ে বর্জন মার্জন করুন আমার তাতে লেশমাত্র আপত্তি ঘটবে না। তুমি তাঁদের সম্মতি নিয়ে যা দাঁড় করাবে তাতেই আমি স্বাক্ষর দেব। এ কথা আমি নিশ্চিত জানি ওর মধ্যে থেকে বিস্তর ত্যাগ করা উচিত।' (ঐ, ৭৫)

৪. 'তোমাদের কার্ট ব্লাঁশ অধিকার দিচ্ছি।... লাগাও কোপ। পরিবর্তন যদি উপযুক্ত লোকের হাতে হয় কিসের আপত্তি? তুমিই আমাকে represent করতে পারবে।

তোমার সঙ্গে মোকাবিলায় Sturge Moore-এর মত কবি যদি মাজাঘষা করেন আমি স্বয়ং থেকে তার বেশ কিছুই করতে পারিনে। তাঁকে অবশ্য পারিশ্রমিক দিতে হবে। এবং বইটার মলাটে লিখে দেওয়া চলবে Edited by Sturge Moore—অবশ্য যদি তোমাদের মত থাকে।' (ঐ, ৭৬) ইত্যাদি।

'চিঠিপত্র' ১১শ খণ্ডে এ-ধরনের আত্মসমালোচনার অন্ত নেই। এখনো যাঁরা রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি বেছে বার ক'রে গোয়েন্দাগিরির সুখ পান তাঁরা বোধ করি এ-সব চিঠিপত্র পড়েননি বা পড়েন না। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর অনুবাদের গলদ নিয়ে বিস্তর অনুতাপ করেছিলেন, দোষ দিয়েছিলেন আর কাউকে নয়, নিজেকেই।

চিঠিপত্র থেকে দেখা যাবে বর্জন মার্জন বিষয়ে অমিয় চক্রবর্তীও কবির সঙ্গে খুবই সহমত ছিলেন। কিন্তু অন্য কারো পক্ষে সে-কাজের দায়িত্ব নেবার সাহস ছিলো না। অনুবাদ হ'লেও তা রবীন্দ্রনাথেরই রচনা, হাত দেবে কে? অমিয় চক্রবর্তী প্রস্তাব করেছিলেন সমগ্র সংগ্রহ ছাপার আগে ছোটো একটি selected poems বা 'চয়নিকা' প্রকাশের। রবীন্দ্রনাথ সম্মত ছিলেন, ম্যাকমিলানদেরও আপত্তি ছিলো না। তবু কী কারণে সেটা হ'য়ে উঠলো না। প্রধানত চার্লস অ্যান্ড্রুজের পরামর্শে একটি *Collected Poems and Plays* ছাপাই স্থির হ'লো। কোথাও তাতে মার্জনের চিহ্ন নেই, তবে বর্জিত হ'লো একশো উনিশটি কবিতা, ঢ্যাড়া চিহ্ন দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই যেগুলিকে বর্জন করেছিলেন। আগের মতোই দিব্যি হেলাফেলা ক'রে তৈরি করা হ'লো বইটি। অনূদিত নাটকের সব এতে না থাকলেও বলা হ'লো 'সমগ্র' নাটক। রচনাগুলি যে মূল বাংলা থেকে অনুবাদ তা কোথাও বলা হ'লো না। আমাদের সৌভাগ্য যে *Fugitive* আর *Lover's Gift* থেকে এই সুযোগে বাদ গেলো বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদের ১৩টি, বাউল গান ৯টি, এবং দেবেন্দ্রনাথ সেন (১), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১) ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর (২) কয়েকটি কবিতা। কী ক'রে অন্যদের এ-সব কবিতা রবীন্দ্রনাথের বইয়ের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলো কেউ জানে না। *Collected Poems*-এ নতুন যোগ হ'লো Boro-Budur, Krishnakali প্রভৃতি দশটি নতুন কবিতা যা তখন পর্যন্ত আর কোনো বইতে ছিলো না। নতুন প্রজন্মের পাঠকদের জন্যে যা কিছু সংস্কারের কথা ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং অমিয় চক্রবর্তী, তার কিছুই করা গেলো না। কেন, কে বলবে? এই সঙ্গে বাতিল হ'য়ে গেলো অনূদিত প্রবন্ধ, ছোটোগল্প, এবং ভ্রমণকথাগুলিও একত্র ক'রে সমগ্র সিরিজে প্রকাশ করার যে-পরিকল্পনা করেছিলেন অমিয় চক্রবর্তী। পরাজয় তবু যে সম্পূর্ণ হ'তে পারেনি সেটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। ম্যাকমিলানের *Collected Poems and Plays* (১৯৩৬) প্রকাশের পঁচিশ বছর পরে, কবির জন্মশতবর্ষের বছরে, *A Tagore Reader* নামে উত্তম একটি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, য়ুনেস্কোর উদ্যোগে। তার সম্পাদনা করেছিলেন অমিয় চক্রবর্তী। এ-দেশে বেশি কপি বোধ করি আসেনি, কিন্তু একটি মাত্র গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক পরিচয় পাওয়ার মতো এরকম উৎকৃষ্ট বই

ইংরেজি বা বাংলা কোনো ভাষাতেই আর দ্বিতীয় নেই। অনুমান করি, পঁচিশ বছর পূর্বে যা করা যায়নি, এ বইটি তারই একটি সংক্ষিপ্ত প্রকরণ। এতে আছে ভ্রমণসাহিত্যের নমুনা, ২৪টি উৎকৃষ্ট চিঠির অনুবাদ, ৩টি ছোটোগল্প, বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত আত্মচরিতের অংশ, আইনস্টাইন-রলাঁ-ওয়েলস-এর সঙ্গে কবির কথোপকথন, 'লিপিকা' ও 'গল্পসল্প' থেকে দুটি কাহিনী, 'বিসর্জন', 'ডাকঘর' ও 'চণ্ডালিকা' নাটকের তর্জমা, 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' থেকে শুরু ক'রে 'বিশ্বপরিচয়' পর্যন্ত বিস্তৃত গ্রন্থাদি থেকে ১৫টি নির্বাচিত প্রবন্ধ এবং ১৫৭টি কবিতা। কবিতার মধ্যে ১২৭টি নির্বাচিত হয়েছিলো ম্যাকমিলান-প্রকাশিত পূর্বের বইগুলি থেকে, বাকি ৩০টি প্রধানত শেষ দিকের কবিতার অনুবাদ। প্রতিটি মূল রচনার পরিচিতি এবং অনুবাদকের নাম আছে পরিশিষ্টে। রবীন্দ্রনাথ সহ অনুবাদকদের সংখ্যা পনেরো।

একাদশ খণ্ড 'চিঠিপত্রে' দেখা যায় ১৯৩৪ সালের অক্টোবর নাগাদ অমিয় চক্রবর্তীকে রবীন্দ্রনাথ 'চার অধ্যায়' উপন্যাসটি তর্জমা করতে বলেছিলেন। বাংলায় মূল বইটি তখনো ছাপা হয়নি, ছাপালে সরকারি হাঙ্গামার আশঙ্কা ছিলো। রবীন্দ্রনাথ তাই চাইছিলেন অনুবাদটা যাতে লণ্ডনে আগে বেরিয়ে যায়। গ্রন্থপ্রকাশের ব্যাপারে রাজরোষের সম্ভাবনা ইংলণ্ডে কম। নিজের গবেষণা ছাড়া আরো একশো রকমের কাজের মধ্যেও কতটা নিষ্ঠা নিয়ে সেই অনুবাদ শেষ করা হয়েছিলো তার ক্রমিক বিবরণ এই পত্রগুচ্ছেই বিবৃত আছে। অনুবাদে প'ড়ে তাঁর ইংরেজ লেখক বন্ধুদের ভালো লেগেছিলো গল্পটা। রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দিলে তিনিও পাণ্ডুলিপিটি পড়েছিলেন, কপিটি রবীন্দ্রভবনে রাখা আছে। লণ্ডনে প্রকাশক ঠিক করা হয়েছিলো। রঙিন মলাট এঁকেছিলেন নিজে রবীন্দ্রনাথ। তবু কেন সে-অনুবাদ ছাপা হ'লো না, কেন পরে ভিন্ন অনুবাদ ছাপা হ'লো, তা জানা যায় না। অমিয় চক্রবর্তীর ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও অন্যের করা অনুবাদটি ছাপা হয়েছিলো ন্যুইয়র্কের *Asia* নামক এক মাসিকপত্রে যার উপদেষ্টা-সম্পাদক ছিলেন বাঙালি বিজ্ঞানী বশীশ্বর সেনের মার্কিনী পত্নী গারট্রুড—Gertrude Emerson Sen। ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বরে শুরু ক'রে চারটি সংখ্যায় ধারাবাহিক ছাপা হয়েছিলো *Four Chapters: Novelette of Young India,* শুধু মার্চের (১৯৩৭) কিস্তি বেরিয়েছিলো এক মাস ফাঁক দিয়ে এপ্রিলে। দ্বিতীয় কিস্তি থেকে শিরোনাম ছিলো এই রকম: II A Love Story of India, III In the Vortex of Revolt, এবং IV Towards the Vast Silence। এ-ব্যবস্থা অমিয় চক্রবর্তীর একেবারেই মনঃপূত হয়নি।

দেখা যাবে বিদেশে কবির গ্রন্থাদির অনুবাদ প্রকাশের ব্যাপারে অমিয় চক্রবর্তীর কোনো প্রস্তাব বা পরিকল্পনাই বিশেষ কাজে লাগেনি, কিন্তু প্রায় নিশ্চয় ক'রে বলা যায় রবীন্দ্রনাথ নিজে সেজন্য দায়ী ছিলেন না। তাঁর সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর সৌহার্দ্য দিনে-দিনে বরং বৃদ্ধি পেয়েছিলো।

ভূমিকা এখানেই শেষ হ'তে পারতো, কারণ পরবর্তী ঘটনা সবই প্রায় জানা। অক্সফোর্ড থেকে মোটামুটি চার বছর পরে, ১৯৩৭-এর ২ সেপ্টেম্বর, অমিয় চক্রবর্তী

দেশে ফিরলেন। মনের দিক থেকে এই চার বছরে যেন চার যুগ পার হ'য়ে আসা মানুষ। শান্তিনিকেতনে বাস না করলেও রবীন্দ্রনাথের তিনি আপন লোক, যেমন সেবাগ্রামে বাস না ক'রেও গান্ধীজির। আধুনিক বাংলা কবিতার জগতে তাঁর স্থান হ'লো প্রথম সারিতে, এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সে-জগতের সম্পর্ক নিবিড় সৌহার্দ্যের না হ'লেও আধুনিক কবি অমিয় চক্রবর্তী হ'লেন কবির আস্থাভাজন পরম স্নেহাস্পদ। এ-সময় থেকে লেখা তাঁর চিঠিপত্র উপভোগ করতে হ'লে টীকাভাষ্যের দরকার কম হওয়ারই কথা। তবু একটি দুটি ঘটনা, একটি দুটি কবিতার কথা না বললে শেষ করা যায় না। চিঠিতে খানিক-খানিক উল্লেখ আছে, তাই যথেষ্ট ছিলো রবীন্দ্রনাথের পক্ষে, আমাদের হয়তো চোখ এড়িয়ে যাবে।

অমিয় চক্রবর্তী তখনো পৌঁছননি ভারতবর্ষে, বিলেত ফিরতি জাহাজ বোধ করি সুয়েজ খালে হামা দিচ্ছে। হঠাৎ তাঁকে দামাস্কাস থেকে কবিকে চিঠি লিখতে দেখে তাই অবাক হওয়াই স্বাভাবিক। দামাস্কাস থেকে তিনি যাবেন জেরুসালেমে, প্যালেস্টাইনে। আরব-ইহুদি সমস্যা কঠিন হ'য়ে উঠছে, তাই দিনকতক মধ্যপ্রাচ্যে ঘুরে দৃষ্টিটা পরিষ্কার ক'রে নিচ্ছেন! (চিঠি ৫৫) আশ্চর্য! তিনি না জাহাজে দেশে ফিরছিলেন? কিন্তু ধীরে সুস্থে জাহাজ ভ্রমণের ঐ একটা সুবিধে ছিলো তখনকার দিনে, মাঝপথে কোনো বন্দরে নেমে এগিয়ে গিয়ে অন্য বন্দরে সেই একই জাহাজ ধরা যেতো। চলতে-চলতে দু-চার দিনের জন্যে স্পষ্টতই কোনো বন্দরে নেমে গিয়েছিলেন অমিয় চক্রবর্তী। কিন্তু আরব-ইহুদি সমস্যা নিয়েই বা হঠাৎ কেন তিনি চিন্তিত তারও একটা কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। দেশে পৌঁছিয়ে নিশ্চয়ই প্রথমে গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে কবিকে প্রণাম করতে। রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালায় রাখা, ঠিক ঐ সময়ে রবীন্দ্রনাথের লেখা, একটি চিঠির খসড়া দেখলে তবে খানিকটা হদিশ করা যায় জাহাজ থেকে নেমে গিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে অমিয় চক্রবর্তী কী করছিলেন! রবীন্দ্রনাথের খসড়া চিঠিটি জেরুসালেমে Jewish Agency-র Dr. Immanuel Olsvanger-কে সম্বোধন ক'রে লেখা, খসড়ার শিরোদেশে প্রাপকের নাম-ঠিকানা লেখা আছে অমিয় চক্রবর্তীর হস্তাক্ষরে। এটা তাঁর দেশে ফেরার এক সপ্তাহের মধ্যে। হঠাৎ মনে পড়তে পারে এই Dr. Olsvanger-এর নামটা একেবারে অশ্রুত নয়, পূর্বে একবার ইনি শ্রীনিকেতনে এসে পল্লীউন্নয়নের কাজ দেখে গেছেন। মনে না-পড়লেও অবশ্য ক্ষতি নেই। রবীন্দ্রনাথের খসড়া চিঠি থেকে খানিকটা তুলে দিচ্ছি :

'I was happy to have from my friend Amiya Chakravarty the goodwishes you have sent me and which I very sincerely reciprocate. ...What interests me perhaps more than any other aspect of the work done by Jewish Settlers is the agricultural development of the country, the reclamation of marshy and sandy stretches, the application of modern scientific methods in dealing with problems of soil and cultivation. ...It struck me and many of our workers while listening to Dr. Chakravarty

that some form of co-operation between our Institution and the zionist organization would be very desirable. I would like this co-operation to take a practical form on the basis of help rendered to the cause of rural development in India ; the inspiration that your workers can give us if some of them would join us here and start settlements of their own would be invaluable ; I have taken the liberty of outlining a scheme of agricultural settlement which would provide a few plots of land in our neighbourhood to Jewish Pioneers from Palestine, and offer them every scope to develop the land and build farms following the advanced technique which they have already used with unique success.'

চিঠির সঙ্গে পাঠাবার জন্যে একটি outline scheme বা খশড়া পরিকল্পনা তৈরি হয়েছিলো :

১. শান্তিনিকেতনের সমীপবর্তী এলাকায় প্রতিটি ইহুদি settler-কে, আপাতত বিনামূল্যে, ত্রিশ একর জমি দেওয়া হবে, আইনত মালিকানা থাকবে বিশ্বভারতীর। বীজ ও সার দেওয়া হবে বিশ্বভারতী থেকে। উৎপন্নদ্রব্য ভোগ করবেন বহিরাগত নিবাসীরা। পরিবর্তে বিশ্বভারতীর ছাত্র ও শিক্ষকদের তাঁরা আধুনিক কৃষিকৌশল শেখাবেন। আপাতত তাঁদের বাসের ব্যবস্থা করা হবে, চাষের জল দেওয়া হবে টিউবওয়েল থেকে। বাগান ও পশুখামারে যা উৎপাদন করা হবে কলকাতায় তার চাহিদা আছে।

২. গোশালা, হাস-মুর্গির খামার, ছাগল বাথান অথবা মধু উৎপাদন কেন্দ্রের সঙ্গে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কেউ-কেউ তাঁরা শ্রীনিকেতনের কাজেও যোগ দিতে পারবেন। লভ্যাংশ হবে সমান-সমান।

৩. কেউ-কেউ ইচ্ছে করলে মাসিক একশো টাকা বেতনে গ্রামোন্নয়ন বিভাগের General Business Manager হিশেবেও কাজ করতে পারবেন। ইত্যাদি।

চিঠিটি শেষ পর্যন্ত পাঠানো হয়েছিলো কি না, হ'য়ে থাকলে উত্তর পাওয়া গিয়েছিলো কি না সে-বিষয়ে কোনো কাগজপত্র নেই। ইজরায়েলের Jewish Agency এখনো হয়তো বলতে পারবেন। স্বাধীনতার পরে ইজরায়েল রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক মধুর নয়। তবে, ১৯৩৭ সালে ইজরায়েল রাষ্ট্রের কোনো অস্তিত্ব ছিলো না, সে কথা মনে রাখা দরকার। এবং মনে রাখা দরকার যে কবি বিশ্বাস করতেন যে আরব ও ইহুদীরা আর্থিক ও সামাজিক ভাবে পরস্পরের সহযোগী না হ'লে, বন্ধু প্রতিবেশী ভাবে বাস করার কোনো সদুপায় আবিষ্কার না করতে পারলে, শুধু লণ্ডনে-ওয়াশিংটনে ব'সে বৈঠক করলেই মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না। প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে আজ সেই চেষ্টা শুরু হয়েছে।

মনে হয় চিঠি এবং পরিকল্পনার মুসাবিদা করেছিলেন কর্মী ও কবি অমিয় চক্রবর্তী। স্বদেশবিহীন চিরভ্রাম্যমাণ ইহুদী জাতির প্রতি তাঁর একটা স্বাভাবিক মমত্ববোধ ছিলো।

দুঃখী ইহুদীর ছবি আছে 'অভিজ্ঞান বসন্তে'-র "হাইফা" কবিতায়। রবীন্দ্রনাথ ও প্যালেস্টাইন প্রসঙ্গে যাঁরা উৎসাহী, এ-বিষয়ে আরো তথ্যাদি জোগাড় করার দায়িত্ব তাঁরা নেবেন। চিঠি এবং পরিকল্পনাটি কবির শ্রীনিকেতন-ভাবনার ক্ষেত্রে নতুন একটি দিগন্তের ইঙ্গিত করে।*

অন্য ঘটনাটি ব্যক্তিগত। আজ তাঁরা দুজনেই গত ব'লে দর্শকের নিস্পৃহ কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখা সম্ভব। লাহোর প্রবাস থেকে রবীন্দ্রনাথের কাছে না-হ'লেও কাছাকাছি চ'লে আসতে চাইছিলেন অমিয় চক্রবর্তী। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে হোক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হোক, অধ্যাপকের কোনো পদ পেলেই তাঁর চ'লে আসার ইচ্ছা। সে জন্যে যা কিছু করণীয় সব করেছিলেন। শূন্য পদ ছিলো না তাও নয়। অক্সফোর্ডে English Board-এর চেয়ারম্যান Nichol Smith, Sir Michael Sadler, C. S. Lewis প্রভৃতির শংসাপত্র পেশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও ব্যগ্র হ'য়ে উঁচুদরের কাউকে-কাউকে চাকরির সম্ভাবনার কথা জানতে চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন। এদিকে অক্সফোর্ডের হ'য়ে কবিকে সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধিতে ভূষিত করতে শিগগিরই ভারতের প্রধান বিচারপতি স্যর মরিস গয়্যারের আশ্রমে উপস্থিত হওয়ার কথা। মধ্যস্থ হিশেবে অমিয় চক্রবর্তী স্যর মরিসের সঙ্গে চিঠিপত্র লিখে অনুষ্ঠানের বিধিব্যবস্থা ঠিক করছেন। অনুষ্ঠান হবে শান্তিনিকেতনের সিংহসদনে। আসনের টানাটানি, তাই কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হচ্ছে আমন্ত্রিত মাননীয় অতিথিদের সংখ্যা। এমন অভূতপূর্ব ঘটনা তো সহসা কোথাও ঘটে না! সবাই ব্যস্ত, সবাই উদগ্রীব। অনুষ্ঠানের দিন ধার্য হয়েছে ৭ অগস্ট ১৯৪০। হঠাৎ এর মধ্যে কলকাতা থেকে কবি চিঠি পেলেন অমিয় চক্রবর্তী আসছেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিয়োগ কমিটির মিটিং ইতিমধ্যে হ'য়ে গেছে এবং উপযুক্ত আবেদনকারীর অভাবে কাউকেই তাঁরা নাকি নিয়োগ করতে পারেননি। অথচ বহুদিন ধ'রে কর্তৃপক্ষ আশা দিচ্ছিলেন যে পদটি অমিয় চক্রবর্তীকেই দেওয়া হবে, যোগ্যতর কাউকেই তাঁরা ভাবতে পারছেন না। আধুনিক ইংরেজ কবিদের উপর তাঁকে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বক্তৃতাও করানো হয়েছিলো। স্বয়ং উপাচার্য ছিলেন এক বক্তৃতায় সভাপতি। অবশেষে এই সিদ্ধান্ত! কবিকে জানিয়ে অমিয় চক্রবর্তী সংক্ষেপে লিখলেন : 'বাংলাদেশ ছেড়ে চললাম—এখানে যে-ভাবে দিন কেটেছে—যে-রকম ব্যবহার পেয়েছি তাতে আর থাকা সম্ভব নয়।' (চিঠি ১০২)। নিয়োগ-কমিটির কোনো-কোনো সদস্য আশ্রমের অনুষ্ঠানেও যাবেন কথা ছিলো, অমিয় চক্রবর্তী সে অনুষ্ঠানেও তাই আর থাকতে চাইলেন না। রবীন্দ্রনাথ এই নিয়োগ-রহস্য নিয়ে কী পরিমাণে রুষ্ট হয়েছিলেন তা তাঁর

---

* এই প্রবন্ধ লেখার কিছুকাল পরে ভারতের সঙ্গে ইজরায়েল-এর কূটনৈতিক সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। এবং অর্ধশতাব্দী আগে রবীন্দ্রনাথ প্যালেস্টাইনবাসী ইহুদীদের সহায়তায় শ্রীনিকেতনে চাষের উন্নতির জন্য যে-পরিকল্পনা করেছিলেন, সেই রকমের একটি সহযোগিতার ব্যবস্থা দুই দেশের গবর্মেন্টের মধ্যে গৃহীত হয়েছে।

চিঠিতেই দেখা যাবে। প্রতিকার কিছু একটা করবেন ব'লে মনঃস্থির ক'রে অমিয় চক্রবর্তীকে লিখলেন : 'আমার বিশেষ ইচ্ছা তুমি ৭ই অগস্টের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকো। আর কোনো কারণ নয়—তোমাকে আমি যে অন্যদের চেয়ে শ্রদ্ধা করি সেইটে দেখাবার সুযোগ পেতুম। তোমার সম্মান তুমি এখানে পেতে। তুমি হার মেনে যেয়ো না চলে। আমাদের সভায় তুমি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারতে। এখানে তোমার এই কাজ শেষ করে যেয়ো। অন্যেরা যেন কোনোমতে মনে না করে যে বাংলাদেশ থেকে তুমি অসম্মানিত হয়ে গেলে। শান্তিনিকেতনের সম্মানের তো মূল্য আছে।' ('চিঠিপত্র' ১১শ, ১০৫)। প্রতিকারের কী উপায় ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, কেউ জানে না। সিংহসদনের ভিতরে ক্যামেরায় অনুষ্ঠানের কোনো ছবি তোলার আদেশ ছিলো না। সংবাদপত্রের প্রতিবেদন থেকে কিছু অনুমান করাও কঠিন। শুধু জানা যায় ভিতরে মঞ্চ তৈরি হয়েছিলো অক্সফোর্ডের প্রতিনিধিদের জন্যে। ভাগ্যক্রমে অনভিজ্ঞ হাতে তোলা অনুষ্ঠান মঞ্চের একটি দুটি ছবি রবীন্দ্রভবন সংগ্রহে রক্ষা পেয়েছে। কেউ-না-কেউ ছবি তোলার আদেশ নিশ্চয়ই লঙ্ঘন করেছিলেন, তাই। তাতে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া মঞ্চে বসেছিলেন আরো চার জন : স্যর মরিস গয়্যার, স্যর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, বিচারপতি হেণ্ডারসন, আর অমিয় চক্রবর্তী। সবাই অক্সফোর্ডের আনুষ্ঠানিক হুডে গাউনে সজ্জিত। রাধাকৃষ্ণন ছিলেন স্যর মরিসের অক্সফোর্ড-নিয়োজিত সহকারী প্রতিনিধি হিশেবে। বিচারপতি হেণ্ডারসন লাতিন ভাষায় অক্সফোর্ডের অভিনন্দনটি পাঠ করেছিলেন। কিন্তু অনুষ্ঠান মঞ্চে ব'সে অমিয় চক্রবর্তীর কী করণীয় ছিলো তা ঠিক বোঝা যায় না। মঞ্চের নীচে সামনের সারিতে, স্টেটসম্যানের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বসেছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট ভারতীয় স্নাতকেরা। মাননীয় অন্য অতিথিদের স্থান হয়েছিলো পিছন দিককার সারিতে, যেখানে উপস্থিত ছিলেন এমন কেউ-কেউ যাঁরা ক'দিন আগেই কলকাতায় অধ্যাপক নিয়োগ কমিটির বৈঠকে অমিয় চক্রবর্তীর যোগ্যতা বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ ক'রে এসেছেন। তাঁদের চোখের সামনে অমিয় চক্রবর্তীকে মঞ্চে আসন দেবার একটিই কারণ হ'তে পারে—তাঁকে সেই বিশেষ সম্মান দেখানো, যার কথা চিঠিতে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অর্থাৎ প্রধান অনুষ্ঠানের সমান্তরাল ভাবে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাময় একটি ইঙ্গিতনাট্যের সেদিন আয়োজন হয়েছিলো, নিশ্চয়ই স্বয়ং নাট্যগুরুর প্রবর্তনায়। বিশেষ দুটি একটি অতিথি ছাড়া আর কেউ বোধ করি বুঝতেও পারেননি। কিন্তু কাজ হয়েছিলো।

অনুষ্ঠানের শেষে অমিয় চক্রবর্তী চ'লে গিয়েছিলেন লাহোরের দিকে, দিল্লীগামী ট্রেনে ব'সে একটি কবিতাও লিখে পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে : "বড়োবাবুর কাছে নিবেদন"—

> 'তালিকা প্রস্তুত
> কী কী কেড়ে নিতে পারবে না
> হই না নির্বাসিত কেরাণী'

সঙ্গে গদ্য মন্তব্য জুড়ে দিয়েছিলেন : 'হাটে-বাজারে মরীচিকা নিয়ে ব্যবসা চলচে—সেই

উপলক্ষে রচিত একটা লেখা পাঠাই।' (চিঠি ১০৪)

কোনো অজ্ঞাতকারণে শিগগিরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত পালটে গেলো, কয়েক মাসের মধ্যেই অপ্রত্যাশিত নিয়োগপত্র পেয়ে, কলকাতায় ফিরে অমিয় চক্রবর্তী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদে আসীন হলেন।

পরিশেষে আরো দুটি কবিতার প্রসঙ্গ আনতে চাই : রবীন্দ্রনাথের "ধূলি", অমিয় চক্রবর্তীর "ঘুম"—যে-দুটি কবিতার সঙ্গেই পত্রগুচ্ছের যোগ আছে। ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে অক্সফোর্ডে ব'সে বিধ্বস্ত আফ্রিকার বিষয়ে কবিকে চিঠি লিখছিলেন অমিয় চক্রবর্তী (চিঠি ৫০)। ইতালীয়রা আদ্দিস আবাবাতে যে-সব বর্বর 'কাণ্ড' করছিলো তার কথা লিখতে গিয়ে মানুষের সামগ্রিক ইতিহাসের কথা এসে পড়লো। ইতিহাসের সত্যি কি কোনো গন্তব্য আছে? 'কত দুঃখের মধ্যে দিয়ে মানুষের জাগরণ। কিন্তু এই জাগরণও কি বেশিদিন থাকে?—আবার ঘুম আসে, যুগ যায়, দুঃস্বপ্নের তাণ্ডবের মধ্যে মিথ্যা লেলিহান হয়ে ওঠে। পৃথিবীর ইতিহাসের একটা দিক বড়ো ভয়ঙ্কর—এই বিশ্ব-process -এর দিক। জানি process-ই সব নয়, পটের একদিক মাত্র, তাও দেখছি খণ্ডকালে —যা সব নিয়ে real, সেখানে শান্তি আছে সত্যে বিধৃত হয়ে—কিন্তু পৃথিবীতে যত দিন আছি ইতিহাসের পটে এই নিয়ত পরিবর্তনলীলায় বেদনারঞ্জিত চৈতন্যের ইতিহাস চেয়ে দেখি—দৃষ্টিতে বারে বারে অন্ধকার নামে।'—(২০ এপ্রিল ১৯৩৭)। হতাশায় ভরা এই ইতিহাসচিন্তা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উত্তর লেখা কোনো চিঠি নেই দেখে বিস্ময় লাগে। কিন্তু থাকবে কী করে? 'চিঠিপত্র' ১১শ খণ্ডে ২৯ মার্চ ১৯৩৭-এর পরবর্তী চিঠির তারিখ ৩ জানুয়ারি ১৯৩৮! মাঝখানে ন'মাস সময়ের ব্যবধান, সেই ন'মাসে রবীন্দ্রনাথ কোনো চিঠি লেখেননি তা হ'তেই পারে না। কিন্তু সংগ্রহে তো নেই, যদিও ঐ সময়ের মধ্যে লেখা অমিয় চক্রবর্তীর আরো পাঁচ-ছ'খানা চিঠি দৈবক্রমে রক্ষা পেয়েছে। অবশ্য মানুষের ইতিহাস চিন্তার প্রসঙ্গ আবার ফিরে আসে আড়াই বছর পরে, চিঠিতে নয়, কবিতায়। তার মাসখানেক আগেই আবার এক সর্বনাশা বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে, সেই বিষয়েই অমিয় চক্রবর্তী চিঠি লিখছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। (চিঠি ৯১) চিঠির সঙ্গে, সে-বিষয়ে একটিও কথা না ব'লে, "ঘুম" নামে কবিতাটি জুড়ে দেওয়া ছিলো :

'ঘুমের আকাশে রাত্রি আসে, দিন, তন্দ্রার উজ্জ্বল সূর্যফুল'

কবিতাটি দুরূহ। ব্যবহৃত কিছু প্রধান শব্দকে খানিক চেনা লাগে : 'কান্নায় রঞ্জিত দুঃস্বপনে'। শেষে মনে পড়ে আবিসিনীয় যুদ্ধ প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা চিঠিটির কথা। সেখানেও আছে ঘুমের প্রসঙ্গ। চমৎকৃত হ'তে হয় রবীন্দ্রনাথের লেখা উত্তর প'ড়ে, ৬ অক্টোবরে লেখা, 'চিঠিপত্র' ১১শ খণ্ডের ৩১০ পৃষ্ঠায় ছাপা আছে। 'অমিয় তোমার ঘুম কবিতাটি খুব ভালো লাগল।' তারপর সবটা চিঠি জুড়ে ঐ কবিতারই বিশ্লেষণ, এবং কবিতার বক্তব্য বিষয়ে, 'বর্তমানের নিষ্ঠুর অট্টহাস্য' বিষয়ে, কবির কিছু মন্তব্য। আধুনিক কাব্যের পাড়ায় একটু আধটু যাতায়াত আছে আমাদের। কিন্তু কবুল করতেই হয়, রবীন্দ্রনাথকৃত

ঐ-বিশ্লেষণটি না পড়লে, আমি অন্তত ঐ "ঘুম" কবিতার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারতুম না। আশার কবি রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটিও আমাদের ধাক্কা দেয়। কবিতার বক্তব্য বিষয়ে বলছেন : 'কেবল প্রশ্ন মনে জাগে যখন অনাদি সৃষ্টির ঘোলা ঘুম ভাঙবে তখন থাকবে কী—প্রলয় কি শুভ্র শূন্যতা—ভালোমন্দহারা নিঃশব্দ, একটা অনন্ত না, যার কোথাও কোনো জবাবদিহি নেই।' (শেষ দিকে কবি প্রশ্ন চিহ্নও ব্যবহার করতেন না, কিন্তু এর সবকটিই প্রশ্ন।) এর পরে আরো কিছু আশ্চর্য অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে। ইতিহাসের ঘুম বিষয়ে চিঠিটি লেখার পরেও বিষয়টা কবির মনে মুলতুবি থাকলো মনে হয়, মাস পাঁচেক পরে (২৮ মার্চ ১৯৪০) অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার উত্তর আর একটি কবিতা হ'য়ে বেরিয়ে এলো, নাম "রাতের গাড়ি" ('এ প্রাণ রাতের রেলগাড়ি')। অমিয় চক্রবর্তী পরে এটিকে 'নবজাতক' গ্রন্থের জন্যে বেছেছিলেন। ইতিহাসের ঘুম ভাঙলে থাকবে কী—"ঘুম" কবিতায় তার কোনো স্পষ্ট উত্তর নেই, "রাতের গাড়ি" কবিতায় আছে। উত্তরটা রাবীন্দ্রিক ধরনে স্পষ্ট। কামরায় গাড়ি ভরা ঘুম, নিদ্রাতুর সব যাত্রীরা, গাড়ির চালক কেউ নেই তা তারা বিশ্বাস করে না। গাড়িও নিশ্চয়ই গন্তব্যবিহীন নয়। ঘুমের ভিতরে আমরা অচেতনে থাকি কিন্তু নিদ্রিত মনে 'কোন্ দূর প্রভাতের প্রত্যাশা' জেগে ব'সে থাকে। ইঙ্গিতে বলা হ'লো, মানুষের ইতিহাসেরও তেমনি একটা গন্তব্য কোথাও র'য়ে গেছে, অনন্ত না-এর মধ্যে ইতিহাসের চাকা কখনোই থমকে থামবে না। সৃষ্টির যাত্রাকে রাতের রেলগাড়িতে চ'ড়ে যাত্রীদের পাড়ি দেওয়ার চিত্রকল্প দিয়ে প্রকাশ করায় কবিতাটিতে সহজেই 'প্রভাতের প্রত্যাশা' আনা সম্ভব হয়েছে, তবে সেটা কবিতাটির বিশেষ উপকার করেনি ব'লেই মনে হয়।

"ঘুম" এবং "রাতের গাড়ি" কবিতা দুটিকে কবির লড়াই বা কবিতাযুদ্ধ বললে ক্ষতি নেই। তুলনীয় সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত আর কোথাও মনে পড়ছে না।

রবীন্দ্রনাথের রচিত অন্য যে-কবিতাটি বিষয়ে দুকথা ব'লে এই ভূমিকা শেষ করতে চাই তার নাম "ধূলি" ('বাণীর মন্দির গড়ি'), এই পর্যায়ের উনশেষ পত্রটিতে উল্লেখ আছে। "ধূলি" শিরোনামে কবিতাটি কোনো গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'শেষ লেখা' গ্রন্থের পনেরোটি কবিতার মধ্যে এ-কবিতার সংখ্যা ৯, শান্তিনিকেতনের উদয়ন গৃহে রচনার তারিখ ৩ মে ১৯৪১। কিঞ্চিদধিক তিন মাস পরেই অপেক্ষা করছিলো সেবারকার ২২শে শ্রাবণ। সমাপ্তির ক্ষণ এত সন্নিকটে তা অমিয় চক্রবর্তীও ভাবতে পারেননি। তাই কবির শেষ জন্মদিন অনুষ্ঠানে শান্তিনিকেতনে উপস্থিত না থেকে তিনি চ'লে গিয়েছিলেন চট্টগ্রামে। সেখানকার সরকারি কলেজের তখন অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁর সেজো মামা সোমনাথ মৈত্র। তাঁরই আগ্রহে চট্টগ্রামে সেবার খুব বড়ো ক'রে কবির আশী বছরের জন্মদিন উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিলো। প্রধান অতিথি হ'য়ে শান্তিদেব ঘোষও গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতন থেকে। তাঁর গানই উৎসবকে সব চেয়ে সমৃদ্ধ করেছিলো ব'লে অমিয় চক্রবর্তী লিখেছেন। অনুষ্ঠানে পাঠের জন্য কবিকে দিয়ে অমিয় চক্রবর্তী একটি কবিতা লিখিয়ে নিয়েছিলেন। সেইটিই "ধূলি"। পূর্বে প্রস্তুত না

থাকলে অত্যধিক বিচলিত করার মতো এই কবিতাটি, আনন্দের অনুষ্ঠানে নিঃসীম বিষাদের এই রচনাটি কী ক'রে পাঠ করা যায় অমিয় চক্রবর্তী ভেবে পাচ্ছিলেন না। লিখেওছিলেন কবিকে : 'জন্মদিন উপলক্ষে এটা পড়লে এর অন্তর্নিহিত বেদনা সকলকে বাজবে এবং আপনার বাণীর মুরতি নির্জ্জন প্রাঙ্গণে আবার ধূলি হ'য়ে যাবে একথা কেউই মানবে না। সমস্ত পরিবর্তনের অতীত যে-শান্তির দৃষ্টি দিয়ে আপনি ধ্বংসের কথা বলেছেন তা সকলে বুঝবে না।' (চিঠি ১০৭)। এ-কবিতার অন্তর্নিহিত পরম বৈরাগ্যের রসে নিজেকে অভিষিক্ত করা সত্যিই বড় কঠিন। অমিয় চক্রবর্তী তাঁর চিঠির কোনো জবাব পেয়েছিলেন ব'লে মনে হয় না। বলা চলে, এ-বিষয়ে নীরবতাই ছিলো কবির প্রকৃষ্ট জবাব।

২২শে শ্রাবণে চ'লে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। তিন মাস পরে অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী'-তে "ধূলি" কবিতাটি বিষয়ে অমিয় চক্রবর্তী লিখলেন : '"তাজমহলে"র শেষ অংশের মতো এই কবিতার নিহিতার্থ দুরূহ সুগভীর।... শিল্পী যা রেখে যান তাতে নিত্যের দাবী নেই এই কথা দুটি কবিতায় এক। কিন্তু ঐটুকু মিল। বৈরাগ্যের শান্ত হাওয়া পৃথিবীকে ঘিরে বহমান ; ধূলি ওঠে মর্ত্য-সৃষ্টির বিলয়লীলায় ; তারি কাহিনী এই কবিতার অন্তর্গত। নব নব পূর্বাচলের আলোকে মৃত্যুহীন মানুষের যাত্রার সঙ্গীত বেজেছে 'বলাকা'-র কবিতাটিতে।... পৃথিবীতে কোনো বিশেষ কারুসৃষ্টি চিরদিন সমাদর পাবে না। সভ্যতার পরিবর্তধারায় মনের আকাশ বদলায় ; যা ছিলো আদরণীর স'রে যায় অবহেলার প্রান্তে। ...বিস্মৃত অধিকারকে প্রমাণিত করবার বিড়ম্বনা আর নেই। প্রকৃতির জগতে এমনতর ব্যর্থ চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায় না। গর্বিত মাটির মূর্তির চেয়ে মূর্তির নিম্নে বিক্ষিপ্ত অব্যবহৃত মাটির পিণ্ডের তাই গৌরব বেশি ...অনাসক্তির এমনতর পূর্ণ স্বরূপতা রবীন্দ্রনাথের অন্য কবিতায় নেই।'

জীবনের সমগ্র সৃষ্টিকর্মকে ডেকে বলা—'আদিম আত্মীয় তব ধূলি', অভিজ্ঞতার এই কঠিন শিখরস্তরে উপনীত কবি আশাবাদী ছিলেন কিনা সে-ধরনের প্রশ্ন তোলা অবান্তর। এই বিশ্ববিষাদের থেকেই নিঃসৃত হয় করুণা, যার সঙ্গে আনন্দের কোনো প্রভেদ নেই। "ধূলি" কবিতাটি পরিপূর্ণ বিষাদে ভরা কঠিন আনন্দের কবিতা, কনিষ্ঠের প্রতি জ্যেষ্ঠকবির শেষ এবং শ্রেষ্ঠ উপহার।

# কবির চিঠি কবিকে

# প্রথম পর্ব ।। ১৯১৬-১৯২৬

১

২৭.১১.২০ College Hostel[১]
Hazaribagh

শ্রীচরণকমলেষু,

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

আপনার ফ্রান্স থেকে লেখা চিঠিখানি আমি পেয়েছি। সেটা জগদানন্দবাবু "শান্তিনিকেতন" পত্রিকায় বার করেছেন এবং তার পর একে একে আমাদের বাংলা দেশের প্রায় প্রত্যেক মাসিক পত্রে দৈনিকে সেটা ছাপা হয়েছে[২]। আপনার চিঠির ভেতরকার আশার বাণী, আমার কেন, আমাদের দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই মনকে উদ্বোধিত করে তুলেছে। আপনি আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন আমাদের জীবন এই খণ্ডকালের মধ্যেই আবদ্ধ নয়, আমরা অমৃতের পুত্র। আপনি আমাদের প্রকৃত স্বরূপ, আমাদের অসীমকালবিহারী অমর আত্মার কথা বলেছেন আর দেখিয়ে দিয়েছেন যে আমাদের বন্ধন যদি অপসারিত হয় ত সে বাহিরের সাহায্যে হবে না, সে মুক্তি একমাত্র আসতে পারে আমাদের আত্মার অবিনশ্বরতার উপলব্ধি থেকে এবং সেই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে আত্মত্যাগের প্রেরণা আসে, যে উচ্চ আদর্শলাভের আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয় তার ভেতর দিয়ে। আপনার এই চিঠি পড়ে বেশ নিশ্চিন্তমনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ দ্বন্দ্ব দ্বেষ তর্কবিতর্ক দলাদলি নিয়ে দিন কাটানো এবং তাই নিয়ে গর্ব্বিত বোধ করা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে, অহঙ্কার ঔদ্ধত্য আপনার লজ্জায় আপনি মলিন হয়ে যায়। আমাদের দেশে এখন এই মুক্ত গগনের অনন্তলোকের বাণী বলবার লোক একজনও নেই। উত্তেজক পানীয়ের মত পলিটিকসেরও একটা নেশা আছে, এতে মানুষের মনে একটা উত্তেজনা আনে, তার perspective একেবারে উল্টে যায় ; সে ন্যায় অন্যায়, সত্য অসত্যের পার্থক্য দেখবার শক্তি হারিয়ে ফেলে,—কি জন্যে সে এত উত্তেজিত হয়ে নিজের এবং অন্যের অশান্তি বিদ্রোহ জাগিয়ে তুলছে তাও ভুলে যায়, সে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দেশের এবং দেশভক্তির নামে যত অন্যায় সাধন করে। আমাদের দেশের লোকেরও সেই অবস্থা হয়েছে। প্রকৃত আদর্শ, প্রকৃত মুক্তিলাভের ইচ্ছা তার নেই, সে কেবল নিজের মতামতের সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে বুদ্ধিবৃত্তির নানারকম চাতুর্য্যের দ্বারা ছোট ছোট জিনিসকে বড় এবং মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করতেই নিজের সমস্ত শক্তি খরচ করে ফেলছে, এবং পরম দেশহিতৈষী বলে তার ভক্তবৃন্দের প্রশংসা অর্জ্জন করে নিজের এবং অন্যের জীবনকে ধন্য জ্ঞান করছে।

আপনি এখন দেশে এলে দেখবেন এখানে কি অবস্থা। এখনকার এই দুঃসময়ে

মানুষের মধ্যে যে অবিনশ্বর বিরাট পুরুষ আছে, তার কথা বলতে গেলে উপহাসাস্পদ (sic) হতে হয়। তুচ্ছ জাত বা মতামতের পার্থক্যকে অবজ্ঞা করে প্রত্যেক জগৎবাসীর প্রতি সমভাবের কথা, সকলের প্রতি আত্মপর নির্বিশেষে করুণাময় স্নেহপ্রবণতার কথা বলতে গেলে, বা সরলতা, দয়া, ঔদার্য্য, ভালবাসা, ক্ষমা প্রভৃতি মানুষের সহজ স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গেলে লোকের চোখে হেয় হয়ে যেতে হয়, সকলে মনে করে এর দেশের টান মোটেই নেই, এ এখনও সেই সব 'সেকেলে' কথা বলতে লজ্জা বোধ করছে না, কারণ এ জানে না যে ঐ সব দয়া দাক্ষিণ্য করুণা ত্যাগস্বীকার করা প্রভৃতি 'ভালমানুষীর' যুগ এখন কেটে গেছে,—প্রকৃত 'পৌরুষ', অর্থাৎ বীরের মত অন্যের দুঃখসুখের দিকে না তাকিয়ে আপনার কামনাসিদ্ধি করার যে আনন্দ, মাতৃভূমির যথার্থ সন্তানের মত বিদেশী দেখলেই তাকে নিপীড়িত করে, অপমানে যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত করে শক্তি প্রয়োগ করার যে নির্ম্মল সুখ—এসব এ এখনও জানেনি বোঝেনি। আমি আমাদের বাঙালী যুবক অনেককেই দেখেছি, অনেকের মধ্যেই এই ভাব ঢুকেছে। অনেকে বহুদিনের সুপ্তি থেকে হঠাৎ উঠেই স্বাধীন ভাবে সংযত চিত্তে কিছু না ভেবেই 'দেশের কাজ' করব বলে অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে, এবং তার ফলে আর কিছু না হোক গোলমাল চেঁচামেচির অন্ত নেই। এর জন্যে তাদের দোষ দেওয়াও হয়ত চলে না ; কারণ দেশের যাঁরা নেতা বলে প্রসিদ্ধ তাঁরা কি নিজেদের জীবনে, কি লেখায় বক্তৃতায় কোনোদিকেই এমন একটা আদর্শ ধরে দিতে পারছেন না যাতে দেশবাসীর মনের ওপর কোনোরকম প্রভাব হতে পারে, তাদের হৃদয় মন সৎকর্ম্মের দিকে নিয়ন্ত্রিত হয়। যার যতটা ক্ষমতা সে অশান্তির ধূলো ওড়াতেই খরচ করে ফেলছে। এতে সত্য দৃষ্টির সম্ভাবনা আরো সুদূর হয়ে পড়ছে, এই অন্ধকার কলুষিত আবহাওয়ার বাহিরে যে এক রৌদ্রালোকিত নির্ম্মল শুভ্র গগন আছে, এই হিংসাদ্বেষপূর্ণ জীবনই যে মানুষের জীবন সম্বন্ধে চরম সত্য নয় সে কথা সকলের কাছে স্বপ্নরাজ্যের অভাব্য কাহিনীর মত মিথ্যা হয়ে পড়েছে। কিন্তু একটা শান্ত সুন্দর মঙ্গলময় আদর্শ সর্ব্বদা চোখের সামনে না থাকলে কোনো গোলমাল কোনো আন্দোলন যে সুফল আনতে পারে এ আমি বিশ্বাস করি না। মাঝে ঐ গোলমালে আমি দিক হারিয়ে ফেলেছিলাম, ধোঁয়ায় ধুলোয় অন্ধকারে আমার প্রকৃত দৃষ্টি হরণ করে নিয়েছিল, কিন্তু আপনার চিঠি পড়ে আমার সমস্ত সংশয় দূর হয়ে গেল, আমাদের অবস্থা যে কোনখানে দাঁড়িয়েছে, আমাদের যে কোনভাবে কি দিকে এগোতে হবে যে সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সংশয় রইল না। নিজের আত্মার বন্ধন ঘোচাতে চেষ্টা না করে, নিজের মনকে সত্যের আলোকে পরিপূর্ণ করতে প্রয়াস না করে কেবল বাহির থেকে মুক্তি পাওয়া যে কতদূর নিষ্ফল আমি তা দেখতে পাচ্ছি। এখনও আমরা অতি ক্ষুদ্র অর্থহীন প্রথার বন্ধনকে সানন্দে সগৌরবে বরণ করে ধর্ম্মের নামে যত অত্যাচার অন্যায়ের প্রশ্রয় দিচ্ছি—আমাদের মুখে মুক্তির কথা শোভা পাবে কি করে? এক জাত না হলে তার সঙ্গে আহার করা কেন, তার ছোঁয়া জল গ্রহণ করা, মুখ পর্য্যন্ত দর্শন করাকে আমরা ধর্ম্মের নামে মহাপাপ জ্ঞান করি ; 'নীচুজাতির' কেউ মরলে তার

সংকার করাকে পর্য্যন্ত ধর্ম্মের নামে বারণ করতে দ্বিধা বোধ করি না ; অসবর্ণের মধ্যে বিবাহের কথা হলে আমাদের দিগ্বিদিক জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায় ; বিবাহের সময় কন্যার পিতাকে পথের ভিখারী করে দিয়ে নির্লজ্জ ভাবে পণগ্রহণ করতেও আমাদের কিছুমাত্র বাধে না ; স্ত্রীশিক্ষার কথা শুনলেই ঘরে ঘরে মেয়েদের পতিভক্তি কমবে, 'হিন্দু রমণীর' যে এতদিনকার আদর্শ—কায়মনোবাক্যে দাসীর জীবন যাপন করা—সেটাও বা আর টিকবে না এই ভয়েই আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ি ; কোনদিন কোন প্রহরে কোন দিকে মুখ করে কি খেলে পুণ্য হয় বা পাপ হয় এই আমাদের সবচেয়ে বড় চিন্তা—এই যদি আমাদের দেশের বেশীর ভাগ লোকের সম্বন্ধে সত্য হয় তবে আমাদের পক্ষে জগতের স্বাধীন জাতির সঙ্গে সমান ভাবে দাঁড়ানর আকাঙ্খা দূরাকাঙ্খা (sic) মাত্র। এই যুগ যুগ সঞ্চিত পুঞ্জীত (sic) আবর্জ্জনা দূর করতে হবে, দেহে মনে কর্ম্মে চিন্তায় স্বাধীন হতে হবে—তাহলে বাহিরের দেওয়া মুক্তির জন্যে আর কাঁদতে হবে না, মুক্তি আপনিই এসে পড়বে।

এই ভেতরের দিকে কিন্তু কৈ কেউই তাকাচ্ছে না—যত কুসংস্কার, মিথ্যা আচারবিচার, হীন প্রথার দাসত্বে লোকে যেমন ছিল তেমনিই আছে এবং তা ক্রমেই বেড়েই চলছে—অথচ এসব কথা বল্লে কেবল লাভের মধ্যে লোকের অপ্রিয়ভাজন হতে হয়। দেশকে ভালবাসি বলেই এত কথা বলতে চাই, যেটাকে অশান্তির মূল বলে মনে হয় সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ইচ্ছে হয় কিন্তু লোকে ভাবে সভায় সমিতিতে উচ্চৈঃস্বরে আমাদের দেশের যা-কিছু-আছে তার প্রশংসা করে সমর্থন করে এই কলিযুগের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে হাহুতাশ করে দীর্ঘ বক্তৃতা না দিলে কোনো কাজই হল না। হয় তাই করতে হবে, না হয় উত্তেজিত ভাবে শ্বেতাঙ্গদের মার, ঘর বাড়ী লুট কর বলে চেঁচাতে হবে।

মহাত্মা গান্ধীর নন কো-অপারেশনেরও সব জিনিস আমার যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। তিনি আমাদের সকলকে ইস্কুল কলেজ ছাড়তে বলছেন, এবং পরের দেওয়া 'বিদেশী বিদ্যা' গ্রহণ করছি বলে লজ্জিত বোধ করতে বলছেন। জানি না আমি কতদূর বুঝেছি, আমার কলেজে পড়ে হষ্টেলে থেকে যেটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে আমার সন্দেহ হয় হঠাৎ সকলে বিদ্যাশিক্ষা ত্যাগ করলে ভাল ফল একেবারেই হবে কিনা। এখন অনেক ছেলেদের মন যা-তবু বাধ্য হয়ে একটু পড়াশোনা, স্বাধীনচিন্তার দিকে যাচ্ছে তখন সেটুকুও হবে না, কেবল দেশশুদ্ধ অন্তহীন অশান্তির সৃষ্টি হবে।

ভাঙ্গা সহজ, গড়ে তুলতে হলে শক্তি চাই। সেটা আমাদের কোথায়? দেশশুদ্ধ যদি National School, National College হয় এবং তাতে প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে ত সকলেরই আনন্দের কথা, কে আর তাহলে সেদিকে না গিয়ে পারবে? কিন্তু এক গান্ধীই এই কথা বলছেন, দেশবাসী সকলে এ-বিষয়ে উদাসীন। আমি দেখছিলাম এতে আর একটা কুফল হয়েছে, অনেক কষ্টে যে সব কৃষকদের, গরীব গ্রামবাসীদের তাদের স্বাভাবিক অনিচ্ছা-সত্বেও (sic) নিজেদের ছোট ছোট ছেলেদের

পাঠশালায় ইস্কুলে শিক্ষার জন্যে পাঠাতে রাজী করা গিয়েছিল, এই আন্দোলনের ফলে তারা আর কারুকে পাঠাতে চায় না। অনেক গ্রামে Night School, পাঠশালা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এর ফল যে ভাল হবে তা কি করে বলি?

সেদিন একটা ঘটনায় আমাদের দেশের অবস্থা সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট ধারণা হল। হাজারিবাগ সহর ছাড়িয়ে আমি সেদিন অনেক দূরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ফিরতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। অন্ধকার শীতের রাত্রি, তার ওপর ভয়ানক ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। নির্জ্জন রাস্তা দিয়ে একা পথ চিনে চিনে আসছি হঠাৎ মনে হল আমার পাশেই অন্ধকারের মধ্যে কি যেন একটা ছায়ার মত ক্ষুদ্র জিনিস এগিয়ে চলছে। ভারি আশ্চর্য্য বোধ হল। কাছে গিয়ে দেখি একটি সাত কি আট বছরের খুব কালো, কঙ্কালসার একটি ছেলে। অত রোগা যে মানুষ হতে পারে আমি জানতাম না, একেবারে অস্থিচর্ম্মসার, দুটো কাঠির মত পা, চোখ দুটো অর্থহীন ভাবে কোনোরকমে সামনের দিকে চেয়ে রয়েছে। এই শীতের রাত্রিতে ঠাণ্ডা বাতাসে তার সমস্ত দেহে কোনো আবরণ নেই, খালি পা। প্রথমে মনেই হচ্ছিল না এ কোনো পৃথিবীর প্রাণী হতে পারে, এর সঙ্গে যে জীবনের কোনো যোগ থাকা সম্ভব। পরে জিজ্ঞাসা করাতে অতি ক্ষীণ কণ্ঠে সে জানাল যে এই কলেরায় (এই অঞ্চলে কলেরায় এক একটা গ্রাম প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল) তার সকলে মারা গিয়েছে, কেউ নেই ; সে, সারাটা দিন বাজারে ঘুরে বেড়িয়েছে, এখন এমনি চলে যাচ্ছে। সে ঐ অন্ধকারে লক্ষ্যহীন ভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল, কোনো বিশেষ জায়গায় যাচ্ছিল না, কারণ তার কোনো জায়গা নেই যেখানে সে যাবে।

এই রাত্রে এই অন্ধকারে গৃহহীন আশ্রয়হীন আত্মীয় স্বজনবিহীন একটি শিশু দারুণ শীতে বিবস্ত্রভাবে সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এ দৃশ্য কখনও ভুলব না। এরকম দুঃখ দেখলে সমস্ত জগৎ মিথ্যা হয়ে যায়। আমি ঘরে গিয়ে আরামে সময় কাটাব এটা কেমন একেবারে অসম্ভবরকম বিসদৃশ বলে বোধ হল। এই দুঃখ দারিদ্র্য অপরিসীম অসহায়তা যে দেশে সে দেশের কবে উদ্ধার হবে? কখনও হবে কি? সে আশাও যে করতে পারি না। এর পর আমরা কি করে সারহীন বক্তৃতা মিথ্যা আন্দোলন নিয়ে সময় কাটাতে পারি? যে দেশভক্তি এই লক্ষ লক্ষ অসহায় মূক চিরদুঃখীদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে না, তাদের সুখস্বচ্ছন্দ (sic), আনন্দবেদনা, আশা নিরাশার দিকে দৃক্‌পাত করা পর্য্যন্ত দরকার মনে করে না, তার সার্থকতা কি? বিলিতী পলিটিক্‌স, —তার বাকচাতুরী, তার বড় বড় গভীর অর্থপূর্ণ ডিপ্লোমাটিক কলকৌশলাদি—ওসব বিদেশেই থাক, এ দেশে তার আমদানি করে লাভ কি? আমাদের আদর্শ ভিন্ন, আমাদের জীবনপ্রণালী ভিন্ন, আমরা দাসত্বশৃঙ্খলবদ্ধ, দৈন্যনিপীড়িত, দুঃখজর্জ্জরিত জাতি, আমাদের আদর্শ হবে ত্যাগের, আত্মউপলব্ধির, সৌম্যের, শান্তসুন্দর মঙ্গলের—পাশ্চাত্য দেশের আত্মসুখানুধ্যায়ী স্বার্থপর হিংসাপ্রিয় সরলতা-বিবর্জ্জিত অস্বাভাবিক দেশভক্তির অনুকরণ করে আমরা কেন নিজেদের হাস্যাষ্পদ (sic) করব?

সেদিনকার ঐ ছোট ছেলেটিকে দেখে আমার মনে হল আমাদের ভারতবর্ষেরও

ঐ অবস্থা—সে-ও অমনি গভীর অন্ধকারে অন্তহীন দুঃখের মধ্য দিয়ে অসহায়ভাবে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে—তারও দেহ দৈন্যদীর্ণ, তারও চতুর্দ্দিকে নির্দ্দয়তা অত্যাচার, তারও সম্মুখের পথ কণ্টকবন্ধুর বিপদসঙ্কুল, কে তাকে মঙ্গলময় শান্তিপূর্ণ আশার বাণী শোনাবে, চিরসূর্য্যালোকোজ্জ্বল আনন্দনিকেতনের দিকে পথ দেখিয়ে দেবে?

আমরা এখন আপনাকে এই দেশে চাই কারণ একমাত্র আপনিই আমাদের মন ওপরের দিকে নিয়ে যেতে পারবেন, আমাদের কোন্ দিকে চলতে হবে সে উপদেশ দিতে পারবেন,—আমাদের সরল আদর্শ দেখিয়ে দিতে পারবেন। আপনাকে এখন আমাদের ভয়ানক দরকার, আপনি ছাড়া কেউ আমাদের বাঁচাতে পারবে না। কারণ আপনি গানের মধ্য দিয়ে দেশবাসীর মনে যে উদারতা, ও একতার গভীর চেতনা সঞ্চারিত করতে পারেন লক্ষ লক্ষ বক্তৃতায়, দৈনিকের আর্ত্তনাদে তার সহস্রাংশও করতে পারে না। এক "দেশ দেশ নন্দিত করি" গানে জাতীয় মনে যে নিবিড় পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছে ও প্রভাব বিস্তার করেছে তাই দেখলেই এ বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না।[৩] সেই জন্যে আপনার কাছ থেকে আমরা আরো গান চাই, আরো লেখা চাই ; আমরা চাই যে নানাদেশ নানালোক দেখে বিচিত্র অভিজ্ঞতার আলোকে আপনি আমাদের মনের সঙ্কীর্ণ অন্ধকার অপসরিত করে দেবেন।

আপনি কি আমেরিকায় বেশিদিন থাকবেন? আপনি গেলে ওরা নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভাবতে আরম্ভ করবে, আর ওরা যখন স্বাধীন দেশ আর বিশ্বপ্রেমকেই নিজেদের মন্ত্র বলে মানতে চায়, তখন ওদের ত আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করাই উচিত।—আমাদের সম্বন্ধে চিন্তা করা উচিত। আমি বিলাতের অনেক খ্যাতনামা লোকদের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি,[৪] তাঁরা সকলেই লিখেছেন আপনি যাওয়াতে সেখানে কি রকম একটা Spiritual influence হয়েছে এবং সেইজন্যে অনেকেই আর এ দেশ সম্বন্ধে নীরব হয়ে উদাসীন ভাবে থাকতে পারছে না। আপনার প্রতি তাঁদের সরল স্বাভাবিক শ্রদ্ধার ভাব দেখলে চমৎকৃত হয়ে যেতে হয়। —এই যুদ্ধের ফলে আমেরিকায় কি পরিবর্ত্তন হয়েছে জানি না। ওরা ত অনেক দূর থেকে এই বিংশ শতাব্দীর নরমেধ যজ্ঞ দেখেছে—এতে অন্ততঃ ওদের চিরকালের মত materialism-এর কুফল সম্বন্ধে শিক্ষা হওয়া উচিত। ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে দেশবাসীদের মধ্যে যে একটা নূতন জাগরণের কথা আপনি বলেছেন আমেরিকায় সেরকম স্বাধীনতার স্বার্থত্যাগের চিহ্ন দেখলেন কিনা জানতে ইচ্ছা করে।

আপনার আর সময় নষ্ট করব না। এর সঙ্গে কয়েকটা গান পাঠালাম,[৫] আশা করি আপনার ভালো লাগবে। এই অশান্তির মধ্যে গান বাঁধা বড় শক্ত। তবু মাঝে মাঝে যা মনে হয় তার একটু চিহ্ন রাখতে ইচ্ছা করে।

এ চিঠি আমি Macmillan-এর ঠিকানায় পাঠাচ্ছি, আশা করি আপনি পাবেন।

ইতি আপনার
স্নেহাকাঙ্খী (sic)
শ্রী অমিয় চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

১. কাতর মনের গান

ক্লান্ত হৃদয় তোমায় ডাকে,
শান্ত আজি কর তাকে।
বিশ্ব জুড়ে নিঠুর খেলা
চারিদিকেই অবহেলা—
তুমিও যদি কাঁদাও মোরে
কেমন করে' জীবন থাকে?

সকল বেদন সইতে পারি
তুমি যদি না যাও ছাড়ি'।

আজকে যদি হৃদয় মাঝে
প্রিয়জনের আঘাত বাজে
সইব তাহাও ; একটুকু প্রেম
তুমি যদি দাও আমাকে।

ক্লান্ত হৃদয় তোমায় ডাকে
শান্ত আজি কর তাকে।।

২. গান

তোমায় কেবল সবাই আঘাত করে,
দেখে আমার চক্ষে যে জল ঝরে।
বন্ধু আমার, কেন তোমার প্রাণে
সারাজগৎ এমন করে' হানে?
আমি ত আর সইতে নাহি পারি
নীরব হয়ে রইতে নারি ঘরে—
দেখে আমার চক্ষে যে জল ঝরে।

হে উদাসী, তোমার হৃদয়তলে
কিসের ব্যথা এমন করে' চলে?
কোলাহলে থাক যে হায় একা
নয়নে কোন সুদূর স্বপ্ন-রেখা,
বহু যুগের কোন সে আঁধার ছায়া

ঘনিয়ে ওঠে তোমার চিত্ত পরে :
দেখে আমার চক্ষে যে জল ঝরে।।

## ৩. দুঃখের মুক্তি

তোমার স্মৃতি, ব্যথার নিবিড় টানে
টানবে আমায় অজানিতের পানে।
এই জীবনের কোলাহলের বাণী
স্পর্শ আমায় করবে না আর জানি,
আমার মনের গোপন বেদন খানি
উঠবে ফুটে নিত্য নূতন গানে
টানবে আমায় অজানিতের পানে।

তুমিই যদি ছাড়লে আমায় তবে
আসুক দুঃখ, ভয় বুঝি মোর হবে?
হে প্রিয়, এই চিত্ত ব্যথায় ভরে'
পারের পথেই আনলে তুমি মোরে,
এখন এ মন সারাজীবন ধরে
দুঃখ মাঝেই মুক্তি শুধু জানে
টানলে তুমিই অজানিতের পানে।।

## ৪. হারা-পাখী

মন যে কেমন করে, বন্ধু, আমার চিত্তখানি
আজ সকালে হঠাৎ কেন কাঁদে তোমার তরে?
ভুলে-যাওয়া কোন সে ব্যথা জাগল তা কি জানি?
মন যে কেমন করে।

কোন অতীতের হারা-পাখী আমার একা ঘরে
পথ ভুলে আজ উড়ে এল? বন্ধু, তোমার বাণী
কেন সে আজ শোনায় আমায় অনেক দিনের পরে?

আজ কে আমার হৃদয় মাঝে করছে কানাকানি
তোমার কথা, তোমার হাসি,—অসীম ব্যথার ভরে
বিশ্বভরা বেদন যেন দেয় আমারে আনি—
মন যে কেমন করে।

## ৫. আপন মনের গান

আমার থাকুক একলা ঘরে
আপন-মনে জানাজানি—
এই বাতায়নে চেয়ে দেখা,
ঐ আকাশ-ভরা উদার বাণী!
সারাটা দিন কতই সুরে
স্বপন আমার বেড়ায় ঘুরে,
কেই বা জানে?—কার আছে তা
ব্যাকুল গানে দেব আনি'?
থাকুক আমার একলা তবে
আপন-মনে জানাজানি!

এই হৃদয়ের অতল নীরে
সন্ধ্যাতারার পড়ুক ছবি—
নানাক্ষণের ভাবনাগুলি
দিক রাঙিয়ে সন্ধ্যা রবি।
গভীর রাতে চাঁদের আলো
চাইবে আমায় সেই ত ভালো,
কি হবে আর সবার মাঝে
মনকে নিয়ে টানাটানি?

আমার থাকুক একলা ঘরে
আপন-মনে জানাজানি।

## ৬. পথিকের গান

হে তরুণ বন্ধু আমার
হে নূতন পথের সাথী
কি আলোয় করলে আলো
আমার এই নিশীথ রাতি!
আমি যে একা একা
চলেছি অন্যমনে,
নিশিদিন স্বপ্নদেখা
উদাসী ক্ষণে ক্ষণে!

তুমি যে কেমন করে'
সারামন নিলে হরে'—
কি মোহন মন্ত্রে তুমি
জ্বালালে প্রেমের বাতি?
হে তরুণ বন্ধু আমার
হে নূতন পথের সাথী!

হে তরুণ বন্ধু আমার
হে নূতন পথের সাথী
শোনালে কি গান আজি
হৃদয়ের ছন্দে গাঁথি?
তোমার ঐ মুখে চেয়ে
শুনে ঐ তোমার বাণী
কি যে সুর ওঠে গেয়ে
আমার এই হৃদয়খানি!

তোমার ঐ নয়ন ভরে'
এনেছ হিয়ার 'পরে
জগতের যত ব্যথা
স্বরগের অরূপ ভাতি—
হে তরুণ বন্ধু আমার
হে নূতন পথের সাথী!

৭. গান

এই যে এরা নিত্যকালের
সঙ্গী আমার তারার আলোর—
যুগে যুগে লোকে লোকে
বাঁধল প্রাণে প্রেমেরি ডোর,—
এই যে এরা স্মৃতির ভরে
চিত্ত আমার কেমন করে
এই যে এদের মুখে চেয়ে
ফেলি আমি নয়ন-লোর,—
এরা যে আজ রইল বাকি
অন্ধকারে প্রাণের কাছে,

নীরব চোখের কাতর চাওয়া
চোখে আমায় চেয়ে আছে।
যাদের আপন বলে মানি
তারা আমায় চায় না জানি
ব্যথার দিনের এদের নিয়েই
কাটাব তাই জীবন মোর,
এই যে এরা নিত্যকালের
সঙ্গী আমার তারার আলোর।।

## ৮. গান

হাত দিয়েছি তোমার হাতে
তারাহারা আঁধার রাতে।
যেথায় আমার নেই গো কেহ
থাকুক তোমার শীতল স্নেহ,
যেথায় কেহ চায় না মোরে
সেথাই থাক বেশী করে'—
যেখানে জল নয়ন পাতে,
তারাহারা আঁধার রাতে।

তোমায় আমি পেলাম প্রাণে
মন যেন মোর তাহাই জানে।
দুঃখ সুখে কি যায় আসে
তুমিই যদি রইলে পাশে?

তোমার প্রেমের নিবিড়তা
ভুলাবে গো সকল ব্যথা,
শান্তিধারা আনবে সাথে
তারাহারা আঁধার রাতে।।

## ৯. গান

তুমি যে ভুলিয়ে নিলে—
আমায় ঐ রূপের রাশিতে।
নীল আকাশে, তারার আলোয়,
মেঘলা দিনে কাজল কালোয়

ফুলের বনের রঙীলতায়
চাঁদের হাসিতে—
বেণুবনে বাঁশের বাঁশিতে
তুমি যে ভুলিয়ে নিলে!

কি সুধা ছড়িয়ে দিলে!
আলোয় ঐ আকুল যূথিকা!
তোমার বাণী ফুলের বাসে
ঈষৎ হাওয়ায় ভেসে আসে—
তোমার সুরে বীণা বাজায়
বনের বীথিকা!
ভুবন ভরা তোমার গীতিকা।
কি সুধা ছড়িয়ে দিলে।

## ১০. দূরের বন্ধু (গান)

আরো দূরে,—নীলাকাশে
ঐ সাদা পথ ঘুরে ঘুরে
রেখায় যেথা মিলিয়ে আসে—
আরো দূরে...

এই জগতের সকল সুরে
ফলে ফুলে সবুজ ঘাসে
পাই না কাছে সে বন্ধুরে।।

না জানি কোন তারার পাশে
রইল সে কোন্ বিজন পুরে—
চিহ্নহারা কোন আবাসে,
আরো দূরে...

## ১১. দিন-যাত্রা

(Swinburne-এর Roundel-এর অনুছন্দে)

এই যে আমার দিনগুলি সব স্বপ্নে উড়ে যায়
আকাশ-পথে পাখীর মত দিগন্তে বিলীন

স্মৃতির রেখা রাখে কেবল মনের কিনারায়
      এই যে আমার দিন—

নানাক্ষণের নানামনের রঙেতে রঙীন
একে একে সবাই এরা নিতেছে বিদায়।
আমার জীবন-শিখাও ক্রমে হয়ে আসে ক্ষীণ।

আজকে হৃদয় ভরল কেন নীরব বেদনায়
চলে-যাওয়ার ব্যথা কেন করল উদাসীন?
বহুকালের কোন স্মরণের বিরহ জাগায়
      এই যে আমার দিন?

---

**টীকা**

১ হাজারিবাগে আইরিশ মিশনের পরিচালিত সেইন্ট কোলাম্বাজ কলেজের হস্টেল থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখা এটিই অমিয় চক্রবর্তীর প্রথম চিঠি যা রবীন্দ্রভবন সংগ্রহে আছে। এ-কলেজে মোট চার বছর থেকে ১৯২১ সালে তিনি বি. এ. পাশ করেন। বিশ্বভারতীর 'চিঠিপত্র' ১১শ খণ্ড থেকে দেখা যায় কবির সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ শুরু হয়েছে আরো আগে, ১৯১৬ সালের মার্চ মাস থেকে, যখন তিনি কলকাতায় হেয়ার স্কুলের ছাত্র, বয়স ১৫।

২ ১৯২০ সালের ২৮ অগস্ট তারিখে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিটি এসেছিলো দক্ষিণ ফ্রান্সের কাপ্ মার্ত্যাঁ থেকে ('চিঠিপত্র' ১১শ, ১৪ দ্র.)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে তিনি তখন য়ুরোপ ভ্রমণ করছেন। স্বদেশে নন-কোঅপারেশনের ঘোর উন্মাদনা, যা তিনি সমর্থন করতে পারেননি। লিখেছিলেন : 'আমাদের বর্ত্তমান সঙ্কীর্ণ, আমাদের সম্মুখে ভাবীকাল বাধাগ্রস্ত, এই জন্যেই আমাদের মন বড় করে ভাবতে পারচে না, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করচে। ... কোনো রিফর্ম্ম বিল আমাদের দুঃখ পার করতে পারবে না।' সমসাময়িক উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র সমাজের পক্ষেই এ-চিন্তাকে মূল্যবান জ্ঞান ক'রে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম সর্বাধ্যক্ষ জগদানন্দ রায় (১৮৬৯-১৯৩৩) চিঠিটি তৎক্ষণাৎ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর যোগাযোগ তার আগে থেকেই ঘনিষ্ঠ ছিলো। এ-ধরনের ভাবনা সংবলিত চিঠি রবীন্দ্রনাথ কেন এই তরুণ ছাত্রটিকে লিখছেন তা ভূমিকায় আলোচিত হয়েছে।

৩ গানটির রচনাকাল অগস্ট ১৯১৭, প্রথম প্রকাশ 'ভারতী' ও 'প্রবাসী'-র ১৩২৪-এর ভাদ্র সংখ্যায়।

৪ আসামের গৌরীপুরে প্রতাপচন্দ্র ইনস্টিটিউশনের ছাত্র অবস্থা থেকেই যাঁদের লেখা তাঁর ভালো লাগতো সেই সব বিদেশী মনীষীদের সঙ্গেও রীতিমতো বয়স্ক ধরনে তিনি পত্রালাপ করতেন। রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁরাও প্রথমে কেউ জানতে পারেননি যে পত্রলেখকটি তরুণ বয়সের ছাত্র। প্রথম চিঠির উত্তরে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাঁকে 'বিনয়সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন'

জানিয়েছিলেন। 'কল্যাণীয়েষু' সম্ভাষণে পৌঁছতে অবশ্য বিলম্ব হয়নি।

৫ কম বয়সে রবীন্দ্রনাথের ধরনে অসংখ্য গান কবিতা লিখেছিলেন অমিয় চক্রবর্তী। রচনাগুলি ভালো লেগেছিলো রবীন্দ্রনাথের, এবং তাঁর পরামর্শে সমসাময়িক পত্রিকায় কিছু-কিছু ছাপাও হয়েছিলো, কিন্তু নিজের কোনো গ্রন্থে এসব কবিতার একটিকেও রাখেননি। কেন রাখেননি সেটা তাঁর পরিণত বয়সের কবিতার সঙ্গে পরিচয় থাকলে বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তাঁর 'কবিতাসংগ্রহ' দুখণ্ডের (১৯৭৭ ও ১৯৮০ ?) পরিশিষ্ট অংশে, লেখকের অনিচ্ছাসত্ত্বেও, সম্পাদকের নির্বন্ধে, তার কিছু নমুনা স্থান পেয়েছে।

## ২

২১.৩.২৫

গৌরীপুর [১]
আসাম

শ্রীচরণকমলেষু,

এ মাসের 'প্রবাসী'তে আপনার "ঝড়" ও "কঙ্কাল" কবিতা দুটি পড়ে' যে কি গভীর সান্ত্বনা পেয়েছি, সমস্ত চেতনা যে কি বিপুল আনন্দে অত্যুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তা আপনাকে না জানিয়ে পারছি না।[২] প্রতিদিনের শত তুচ্ছতায় মনের আকাশ ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন হ'য়ে ওঠায় যখন সঙ্কীর্ণ মানসমণ্ডলে সব জিনিষ অকারণ বেদনায় মণ্ডিত হয়ে দেখা দিচ্ছিল সেই সময় আপনার কবিতা প্রচণ্ড বিশ্বাসের বাণী বহন করে' মনকে দুঃসহ মুক্তির মধ্যে নবজীবন দান করল, সমস্ত সুখদুঃখের পারে অসীম শান্তির চিরোজ্জ্বল আনন্দনিকেতনের পরিচয় পেয়ে সমস্ত মনপ্রাণ পুলকিত ধন্য হল।

আবেশের রসে মত্ত
আরাম-শয্যায়
বিজড়িত যে-জড়ত্ব
মজ্জায় মজ্জায়—
তাকে মর্ম্মে মর্ম্মে নির্ম্মমভাবে হেনে' যে ঝড়, বিদ্যুতের ছন্দে
ডেকে ওঠে মেঘ-মন্দ্রে
নয়, নয়, নয়—

এই সেই ঝড় ; আপনি কোনোদিন আমাদের ছোট সুখের সন্ধান দিয়ে তৃপ্ত করার চেষ্টা করেননি, আপনার কবিতা পড়ে যে-বেদনা পাই তা সৃজনধর্ম্মী, জড়ত্বের বাঁধন ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত চৈতন্যে রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে দৃপ্ত আনন্দের জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে— আপনার পৌষ মাসের কবিতা "আহ্বানে"র [৩] ভাষায় বলতে গেলে চিত্তের সেই বন্ধনহীন 'শুভ্রতায় শূন্যে দেখা দেয় চিরন্তন শান্তি সুগম্ভীর', 'স্বচ্ছ আনন্দে'

'পূর্ণ হয় অরূপসুন্দর আবির্ভাব, অশ্রুধৌত জ্যোতি'। "কঙ্কাল" কবিতাও আপনার যে-কোনো সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতার সঙ্গে সমান আসন পেতে পারে ; আনাতোল ফ্রাঁসের একটা গল্পে আছে মানুষের কঙ্কাল দেখে বৈরাগ্যব্যথিত কোনো একটি তরুণীর মনে জীবনের আসক্তি ফিরে এসেছিল, আপনার কবিতায় যে-সান্ত্বনা আছে সে তার চেয়ে অনেক গভীর। [৪] Browning-এর "Prospice" বা "Epilogue to Asolando" [৫] প্রভৃতি যে-সব কবিতাকে 'পাশ্চাত্য জগতে আত্মার প্রতি বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠ এবং পূর্ণতম নিদর্শন বলে' গ্রহণ করে যাতে তার মধ্যেও একটা যুদ্ধের আস্ফালন আছে, একটা উগ্র তীব্রতা আছে যাতে একটা জায়গায় গভীর বিশ্বাস-শক্তির অভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়—কিন্তু এমন মৃত্যুর মুখের উপর উত্তর করে হাসিমুখে 'তোমার কথা বিশ্বাস করি না!' এ কথা কে বলতে পেরেছে. বা তার পরে এমন শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে অমর আত্মার বিজয়গান গাইতে? আপনি বরাবরই কথার যুক্তির চেয়ে যা ঢের বড়, প্রাণের আপন যুক্তি দিয়ে, যা আছে রয়েছে তাকেই ফুটিয়ে তুলে' জীবনের সত্যরূপ উদঘাটিত করে' সমস্ত অশান্তি অবসাদ মুহূর্ত্তের মধ্যে দূর করে দেন—আমরা নিজেরাই নিজের ভিতর থেকে এবং চারদিকে অনন্ত সুন্দরকে আবিষ্কার করি আর সব কথা ভুলে যাই! "ঝড়ের খেয়া"য় [৬] ঘনঘোর দুর্দ্দিনের ঐ অসহ্য সংশয়সঙ্কুল অশান্ত আন্দোলনের পর যখন শেষ কয়েকটি লাইনে মানুষের নিজেরই প্রতি কর্ম্ম প্রতি চিন্তার অন্তর্নিহিত সহজ বিশ্বাসের কথা বল্লেন, যার নিগূঢ় আশ্বাসে বীরের দল লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মত প্রভাত-আলোর দিকে ছুটে যেতে পারছে প্রাণ দিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে করতে,—তখন এক মুহূর্ত্তে সব আশঙ্কা দূর হল ; 'বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা। এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা?' —এই প্রশ্নের মধ্যেই চিরন্তন যে-উত্তর তা ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। ওরা Problem of Evil নিয়ে গোলমাল করে, বলে এই নির্ম্মম সমস্যা চিরদিনই মানুষের মনকে একদিকে অন্ধকারে অসহায় করে' রাখবে—কিন্তু একবার যদি "হে মোর সুন্দর" কবিতাটি [৭] সহজ মন নিয়ে তলিয়ে ভেবে পড়তে পারত তাহলেই মনে আলো পেত। কিন্তু 'বলাকা'র কবিতার চেয়েও এই "ঝড়" "কঙ্কাল" "হে ধরণী" [৮] প্রভৃতি প্রত্যেক কবিতাই আরো এক ধাপ উপরে উঠে গিয়েছে—যারা আপনার কবিতা নিজের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে অনেককাল থেকে গভীরভাবে পড়ে আসছে তাদের মনে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আপনার ছন্দের এবং ভাষার সঙ্গীত যে ক্রমেই কিরকম অন্তর্গূঢ় হয়ে এসেছে—প্রত্যেক কথাটি কতদূর স্বচ্ছ হয়ে' সহজে আলো বিকীর্ণ করছে ; ভাবের গভীরতা যে কিরকম আকাশের মত স্বাভাবিক অথচ অন্তহীন ব্যঞ্জনায় ভরা সে সব কথা কেমন করে' বোঝাব জানি না কিন্তু সমস্ত হৃদয় দিয়ে তা বুঝতে পেরেছি। যদি কোনোদিন যোগ্য বোধ করি, এবং বেঁচে থাকি ত একথা নিশ্চয়ই স্পষ্ট করে' খুলে দেখাতে পারব। "অপরিচিতা", "আহ্বান", "আন্‌-মনা" প্রভৃতি কবিতায় [৯] 'মানসী'-র সুর কিরকম অন্য রূপ নিয়ে ফিরে এসেছে,— "হে ধরণী" প্রভৃতি কবিতায় 'বলাকা'র যে বিশেষত্ব—বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্যের মধ্যে যে-সত্যের বিচিত্র প্রকাশ তাকে এক করে'

কল্পনায় অনুভূতির আলোয় সমগ্র সুন্দর অনির্ব্বচনীয় আনন্দময় করে দেখা—সেটা আরো কিরকম পরিণতি লাভ করেছে...এ সমস্ত পরিষ্কার করে' ধরে' দেওয়ার লোক চাই। কিন্তু এখনকার দিনে শুধু কাব্যের ভাবগুলিকে পরস্পরের সাহায্যে বোঝাবার চেষ্টা করাও যথেষ্ট নয়, দর্শন এবং সাহিত্য (বিজ্ঞানেরও মূলতত্ত্ব) অন্য দেশে যে উৎকর্ষলাভ করেছে তার মধ্যে যার সহজ প্রবেশ নেই তার দ্বারা কাজটা সম্পূর্ণ ভাবে ঠিকমত হতে পারবে না। আমার ত সমস্ত সাধনার লক্ষ্যই তাই। জানি না সে অবধি কোনোদিন পৌঁছতে পারব কিনা। কিন্তু আশা, বা চেষ্টাও ছাড়ছি না ; তত্ত্ব-আলোচনা ত নয়, এ হচ্ছে প্রাণের সঙ্গে যে-সব উপলব্ধি এক হয়ে আছে তাকেই যথাবিহিত রূপে সহজে প্রকাশ করা।

আপনি শুনে খুশি হবেন Ellis-এর মত অমন একজন দুর্ধর্ষ বৈজ্ঞানিক এবং পণ্ডিত ব্যক্তিও [১০] তর্জ্জমার মধ্য দিয়েও আপনার কাব্যের যে-রস পেয়েছেন তাতে সম্পূর্ণ মুগ্ধ হয়ে গেছেন। তাঁর কাছ থেকে সম্প্রতি মস্ত একখানি চিঠি পেয়েছি—তাতে তিনি আপনার 'Nationalism' বইটাকে [১১] "profoundly significant" বলে' লিখেছেন আর বলেছেন বইখানি "of abiding value" যা লোকে আরো "divine common-sense" ফিরে পেলে আদর করতে এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে শিখবে। 'বিশ্বভারতী' সম্বন্ধে তিনি খুব কমই জানেন, [১২] এবং তাই সে সম্বন্ধে তাঁর ঝাপসা রকমের ধারণা, যদিও যেটুকু বুঝেছেন তার সঙ্গে ওঁর মনের সম্পূর্ণ মিল আছে জানিয়েছেন। সে বিষয়ে আমি ওঁকে যথাসাধ্য মূল কথা বোঝাবার চেষ্টা করব ; আর সাহায্য হয় এমন আপনার বই এবং 'Quarterly' [১৩] পাঠিয়ে দেব। তিনি কিন্তু আপনার সম্বন্ধে মস্ত বড় এক অভিযোগ করেছেন। তিনি বলছেন ভাবুক হিসাবে আপনি "Modern Civilization"কে যে রকম "vehemently denounce" করেছেন তার চেয়ে "noble" এবং "inspiring" আর কিছু হতে পারে না, কিন্তু কবি-হিসাবে আধুনিক সভ্যতার যে "high romance" আছে তা শুধু "idea"র মধ্য দিয়ে নয়, বিজ্ঞানের তপস্যার ফলে আকাশে যে aeroplane উড়ছে, মহাসমুদ্রে যে-সব মস্ত মস্ত জাহাজ নীল-মৃত্যুর তুফান-কষায়িত ঊর্ম্মিমালা ভেদ করে' চলেছে শুধু তার বাহিরের সৌন্দর্য্যও আপনার দেখা এবং দেখানো উচিত। উনি বলছেন আপনাকে জগৎ ক্রমেই "the most widely representative poet of the age" বলে মেনে নিচ্ছে, —এবং সেই কারণেই পরের লোক যদি দেখে আপনার কোনো কবিতায় বা সাহিত্য-রচনায় সভ্যতার যে-সব "concrete blessings" তার উল্লেখমাত্র নেই, তাহলে তারা আশ্চর্য্য হবে এবং দুঃখ করবে। উনি লিখেছেন উনি আপনার লেখার মধ্যে এই "imaginatively interpreted" এখনকার নূতন নূতন discovery প্রভৃতি কথার জন্যে "vainly search" করেছেন ; আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন আপনি যখন কেবল বাঙালীর নন, বিশ্বজগতের, এবং বহুবার ইউরোপ আমেরিকায় গিয়েছেন তখন আপনার কাছ থেকে আধুনিক জগতের এই দাবী করবার কি একটা অধিকার নেই? উনি বারে বারে বলেছেন, এটা অবশ্য শুধু কবি এবং শিল্পী হিসাবে "a sensitive imaginative mind" -এর কাছ থেকে তিনি চাইছেন, তা না হলে "pure intellect"-এর দিক দিয়ে আপনি

আধুনিক সভ্যতার বিষয় যা বলেছেন তা খুবই "convincing & satisfying". উনি বলছেন Kipling-এর [১৪] মন অত্যন্ত ছোট এবং বাঁকা বলে উনি পারেননি, কিন্তু ওঁর মধ্যে সাধারণ রেলোয়ে ষ্টেসন, বা বড় সহরের কর্ম্মমুখর মস্ত মস্ত রাস্তা, বা সমুদ্রের জাহাজ কিম্বা light-house-কে কল্পনায় মণ্ডিত করে' দেখার যে-চেষ্টা আছে সেটা "completely in the right direction", এবং ওঁর বিশ্বাস এখন নূতন যে-কোনো কবি জন্মাবেন তিনি চিরন্তন সত্যও যেমন দেখবেন, "Nature"-এর অঙ্গ বলেই মানুষের অক্লান্ত স্বার্থত্যাগ এবং যুগযুগান্তরব্যাপী একনিষ্ঠ সাধনার ফলে সৃষ্ট এই আধুনিক আবিষ্ক্রিয়াগুলিকেও তাঁর তেমনি কল্পনায় অপরূপ করে' দেখতে হবে—কারণ এর অনেক জিনিষই মানুষের জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে গেছে। Havelock Ellis-এর মত বৈজ্ঞানিক দার্শনিক এবং সাহিত্যরসগ্রাহী লোক এ কথাটা বলেছেন বলে এটা ভেবে দেখা দরকার। বাহির থেকে ঝট করে' এর উত্তর দেওয়া শক্ত, কিন্তু এ বিষয়ে আসল যা বলবার তা আমার মনে এসেছে। আমি বলতে চাই আধুনিক scientific spirit-কে কল্পনায় অনুপ্রাণিত করে' সত্য করে' দেখা ত কবির কাজ বটেই—আর 'বলাকা'র কবিতায় (এ ত শুধু একটা দৃষ্টান্ত ) এবং আধুনিক "হে ধরণী, কেন প্রতিদিন" প্রভৃতি কবিতায় সেই জিনিষটা যেমন ফুটে উঠেছে, অন্য কোনো দেশের কবি বা সাহিত্যিক aeroplane আর বড় বড় জাহাজের বর্ণনা দিয়ে সেটা ধরতে পারেননি। বিজ্ঞানকে এরকম "high romantic plane"-এ sublime করে' দেখাতে কে পেরেছে—যাতে চিন্তা, কল্পনা, অনুভূতির বিচিত্র ধারা এক অপরূপ সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতে এসে চরম ব্যঞ্জনা লাভ করেছে? আমি ওঁকে বলতে চাই যে আপনার কবিতায় যে সহর বা রাস্তা বা রেলগাড়ীর বর্ণনা খুঁজতে গিয়ে উনি ভুল করেছেন —ওরকম "information" ওতে না খুঁজে এইটেই দেখতে হবে যে তা "informed with the spirit of the times" কিনা। "আমার জগৎ"—প্রবন্ধটা [১৫] ওঁর পড়া উচিত—তার ত ইংরিজিও চমৎকার হয়েছে। আমার বক্তব্য যথার্থ কবি এইভাবেই সাহিত্যে আধুনিকতাকে স্বীকার করবেন ; যার কবিতাকে ব্যঞ্জনায় ভরে' তোলবার ভগবদ্দত্ত প্রতিভা নেই সে-ই ঘটনা দিয়ে কাব্যকে sensational করে' তার ভিতরের গভীর শূন্যতাকে ভরে' তোলবার চেষ্টা করে। এ বিষয়ে অনেক ভাববার বিষয় আছে সন্দেহ নেই। আর দেখতে পাই ইউরোপে এ নিয়ে প্রবল আন্দোলন চলছে, যার ফলে দুর্ব্বলচিত্ত অনেক কবিই (যেমন Noyes, কি Masefield, এমন কি Yeats ) [১৬] বাহ্যিক ঘটনা অবলম্বন করে' কবিতা গড়ে তুলতে সজ্ঞান সাধনা করছেন। এ কিন্তু সাহিত্যের পক্ষে একটা মারাত্মক রকমের বিপদ বলে মনে হয়। আপনার কাছে থাকলে, এবং আপনার শরীর ভাল থাকলে এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলে মন পরিষ্কার করে' নিতাম, কিন্তু আমার ত বোধ হচ্ছে মূলসূত্রটি আমি ধরতে পেরেছি। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আপনার মতামত শোনবার সুযোগের প্রতীক্ষায় রইলাম। Ellis যেমন ভাবে লিখেছেন তাতে মনে হয় তিনি সত্য সত্যই আপনার কাব্যের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণতার এই একটা অভাব ( তাঁর মতে) দেখে আশ্চর্য্যই হয়েছেন, এবং এর কারণ বুঝতে পারছেন না। উনি এ বিষয়ে

প্রকাশ্যে কিছু লেখবার আগে ওঁর ভ্রম সংশোধন করে' দেওয়া উচিত মনে করছি। আমি খুব জোর করেই কথা বলছি, কারণ আমার সত্যিই মনে হচ্ছে ঐ রকম মিথ্যাভাবে "true to life" হতে যাওয়াই আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের একটা মস্ত ব্যাধি—যার ফলে তা সার্ব্বজনীন এবং চিরন্তন হতে পারছে না। আমি ত ওঁর কথায় কিছুমাত্র convinced হতে পারলাম না ; তা ছাড়া 'Nationalism' -এর লেখক চিন্তাশীল ভাবুকের কথায় যদি ওঁর বিশ্বাস জন্মে' থাকে তাহলে "Fugitive" [১৭]-এর কবিকে উনি অপবাদ দিচ্ছেন কেন? কবি এবং ভাবুককে সমগ্র ভাবে এক personalityর মধ্যে না দেখে বিচ্ছিন্ন করে' জানবার চেষ্টাটা কি ওঁদের মজ্জাগত বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিরই পরিচায়ক নয়?

অনেক বাজে বলে' আপনার সময় নষ্ট করলাম—কিন্তু এই সব কথা Ellis-এর চিঠি পড়ামাত্র আমার মনে এমন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে যে তৎক্ষণাৎ আপনাকে চিঠিতে সে বিষয়ে না জানিয়ে পারলাম না—যা মনে এল হুড় মুড় করে' লিখে গেলাম—চিঠিও কাটাকাটিতে ভরা এবং অপরিষ্কার রইল। আজ সারাটা দিন আমাকে তুমুল ভাবে ভাবিয়ে রেখেছে।...

'কল্লোলে' [১৮] আপনার নতুন কবিতা বেরোবে বলে' ছাপিয়েছে—তার প্রত্যাশায় উৎসুক হয়ে আছি। এ সব জিনিষ যে আমার জীবনে কত সত্য, রাজ্য সাম্রাজ্যের উত্থান পতন, পোলিটিকাল আন্দোলন, এমন কি নিজের ব্যক্তিগত জীবনের বেশীর ভাগ জিনিসের চেয়েও, —তা বলেই বোঝাতে পারি না। কাগজে যখন আপনার নতুন কবিতা দেখি তখন খানিকক্ষণ পড়তেই পারি না। এবারকার কবিতা প্রত্যেকটি যে মনে কি বিপুল আনন্দের সৃষ্টি করেছে সে কথা সামান্য দু-চার কথায় বল্‌বার ভাষা আমার নেই। প্রার্থনা করছি আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলে এই কবিতাগুলির সঙ্গে ধারা রেখে একটি 'বলাকা'র মত, এমনকি তার চেয়েও বড় কাব্য পৃথিবীকে দেবেন।

আশা করি সম্পূর্ণ বিশ্রামের ফলে আপনি আগের চেয়ে অনেকটা ভালো বোধ করছেন। মেলা লোকে আপনাকে জ্বালাতন করছে মনে করলে এখনি গিয়ে আপনার দ্বার-রক্ষক হয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে—ও বিষয়ে অনেক ভ্রম ভ্রান্তির পর আমার বেশ একটু অভিজ্ঞতা জন্মে গেছে। Visitor-দের কবল থেকে কি করে' উদ্ধার পেতে হয় তা আমি অনেকটা জানি। ওদের ধরন ধারণও তিন বছর ধরে' মন দিয়ে পর্য্যবেক্ষণ করেছি। [১৯]

আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন। ইতি প্রণত

শ্রী অমিয় চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

Manchester Guardian-এ এক ইটালীয় যুবককে Nation এবং The People সম্বন্ধে আপনি যা বলেছিলেন তা পড়লাম। এটা হয় Modern Review, নয় Quarterly-তে সম্পূর্ণটা ছাপানো দরকার—এর মধ্যে বিশেষ ভাববার কথা, এবং নূতন কথা আছে। এত সোজা করে' এবং বুঝিয়ে আপনি এবিষয়ে আর কোথাও আগে বলেননি।

টীকা

১ পিতা দ্বিজেশচন্দ্র ছিলেন আসামে গৌরীপুর স্টেটের দেওয়ান। অমিয় চক্রবর্তীর কৈশোর-যৌবনের অনেকটা সময় তাই গৌরীপুরে কাটে। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার বছরে (১৯২১) হাজারিবাগ থেকে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হ'য়ে তিনি বি. এ. পাশ করেন এবং রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে নবেম্বর থেকে বিশ্বভারতীতে যোগ দেন। ('চিঠিপত্র' ১১শ, ১৬) তিন বছর পরে অসুস্থ হ'য়ে গৌরীপুরে চ'লে যান, প্রাইভেট এম. এ. পরীক্ষার জন্যেও তৈরি হ'তে থাকেন। চিঠিটি সেখান থেকে লেখা।

২ 'প্রবাসী'-তে (চৈত্র ১৩৩২) ছাপা "ঝড়" ('অন্ধ কেবিন আলোয় আঁধার গোলা'), ও "কঙ্কাল" ('পশুর কঙ্কাল ওই') কবিতা দুটি পরে 'পূরবী'-তে যায়।

৩ এটিও 'পূরবী'-র কবিতা।

৪ আগের বছর মৃত্যু হয়েছে আনাতোল ফ্রাঁসের ( Anatole France,১৮৪৪-১৯২৪)। এই ফরাসি লেখক নোবেল পুরস্কার পান রবীন্দ্রনাথের পরে, ১৯২১ সালে। নানা ভাষার কবি-সাহিত্যিকের সঙ্গে তুলনা ক'রে রবীন্দ্রনাথকে পড়ার অভ্যাস ছিলো অমিয় চক্রবর্তীর।

৫ উনিশ শতকের ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রাউনিং-এর (১৮১২-১৮৮৯) খ্যাতিতে তখনও ভাঁটা পড়েনি। 'Asolando' কবিতাটি তাঁর মৃত্যুর দিনে প্রকাশিত হয়েছিলো। *Dramatis Personae* (1864)-র 'Prospice' অনেক আগেকার লেখা।

৬ 'বলাকা'-য় এটি শিরোনাম-বর্জিত ৩৭-সংখ্যক কবিতা।

৭ 'বলাকা' ১১।

৮ 'হে ধরণী'—'পূরবী'-র "লিপি" দ্র.।

৯ তিনটিই 'পূরবী'-র কবিতা। প্রকাশ হ'লেই নতুন কবিতা নিয়ে কবির সঙ্গে আলোচনা করতেন অমিয় চক্রবর্তী।

১০ নারীস্বাধীনতার প্রবল সমর্থক হ্যাভেলক এলিস ( Havelock Ellis,১৮৫৯-১৯৩৯) চিকিৎসা ব্যবসায় ছেড়ে সাহিত্য ও গবেষণাকর্মে লিপ্ত হয়েছিলেন। অশ্লীল জ্ঞান ক'রে সাত খণ্ডে লেখা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Studies in the Psychology of Sex* ইংলণ্ডে নিষিদ্ধ হয়। পত্রবিনিময় সূত্রে তরুণ বাঙালি কবিকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যজগতের বিষয়ে তিনি যে-ধরনের অতৃপ্তির কথা লিখেছিলেন তেমন কথা পূর্বে কেউ তোলেননি। [ভূমিকা দ্র.]

১১ জাতীয় আন্দোলনের উত্তেজনার মুখে জাতীয়তার জয়ধ্বনির বদলে বরং তার বিরোধিতা ক'রে জাপানে আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথ যে-সব বক্তৃতা করেন সেগুলি একত্রে *Nationalism*(১৯১৭) নামে ম্যাকমিলানরা ছেপেছিলেন। স্বদেশে-বিদেশে তা নিয়ে কবির লাঞ্ছনার অবধি ছিলো না। অল্প কিছু চিন্তাশীল ব্যক্তিই শুধু এ-গ্রন্থের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিলেন। মনে হয় হ্যাভেলক এলিস তাঁদের একজন।

১২ 'বিশ্বভারতী'-র কথা তেমন জানতেন না এলিস কারণ তার মাত্র চার বছর আগে (১৯২১) বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

১৩ *Visva-Bharati Quarterly* (প্রথম সিরিজ) ১৯২৩ সাল থেকে বিশ্বভারতীর মুখপত্র হিশেবে বেরুতে থাকে। প্রথম বছরের সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

১৪ বোম্বাই ও লাহোর মিউজিয়ামের ব্রিটিশ অধ্যক্ষের পুত্র কিপলিং ( Rudyard Kipling, ১৮৬৫-১৯৩৬) ছিলেন তখনকার দিনের নামকরা কবি-সাংবাদিক-উপন্যাসকার। এঁর

লেখায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক মহিমার উচ্চ ঘোষণা আছে। আধুনিক কালে Eliot এঁকে কাব্যের-সীমানা-স্পর্শ-করা উৎকৃষ্ট পদ্যের লেখক ব'লে প্রশংসা করেছেন। প্রধান গ্রন্থ : *Barrack Room Ballads* (১৮৯২)। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার : ১৯০৭।

১৫ 'সঞ্চয়' (১৯১৬) প্রবন্ধগ্রন্থ দ্র.।

১৬ সাবেকী ধাঁচের জনপ্রিয় ইংরেজ কবি নয়স ( Alfred Noyes, ১৮৮০-১৯৫৮) এবং তখনকার রাজকবি মেজফিল্ড-এর ( John Masefield, ১৮৭৮-১৯৬৭) সঙ্গে একত্রে ইয়েট্‌সকে (১৮৬৫-১৯৩৯) দুর্বলচিত্ত কবিদের মধ্যে গণ্য করেছেন সেটা অপ্রত্যাশিত। পরে এক চিঠিতে এঁরই কবিতা রবীন্দ্রনাথকে কপি ক'রে পাঠিয়ে বলেছেন—এ-যুগে য়ুরোপের তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। ১৯১২ সালে ইয়েট্‌স ইংরেজি *Gitanjali*-র ভূমিকা লিখেছিলেন। নিজেও নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের দশ বছর পরে।

১৭ *Fireflies* (১৯২৮) নামে কবিতাকণিকার সংগ্রহটি না ধরলে, *Fugitive*-ই (১৯২১) ইংরেজি অনুবাদে রবীন্দ্রনাথের শেষ কাব্যগ্রন্থ যা ম্যাকমিলানরা ছেপেছিলেন। অনেকেই বইটি নিয়ে সুখী হ'তে পারেননি। *Collected Poems and Plays* (১৯৩৬) গ্রন্থটি তৈরি করার সময় কবি নিজেই এ-বই থেকে পঁচিশটি অনুবাদ বর্জন করেন।

১৮ গোকুল নাগ-দীনেশ দাস সম্পাদিত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মুখপত্র 'কল্লোল' পত্রিকাতেও রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছিলেন সেটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অল্পদিন পরেই, প্রধানত এই পত্রিকায় ছাপা গল্প-উপন্যাস নিয়ে একটি প্রবল গোষ্ঠীর দিক থেকে অশ্লীলতার অভিযোগ ওঠে। জোড়াসাঁকোতে দুই পক্ষকে নিয়ে এক বিতর্ক সভা বসে, সেখানে মধ্যস্থতা করতে হয়েছিলো রবীন্দ্রনাথকেই।

১৯ শান্তিনিকেতনে কখনোই ঠিক ছাত্র বা অধ্যাপক ছিলেন না অমিয় চক্রবর্তী। তবে ১৯২১ সাল থেকেই কবির সান্নিধ্যে ছিলেন ব'লে visitor-দের উৎপাতের কথা অজানা ছিলো না। [ভূমিকা দ্র. ]

## ৩

গৌরীপুর
আসাম

১লা এপ্রিল '২৫

শ্রীচরণকমলেষু,

আপনার চিঠি পড়ে' কথাটা আমার কাছে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল, ১ আমি এখন এলিস-সাহেবকে খুব বুঝিয়ে দিতে পারব মনে করি। এই উত্তরই আমি মনের মধ্যে খুঁজছিলাম—আপনি যা বলেছেন, এরা যে মনে করছে সায়ান্স জিনিষটা বিশেষ করে' আধুনিক যুগেরই একটা নূতন আবিষ্কার সেইটেই যে মস্ত ভুল—"এখন তাকে জীবনের অন্য অঙ্গ থেকে পৃথক করে' বিশেষ নাম দিয়ে বিশেষভাবে তার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছি"—এই মাত্র। এবং উদ্দেশ্য সাধনের হিসাবে কেবলমাত্র প্রয়োজনধর্ম্মীরূপে এই সায়ান্স শাশ্বত সত্যের এবং সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি যে সাহিত্য বা শিল্পসৃষ্টির জগৎ,

তাতে কোনোদিনই স্থান পায়নি—পাবেই বা কেমন করে'। কিন্তু যেখানেই "মানুষের চেষ্টা চরমকে ultimate-কে স্পর্শ করেছে সেইখানেই তার গান জেগেছে"—এবং এই মঙ্গলসঙ্গীত আপনার রচনায় যেমন প্রকাশ পেয়েছে কোনোখানেই তার কাছাকাছি কিছু ত দেখতে পাওয়া গেল না। 'বিশ্বভারতী'র আদর্শে কি এই কথা নেই? "বিজ্ঞানের কল্যাণে জলেস্থলে আকাশে আজ এত পথ খুলেচে, এত রথ ছুটেচে যে ভূগোলের বেড়া আজ আর বেড়া নেই।... বৈজ্ঞানিকশক্তি যাদের একত্র করেচে তাদের এক করবে কে?" —এই প্রশ্নের উত্তর 'বিশ্বভারতী'র আদর্শের মধ্যে দেখতে পাই। বিজ্ঞানের ভিতর দিয়ে মানুষ যেখানে সত্যকে কল্যাণকে লাভ করেছে, করছে, সেখানে আপনি মুক্তকণ্ঠে তাকে আহ্বান করে' নিয়ে তারই প্রেরণায় যাতে মানুষ পূর্ণতার পথে মঙ্গলকর্ম্মের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে সেই উপায় দেখিয়ে দিলেন। সত্য ত সব সময়েই সব অবস্থাতেই মানুষের ব্যবহারে প্রয়োজনে সকল বিষয়ে তার আসল "সুবিধা"র সহায়তা করতে বাধ্য, কিন্তু যারা বেশী বড় করে' সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে না তাদেরও এটুকু অন্তত দেখতে পাওয়া উচিত যে আধুনিককালে ব্যবহারিক বিজ্ঞানেরও পরিণতির ফল কলকব্জার চাতুর্য্য বা তার অন্ধশক্তিবেগের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে না ; তাতে করে' জগতে যেটুকু কল্যাণ হয়েছে সেই কল্যাণশক্তির মধ্যেই প্রকাশ পাচ্ছে। আর বিজ্ঞান যেখানে সত্যের পূজারী, অনির্ব্বচনীয়ের উপলব্ধিতে মুগ্ধ, বিস্মিত, পূর্ণ-জাগরিত, সেখানে যে তা যথার্থ কবিকে গান গাইয়েছে তা আমরা ত দেখতেই পাচ্ছি। ওরা যে পাচ্ছে না তার কারণ ওদের দেশে এখন কবি নেই, যদি বা থাকে ত সে "সাহিত্যজগতের কবি, বিশ্বজগতের কবি নয়।"

আপনি একবার বলেছিলেন মস্ত মস্ত পণ্ডিত হয়েও ওরা এক এক জায়গায় এমন ছেলেমানুষী করে যে আশ্চর্য্য হতে হয়, সেই কথাটা যে কত সত্য তা বারেবারেই দেখতে পাচ্ছি। Wells বা Shaw-এর মত দুর্দ্ধর্ষ পণ্ডিত ব্যক্তিও[২] যখন ধর্ম্মের প্রসঙ্গ নিয়ে অতিবুদ্ধির চাতুর্য্য খেলাতে যান তখন দেখি আমাদের দেশের সাধারণ চাষীও সহজবুদ্ধি দিয়ে অনেক সত্যকে পেয়েছে যা ওঁদের সাধ্যের অতীত। দেশের গর্ব্ব না করে' জোর করেই একথা বলা যায়।

আসল কথা, আপনি যা বহুবার বলেছেন, পাশ্চাত্য দেশ তার নবলব্ধ শক্তিকে সামলাতে পারছে না—প্রাকৃতিক জগতের উপর তার প্রভুত্ব হঠাৎ এত বেশী বেড়ে উঠেছে যে তাকে প্রভুত্ব করার নেশাই পেয়ে বসেছে—অর্থাৎ যেটা হওয়া উচিত উপায়মাত্র, নেশার ঘোরে তাদের কাছে সেইটেই অন্তিম হয়ে দাঁড়ালো—এবং উপকরণের দাসত্বে তার অন্তরাত্মার মরণদশা ঘটবার উপক্রম হয়েছে। শক্তির মদ খেয়ে মাতলামি নয় ত কি?— নইলে আর্ট সম্বন্ধে একটি বিখ্যাত ইউরোপীয় পত্রিকায়[৩] সেখানকার শিল্পীদের এই উন্মত্ত প্রলাপ ছাপা হয়ে বেরোতে পারে কি করে'—

"The magic word in modern art—Construction. Construction & not composition, teaches the new gospel.

## Why?

Because composition is inspired by the past, looks towards the past, and therefore belongs to the past ; because composition means ornamentation, decoration, romanticism, prettiness ; because composition stands apart from Life..." (Composition" কথাটাকে কেন ব্যবহার করছে "creation" না বলে?)

## And Construction?

Construction is inspired by what is most characteristic of our epoch ; industry, machinery, **Science!** Construction borrows the methods and makes use of the materials common in modern technical processes. Hence iron, glass, concrete, circle, triangle, cube, cylinder, synthetically combined with mathematical precision and structural logic. Construction scorns prettiness, seeks **Strength**... acts as a stimulus to vigorous life..."

এই উন্মত্তটা আরো বেশী দূর গড়িয়েছে! লেখক শেষকালে যন্ত্রের স্তবগান আরম্ভ করেছেন, এবং বলেছেন মানুষের সৃষ্টির জগতে যথার্থ "জীবন-সত্য" আনতে হলে যন্ত্রের কাছ থেকেই তার প্রেরণা ধার করতে হবে, এবং তারই অনুকরণে ভাবকে গড়ে' তুলতে হবে! লেখক তাঁর সমভাবাপন্ন সতীর্থদের মুখপত্র হয়ে বলছেন

"We therefore proclaim

1) The machine to be the tutelary symbol of the Universal Dynamism. potentially Embodying in itself the Essential Elements of human creation ; the discoverer of fresh developments in modern aesthetics.
2) The aesthetic virtues of the machine and the metaphysical meaning of its motions & movements constitute the new fount of inspiration for the Evolution & development of contemporaneous plastic arts..."

ইত্যাদি, ইত্যাদি ! এই প্রলাপ দিয়ে আর আপনাকে ক্লিষ্ট করতে চাই না। আশ্চর্য্য এই যে আপনি কেমন করে' অত আগেই 'মুক্তধারা'য় হুবহু এই মনোভাবের প্রকৃত চেহারা ধরে' দিয়েছেন! "নমো যন্ত্র"-এর মত গান বাঁধা অবশ্য ওদের কারুর সাধ্য নেই, কিন্তু ওদের যন্ত্রের পূজা তা বৈ আর কি? [৪]

আপনার চিঠিখানা এত দরকারী, এবং এতে এমন চমৎকার করে' জিনিষটা বোঝানো আছে, আর অনেক খুব নতুন ভাববার কথা আছে, যে আমার মনে হচ্ছে এখনি ছাপানো উচিত। এই বিষয় নিয়ে ওদের দেশে এত ধূলো ওড়াচ্ছে যে ওদের দেশে অনেকেই সত্যদৃষ্টি হারিয়েছে, এবং তার দেখাদেখি আমাদেরও অনেকের সেই দশা ঘটেছে। "মদ খেয়ে কবিতা লেখা" এবং তাই করে' শক্তির পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা আমাদের সাহিত্যে কি দেখতে পাচ্ছি না?—সেই সব উচ্ছৃঙ্খল কবিতা পড়ে' দেশের গুণীজ্ঞানী কত লোককেই বলতে শুনেছি—"হ্যাঁ, এরই মধ্যে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় বটে, নরম নরম সুন্দর সব ভাবের ছড়াছড়ি নেই, যেন কামান বন্দুক যুদ্ধের হুহুঙ্কারে আধুনিক জীবনের যথার্থ পরিচয় এতে একেবারে স্পষ্টাস্পষ্টি টগবগিয়ে ফুটে উঠছে।"

অবশ্য যে একটু বোঝে সে-ই এই উগ্রতার মধ্যে যথার্থ শক্তির অভাব এবং অন্ধ উত্তেজনার প্রভাব দেখে চিন্তান্বিতই হবে, কিন্তু ইউরোপের এত সব বাঁধা বুলি এদেশের হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে যে বহুলোকই তেজকে ঝাঁঝালো ভাবে দেখতে এবং দেখাতে চাচ্ছে, মনে করছে তাহলে একবার খুব করে' "Reality"কে পাওয়া যাবে। সঙ্গীতে, নাট্যমঞ্চে, রাষ্ট্রনীতিতে কোনখানে না আমাদের দেশে এই ভাব এসে পৌঁছেছে? আমরা ত আবার সকল বিষয়েই পরতন্ত্র বলে' আরো এম্‌নি করে' ঘরের উঠোনে বসে' বীরত্ব না করে' পারি না।

এই প্রসঙ্গে সমস্ত জিনিষটা আমার চেতনায় অত্যুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, আমি নূতন করে' আপনার Nationalism এবং শেষদিকের অন্য ইংরিজিলেখা পড়লাম, এবং Russell, [৫] Wells প্রমুখ লেখক সম্বন্ধে আমার বিদ্যাটাকে আবার ঝালিয়ে নিলাম। একটা ভালরকম করে' সব কথা খুলে বলে লেখা তৈরি করতে পারলে তবে মনের সাধ মেটে, অনেক জিনিষ নূতন করে' জান্‌তে পেরে মন উৎসাহিত হয়ে উঠেছে, কিন্তু লেখা সম্বন্ধে নিজের ভরসা বড় কম, এখনকার লোকেরা এত বেশী বুদ্ধিমান যে তাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে কথা বল্‌তে ভয় করে! আর দুর্ভাগ্যবশতঃ এখানে চারদিকে যারা থাকে তাদের কাছে মাছের দর বা অম্‌নি কিছু অত্যন্ত দরকারী কথা ছাড়া অন্য বিষয় একটু কিছু বলতে গেলেই তারা সত্যই ভিতর থেকে ভাববে লোকটার মাথা খারাপ। কারুর চেয়েই নিজেকে বড়ও মনে করি না, এবং গর্ব্বও করি না, কিন্তু এ কথা না বলে পারা যায় না যে বেশীর ভাগ লোকই আপনার 'ছিন্নপত্রে'র কথায় বলতে গেলে "উপছায়া" মাত্র, "খাচ্চে দাচ্চে, আপিস যাচ্চে, ঘুমুচ্চে... এবং নিতান্ত নির্ব্বোধের মত বকর্ বকর বকচে।" "যখন ভাবের কথা বলে তখন সেন্টিমেণ্টাল্ হয়ে পড়ে, আর যখন যুক্তির কথা পাড়ে তখন ছেলেমানুষী করে।... সত্যকার রক্তমাংসের শক্তসমর্থ মানুষ ত নেই —সমস্ত উপছায়া, পৃথিবীর সঙ্গে অসংলগ্ন বাষ্পের মত ভাসচে।" [৬] তাই সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করে' তবু শরীরে প্রাণ পাই, আর অবশ্য শ্যামল প্রকৃতির সৌন্দর্য্য আছে—তার সঙ্গে কথা ত আর ফুরোয় না! আহা, এখন চারদিকে এমন চমৎকার নাগকেশর ফুটে উঠেছে। আপনার কাব্যকুঞ্জে এই ফুলটির অন্বেষণ করছি—অনাদৃত "আকন্দ" ত অমর হয়ে রইল। [৭] চিরকালের মত তার ছবি আঁকা হয়ে গেছে—

"আকাশের এক বিন্দু নীলে
তোমার পরান ডুবাইলে,
শিখে' নিলে অনন্তের ভাষা।
বক্ষে তব শুভ্র রেখা এঁকে
আপন স্বাক্ষর গেছে রেখে
রবির সুদূর ভালোবাসা।"

এই ক'লাইন যখনই পড়ি তখন যে কিরকম বোধ হয় কি বলব ; এই কবিতাটি অপূর্ব্ব হয়েছে। আমাদের গেটের সাম্‌নের অশোকগাছ নবমঞ্জরীতে ভরে' ভরে' উঠ্‌ছে, আর

অষ্টমীর যাত্রীরা পথে যেতে তার থেকে তর্পণের ফুল তুলে নিচ্ছে দেখতে বেশ লাগছে, যদিও গাছটা গেল বলে'। এবার আবার বহুকাল বাদে "বুধাষ্টমী" বলে' অগণ্য নারীর সমাগম, আজ তিন দিন থেকে দিন নেই রাত নেই ক্রমাগত দলে দলে সব স্নানার্থী নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মপুত্রে তীর্থ করতে চলেছে—তার ওপর আবার খুব ঝড় হচ্ছে—রাস্তার দিকে তাকিয়ে এবং অবিশ্রান্ত কলশব্দ শুনে হঠাৎ মনে হচ্ছে সমস্ত পৃথিবী যেন বিবাগী হয়ে মহাকালের স্রোতে কোথায় ভেসে চলেছে। দূর থেকে এই যা পাওয়া যায় তাই ভালো, নইলে ব্রহ্মপুত্রে যাত্রীরা যেরকম নির্ম্মমভাবে ছাগলগুলোকে স্রোতে ভাসিয়ে দেয় তা চোখে দেখা শক্ত।

আপনি কলকাতায় আছেন মনে করে' সেইখানেই লিখছি—আপনি অসুস্থ শরীর নিয়ে চিঠি লিখেছেন তাই মনে করে' কেমন বোধ হচ্ছে, কিন্তু চিঠি পেয়ে অবধি যে আমার কি ভাবে দিন কাট্‌ছে তা বলে' বোঝাতে পারি না।

আশা করি এখন আপনি ক্রমে অনেকটা ভালো বোধ করছেন।

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

ইতি

প্রণত

শ্রীঅমিয়

পুঃ

"রূপদক্ষ" কথাটায় সব সময়ে ঠিক চল্‌ছিল না, এতদিনে আপনার এই চিঠিতে আসল কথাটি পাওয়া গেল। "রূপকার"-এ বরাবরের মত রইল, আর আমাদের কথা খুঁজে মরতে হবে না।[৮]

---

টীকা

১ নিজের কবিতা বিষয়ে হ্যাভেলক এলিস-এর অতৃপ্তির কথা জেনে অমিয় চক্রবর্তীকে রবীন্দ্রনাথ একটি স্মরণীয় চিঠি লেখেন ১৯২৫-এর ২৮ মার্চ তারিখে। ('চিঠিপত্র' ১১শ, ৩১)। কেন তাঁর কবিতায় ফলিত বিজ্ঞান প্রসঙ্গ অনুপস্থিত তার ব্যাখ্যা ক'রে সে-চিঠিতে বলেছিলেন : 'মানুষের personality-র মহত্ত্বর চেয়ে তার সাংসারিক সুবিধা সাধনের সুযোগ বড় নয়। এই জন্যেই কলকারখানা নিয়ে কোনো আধুনিক দান্তে Vita Nuova লিখছে না—কারণ ওতে নূতন থাকতে পারে কিন্তু Vita নেই।' মতটি তখনকার মতো অমিয় চক্রবর্তী মেনে নিয়েছিলেন। [ভূমিকা দ্র. ]

২ মার্ক্সবিরোধী কিন্তু সমাজতন্ত্রী ফেবিয়ান সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য এবং ইতিহাসবিদ প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক H. G. Wells (১৮৬৬-১৯৪৬) কল্পবিজ্ঞান অবলম্বনে চমৎকার কিছু উপন্যাসও লিখেছিলেন। রাশিয়াযাত্রার অব্যবহিত পূর্বে জেনেভায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আলাপচারিতার মনোজ্ঞ একটি বিবরণ আছে *A Tagore Reader* গ্রন্থে। উভয়ের বাক্যালাপের সদ্য-সদ্য বিবরণ লিখে নিয়েছিলেন জেনেভাবাসী লেখক ড. সুধীন ঘোষ এবং কবির সঙ্গী অমিয় চক্রবর্তী।

George Bernard Shaw (১৮৫৬-১৯৫০) নাটক লিখে সমাজবিপ্লব ঘটাতে চেয়েছিলেন, ধর্মে আগ্রহ ছিলো না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সস্ত্রীক শ'-র প্রথম দেখা হয় ১৯১২ সালে, লণ্ডনে রটেনস্টাইনের গৃহে।

৩ উদ্ধৃতি এসেছে শিল্পসাহিত্যে ঘোর আধুনিকপন্থী ইউরোপীয় মাসিকপত্র *Broom* (১ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯২২) থেকে। প্রবন্ধের নাম 'The Aesthetic of the Machine and Mechanical Introspection in Art', লেখক ইতালীয় 'কনস্ট্রাকশনিস্ট' Enrico Prampolini। গ্রন্থপ্রেমিকদের জন্যে এই দুষ্প্রাপ্য এবং স্বল্পকালস্থায়ী বিশিষ্ট পত্রিকাটির অল্প কিছু সেট কিছুকাল আগে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিলো। [ভূমিকা দ্র. ]

৪ এ-চিঠির তিন বছর আগে 'মুক্তধারা' নাটক প্রকাশিত হয়। "নমো যন্ত্র" ঐ নাটকের গান।

৫ প্রতিভাবান গণিতবিজ্ঞানী, দার্শনিক, শান্তিবাদী প্রবন্ধকার রাসেল ( Bertrand Russell, ১৮৭২-১৯৭০) যুদ্ধের বিরোধিতা ক'রে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কারাবরণ করেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ১৯১২ সালে। 'শিল্প ব্যাপারটা কী' এই প্রশ্ন ক'রে চুপচাপ ব'সে তিনি কবির বক্তব্য শুনেছিলেন, তারপর নাকি বাক্যব্যয় না ক'রে নিঃশব্দে উঠে চ'লে গিয়েছিলেন, লিখেছেন রথীন্দ্রনাথ। *Creative Unity* (১৯২২) গ্রন্থে রাসেলকে বলা রবীন্দ্রনাথের সেই উত্তর খানিকটা বিশদ ক'রে বলা আছে। রাসেল সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান ১৯৫০ সালে।

৬ 'ছিন্নপত্র', ৬৮ (১৮৯০, ফেব্রুয়ারি) দ্র.।

৭ 'পূরবী'-র কবিতা, ১৯২৪ সালে দক্ষিণ আমেরিকায় লেখা।

৮ দ্র. 'চিঠিপত্র' ১১শ, ৩১—রবীন্দ্রনাথ যেখানে ইংরেজি artist কথাটার বাংলা প্রতিশব্দ করেছিলেন—'রূপকার'।

## ৪

১০ই বৈশাখ ১৩৩২ GAURIPUR ASSAM

শ্রীচরণকমলেষু

এ ক'দিন ধরে' বৈশাখের প্রবাসীতে আপনার কবিতাগুলি পড়েছি, আমার সমস্ত একলা জীবন ভরে' উঠেছে। প্রথম যখন আপনার লেখা পড়ি তখন নেশার মত বোধ হয়, কতদূর কি বুঝি সেদিকে মন থাকে না, সুরে ছন্দে অন্য লোকে চলে' যাই ; কিন্তু ক্রমে ক্রমে গভীরতম অন্তরে তার আলো ছড়িয়ে যায়, তখন চোখ চেয়ে আরো বেশী দেখতে পাই। এবারে যেমন হয়েছে কখনো জীবনে আমার এমন হয়নি—আমার সমস্তই আগাগোড়া ভিতর থেকে বদলে গিয়েছে—

উদয়াস্ত দুই তটে অবিচ্ছিন্ন আসন তোমার,
নিগূঢ় সুন্দর অন্ধকার [১] —

এই কবিতাটি পড়া অবধি কি ভাবে আমার দিন কাটছে তা আমি বলবার চেষ্টা করব

না, আমি যেন এরই অপেক্ষায় দিন কাটিয়েছি, আমার সমস্ত সংশয় আন্দোলনকে শান্ত করে' পরম চেতনায় স্থির দীপ্তি এসে পৌঁচেছে। এ মাধুর্য্যের অন্ত নেই, যা-কিছু ম্লান, মলিন, তার বোঝা দূরে ভেসে গেছে, শুভ্র মাধবীমঞ্জরীর মত আমার সমস্ত জীবনের ভালোবাসা অসীম বিশ্বাসভরে আকাশের দিকে মুগ্ধ আনন্দে চেয়ে দেখল, যেখানে যা-কিছু সবই অনির্ব্বচনীয়, কোনোখানে কোনো ছেদ নেই, জানতে পারলাম ক্রমাগত নিজের মধ্যে বিরুদ্ধ গতির সংঘর্ষের সৃষ্টি করি বলেই সত্যের সহজ, অনন্তরূপ, পরমা শান্তির মধ্যে মন মুক্ত হতে পায় না ; নিজের মন ঘোলা হয়ে ওঠে বলে স্বচ্ছ সৌন্দর্য্যকে হারাই। তখন প্রত্যহের জীবনকে তুচ্ছ মনে করে' সব থেকে নিজেকে সরিয়ে ফেলতে চাই, এবং সেই একান্ত নির্জ্জনতায় যে দুঃসহ মুক্তির মূর্ত্তি তৈরি করি তা মায়া বলেই তার কঠিন ভারে জীবন অবসাদে বেদনায় জীর্ণ হতে থাকে। এই বিচ্ছিন্ন সত্যের সাধনায় আরো বিষম অন্ধকার—এর চেয়ে দশের মত জীবনের স্রোতে ভেসে যেতে পারলেও সত্যের মধ্যে থাকা যায়। কিন্তু শান্ত উপলব্ধির ভিতর দিয়ে এই প্রাণের লীলার দিকে চেয়ে দেখলে তো আর কিছুই তুচ্ছ থাকে না, তখন বিকৃতিকে স্বীকার করি, অথচ সুন্দরের অখণ্ড রূপ মনকে আনন্দিত করে' তোলে। পৃথিবী আগেকার মতই থাকে অথচ কি-একটু যেন বদলে যায় যাতে আকাশ আলো থেকে আরম্ভ করে', মানুষের কথা, রাস্তার চলাচলের শব্দ সবই গান গেয়ে ওঠে! এই অতি সহজ, এই কিছুই নয় অথচ প্রাণপূর্ণকরা বোধটুকুর জন্যে এক এক জনকে কত ঝড় ঝঞ্ঝাট বৈরাগ্য নৈরাশ্যের ভিতর দিয়ে আসতে হয় তার ঠিক নেই, অনেকে হয়ত এমনিই এই সহজ বোধের মধ্যে বাস করে, প্রথম থেকেই তারা নিরুদ্বিগ্ন, কিন্তু নিজের ভিতর থেকে তাদের আমি কোনোদিন ঠিক বুঝতে পারিনি। শিশুকাল থেকে তাই অসহ্য রকম কষ্ট পেয়ে এলাম, অত্যন্ত কাছের লোকেরাও কিছুই জানল না, বুঝল না, দরদ দিয়ে দেখল না,—কিন্তু এই তো স্বাভাবিক, এবং এই জন্যেই রক্ষা, নইলে আরো মিথ্যা জীবনে ঢুকে পড়ত। তারপর তরুলতা যেমন আপনা হতেই অজ্ঞাত আকর্ষণে আলোর দিকে এগিয়ে চলে তেমনি করে' শান্তিনিকেতনে গিয়ে পৌঁছলাম, তারপরেও অনেক বিষম ঝড় ব'য়ে গেছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে প্রতিষ্ঠাভূমি দৃঢ়তর হয়ে উঠল। বেদনায় অধীর হয়ে যেদিন দুপুর বেলা আপনার কাছে গিয়েছিলাম সেদিন থেকে আমার জীবনের গতি অন্য দিকে ফিরে গেল।[২] নিগূঢ় সুন্দর আলোয় ভরা অন্ধকারকে আমি উল্টো দিক থেকে প্রলয়রূপে দেখছিলাম, যেন দিনের বেলাটুকুর যা-কিছু তা ওখানে এসে হারিয়ে লুপ্ত হয়ে গেছে, সমস্তই যে তাতে অটুট পূর্ণতায় বিধৃত হয়ে বিরাজ করছে মন তা দেখছিল না। সেদিন আপনি বলেছিলেন একবার মৃত্যুশয্যায় বসে' অন্তিম প্রহরে মনে শুনলেন—রাত্রিরূপিণী মা আসছেন, মৃত্যুর অন্ধকার অনন্ত প্রেমে ভরে উঠল। আপনার নিগূঢ় সুন্দর অন্ধকার কবিতাটি পড়তে পড়তে আমার সেই কথা মনে পড়ল। দেখতে পেলাম চিরজননীর কোলেই আমরা রয়েছি, আঁধার পূর্ণ করে' তিনি প্রসন্ন হাসিমুখে চেয়ে রয়েছেন, কেন আর মিথ্যে ভয় করব? সমস্ত বুক জুড়িয়ে যায়, সুখদুঃখ কিছুই কোথাও থাকে না।

আমার মনে হচ্ছিল নিজেকে কেবলমাত্র স্থির হতে দেওয়া সাধনার একটা প্রধান লক্ষ্য, এবং উপায়। আমরা বড্ড বেশী নিজের গতিতে চলতে চেষ্টা করি, বড্ড বেশী কথা বলে আকাশকে ঘন করে' তুলি। Wordsworth যাকে "wise passiveness" বলেছেন সেটা যেন বড়ই বেশী আমাদের দরকার।[২] যারা তা করতে পারে না তারা যেন গভীরতম সত্যের সময়হীন উপলব্ধিতে পৌঁছতে পায় না। এই সুর আপনার বহু লেখায় পেয়েছি—"যাস নে কোথাও ধেয়ে, দেখরে কেবল চেয়ে" গানটায় এই মনোভাব যেন দেখতে পাই—বড়মামা এই গানটা বারেবারে আবৃত্তি করতেন। "আমি জ্বালব না মোর বাতায়নে প্রদীপ আনি" "স্থির নয়নে তাকিয়ে আছি" "মন চেয়ে রয় মনে মনে হেরে মাধুরী" প্রভৃতি অনেক গানে কবিতায় এই কথা আছে।[৩] আপনি শান্তিনিকেতনে একবার একটি বিদেশী অতিথিকে এই বিষয় নিয়ে কয়েকটা কথা বলেছিলেন, আমার খাতায় লেখা আছে। আমার তা এত বেশী মনে লেগেছিল যে বলতে পারি না—

"We must have our world of activity, but we must have our sky of repose. This atmosphere of absolute restfulness is necessary for the harmony of our mind, brings completeness to our mental life. There are many things which we ignore and push aside in our daily activities, passing thoughts, inner experiences, sudden flashes of realization, elusive dreams of no name—but trivial as these might seem in the work-a-day world, they become significant when we allow them a chance to unfold themselves to us in hours of perfect repose. They give a meaning to our lives, we understand ourselves through their help, and our motives of inner tendencies become clear to us. For this reason, I have always to keep certain hours in the morning, and in the evening when I can be absolutely alone, and when I do nothing but sit still—merely idling away my time. When in my youth I lived in the boat on river Padma, writing from morning till evening, I used to do the same; for hours I would sit in silence listening to the liquid murmur of the waves, the whispering of the breeze, gazing at the sky and the far-away stars. Sometimes I would go out for a walk all by myself along the stretches of grey stand-banks gleaming faintly in the twilight, & the dumb repose of nature used to fill up my mind with ineffable peace, & I could dive deep down into the depths of my being, & discover the sources of my activity, & let my thoughts blossom out in an atmosphere of serenity...."

'ছিন্নপত্রে'ও এক জায়গায় আছে যখন কথা বন্ধ করি তখন শুনতে পাই আমাদের চতুর্দ্দিকই কথা কইছে।[৪] এই অশ্রুত সঙ্গীত, এই "still small voice"[৫] আমরা শুনি না বোধ হয় নিজেদের passive করতে পারি না বলে'। নিজেকে yield করতে পারাতেই কি যথার্থ শক্তি নয়? আমাদের শক্তি কম বলেই নিজের মধ্যে উত্তেজনা জমে উঠে' ক্রমাগতই আমাদের সত্য দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে' দিতে থাকে। আমি এখন দেখছি এই

অসহ্য friction—সংঘর্ষই—আমাকে জীর্ণ করে' দিয়েছিল—আমার চোখ থেকে ঘুম মন থেকে শান্তি কেড়ে' নিয়েছিল। অসুখ না হলে' আমি সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি এবং নিজের স্বরূপের বিরুদ্ধে ক্রমাগত একাকী যুদ্ধ করে' জ্বলে পুড়েই শেষ হয়ে যেতাম ; এই দেড়বছর ধরে' শিলঙে এবং গৌরীপুরে প্রায় একাকী দিন কাটল—বাধ্য হয়ে চোখ মেলে দেখলাম, কান পেতে শুনলাম।[৭]

শচীশ[৮] কি কম কষ্ট পেয়েছিল—ক্রমাগতই তাকে বাহিরের বিরুদ্ধতা, ভিতরের অশান্তি হনন করেছে, কলেজে দশের মধ্যে সে পেয়েছিল নির্ম্মম বিদ্রূপ, নদীতীরে আপনার মধ্যে পেয়েছিল ঝড়। এমন কি দামিনী—বিচিত্রসুখদুঃখচঞ্চলিত সংসারের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি—তাকেও তার সাধনার বাধা বলেই মনে হল—তাকে বলতে হল—"আমার তাঁকে বড় দরকার, তুমি আমার পথে দাঁড়িয়ো না", এবং ভিতরে ভিতরে তীব্র অবরুদ্ধ বেদনা (এ জায়গায় 'চতুরঙ্গ' বিদ্যুতে সাদা হয়ে উঠেছে, মনে হয় আর পড়তে পারব না, কিছু একটা ছিঁড়ে যাবে—কিন্তু হঠাৎ ঝড় উঠে আকাশ আবার শান্ত হল) সত্ত্বেও চরম স্বার্থত্যাগের ভিতর দিয়ে শচীশ ক্রমে ক্রমে বৈরাগ্যের পরপারে আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হল। এ পর্যন্ত তার মধ্যে কেবলি ঝড়, অবিশ্রান্ত আন্দোলন, সে যে কি অতলস্পর্শ অসহায় শান্তিহীনতা তা যারা জানে তারাই জানে। এতক্ষণ নিজেকে নিয়েই সে ব্যস্ত, কারণ তার স্বরূপকে সে বিশ্বরূপের মধ্যে উপলব্ধি করে' সমস্তের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি। কিন্তু যে নিজেকে বিষম সত্য করে' জানতে চায় সেই বুঝি শেষে নিজেকে সবের মধ্যে পেয়ে এবং নিজের মধ্যে সবকে পেয়ে আত্মপর বিরোধবোধ থেকে মুক্তি পায়—তখন আর তার ভয় নেই। শচীশ তখন হঠাৎ একসময় চুপ হয়ে গেল, কোথায় যে তলিয়ে গেল তা কেউ জানল না। কিন্তু এ-ও শেষ কথা নয়, তলিয়েও থাকতে হবে, অথচ প্রাণলোকের আনন্দলীলায় যোগ দেওয়া চাই—যার সাধনায় এই দুয়ের মিল ঘটেনি তাকে যে বারেবারেই ঠেকতে হবে, ঠকতে হবে। তাই ধীর যুক্তাত্ম হয়ে শচীশকে আবার এই সংসারেই ফিরতে হল—দামিনীর সঙ্গে তার যে সম্বন্ধ তখন তাতে আকাশভরা সহজ বিশ্বপ্রেম প্রবেশ করেছে—সংসারকে সে তখন ত্যাগ করছে না, কেবল নিজের মধ্য দিয়েই দেখছে না—এইজন্যে দামিনীর বিবাহোৎসবে যখন তাকে দেখি তখন তার মুখ হাস্যোজ্জ্বল, সে সহজ হয়ে উঠেছে। তারপর আর যতই বেদনা আসুক, ক্ষণে ক্ষণে অদর্শনের কষ্ট সে যতই পাক, তাকে আর কিছুতেই দিক-হারা করতে পারবে না। সে যে পেয়েছে। কিন্তু উৎসাহের বেগে "পেয়েছি" এই কথা বলে' বেড়ালেই সব আবার ঘুলিয়ে যায়, রাজ্যের মিথ্যা সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে ঢুকে পড়ে, তখন আবার গোড়া থেকে আরম্ভ করতে হয়। তাই এবারকার 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারিতে'[৯] আপনি বলেছেন "পেয়েছি মনে করার মত হারানো আর নেই"। "পেয়েছি" বলা যায় বোধ হয় শুধু দুর্লভ মুহূর্ত্তে, গানের কাছে, তাও সেখানেও কখন যে বিরহের আনন্দ, মিলনের বেদনা তা কে জানবে। "ওগো আমার না-পাওয়া গো" কবিতায়[১০] এই কথাই বুঝেছি—নীড়ের পাখী ভোরের অরুণ-আভা মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করে' আধেক-ঘুমে যে-গান গেয়ে

ওঠে তাত্ত্বিকরা তার যেমনই ব্যাখ্যা করুন না কেন কিছু আসে-যায় না, সেই নিগূঢ় অতি-চেতন অপরূপ আনন্দের মর্ম্মে সতর্ক বুদ্ধি পৌঁছবে কেমন করে'? এই গান ভালোবাসার গান, তার মধ্যেই পূর্ণতা, আর "ভাল-লাগা" জিনিষটা নিয়ে যতই আলোচনা বিশ্লেষণ চলুক, "ভালোবাসা" যে শরীরতত্ত্ব মনস্তত্ত্ব সকলের বাহিরে তা আপনার এ মাসের 'ডায়েরি' পড়ে বিশেষ বুঝতে পেরেছি—কেননা ও শুধু হয়, তাছাড়া তার অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই, চেষ্টা নেই। তাই নিজের মনে গান গেয়ে উঠতে হয়,—

"বুঝেছি কি বুঝি নাইবা, সে তর্কে কাজ নাই
ভালো আমার লেগেছে যে
রইল সে কথাই।"[১১]—

এখানে "ভালো আমার লেগেছে" মানে "আমি ভালোবেসেছি"—সেই কথাই সুরে সুরে খুসি হয়ে উঠছে, তার আর শেষ নেই। ভালোবাসা তো আর হারায় না, কারণ সত্যকে আমরা পাই না, আমরা সত্য হই ;—এবং সত্যের সঙ্গে সত্যের যোগেই এই ভালোবাসা, সেখানে ব্যবধানের আকাশ স্বচ্ছ, সেখানে অবশ্যম্ভাবীর রাজত্বে গিয়ে পৌঁছন।

হয়ত ঠিক-রকম হতে-পারার মধ্যে যে পরিপূর্ণতার মুক্তি তা সব সময়ে জাগ্রত ভাবে অনুভব করার শক্তি থাকে না, সুর নেমে যায়, নিজের দুর্ব্বলতা, বাহিরের বিরোধ সত্যবোধকে বিকৃত করে, কিন্তু শচীশ জানে যে "ফাঁকিই সহজ, সত্য কঠিন" এবং "নিত্য নূতন সাধনা"র "নিত্য নূতন ব্যথা"কে সে নির্ভয়ে বরণ করে' নেয়। তার পরে যে বিরহমিলনের কান্নাহাসির ভিতর দিয়ে প্রেমের ধারা বয়ে যেতে থাকে সেখানে কৌতূহলী জগতের প্রবেশ নেই, যারা জানে তারা জানে, তারা বোঝে।

আমি কিছুই ঠিকরকম করে' প্রকাশ করতে পারি না, কিন্তু আজ যে আমার কি আনন্দ তা আপনাকে না জানিয়ে পারলাম না। জানি আমি যা-কিছু বলতে চেয়েছি আপনি এমনিই বুঝবেন। আজ মাথা নত করে' আকাশ আলোর কাছ থেকে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করলাম, কচি ঘাসের ডগাটুকু পর্য্যন্ত ভালোবাসায় ভরে' উঠল, আমার মন আজ ভুলে গেল।

আপনি সন্ধ্যার সুরে যে অপরূপ আনন্দের বাণী আমাদের জীবনে সঞ্চারিত করেছেন তাতে এই প্রাণময় সৃষ্টির ভুবন আমাদের কাছে অপূর্ব্ব নবীন অনন্ত সুন্দর হয়ে দেখা দিল। এই কথাই আজ আপনাকে বলতে চেয়েছি।

'বলাকা'র পর যে আর কি হতে পারে কল্পনাতেও ভাবতে পারিনি, এখন দেখছি এই আরো নিবিড় শান্ত পরম পূর্ণতার সুর নিয়ে আপনার কবিতা দেখা দিতেই হত। কিছুকাল না লেখার পর আপনার কবিতা যে কোন জায়গায় এগিয়ে গিয়ে প্রকাশ হল তার কতকটা বোধ হয় উপলব্ধি করতে পেরেছি। এইবারকার পালার আরম্ভের দিকে আপনার কবিতায় বেদনার সুরে বেজেছিল—"ওরে পান্থ কোথা তোর দিনান্তের যাত্রা-সহচরী"[১২]—তারপর কবিতার পর কবিতায় অনির্ব্বচনীয় আবির্ভাব দেখা দিতে থাকল, আপনার নূতন সৃষ্টির যুগ পূর্ণতমরূপ নিয়ে প্রতিভাত হল। আপনার কবিতায় কিন্তু একটা

অবসানের ধুয়ো আছে যাতে আমাদের বুকের ভিতর হুহু করে' ওঠে, সব যেন কেমন হয়ে যায়,—শেষ দিকের আপনার এই কবিতাগুলির প্রায় এমন একটিও নেই যাতে সন্ধ্যা বা অন্ধকারের বর্ণনা, উপমা, বা প্রচ্ছন্ন ব্যঞ্জনা নেই। তবে এ কিছু নূতন নয়—"মনে ভাবি পথ ফুরালো" এ কথা আপনার গানে অনেকবারই বেজে উঠেছে—এবং দেখা গেছে সে-পথের শেষে নূতন লোকের আনন্দবাণী আপনি শুনিয়েছেন। "যৌবন বেদনারসে উচ্ছল আমার দিনগুলি" কবিতা [১৩] থেকে এ পর্য্যন্ত আপনার প্রত্যেক কবিতার মধ্যেই বিপুল সৃষ্টিশক্তি অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যের রূপে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে—আমরা তাই এখন কিরকম প্রতীক্ষায় যে দিন কাটাচ্ছি বলতে পারি না, নতুন 'প্রবাসী' যখন আসে তখন মনে হয় যেন পাতাই খুলতে পারব না। 'কল্লোলে' এবার আপনার একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর কবিতা বেরিয়েছে দেখলাম [১৪]—( কিন্তু এ কাগজটা সবুজপত্রের মত কিছুই হল না, 'প্রবাসী'তে তুলে দেয় তাই, নইলে ওরা আপনার লেখা পাবার আশাই করতে পারে না। ) 'সন্দেশে'র কবিতা [১৫] যে আমাদের কিরকম বেশী ভালো লেগেছে কি জানাব! আপনি বলেছেন আপনার "খেলা"য় রঙীন শিখার বাতি জ্বালিয়েছেন—আমাদের সাধারণ জীবনও তাতে রঙে রঙে রঙীন হয়ে মধুর আলোয় ভরে' উঠেছে।

আপনি শুনলে আনন্দিত হবেন এই সুদূর আসামপল্লী পর্য্যন্ত সাহিত্যের আনন্দ হিল্লোল এসে পৌঁচেছে, এখানকার মাস্টার, ছাত্রেরা মিলে একটি বড়রকমের সাহিত্যসভা করে' আপনার 'রক্তকরবী' নিয়ে আলোচনা করলেন [১৬]—কাছেই একটি শহর থেকে একটি উচ্চপদস্থ ইংরাজ-শিক্ষিত বাঙালী সভাপতি হয়ে আপনার আধুনিক কাব্য সম্বন্ধে যথার্থই ভালো রকম বললেন। ( এই বীরেন্দ্র সেন মহাশয়ের [১৭] সঙ্গে তো আপনার বিলেতে দেখা হয়েছিল বললেন—এঁরা বাড়ীসুদ্ধ সকলে কয়েকদিন আমাদের এখানে থেকে গেলেন, আপনাকে এঁরা কিরকম শ্রদ্ধা করেন, আপনার লেখার ভাবে ওঁরা কতদূর অনুপ্রাণিত দেখলে মুগ্ধ হতে হয় )। আমি সেদিন "বহুদিন মনে ছিল আশা" কবিতাটি [১৮] পড়ে শোনালাম—সভাসুদ্ধ ছোট বড় সকলকে সম্পূর্ণ তন্ময় হয়ে যেতে কখনও দেখিনি। এরকম সব হলে ভারি উৎসাহ বোধ হয়, সব আশা ফিরে আসে।

বেণোয়া সাহেবের [১৯] চিঠিতে জানলাম আপনি এখন কলকাতায় নেই, শান্তিনিকেতনেই কিছুদিন থাকবেন। তাই সেখানেই লিখছি। আশা করি আপনি অনেকটা ভালো বোধ করছেন।

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

ইতি

প্রণত

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

* কিছুদিন আগে একটা ভূমিকা যোগ করে' আপনি আমাকে যে চিঠি লিখেছিলেন সেটা আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, আশা করি ঠিকমত পৌঁচেছিল। ঐ চিঠিখানি 'প্রবাসী' কিংবা কোনো ভালো কাগজে বেরোলে বেশ হয়। [২০]

টীকা

১ 'প্রবাসী' ১৩৩২ বৈশাখ, "অন্ধকার" কবিতা থেকে। পরে কবিতাটি 'পূরবী'-তে যায়।

২ কঠিন এক মানসিক বিপর্যয়ের সময় স্কুলের তরুণ ছাত্র অমিয় চক্রবর্তী, ১৯১৭ সালে, প্রমথ চৌধুরীর মধ্যস্থতায়, প্রথম বার শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সমীপে পৌঁছেছিলেন। [ভূমিকা দ্র. ]

৩ ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর 'Expostulation and Reply' কবিতার পঙ্‌ক্তি।

৪ 'আমি জ্বালব না'—'অরূপরতন' ১ম সংস্করণ (১৯২০)। 'স্থির নয়নে তাকিয়ে আছি' —'গীতিমাল্য' (১৯১৪)। 'আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে'—'শান্তিনিকেতন পত্রিকা' (১৯২৪, জানুয়ারি), এখন 'গীতবিতানে'র অন্তর্গত।

৫ 'ছিন্নপত্র', চিঠি ১১২ (৮ অগস্ট ১৮৯৪) দ্র. 'দিনের পর দিন যখন একটি কথা না ক'য়ে কাটে তখন হঠাৎ টের পাওয়া যায় আমাদের চতুর্দিকই কথা কচ্চে।'

৬ Tennyson-এর 'The Two Voices' কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তি। অনেকেরই প্রিয়। ৩০.৯.৩৯-এ *Harijan* পত্রিকায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিষয়ে এক বিবৃতিতে গান্ধীজীও পঙ্‌ক্তিটি ব্যবহার করেন: "And even at the risk of being misunderstood, I must act in obedience to 'the still small voice.'"

৭ অপ্রকাশিত ডায়েরিতে অমিয় চক্রবর্তীর পিতার মন্তব্য: 'অমিয়র অনেক উন্নতি হইয়াছে ও তাহার views বেশ উঁচু এবং practical,—moral ideals ও খুবই উন্নত। তবে কাজে কিছু করিতে পারিবে কি না সন্দেহ হয়। তাহার শরীর একটুও ভাল না। ...আমার মনে হইতেছে যে তাহার এখন বিয়ে দেওয়া উচিত—মেয়েদের সঙ্গ সে এখন ভালবাসে।' অমিয় চক্রবর্তীর বয়স তখন পঁচিশ।

৮ 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬) উপন্যাসের মূল সমস্যা নিয়ে স্বয়ং লেখকের সঙ্গে আলোচনা।

৯ 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি' 'প্রবাসী'-তে ধারাবাহিক প্রথম ছাপা হয়। বই আকারে বেরোয় 'যাত্রী' নামে (১৯২৯), 'জাভা যাত্রীর পত্রে'র সঙ্গে একত্রে। আলাদা বই হিশেবে ছাপা হয় ১৯৬১ সালে।

১০ 'পূরবী'র "না-পাওয়া" কবিতা দ্র.।

১১ 'গীতবিতান' দ্র.। রচনা ১৯২১, শান্তিনিকেতন।

১২ 'পূরবী'-র "আহ্বান" কবিতা থেকে। রচনাকাল ১ অক্টোবর ১৯২৪।

১৩ 'পূরবী'-র "তপোভঙ্গ" কবিতা থেকে। রচনাকাল কার্তিক ১৩৩০।

১৪ ১৩৩২ সালে 'কল্লোল' পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা "মুক্তি" নামে এই কবিতাটি পরে 'পূরবী'তে যায়। এ-সংখ্যাতেই "নববর্ষের গান" নামে অমিয় চক্রবর্তীরও একটি কবিতা ছিলো। কবিতাটি কোনো গ্রন্থে নেই, থাকার কথাও না।

১৫ সংখ্যাটি বিলম্বে বেরিয়েছিলো কিনা জানা যায় না, তবে "সময়হারা" নামে রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি 'সন্দেশ' পত্রিকার ১৩৩০-এর বৈশাখ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিলো, এর প্রায় দু'বছর আগে। 'শিশু ভোলানাথ' দ্র.।

১৬ 'রক্তকরবী' বই হ'য়ে বেরোয় ১৯২৬ সালে, এ-চিঠির এক বছর পরে। তবে ১৩৩১-এর আশ্বিনে 'প্রবাসী' পত্রিকার ক্রোড়পত্র হিশেবে সবটা নাটক এক সংখ্যায় ছাপা হয়েছিলো, শুরুতে গগনেন্দ্রনাথের আঁকা ছবি ছিলো : "যক্ষপুরীর রাজপ্রাসাদের

জালাবরণ"। এই ক্রোড়পত্রে ছাপা 'রক্তকরবী' নিয়েই তাহ'লে আলোচনা হয়।

১৭ ইনি কে ঠিক বোঝা গেলো না।

১৮ দ্র. 'পূরবী'-র "আশা" কবিতা।

১৯ F. Benoit, রোম্যাঁ রলাঁর তরুণ বন্ধু, ভারতপ্রেমিক, ফরাসিভাষী এই সুইস্ ভদ্রলোক 'আন্তর্জাতিক কর্ম, আদর্শিক শিক্ষাদান ও সাহিত্যচর্চার জন্য' শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন, ফরাসি-জর্মান পড়াতেন। অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা ছিলো এবং তাঁর সহায়তায় 'মুক্তধারা'র ইনি ফরাসি তর্জমা করেছিলেন, *La Machine* নামে সেটি ১৯২৯ সালে প্যারিস থেকে বেরোয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে স্নেহ করতেন, পুপের (নন্দিনীর) ফরাসি শিক্ষার ভার ছিলো তাঁর উপর। পরে কী হ'লো, বাঙালি এক ব্রাহ্ম মহিলাকে বিবাহ ক'রে বেনোয়া শান্তিনিকেতন ছেড়ে হঠাৎ বিহারে চ'লে গেলেন।

২০ এটি হ্যাভেলক্ এলিস-এর মন্তব্য খণ্ডন ক'রে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি। 'কবিতা', ১৩৫০ আশ্বিন সংখ্যায় ছাপা হয়েছিলো। 'চিঠিপত্র' ১১শ, ৩১ দ্র.।

## *দ্বিতীয় পর্ব ।। ১৯২৭-১৯৩৩*

### ৫

১লা এপ্রিল ১৯৩০

1 Endsleigh Street
London

শ্রীচরণকমলেষু

আমরা কাল এখানে পৌঁছেচি—দুজনেই খুব ভালো আছি।[১] এখানে এক ইংরেজ পরিবারের সঙ্গে আছি, তাঁরা খুব যত্নে রেখেচেন। আজই সন্ধ্যায় Selly Oak-এ যাবো। এখানে এখন সুন্দর সময় যাচ্চে।

Drummond-এর [২] খোঁজ করেছিলাম, তিনি Oxfordএ আছেন, মধ্যে মধ্যে এখানে আসেন। তাঁর Oxford-এর ঠিকানায় চিঠি লিখেচি, আপনাকে শীঘ্রই উত্তর দেবেন।

Timbers এখানেই আছেন, আপনাকে তাঁদের প্রণাম জানাতে বললেন। তিনি প্রতি week end-এ Selly Oak-এ যান।[৩]

আশা করচি রথীবাবু ওখানে গিয়ে অনেকটা ভালো বোধ ক'রচেন—Andree [৪] বলছিলেন তিনি খবর পেয়েচেন রথীবাবু Switzerland-এ যাচ্চেন। আপনি কখন Paris-এ এবং ইংলণ্ডে আসবেন আরিয়ম [৫] একটু আমাদের খবর দিলে বিশেষ আনন্দিত হব।

আশা করি সুশীলবাবু বই পাঠিয়েছিলেন। আসবার আগে একদিন Morris-এর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাঁকেও ব'লেছিলাম কাব্যগ্রন্থের প্রথম দুখানা বই পাঠাতে।[৬]

এখানেও নানা কাগজে আপনার কথা রোজই বেরোচ্চে—যা পেয়েচি cuttings তৈরি ক'রে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দিয়েচি সেখানকার বইয়ে রাখবার জন্যে।

আমাদের দুজনের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

প্রণত

শ্রীঅমিয় চন্দ্র চক্রবর্তী

---

টীকা

১ বার্মিংহামের উপকণ্ঠে ইংরেজ কোয়েকারদের সেলি ওক্ উডব্রুক কলেজে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন অমিয় চক্রবর্তী। সেই উপলক্ষে প্রথমবার য়ুরোপে যাওয়া। পথে লণ্ডন থেকে এ-চিঠি লেখা। কবি তখন আছেন দক্ষিণ ফ্রান্সে।

কোয়েকার সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রথমাবধি রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীর নিবিড় যোগাযোগ বিষয়ে কেউ কখনো গবেষণা করলে বহু অজ্ঞাত তথ্য জানা যাবে।

জাহাজ মার্সাইতে পৌঁছলে সঙ্গীদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চ'লে গিয়েছিলেন Riviera অঞ্চলে, Cannes-এর কাছে।

২ লীগ অব নেশন্স-এর প্রথম সেক্রেটারি জেনারেল এবং লণ্ডনে হিবার্ট ট্রাস্টেরও সেক্রেটারি Sir W. H. Drummond (১৮৭৬-১৯৫১) একবার শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন ১৯২৪ সালে। ১৯২৭-এর জুন মাসে তিনিই রবীন্দ্রনাথকে হিবার্ট বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি লেখেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৩০ সালে সেই বক্তৃতা দিতে রবীন্দ্রনাথ যখন ইংলণ্ডে যান, সস্ত্রীক অমিয় চক্রবর্তীও সেই ফরাসি জাহাজেই গিয়েছিলেন, যদিও সহযাত্রী হিশেবে নয়। তাঁদের প্রথম এবং একমাত্র সন্তানের জন্ম তখন আসন্ন। হিবার্ট বক্তৃতার তারিখ সংক্রান্ত একটি বার্তা অমিয় চক্রবর্তীর হাতে ড্রামণ্ডকে পাঠিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ফ্রান্সে নেমে যান, সেই প্রসঙ্গ।

৩ ম্যালেরিয়া-বিশেষজ্ঞ, কোয়েকার ডাক্তার টিম্বার্স (Harry G. Timbers, ১৮৯৯-১৯৩৭) কিছুকাল বিশ্বভারতীতে প্রধান মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন। এঁরাই হয়তো বিশ্বভারতীতে প্রথম মার্কিনী কর্মী। বিনা বেতনে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে কিছু ক্লাসও নিতেন। পরে শ্রীনিকেতনের কাজে যোগ দিয়ে সুরুল গ্রামে গিয়ে বাস করতে থাকেন। সেখানকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নাম দেওয়া হয়েছিলো 'স্বস্তিনিকেতন', কখন নামটা উঠে গেছে। রাশিয়া ভ্রমণকালে কবির পঞ্চসঙ্গীর একজন ছিলেন হ্যারি। স্ত্রী রেবেকার সঙ্গে দ্বিতীয়বার রাশিয়া যান ১৯৩৪ সালে, সেখানকার মহামারীতে সেবাব্রতের কাজ নিয়ে। *Visva-Bharati News*, ১৯৩৭ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় রাশিয়া থেকে লেখা রেবেকার চিঠি আছে। ঐ সালের মে মাসে দুরন্ত টাইফাস্ রোগে রাশিয়াতেই মৃত্যু। (৫৩-সংখ্যক চিঠি দ্র.)। রেবেকার ডায়েরি ১৯৩৯ সালে *We didn't ask utopia : a Quaker family in Soviet Russia* নামে ন্যুইয়র্ক থেকে বেরোয়। হ্যারির স্মরণে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ মন্দির নিয়েছিলেন।

৪ গুণী ফরাসি শিল্পী আঁদ্রে কারপেলেস (Andrée Karpeles) ছিলেন, অমিয় চক্রবর্তী লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়তুল্য বন্ধু'। বহুবার আশ্রমে আসেন, প্রথমবার ১৯২২ সালে, কলাভবনের শিক্ষক হিশেবে। প্রতিমা দেবী এঁর কাছে য়ুরোপী ধাঁচের পটারির কাজ শিখেছিলেন।

৫ শ্রীরামপুর মিশনারি কলেজ থেকে Bachelor of Divinity ডিগ্রি পাওয়া আরিয়ম (আর্যনায়কম্) ছিলেন বর্তমান শ্রীলঙ্কার জাফ্না অঞ্চলের তামিল খ্রিস্টান। ইংলণ্ডে YMCA-র কর্ম ত্যাগ ক'রে, ১৯২৪ সালে বিশ্বভারতীতে যোগ দেন। শান্তিনিকেতনেই বিবাহ করেন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফণীভূষণ অধিকারীর কন্যা, লেডি রাণু মুখার্জির দিদি, আশা অধিকারীকে। ১৯২৭ সালে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং ১৯৩০ সালে রাশিয়া ভ্রমণের কালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী ছিলেন। শান্তিনিকেতন ত্যাগ ক'রে গান্ধীজীর কর্মে যোগ দেন ১৯৩৪ সালে। এঁরা স্বামী-স্ত্রী মিলে গান্ধীজীর 'বুনিয়াদি শিক্ষা'-র মূল খসড়াটি তৈরি করেছিলেন ব'লে জানা যায়।

৬ সুশীলবাবু, কানাই সামন্ত মহাশয় বললেন, হয়তো বা অজিত চক্রবর্তীর ভ্রাতা, আশ্রমে ছিলেন।

Morris. (H. P.)—পারসী ভদ্রলোক, বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ছিলেন, এবং এই প্রতিষ্ঠানের জন্যে পশ্চিম ভারত থেকে অর্থও সংগ্রহ করেছেন। অজ্ঞাত কারণে জাহাজ থেকে সমুদ্রে লাফিয়ে প'ড়ে আত্মহত্যা করেন। কবি এঁর নাম দিয়েছিলেন 'মরীচি'। পোরবন্দর রাজ্যের রেসিডেন্টের নামও ছিলো H. P. Morris, দুজনে একই ব্যক্তি কি না জানা যায় না।

## ৬

৫ই এপ্রিল ১৯৩০

College walk
Selly Oak
Birmingham [১] England

শ্রীচরণকমলেষু

এখানে প্রত্যহ অসংখ্য চিঠি আসচে—ইংলণ্ডের নানা জায়গা থেকে সবাই জানতে চান আপনি কখন এখানে আসবেন, আপনাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চান। Mr. Alexander -এর [২] কাছেই বেশি চিঠি আসে, তিনি বেশির ভাগ উত্তর দিয়েচেন—কিছু আপনার কাছে পাঠিয়েচেন, আপনার কথামতো আরিয়ম লিখবেন এই আশা ক'রে। ইংলণ্ডের প্রবীণ কবি Laurence Housman [৩] আজ একখানি চিঠি লিখেচেন—তাঁর বিশেষ ইচ্ছে Selly Oak থেকে Devonshire-এ Elmhirst-দের [৪] কাছে আপনি যদি যান তাহলে পথে Somerset -এ দুএকদিন তাঁর বাড়িতে আপনি থাকেন। Laurence Housman-এর কবিতা আমার ছেলেবেলা থেকে ভালো লাগে, একসময়ে তাঁকে চিঠি লিখতাম—তাঁর এই চিঠি পড়ে বড়ো আনন্দ হল। তিনি আপনাকে গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েচেন এবং বহুদিন থেকে আপনাকে দেখতে তিনি উৎসুক হয়ে আছেন সেই কথা বলেচেন। ইংলণ্ডে সৰ্ব্বত্র আপনার বই এঁরা কীরকম ক'রে পড়েচেন জেনে স্বদেশের বিষয় লজ্জা হয়। এখানে এসে সেই ইংলণ্ডের পরিচয় পাচ্চি যাকে সাহিত্য শিল্প সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে জেনেচি —লুব্ধ বণিকবৃত্তি নিয়ে যে সব ছোট ইংরেজ আমাদের দেশে যায় তারা আমার দৃষ্টি

আচ্ছন্ন ক'রেছিল। এই জায়গার সঙ্গে শান্তিনিকেতনের কী গভীর মিল আছে দেখে বিস্মিত হয়েচি। এখানকার লোকজন কাজকর্ম্ম, এখানকার সাধনার জীবনের সঙ্গে পরিচিত হ'লে বাংলাতে সব কথা লিখতে চেষ্টা করব—আজকের দিনে ইংলণ্ডের বিষয় বিদ্বেষচালিত হয়ে না লিখলে দেশের লোক রাগ করবে কিন্তু বিশ্বভারতীর আদর্শের যে সমগ্র দৃষ্টি আমাদের সামনে রয়েচে তা'র প্রত্যক্ষ পরিচয় দেশে বিদেশে উপলব্ধি করতে আমরা বেরিয়েচি—আজকের এই বিরোধের দিনে সত্য কথা বলতে হবে—সকলকে জানাতে হবে শান্তিনিকেতনের আদর্শ কীভাবে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে যাচ্চে—মানুষের মধ্যে চিরন্তন মৈত্রীর সম্বন্ধ কোনোদিন ছিন্ন হতে পারে না।[৫] এঁদের আদর্শ এঁদের কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে এঁরা আমাকে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সুযোগ দেবেন ব'লেচেন। শান্তিনিকেতন কীভাবে বর্ত্তমান ইংলণ্ডকে গঠন ক'রে তুলচে সে বিষয়ে ওঁদের কাছে অনেক জানতে পারব।

প্রণত
শ্রীঅমিয়

---

টীকা

১ উডব্রুক কলেজে পৌঁছে অমিয় চক্রবর্তীর লেখা প্রথম চিঠি। রবীন্দ্রনাথ তখনো ফ্রান্সে কাপ মার্তাঁয় (Cap Martin) আছেন, লণ্ডনে পৌঁছননি।

২ Mr Alexander (Horace Alexander)—ইংরেজ কোয়েকার নেতা, নব্বুই পেরিয়ে কিছুকাল পূর্বে আমেরিকায় ফিলাডেলফিয়া কোয়েকার কলোনিতে মারা গেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর সুহৃদ ছিলেন। একাধিকবার শান্তিনিকেতনে এসেছেন, প্রথমবার বোধ করি ১৯২৭ সালে—অমিয় চক্রবর্তী-হৈমন্তী দেবীর বাগ্‌দান অনুষ্ঠানের দিন। অমিয় চক্রবর্তীকে ইনিই উডব্রুক কলেজে আমন্ত্রণ করেন। এ-যাত্রায় (১৯৩০) হরেস ছিলেন কবির সঙ্গে ইংলণ্ডে অন্যদের যোগাযোগের সেতু। কবি নিজেই তাঁকে এ-ভার দেন। হিবার্ট বক্তৃতার পূর্বে কবি তাঁকে লিখেছিলেন, 'I shall mostly be guided by your friendly advice while I am in England.'

বহুবার বহুভাবে হরেস ভারতে এসে সেবার মঙ্গলকর্ম করেছেন। ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় তিনি এবং Friends Society নামের কোয়েকার সংস্থা কলকাতায় এবং অন্যত্র যেভাবে সেবার কাজ করেন তার তুলনা হয় না। প্রণীত গ্রন্থের মধ্যে আছে *Consider India : an Essay in Values* (১৯৬১) এবং *Gandhi Through Western Eyes* (১৯৬৭), ন্যুইয়র্ক থেকে বেরিয়েছিলো।

৩ Laurence Housman (১৮৬৫-১৯৫৯) কবি A. E. Housman-এর ভ্রাতা, নিজেও কবি লেখক এবং পুস্তক অলংকরণ শিল্পে খ্যাতিমান। এঁর দুখণ্ড একাঙ্ক নাটিকার সংগ্রহ, *Little Plays of St. Francis* (১৯২২, ১৯৩১) নাম করেছিলো। কৈশোর থেকেই অমিয় চক্রবর্তীর পত্রালাপ ছিলো এঁর সঙ্গে।

৪ কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, ইংরেজ কৃষিবিজ্ঞানী (Leonard Elmhirst) ১৯২২ সালে এসে শ্রীনিকেতনের প্রথম অধ্যক্ষ হন। বহুকাল অবধি সেখানকার গ্রামোন্নতি প্রকল্পের মূল ব্যয়ভার বহন করেছেন তাঁর মার্কিনী পত্নী শ্রীমতী ডরোথি স্ট্রেইট (Dorothy

Straight)। ১৯২৫ সালে ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে এলমহার্স্ট ডিভনশায়ারের টটনেস্-এ, শ্রীনিকেতনের আদর্শে, Dartington Hall নামে বিদ্যালয় স্থাপন করেন। রবীন্দ্রনাথ দুবার (১৯২৬, ১৯৩০) সেখানে বাস করেছেন। এঁদের সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথের আঁকা একুশখানা উৎকৃষ্ট ছবি রয়েছে। এলমহার্স্ট মারা যান ১৯৭৪ সালে। গ্রন্থ: *Rabindranath Tagore, Pioneer in Education* (১৯৬১), *Poet and Plowman* (1965)। পরে দেখা যায়, ডার্টিংটন হলের ব্যবস্থাপনার মধ্যে 'আকস্মিকতা এবং ব্যক্তিগত ধনের অপচয়' মনে হয়েছিলো অমিয় চক্রবর্তীর। (৪৪-সংখ্যক চিঠি দ্র.)

৫ ভারতবর্ষে তিরিশের যুগের রাজনৈতিক আবহাওয়া রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমৈত্রী ভাবনার অনুকূল ছিলো না।

## ৭

১৮.৫. [১৯৩৩] কলিকাতা

শ্রীচরণকমলেষু

মধ্যে শান্তিনিকতনে গিয়েছিলাম—গরম খুবই বেশি। আজ সাততালে রওনা হব এমন সময় দেবদাস গান্ধীর চিঠি পেলাম, তিনি অবিলম্বে আমাকে পুনায় যেতে অনুরোধ করেছেন। মহাত্মাজির কাছে এ সময় আপনার তরফ থেকে কেউ থাকলে তিনি বিশেষ সুখী হবেন এই মনে ক'রেই লিখেচেন আর ব'লেচেন কোন সময়ে কী হবে কিছুই বলা যায় না, আপনাকে কিছু জানাবার ইচ্ছা বোধ হয় মহাত্মাজির আছে তিনি তা এখনই বলতে পারবেন। আমি তাই আজই রওনা হচ্চি।[১] এই গরমে যেতে ভয় হয় কিন্তু সেখানে পৌঁছে গেলে তেমন কষ্ট হবে না। সেখান থেকে সোজা সাততালে চলে যাবো—Tucker[২] আমার জন্যে ব্যবস্থা করে রেখেচেন এবং অপেক্ষা করচেন। পুণায় পৌঁছেই বড় করে লিখব।

আমি মধ্যে করুণাবাবুর কাছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়েচি। দুজায়গাতেই অত্যন্ত ধীরে ধীরে কাজ চলচে—বলচেন আর বেশি দেরি নেই। কিছুই ভরসা পাওয়া যায় না। কেদারবাবুর আলবামের জন্যে যে-ছবি যাওয়ার কথা ছিল সেটি বিচিত্রিতায় ব্যবহার করা বিষয়ে গোলযোগ চলছিল, যদিও কেদারবাবু আমাকে কতদিন আগে নিজের মুখে বলেচেন এ নিয়ে কিছুই দেরি বা বাধা হবে না। কিশোরীবাবু এখন ব্যবস্থার ভার নিয়ে যা কর্তব্য সবই করচেন।[৩]

মালঞ্চ নাটক হয়ে কীরূপ নিয়েচে পড়তে খুব উৎসুক বোধ হচ্চে[৪]—জানি না কবে হবে। আশা করচি ওখানে অভিনয়ের জন্য দুএকজনের সন্ধান পাওয়া যাবে।

শরীরের জন্য ভয় করা কিছু নয় জানি কিন্তু এবারে কীরকম যেন বোধ হচ্চে।[৫] খাওয়ার বিষয়ে অভ্যাস বদলাবার চেষ্টা করব। সাততালে ঠাণ্ডা হাওয়া পেলে

একটু প্রাণ সঞ্চার হবে কতদিন থেকে আশা করে আছি।

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

প্রণত

অমিয়

---

**টীকা**

১ এ-চিঠিটি লেখা হয় ৬-সংখ্যক চিঠির তিন বছর পরে। মাঝখানে লেখা কোনো চিঠি রক্ষা পায়নি, যদিও অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের উত্তর আছে অন্তত পাঁচটি। ('চিঠিপত্র' ১১শ দ্র.)।

হরিজন আন্দোলন সংক্রান্ত ব্যাপারে এসময় কিছু গোলযোগ দেখা দিয়েছিলো। পুণায় গান্ধীজী তখন আত্মশুদ্ধির জন্যে তিন সপ্তাহের অনশন শুরু করেন ১৯৩৩-এর ৮ মে থেকে। রবীন্দ্রনাথ এ-অনশন সমর্থন করতে পারেননি। অমিয় চক্রবর্তীকে একথা জানিয়ে কবি দুখানি চিঠিও লিখেছিলেন। ('রবীন্দ্রজীবনী'-৩, ৪৭৭ পৃ. দ্র.)। কোনো অজ্ঞাত কারণে চিঠিদুটি 'চিঠিপত্র' ১১শ খণ্ডে ছাপা হয়নি।

দেবদাস গান্ধীর বার্তা পেয়ে, কলকাতা থেকেই অমিয় চক্রবর্তী নিজের দায়িত্বে পুণায় চ'লে যান, কবির অনুমোদন নেবার সময় পাননি।

২ (Boyd C.) Tucker, আমেরিকান মেথডিস্ট, ১৯২৭ সাল থেকে বিশ্বভারতীতে ইংরাজি পড়াচ্ছিলেন। জাপান হ'য়ে কানাডা ও আমেরিকায়, ১৯২৯ সালে, রবীন্দ্রনাথ যেবার বক্তৃতা করতে যাচ্ছিলেন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও অপূর্বকুমার চন্দ্র ছাড়া তাঁর তৃতীয় সঙ্গী ছিলেন বয়ড্ টাকার। গান্ধীজির বর্তমান অনশনের তিনিও সমর্থক ছিলেন না।

৩ প্রসঙ্গটি, মনে হয়, সচিত্র 'বিচিত্রিতা' (১৯৩৩) ছাপা সংক্রান্ত। কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ভারতীয় ছবির অ্যালবাম এবং বিশ্বভারতীর 'বিচিত্রিতা'—এই দুই গ্রন্থেই রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির যুগপৎ ব্যবহার করা নিয়ে বোধ করি কিছু সমস্যা দেখা দেয়। নিশ্চয়ই অমিয় চক্রবর্তীর উপরে সমস্যা সমাধানের কিছু দায়িত্ব পড়েছিলো। এ-চিঠির ভাষা থেকে মনে হয় এ-ধরনের খুচরো কাজ কবির সাহিত্য-সচিবের ঠিক মনঃপূত হচ্ছিলো না।

বিশ্বভারতীতে তখনকার প্রকাশন ব্যবস্থার কর্মী ছিলেন করুণাবাবু (করুণাবিন্দু বিশ্বাস), প্রকাশক ছিলেন কিশোরীবাবু (কিশোরীমোহন সাঁতরা), আর কেদারবাবু (কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়) হলেন 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র।

৪ ছোটো উপন্যাস বা novelette রূপে 'মালঞ্চ' প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ সালে। তার আগে, ১৯৩৩-এর মাঝামাঝি এর একটি নাট্যরূপ ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কবির হাতের পরিমার্জনা ও সংযোজনসহ সুধীরচন্দ্র করের কপি করা এই নাটিকার একটি পাণ্ডুলিপি আছে রবীন্দ্রভবনে। অশোকবিজয় রাহা -সম্পাদিত এবং রবীন্দ্রভবন-কর্তৃক প্রকাশিত দ্বিতীয় খণ্ড 'রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা'য় (১৯৬৬) ছাপা হওয়ার পরে ১৯৭৯তে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিলো।

৫ অমিয় চক্রবর্তীর স্বাস্থ্য কৈশোর থেকেই রুগ্ণ ছিলো। ডায়েরিতে পিতাকে তা নিয়ে চিন্তিত দেখা যায়। বর্তমান সিরিজের ৯-সংখ্যক চিঠি ও ৯.১ টীকা দ্র.।

২৩ মে [ ১৯৩৩ ]

C/o Servant of India Society
পুণা

শ্রীচরণকমলেষু

এখানে এসে দেখচি খুবই ভালো করেচি—সকলেই আশা করছিলেন আপনার তরফ থেকে এখানে কেউ উপস্থিত থাকবেন। মহাত্মাজি নিজে বিশেষ আনন্দিত হয়েচেন। আপনি আসবেন কিনা সবাই জিজ্ঞাসা করেন, আমি মহাত্মাজিকে তাই বললাম আপনি তাঁর কাছ থেকে একটুও দূরে নেই। এতে তিনি খুব খুশি হয়ে উঠলেন। আগেরবার উপবাসের সময় আপনি আসায় তাঁর প্রাণরক্ষা হয়েছিল সকলেরই বিশ্বাস—তা না হলে বিলেত থেকে খবর আসা পর্য্যন্ত বাঁচতে পারতেন না। এবারে উনি আরো বিশুদ্ধ ভাবে ব্রত পালন করচেন মহাত্মাজি এই মনে ক'রে অক্ষুণ্ণ শক্তি রক্ষা করতে পারচেন। হরিজনদের বিষয়েও উনি ভাবচেন না—সমস্তক্ষণ ধ্যানের ভাবে নিবিষ্ট থাকেন। সকালে সন্ধ্যায় বড়ো সুন্দর গান হয়, বেশির ভাগই তুকারাম বা নানক বা অন্য কোনো সাধকের রচনা ভজন প্রভৃতি। সান্ধ্য প্রার্থনার সময় আমি ওখানে থাকি।[১]

আমি উঠেচি Servant of India Society-র অতিথিশালায়। নিভৃত সুন্দর জায়গা, কাজ করবার সব সুবিধে আছে। পর্ণকুঠী এখানে থেকে পাঁচমাইল দূরে [২], যাতায়াতে অনেক সময় যায়।

Mrs Naidu, রাজগোপালাচারী, দেবদাস এঁরা প্রত্যহই আপনার খবর জানতে চান।[৩] চারদিকের আবহাওয়া বড়ো নির্ম্মল এইটেতে মনকে এত আনন্দ দেয়—সকলেই সেবাতৎপর, ব্যবহার শোভন ও সহজ, কাজের ব্যবস্থা এমন পরিপাটি। মহাত্মাজির বেশির ভাগ মনোবৃত্তি আমার পক্ষে অবোধ্য, ওঁর দলের মনোভাবও প্রায় বুঝি না কিন্তু দেশে এই যে হাওয়া তৈরি হয়েচে, আজকে এই উপবাসের ফলে পর্ণকুঠীতে এবং চারপাশে যে গভীর সত্যের ভাব ছড়িয়ে গেছে তাতে মন তৃপ্ত হয়। উপবাসভঙ্গের পরেই আমি সোজা সাততালে Tucker-এর কাছে চলে যাব—তাঁরা আমার জন্যে ঘর ভাড়া করে রেখেচেন। মহাবলেশ্বর কাছেই—Vakil-রা [৪] একবার ডেকেচেন—একদিনের জন্যে ঘুরে আসব। এখানকার আর সব ব্যবস্থা ভালো, আহার্য্যের ব্যবস্থা ছাড়া। তা না হলে এই অঞ্চলে কোথাও থেকে যেতাম।

Lady Thackersay আপনাকে প্রণাম জানিয়েচেন। শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাই প্রত্যহ আপনাকে প্রণাম জানান।

শান্তিনিকেতনের তিনজন এখানে আছেন—কৃপালাণি, প্রভুভাই আর ভক্তিপ্রসাদ [৫] তা ছাড়া Miss Pocha [৬]—ইনি শান্তিনিকেতনের জন্য পার্শী ছাত্রী সংগ্রহের চেষ্টায় আছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের থাকবার ঘর তৈরি করবার জন্য অর্থের আবেদন নিয়ে ঘুরবেন ভাবচেন। এখন কিছুদিনের মতো সব বন্ধ, ভালোমতো বিঘ্ন কেটে গেলে [৭] দেশের

লোকের দেওয়ার ইচ্ছে জাগবে আশা করা যায়।

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

প্রণত
অমিয়

---

**টীকা**

১ সাহিত্য-সচিব হিশেবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তী পূর্বে একবার গান্ধীসমীপে যান, কিন্তু যারবেদা কারাগারে গিয়ে পৌঁছতে-পৌঁছতেই সেবার গান্ধীজির অনশনের কাল শেষ হ'য়ে গিয়েছিলো। এবার খুব কাছে থেকে অনশনব্রতী মহাত্মাকে দেখলেন।

২ পুণায় ধনী গুজরাতি পরিবার বিঠলভাই এবং লেডি থ্যাকার্সেদের বাসভবনের নাম ছিলো পর্ণকুঠী। রবীন্দ্রনাথও এঁদের বাড়িতে অতিথি হয়েছেন।

৩ সুরসিকা এবং অসামান্য বাগ্মী Mrs (Sarojini) Naidu (১৮৭৯-১৯৪৯) ছিলেন শিক্ষাবিদ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা। প্রথম জীবনে ইংরেজি ভাষায় কবিতা লিখে খ্যাতি পান, বিলেতে ইয়েট্‌সদের Rhymers' Club-এ যাতায়াত ছিলো, এড্‌মণ্ড গস্ প্রশংসা ক'রে এঁর কবিতার ভূমিকা লিখেছিলেন। পরে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেত্রী এবং কংগ্রেসের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট হন। স্বাধীন ভারতে উত্তর প্রদেশের প্রথম গভর্নর ছিলেন।

রাজাগোপালাচারী (১৮৭৮-১৯৭২)—তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত তামিল ব্রাহ্মণ, অগ্রণী দেশনেতা, ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল। স্বাধীনতার পরে কংগ্রেস ত্যাগ করেন। মহাভারত সহ বিবিধ প্রসঙ্গ নিয়ে এঁর ইংরেজি লেখা উৎকৃষ্ট সাহিত্যগুণসম্পন্ন।

দেবদাস (গান্ধী, ১৯০৫-১৯৫৭)—মহাত্মার কনিষ্ঠ পুত্র, সাংবাদিক। বাল্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় পিতার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে, পরে কিছুদিন শান্তিনিকেতন ও বেশিদিন গুরুকুলে ছাত্র ছিলেন।

৪ পার্শি শিক্ষাবিদ (J. J.) Vakil শান্তিনিকেতনে পাঁচ বছর ইংরেজি পড়িয়েছেন। পরে পুণায় The Pupils' Own School প্রতিষ্ঠা ক'রে তার প্রিন্সিপাল হন। কৈশোরে ইন্দিরা গান্ধী কিছুদিন সেখানে ছাত্রী ছিলেন।

৫ কৃষ্ণ কৃপালানী (১৯০৭-১৯৯১) শিক্ষায় ব্যারিস্টার হ'লেও আইন ব্যবসায়ে না গিয়ে ১৯৩৩ সালে বিশ্বভারতীর কর্মে যোগ দেন। এঁরা সিন্ধুদেশীয়। কিছুকাল বন্ধ থাকা *Visva-Bharati Quarterly* পত্রিকা কৃষ্ণ কৃপালানীর সম্পাদনায়, ১৯৩৫ থেকে, দ্বিতীয় পর্যায়ে, আবার প্রকাশিত হয়। ১৯৩৬ সালে ইনি মীরাদেবীর কন্যা, কবির দৌহিত্রী, নন্দিতাকে বিবাহ করেন। পরবর্তী জীবনে সাহিত্য অকাদেমির সেক্রেটারি ও ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের চেয়ারম্যান, এবং কিছুদিন রাজ্যসভার মনোনীত সদস্য ছিলেন। শান্তিনিকেতনে মৃত্যু হয়। এঁর লেখা *Rabindranath Tagore : A Biography* (১৯৬২, ১৯৮০) একটি উৎকৃষ্ট জীবনী।

প্রভুভাই—শান্তিনিকেতনে (১৯২৮-৩৩) ক্ষিতিমোহন সেনের কাছে গবেষণা

করতেন। ভক্তিপ্রসাদও সম্ভবত আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র, কিন্তু বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

৬ Miss Pocha (Rati Petite Poachkhanewala) শান্তিনিকেতনে কলাভবনের পার্শী ছাত্রী। বিশ্বভারতীর ধারাবাহিক আর্থিক সংকট অন্তত আংশিক মোচনের জন্যে এঁর মতো আরো অনেকেই উদ্যোগী হয়েছিলেন, প্রধানত বাংলাদেশের বাইরে। লামা অনাগারিক গোবিন্দ-কে বিবাহ করার পর মিস্ পোচা লী গৌতমী নাম গ্রহণ করেন। আলমোরায় স্টুডিও করেছিলেন।

৭ 'বিঘ্ন'—গান্ধীজির অনশনব্রত।

## ৯

২১ জুন [ ১৯৩৩ ]

Pine Lodge
Sat Tal
Naini Tal (Dt.)

শ্রীচরণকমলেষু,

এখনও খুব দুর্ব্বল আছি না হলে কলকাতায় চলে যেতাম। যত শীঘ্র পারি যাবো, হোমিয়োপ্যাথিক ডাক্তার দেখাব।

বোধ হয় একটু জ্বর হচ্চে। অস্বাভাবিক দুর্ব্বলতা ঢেউএর মতো আসে, সকালবেলা অনেক সময় মনে হয় উঠতে পারব না। ধীরে ধীরে আবার জোর পাই। এক একবার মনে করেছিলাম কাছেই ভাওয়ালি স্যানেটরিয়ামে থাকি, কিন্তু ওখানকার অসুখের আবহাওয়া দেখলে হতাশ বোধ হয়, মনে হয় আর কখনো বেরোতে পারব না। তা ছাড়া ছোঁয়াচ লেগে lung-এরও অসুখ হতে পারে। ইংরেজ ডাক্তার ঠিক বলতে পারচেন না, কিন্তু তাঁর বিশেষ মত এই যে দেরি না ক'রে যেমন ক'রে হোক Vienna-তে জর্ম্মনীর কোথাও যাই। যদি intestinal TB.র একটুও সূত্রপাত হয়ে থাকে তাহলে আমার শরীরে এমন জোর নেই যে কিছুতে যুদ্ধ করতে পারব। আমাকে বড়ো যত্ন করে দেখলেন, একটুও অকারণ ভয় বা ভরসা দেননি। বললেন এ দেশে কোথাও এমন ব্যবস্থা নেই যে intestine-এর ঐ অসুখ সারাতে পারে। অপেক্ষা ক'রে স্পষ্ট প্রমাণের জন্যে দেরি করলে তখন কোনো দেশে সারাবার উপায় থাকবে না। আমার tissue-র জোর কম, সহজেই দ্রুত ক্ষয়ে যাবে।[১]

এতদিন ধ'রে ভালো ক'রে ভেবেচি। কাউকেই এ সব ভাবনার কথা জানাইনি। সাহস ক'রে বেরিয়ে প'ড়ে শরীর সারিয়ে আনব, আবার কাজে লাগব এই ইচ্ছে জাগচে। বিদেশে একটু ভালো হলে স্বাস্থ্যকর জায়গায় বিশ্রামের সঙ্গে সঙ্গে কিছু সত্যিকার কাজও করতে পারব। এখন য়ুরোপে Humanism সম্বন্ধে খুব আন্দোলন চলচে—নানা দিক থেকে। আমার মনে এই বড়ো সঙ্কল্প জাগচে যে আপনার সমস্ত জীবনের মধ্যে দিয়ে

Humanism-এর অভিব্যক্তি কত ধারায় প্রকাশ পেয়েচে তাই দেখাতে চেষ্টা করব।[২] Religion of Man পড়ে এবং 'মানুষের ধর্ম্ম' অনুবাদ করতে করতে অনেক কথা মনে হয়েচে।[৩] ঐ দুই বই ছাড়া আর কিছু বই পড়িনি—আপনার গানের মধ্যে দিয়ে, বিচিত্র কাব্য, বিচিত্র কর্ম্মের মধ্যে দিয়ে ঐক্যতত্ত্বের সন্ধান করেচি গভীর ভাবনায়। ওরা যাকে Humanism বলচে তার মধ্যে দিয়ে ওরা ঐ জিনিষই খুঁজচে। Otto বা Glasenapp এই রকমের কেউ হয়তো Europe-র (sic) ভাবধারার সঙ্গে আমার পরিচয়লাভের সাহায্য করতে পারেন।[৪] তাহলে ওদের Perspective পাব, বোঝবার এবং বোঝাবার কাজে সুবিধা হতে পারে। এইভাবে স্বাস্থ্যের জন্যে দেশ থেকে নির্ব্বাসনকে কাজে লাগাতে পারব। খুব সাদাসিধে ভাবে ছাত্রের মতো একলা থাকব। হৈমন্তী আর খুকী এখন যদি শান্তিনিকেতনে ঐ বাড়িতে থাকে, ওখানে নানা কাজে ঘরের আবহাওয়ায় আনন্দে থাকবে। যদি ছোঁয়াচের কিছুমাত্র ভয় থাকে আমার পক্ষে এখন দূরে দূরে থাকাই ঠিক হবে। এখনও আমার এমন কিছু অবস্থা হয়নি যাতে শুশ্রূষার জন্যে কারো কাছে থাকা দরকার। খুব আরম্ভের দিক থেকেই পুরোপুরি সাবধান হতে চাই।[৫]

আমার পক্ষে অসহ্য এই যে, যে-কাজে সমস্ত জীবনের সার্থকতা পেয়েচি তাতে বাধা পড়বে। কিন্তু সেরে এসে আবার একদিন কাজে যোগ দেব।[৬]

আমার মনকে খুব শান্ত সবল করেচি।

'মানুষের ধর্ম্ম'-এর একটি প্রবন্ধ আমি এবং একটি হুমায়ুন কবীর তর্জ্জমা করচি। কবীর এখানে এসেছিলেন, আমি করচি দেখে তারও তর্জ্জমার কাজ করতে বিশেষ উৎসাহ হল। তৃতীয় প্রবন্ধ যদি সুরেন বাবু অনুবাদ করেন তো বেশ হত।[৭] পরে সবগুলি আপনি একবার একটুও দেখে দিলে কাজ-চালানোর মতো হয়ে যাবে। এখনও যা সময় আছে তাতে আমি আরো প্রবন্ধের তর্জ্জমা করতে পারব।

এখানে বৃষ্টি নেমেচে তবু সময় ভালোই। পাইন অরণ্যের মধ্যে এই বাড়ি।

আপনার শরীর ভালো নেই শুনে আমরা সকলে উদ্বিগ্ন হয়েচি।

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

প্রণত
অমিয়

---

**টীকা**

১ 'কঠিন' পীড়ার এরকম বিবরণ পেয়েও রবীন্দ্রনাথ খুব বিচলিত হয়েছিলেন ব'লে মনে হয় না। হয়তো বুঝেছিলেন পীড়ার সূত্রে য়ুরোপে যাওয়ার ইচ্ছেটাই প্রবলতর। তাই উত্তরে লিখেছিলেন : 'য়ুরোপে যাওয়া হয়তো ভালোই হবে—তবু তার পূর্বে একবার এখানকার সহজ চিকিৎসা চেষ্টা করে দেখো। ছাঁচি কুমড়োর রস প্রভৃতি পথ্যযোগে বিশেষ উপকারের দৃষ্টান্ত দেখেছি। ...ইতিমধ্যে তুমি যদি বায়োকেমিক সাইলিসিয়া খেয়ে দেখ তাতে দোষ নেই আর সেই সঙ্গে ক্যালকেরিয়া ফস্।'

('চিঠিপত্র' ১১শ, ৬২)। অসুখ সারাতে যিনি ভিয়েনা বা জর্মনী যেতে উদ্যত তাঁকে আপাতত ছাঁচি কুমড়োর রস খেয়ে দেখতে বলাটা হয়তো নির্মম কৌতুক। কিন্তু একথাও ঠিক যে তাঁর সাহিত্য সচিবের মনে য়ুরোপে যাওয়ার ইচ্ছেকে কবি কখনো দমিয়েও দেননি।

২ য়ুরোপীয় হিউম্যানিজম্ আন্দোলনের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের ধর্মমত বিচার ক'রে বই লেখা হ'য়ে না উঠলেও, 'সাম্প্রতিক' নামে তাঁর একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থে এবিষয়ে কিছু লেখা আছে। বইটি দুষ্প্রাপ্য, নাভানা থেকে ১৯৬৩ সালে একটিমাত্র সংস্করণ ছাপা হয়েছিলো।

৩ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করা 'কমলা লেক্চার'গুলি (১৯৩৩-এর জানুয়ারি) নিয়ে 'মানুষের ধর্ম' ছাপা হয়। হিবার্ট বক্তৃতার সঙ্গে সম্পর্ক অবশ্যই আছে, কিন্তু 'মানুষের ধর্ম' প্রকৃতই স্বতন্ত্র গ্রন্থ, *The Religion of Man*-এর বাংলা সংস্করণ নয়। এখানে তাঁর ধর্মমত খুব স্পষ্ট ক'রে বলা হয়েছে। (দ্র. 'রবীন্দ্রজীবনী' ৪, পৃ. ৪৬০ )।

৪ Otto (Rudolf Otto ১৮৬৯-১৯৩৭) ছিলেন ধর্মতত্ত্ববিদ দার্শনিক ; টুইবিঙ্গেনের (Helmuth Von) Glassenapp (১৮৯১-১৯৬৩) ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংস্কৃতবিদ, ভারততত্ত্ব বিশারদ। দুজনেই জর্মান মনীষী। রবীন্দ্রনাথ এঁদের জানতেন।

৫ স্ত্রী-কন্যাকে রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়ে রেখে অমিয় চক্রবর্তী বিদেশে যাওয়ার কথা ভাবছেন। সেখানেই তাঁরা অবশ্য ছিলেন, বাস করতেন রবীন্দ্রনাথের প্রতিবেশী হ'য়ে, কোণার্কের সংলগ্ন মৃন্ময়ী নামে কুটীরে। এখন সে-গৃহের ভিতটুকু শুধু বাঁধানো চাতাল হিশেবে ব্যবহার হয়। হৈমন্তীদেবীকে 'শ্রীভবনে'র পরিদর্শিকার ভার দেওয়া হয়েছিলো। নৃত্যেও তিনি উন্নতি করেছিলেন। অক্সফোর্ডে খবর দিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ : 'হৈমন্তী নাচে বিশেষ একটা কৃতিত্ব দেখাতে পেরেচে। ওর মধ্যে সত্যিকার আর্টিস্ট্ আছে সে জেগে উঠেচে—এই নিয়ে সে খুব আনন্দ পেয়েছে। আমরা চেষ্টা করব ওকে এই পথে যথাসম্ভব এগিয়ে দিতে।' ('চিঠিপত্র' ১১শ, ৬৬)।

৬ বিদেশ থেকে আবার তিনি বিশ্বভারতীতেই ফিরে আসবেন এরকম আগাম প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা চার বছর পরে সম্ভব ছিলো না। বরং দেশে ফেরার আগে থেকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো অধ্যাপক পদের জন্যে তখন তিনি কবিরই সহায়তা প্রার্থনা করেছিলেন। (বর্তমান সিরিজের ৪৯ থেকে ৫৩-সংখ্যক চিঠি দ্র.)।

৭ অমিয় চক্রবর্তীর মতো হুমায়ুন কবিরও (১৯০৬—১৯৬৯) অক্সফোর্ডের স্নাতক, কবি এবং সাহিত্যিক। 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, প্রথম দিকে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে একত্রে। ১৯৪০ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক, পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য হন। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম অনুবাদক ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেনবাবু (সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৮৯৪—১৯৪০)। রবীন্দ্রনাথের বহু অনুবাদ তাঁর করা। *Visva-Bharati Quarterly* সম্পাদনা করেন বহুদিন। 'মানুষের ধর্ম' এঁরা তিনজনে মিলে যদি অনুবাদ ক'রেও থাকেন, সেগুলি কখনও একত্রে বই হ'য়ে বেরোয়নি।

## ১০

October 5 / 34

P & O. S. N. Co.
S. S. Strathnaver [১]

শ্রীচরণকমলেষু,

এই কখানা চিঠি দেশ ছাড়বার আগে তাড়াতাড়িতে আপনাকে দিতে পারিনি।[২] আপনি যদি Airmail -এ পাঠিয়ে দেন তাহলে আমি Oxford -এ পৌঁছবার দু-চার দিনের মধ্যেই চিঠিগুলিও এসে পৌঁছবে। আমি তখন Sadler-এর [৩] সঙ্গে দেখা করব—ওঁর বাড়ির কাছেই আমি থাকি। উনি আপনার ছবির কীরকম ভক্ত বলা যায় না, আপনি যে ছবিখানি ওঁকে দিয়েছিলেন দেশবিদেশের লোককে প্রথমেই সেটি দেখান। ওঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা ক'য়ে জানাব। আধুনিক চিত্রকলা সম্বন্ধে উনি ছোট্ট একখানি বই লিখেছিলেন, ভারি চমৎকার জিনিষ। হয়তো আপনাকে আগেই পাঠিয়েচেন, তবু আমি গিয়ে এক কপি পাঠিয়ে দেব। Rothenstein-এর [৪] সঙ্গেও দেখা হবে—অবণ্‌বাবুর (sic) সঙ্গে আসবার সময়ে প্রদর্শনীর বিষয়ে সব কথা হল। [৫] সব কথা পরিষ্কার ক'রে Rothenstein -কে বলতে বল্‌লেন। এক আমাদের ছবি যাওয়াই উচিত নয়, নয়তো প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবস্থা করা দরকার যাতে আমাদের আর্টিষ্টদের প্রথমেই ঘর থেকে টাকা খরচ করতে না হয়। এরকম বিক্রির সুযোগ আর সহজে হবে না—নানাদেশ থেকে লোক আসবে ছবি কিনতে, যাচাই করতে। পারসিক ছবির প্রদর্শনীর সময়ে বিক্রির জন্য যা কিছু ছবি ছিল অসম্ভব দামে তার প্রত্যেকটি কিনে নেয়। Dr. Royden-এর [৬] বাড়ির ঠিকানা দিয়ে চিঠি দিলাম—পূর্ব্বের চিঠি অন্য সহরে গিয়েচে. এটা ঠিক পৌঁছবে।

কাল পোর্ট সৈয়দে পৌঁছব। জাহাজে অষ্ট্রেলিয়ানদের ভিড়ে বড়ো নিরানন্দে সময় কাটচে। হায়দ্রাবাদের একটি তরুণ অধ্যাপক আর তাঁর স্ত্রী Oxford-এ পড়তে যাচ্চেন, তাঁদের সঙ্গ পেয়ে তবু বেঁচেছি। Dr. Ali 'কে চেনেন। অতি অমায়িক প্রিয়দর্শন দুজনেই —সমস্ত জাহাজের ভিড়ে স্বতন্ত্র। আর সবাই যারা আছে কী ক'রে সময় কাটাবে কিছুতেই উপায় খুঁজে পায় না তাই এত বড়ো আকাশ সমুদ্রের মধ্যে থেকেও উত্তেজনার কেন্দ্র তৈরি ক'রে তার মধ্যে ক্রমাগতই আবর্ত্তিত হচ্চে। দুর্ভাগ্যের বিষয় ভারতীয় যাঁরা আছেন. তাঁদের বেশির ভাগই ঐ চক্রের বাহিরে ঘোরেন, প্রবেশ পান না, তাঁদের অবস্থা আরোই অস্বাভাবিক। একটি ভারতীয় মহিলাও ঐ দলে।

কিছুতেই এবারে মনে শান্তি পাচ্চি না পশ্চিমযাত্রার মুখে। দিগন্তব্যাপী মৃত্যু এবং অনিত্যের ছায়া সমস্ত পশ্চিমদেশের দিকে ছড়িয়ে আছে, মনে হচ্চে যা কিছু প্রাণের যা কিছু আনন্দময় সমস্ত সত্যকার আশ্রয় ছিন্ন ক'রে ঐ দিকে চলেচি। এবারে কী হবে জানি না। এন্ড্রুজ আমার জন্যে কত করেচেন, কিন্তু আর ওভাবে চলতে পারব না,

কোনোমতে নিজের জায়গা তৈরি ক'রে সম্পূর্ণ স্বাধীন না হতে পারলে ওঁর উপর অন্যায় করা হবে। বিদেশে কাজ করতে পারা যায়, আপনাকে দেবার এবং জানবার জানাবার সত্যকার পথ পাওয়াও অসম্ভব নয়, কিন্তু তার সঙ্গে আর্থিক কোনোরকম সংস্রব রাখতে পারা যায় না সেইখানেই ভয়ানক বাধে। অথচ তা করতে হবে। সকাল থেকে রাত প্রত্যহ ক্রমাগত অজানা জনসঙ্ঘে এইভাবে যুদ্ধ করতে ভয় করে। অথচ আজ আর কোনো পথ রাখিনি।

"আবার জাগিনু আমি, রাত্রি হোলো ক্ষয়"—'পরিশেষে'র ঐ কবিতাটি [৮] আমার কাছে সর্ব্বক্ষণ দিনযাপনের মন্ত্রের মতো জাগে। সপ্তর্ষির সঙ্গে আছি, হিমাদ্রির সঙ্গে আছি, অপরিসীম বিস্ময়পূর্ণ ধরণীর প্রাণলোকে আমি আছি। সমস্ত চেতনাকে এমন করে' ব্যাপ্ত ক'রে দেবার মন্ত্র ঐ কবিতাটিতে, নূতন প্রভাতে আবার নূতন ক'রে আপনাকে সমস্তের সঙ্গে মিলিয়ে জানবার এই মন্ত্র। এই ছোট কবিতায় কি সুর দেওয়া যায় না? তা'হলে আমাদের আশ্রমের বৈতালিকে, বুধবারের মন্দিরে ছেলেমেয়েরা প্রায়ই গান করতে পারে। এর কথাগুলি এমন যে ছোট বড়ো সবাই সহজে মনে গ্রহণ করতে পারবে। জাহাজে কত শান্তি পেয়েচি ঐ কবিতাটি মনে মনে আবৃত্তি ক'রে।

আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

অমিয়

---

**টীকা**

১ এ-চিঠি প্রথমবার অক্সফোর্ডে যাওয়ার পথে লেখা নয়। অক্সফোর্ডে ন'মাস থাকার পর, জরুরি কিছু কাজ নিয়ে, দুমাসের জন্যে দেশে ফিরেছিলেন। দুমাস পরে আবার অক্সফোর্ডে প্রত্যাবর্তনের সময় এ-চিঠি স্ট্রাথ্‌নাভার জাহাজ থেকে লেখা। [ভূমিকা দ্র. ]

২ সই ক'রে ডাকে দেবার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে পাঠানো 'কখানা চিঠি' স্পষ্টতই স্যাডলার, ডঃ রয়ডেন, হয়তো আরো কাউকে-কাউকে লেখা। খসড়া তৈরি ক'রে দিয়েছিলেন অমিয় চক্রবর্তী। ১৯৩৩-এর পর থেকে সাহিত্যসচিব ছিলেন না বটে, কিন্তু এ-ধরনের জরুরি কাজ তিনি শেষ পর্যন্ত করেছেন। কবির বক্তব্য জেনে নিয়ে চিঠির বয়ান তাঁকেই প্রস্তুত করতে হ'তো। সই করার আগে রবীন্দ্রনাথ একবার দেখে দিতেন।

৩ কবির সমবয়সী স্যাডলার (Sir Michael Sadler, ১৮৬১—১৯৪৩) শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতের খ্যাতিমান পুরুষ ছিলেন, এ-চিঠি লেখার সময় তিনি অক্সফোর্ডে ইউনিভার্সিটি কলেজের Master বা সর্বাধ্যক্ষ। শিক্ষা কমিশনের ভার নিয়ে ১৯১৭ সালে যখন ভারতে আসেন তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্রালাপ শুরু। প্রকাশক কনস্টেবল কোম্পানিরও ডিরেক্টর ছিলেন। নিজেও কিছু উপন্যাস এবং জীবনীর লেখক। য়ুরোপ ছাড়া ভিন্ন দেশেরও আধুনিক চিত্রকলা বিষয়ে তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিলো। লণ্ডনে ১৯৩৪ সালে আফ্রিকার চিত্রকলা প্রদর্শনী উপলক্ষে *Art*

*of West Africa* নামে যে-বই বেরোয় সেটি ছিলো তাঁরই সম্পাদিত। [ভূমিকা দ্র. ]

৪ Rothenstein (স্যার উইলিয়াম, ১৮৭২—১৯৪৫) ছিলেন লণ্ডনে Royal College of Art-এর অধ্যক্ষ, রবীন্দ্রনাথের বিশেষ গুণগ্রাহী। লণ্ডনে এঁর গৃহেই এক বিদ্বজ্জনসমাগমে (৩০শে জুন ১৯১২) কবি ইয়েট্‌স তখন-পর্যন্ত-অপ্রকাশিত ইংরেজি *Gitanjali*-র কিছু কবিতা সরাসরি পাণ্ডুলিপি থেকে প'ড়ে শুনিয়েছিলেন। তখন থেকেই এই বাঙালি কবির খ্যাতি পশ্চিমদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্কিনী বিদুষী Mary Lago হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রটেন্‌স্টাইন-রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী সম্পাদনা ক'রে প্রকাশ করেছেন।

৫ ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বিরাট 'এম্পায়ার এক্সিবিশনে'র আয়োজন হচ্ছিলো লণ্ডনে। প্রদর্শনীতে 'ভারতীয়' চিত্রকলার নামে কী বস্তু দেখানোর পরামর্শ হচ্ছিলো সে-বিষয়ে অমিয় চক্রবর্তী খোঁজখবর নেন, এবং এবারকার ছুটিতে দেশে ফিরে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে সে-বিষয়ে আলোচনা করেন। এ-বিষয়ে পরে চিঠিতে আরো উল্লেখ আছে।

৬ দেহের পঙ্গুতা নিয়েই নারীস্বাধীনতার জন্যে ইংলণ্ডে আজীবন আন্দোলন করেছেন ড. রয়ডেন (Dr. Agnes Maud Royden, ১৮৭৬— ?)। নারীদের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্যে লণ্ডন থেকে তিনি *Common Cause* নামে পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। রীতি লঙ্ঘন ক'রে চার্চে যাজকের আসন থেকে উপদেশ দেবার অধিকার মহিলাদের মধ্যে তাঁকেই সর্বপ্রথম দেওয়া হয়। এঁর দ্বারা পরিচালিত Guild Hall-এ নিয়মিত বক্তৃতা করতেন ভাবুক লেখক Gerald Heard। গান্ধীজি ড. রয়ডেনকে সাদরে আশ্রমে আমন্ত্রণ ক'রে এনেছিলেন। গোঁড়া খ্রিস্টানদের চোখে ইনি ছিলেন সমাজতন্ত্রের বিপজ্জনক প্রবক্তা। গোঁড়া সমাজতন্ত্রীরা মনে করতেন তিনি আসলে খ্রিস্টান ধর্মের এক ভীরু, 'sentimental apostle'। তাঁকে বলা হয়েছে—'at once a true *woman* and a great *man*'।

৭ Dr. (Hasem) Ali ছিলেন কৃষি-অর্থনীতিবিদ। এল্‌মহার্স্ট এঁকে বিলেত থেকে ১৯৩১ সালে শ্রীনিকেতনে গবেষণা করতে পাঠান। শান্তিনিকেতনে তিনি ছিলেন নিজামেরও প্রতিনিধি। নিজামের দান থেকেই বিশ্বভারতীতে ইস্‌লামিক সংস্কৃতির কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিলো ১৯২৭ সালে। 'আর কোনোখানে' গ্রন্থে লীলা মজুমদার এঁর কথা লিখেছেন : 'লম্বা ফরসা সুদর্শন মানুষটির অমায়িক ব্যবহারে কে না মুগ্ধ হতো। ব্যাচেলার মানুষ, (শ্রীনিকেতনে) পুরনো বাড়ির তিনতলায় তাঁর বাস ছিল, উৎকৃষ্ট একজন পাচক ছিল। মাঝে মাঝে রাতে নেমন্তন্ন করতেন। ...বলতেন উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক নাকি ঐ বাড়িতে রাত কাটিয়েছেন ; নাকি ভূত আছে।'

শান্তিনিকেতনে ইসলামিক ধর্মসংস্কৃতির প্রথম অধ্যাপক, হাঙ্গেরি থেকে আগত, ড: গেরমানুস-এর পত্নী Rózsa Hajnóczy আশ্রমে এই সময়কার ঘটনাবলী অবলম্বনে *Fire of Bengal* নামে একটি উপন্যাস লিখেছেন। সেখানে ড. আলীর একটি অবিশ্বাস্য রকমের কাল্পনিক রোমান্টিক চরিত্র বর্ণিত হয়েছে। অমিয় চক্রবর্তী (ইংরেজি সংস্করণে অতনু রায় নামে) এবং আরো অনেকেই এই উপন্যাসের চরিত্র। বইটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে ঢাকা থেকে, ১৯৯৩ সালে।

৮ 'পরিশেষ' (১৯৩২) গ্রন্থে কবিতাটির নাম "বিস্ময়"।

১৫ই নভেম্বর [ ১৯৩৪ ]

Balliol College [১]
Oxford

শ্রীচরণকমলেষু,

আপনার মাদ্রাজ থেকে লেখা চিঠি (ছবিসুদ্ধ) পেয়ে কীরকম আনন্দ হল বলতে পারি না। [২] মাদ্রাজী খবরের কাগজে বক্তৃতার রিপোর্ট খুব ভালো ক'রে দিয়েচে। আধুনিক সভ্যতার নানা সমস্যার মূল কথা নিয়ে Quarterly-তে এবং অন্যত্র আপনি ইংরেজিতে যা লিখেচেন তা এক সঙ্গে পেলে এদেশে ছাপানো যায়। —তাতে খুব ভালো ফল হবে —এরা সকলেই আপনার মতামত জানতে উৎসুক। যেরকম বুঝতে পারি যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও য়ুরোপে বছর দুয়েকের মধ্যে যুদ্ধ বাধবে প্রায় অনিবার্য্য—এখন Peace Ballot নিয়ে তার বিরুদ্ধে এদেশেও যেরকম আন্দোলন এবং একান্ত উত্তেজনা চলচে তা দেখে ভয় হয়। [৩] আমেরিকায় তবু জোর ক'রে armaments সম্বন্ধে Enquiry এগিয়েচে—এদেশে সকলে মিলে তৎক্ষণাৎ চেপে দিল। যুদ্ধের আয়োজন পুরোপুরি চলচে—Germany যেরকম তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে উঠচে তাতে এদের বুক দুরদুর করচে, এমন যে শত্রু জাপান তার সঙ্গেও ইংরেজ গোপনে সন্ধি করচে, আমেরিকা এতে অপ্রসন্ন হলেও ইংরেজের সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করবে না এই ভরসা এদের আছে ; সবচেয়ে ভয় এদের এই জেনে যে য়ুরোপে এদের আসন টলমল। আকাশে বারুদের গন্ধ লেগে আছে, লোকের মন উতলা হয়ে উঠচে। আশার কথা এই যে জনসাধারণের মন সমস্ত য়ুরোপে ক্রমেই রাজনৈতিক বিভীষিকা, যুদ্ধ এবং মৃত্যুর চরম পাশবিকতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠচে, তাদের বঞ্চনা করা আর সোজা হবে না। যদিবা যুদ্ধ বাধে এবং প্রথমটা একদল লোক উত্তেজনার মুখে যোগ দেয় তাহলেও বেশিদিন মৃত্যুর ব্যবসা কোনো দেশই চালাতে পারবে না। G. D. H. Cole, Wells, Huxley প্রভৃতির সঙ্গে প্রায়ই এবারে কথাবার্ত্তার সুযোগ হয়েচে, [৪] তাঁদের মত যুদ্ধ যে কারণে যে-ভাবেই বাধুক, শেষটা যুদ্ধ গিয়ে দাঁড়াবে Civil War-এ, কেউ তা ঠেকাতে পারবে না। ইতিমধ্যে Russia সত্যি সত্যিই গড়ে উঠেচে। আজকে League of Nations-এ তার বড়ো প্রতিষ্ঠা। Europe-এ বৃহৎ যুদ্ধের ফলে Communal Republic গ'ড়ে ওঠার সম্ভাবনা। [৫] ভিতরের দিক থেকে কোন দুর্ব্বলতা, কোন ক্ষতের জন্যে য়ুরোপ আজ এই জায়গায় এসে পৌঁছেচে, সমস্ত এশিয়াকেও এই জালে জড়াতে চাচ্চে, তাদের পরাশ্রিত সভ্যতা এশিয়াকে এবং নিজের দেশের জনসাধারণকে কীভাবে ব্যবহার করার জন্যে এদের এত শক্তি এত Sanity এদের রক্ষা করতে পারচে না—সেই কথা এরা এখনও ঠিক বুঝতে না পারায় বাহির থেকে আলো পেতে উৎসুক হয়েচে। আপনি দুইদিক দেখে যা বলচেন তার থেকে ওরা দৃষ্টি পাবে। [৬] খুব ভালো হবে যে আপনার Murray-কে লেখা Open Letter শীঘ্রই

বেরোবে।[৭] এঁরা সবাই মনে করচেন এতে য়ুরোপে বড়োরকম সাড়া পড়ে যাবে। তা ছাড়া White Paper তো বেরোলো ব'লে [৮]—এই সময়ে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এদের ঔৎসুক্য প্রবল হয়ে উঠচে—আপনার চিঠি ঠিক সময়ে দেখা দেবে।

গল্পের তর্জ্জমা চলচে [৯]—Publisher দুএকজনকে বলে রেখেচি—next spring -এর আগে বের করা সঙ্গত হবে না এই এদের মত। তখন আসবে Book Season —এখন বেরোলে বই চাপা পড়ে যাবে। Macmillan-এর বিশ্বাস আপনার ছোটগল্পের বই অনেকটা চাপা পড়ে গিয়েচে ভুল Season-এ দ্রুত বেরোনোর জন্যে। *Gora*ও বেরিয়েছিল ঠিক Somme-এর যুদ্ধের সময়, তখন ইংরেজের আকাশ অন্ধকার, ঐ প্রবল দুর্দ্দিনে ওরা কোনো বাহিরের বই নিতেই পারেনি। আমি Daniel Macmillan, Thompson, Unwin সবাইয়ের সঙ্গে আপনার ইংরেজি বইয়ের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেচি।[১০] সকলেরই মত সব প্রথমে আপনার Revised & Collected Poems বের করা। তার কিছুদিন বাদে Collected Short Stories। তার পরে *Gora*-র revised edition, এখন নয়। Poems যে-কোনো সময়ে বেরোতে পারে, এমন কি February-তে। Short Stories April-এ এবং ঠিক তার পরেই অন্য কোনো Publisher ( কারণ 'চার অধ্যায়ের' ইংরেজি Macmillan-এর কাছে দিতে চাই না ) 'চার অধ্যায়' উপন্যাস বার করবে। আমি translation করচি—Christmas-এর ছুটিতে এক মাস লণ্ডনে থাকব, সেই সময়ে দুএকজন ভালো লেখক বন্ধুকেও দেখাবো। ইতিমধ্যে আপনার কবিতার বই Macmillan-কে পাঠাতে বলেচি আমার কাছে, সবটা একসঙ্গে পড়ে এবং অন্যকে দেখিয়ে তার থেকে Selection করা সম্বন্ধে আমার, Thompson-এর এবং অন্য দুএকজনের suggestion পাঠাব। কিন্তু এই যে Revision এবং Selection হবে এ আপনাকেই করতে হবে—এবং একমাত্র আপনারই হাত থেকে Public-কে দিতে হবে। আমরা suggestion দিতে পারি মাত্র। আমার প্রথম suggestion এই যে *Gitanjali, Gardener, Crescent Moon* এই তিন বইয়ের order এবং সমগ্রতা না ভাঙা। Collected Volume-এর প্রথমেই এই তিনটি বই আসুক। বাকি ক'টি বইএর কবিতা *Fruit Gathering, Lover's Gift & Crossing, Fugitive* (এবং *Stray Birds* ও *Fireflies* থেকে কিছু ) এক হয় Chronologically ( according to date of Bengali publication ) নয়তো মোটামুটি বিষয় হিসাবে ভাগ করতে হবে। তার মধ্যে নূতন কিছু কবিতা (যা Quarterly-তে বেরিয়েচে বা V. B. News, Modern Review ইত্যাদিতে) কিছু মিশিয়ে দেওয়া যাবে। (*Gitanjali* এবং *Crescent Moon*-এ দুএকটা কবিতা দুবার ক'রে আছে—তার অবশ্য একটা করে থাকবে।)[১১]

এই Poems-এর Volume আপনি নিয়ে বসলে শীঘ্রই তৈরি হবে। Textual Change কারো সাহস নেই যে suggest করে। আপনি একবার প'ড়ে গেলে যদি ইচ্ছে হয় বদল করবেন। Yeats যদি December-এ London-এ আসেন তাঁর copy-তে

কোনো suggestion আছে কিনা জেনে নেব। আরো দুএকজনকে জিজ্ঞাসা করব। Andrews তো ভারতবর্ষ চললেন। জানুয়ারির মাঝামাঝি ফিরবেন, তিনি যদি সঙ্গে ক'রে copy নিয়ে আসতে পারেন তো বেশ হয়। নয়তো তার পরে এখানে পাঠিয়ে দেবেন।

ইংরেজি Short Stories সম্বন্ধে সব গল্প ভালো ক'রে প'ড়ে এবং expert advice নিয়ে তার পরে আপনাকে আমাদের যা মনে হয় জানাবো। *আরো দুএকটা নূতন গল্প কিন্তু যোগ হওয়া দরকার।* তা না হলে public-কে তেমন ক'রে টানা যাবে না—লোকে আপনার কাছ থেকে নূতন ক'রে কিছু পেতে উৎসুক। **"তপস্বিনী"** প্রভৃতি গল্প ( তা ছাড়া **"গল্পগুচ্ছে"ও তো অনেক আছে** ) এমন কি 'দুই বোন'ও যেতে পারে। আপনার হাতে যদি হয় তবেই সব সার্থক হবে। আপনি যদি প্রথমটা মুখে মুখে dictate ক'রে তারপর verbatim typed কপি নিয়ে ব'সে লেখা গ'ড়ে তোলেন তাহলে সহজে এবং সম্পূর্ণ নূতন রূপে গল্পগুলি দেখা দেয়। আমি জালে জড়িয়েছি, সময় একটুও পাই না, তা না হলে প্রথম খসড়া যেমন ক'রে হয় অনেক জমা ক'রে পাঠাতাম। কোনো একদিন পরে করবই।

আপনার ইংরেজি প্রবন্ধ একত্র একবার পাওয়া দরকার। Unwin-রা বলচে Andhra Lectureগুলি [২] আরেকটু বড়ো ক'রে, বা তাতে নূতন ঐ বিষয়ের প্রবন্ধ যোগ ক'রে তবে বইয়ের আকার দেওয়া চলে। তা না হলে ঠিক পৌঁছবে না—বিশেষত *Religion of Man* -এর পরে।

ইতিমধ্যে General Smuts এর [২] সঙ্গে অনেক কথা হয়েচে, তিনি বিশেষ ক'রে আমাকে বললেন আপনাকে কত তিনি শ্রদ্ধা করেন। আপনার প্রত্যেক লেখা তিনি পড়েচেন—এই কথা আপনাকে জানাতে। তিনি শান্তিনিকেতনের জন্যে যে ফোটো দিয়েচেন তা Andrews সাহেবের হাতে দিয়েছি, তিনি সঙ্গে নিয়ে যাবেন। Visvabharaṭi authority-র তরফ থেকে রথীবাবু নিজে যদি দুলাইন acknowledge করেন তো বড়োই শোভন হয় এবং সকলে সুখী হন। Gen Smuts এরোপ্লেনে আজ Africa-র দিকে চ'লে গেলেন। এখানকার debate-এর মজার একটা cutting পাঠাচ্চি। এই বিষয়ে আমাদের কলেজের ছাত্র ছাত্রীর বাকযুদ্ধ চলতে পারে। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

অমিয়

---

**টীকা**

১ দেশে দুমাস ছুটি কাটিয়ে অক্সফোর্ডে ফিরে গিয়ে অমিয় চক্রবর্তীর প্রথম চিঠি।

২ অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'Man' নামে তিনটি বক্তৃতা পাঠ করেন। আডায়ার থেকে সেই সময়ে লেখা চিঠি। (দ্র. 'চিঠিপত্র' ১১শ, ৬৯)। রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে খোঁজ নিতে

বলেন বিলেতে আনউইনরা বক্তৃতা তিনটি নতুন ছোট বই ক'রে ছাপতে রাজি কিনা। তাছাড়া উল্লেখ ছিলো যে ম্যাকমিলানরা তাঁর সব অনুবাদ-কবিতার একত্র সংগ্রহ ছাপানোর প্রস্তাব করেছেন, এবং Pearson-এর অনূদিত *Gora* (১৯২৪) উপন্যাসের নতুন সংস্করণে অনুবাদটি মেজে-ঘ'ষে দিতে রাজি হয়েছেন অক্সফোর্ডে ইতিহাসের অধ্যাপক এডোয়ার্ড টমসন।

৩ যুদ্ধবিরোধী বেসরকারি সংস্থা Peace Ballot-এর নেতৃত্বে ছিলেন রেভারেণ্ড Dick Shephard। Peace Pledge Union-এর কোয়েকাররা এবং Fellowship of Reconciliation-এর সদস্যরাও আন্দোলনে যোগ দেন। এঁদের প্রতি বর্নার্ড শ'র সমর্থন ছিলো, এবং গান্ধীজির সঙ্গেও এঁদের যোগ ছিলো।

৪ G. D. H. Cole (১৮৮৯—১৯৫৯) ছিলেন অক্সফোর্ডে অর্থবিদ্যার অধ্যাপক ও উৎসাহী সমাজতন্ত্রী লেখক। Guild Socialism এবং *New Statesman* পত্রিকার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ছিলো। বার কয়েক Fabian Society-র চেয়ারম্যান হয়েছেন। গোয়েন্দাগল্পও কিছু লিখেছেন।

H. G. Wells—৩য় চিঠির ২য় টীকা দ্র.।

Huxley —মনে হয় অল্‌ডাসের (Aldous Huxley) বামপন্থী জ্যেষ্ঠভ্রাতা জুলিয়ান (১৮৮৭—১৯৭৫), অমিয় চক্রবর্তীর বেলিয়ল কলেজেরই প্রাক্তন স্নাতক, রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউশনের Fullerian প্রফেসর, বিজ্ঞান বিষয়ে খ্যাতিমান লেখক।

৫ সম্মিলিত য়ুরোপ গঠনের সেই সম্ভাবনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রায় পাঁচ দশক পরে বর্তমানে সফল হ'তে চলেছে।

৬ য়ুরোপের জাতিসংঘর্ষকে রবীন্দ্রনাথ যতটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখছিলেন তাতে আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত কোনো পক্ষকেই দোষী বা নির্দোষ বলা তাঁর পক্ষে কঠিন ছিলো। 'চিঠিপত্র' ১১শ খণ্ডে প্রাসঙ্গিক চিঠিগুলি দ্রষ্টব্য।

৭ মারে—(Sir Gilbert Murray, ১৮৬৬—১৯৫৭) ছিলেন অক্সফোর্ডে প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের সম্মানী Regius প্রফেসর। তাঁর ইউরিপিদেস তর্জমা বিশেষ সুখ্যাতি পেয়েছিলো। লীগ অব নেশন্স-এর Committee on Intellectual Cooperation-এরও তিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন। মনুষ্যত্বের আদর্শ মেনে কী উপায়ে প্রাচী-প্রতীচীর পারস্পরিক সদ্ভাব ও আনুকূল্যের বিকাশ সম্ভবপর সে-বিষয়ে, এই সংস্থার উদ্যোগে, মারে ও রবীন্দ্রনাথের পত্রাকারে দুটি লেখা নিয়ে *East and West* নামে পুস্তিকা প্রকাশ হ'তে যাচ্ছিলো। এই পুস্তিকা প্রকাশের ব্যাপারে অমিয় চক্রবর্তীর অনেকটা দায়িত্ব ছিলো। বিক্ষুব্ধ হতাশায় প্রতীচীর দিক থেকে ভারতবর্ষ যখন মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলো, সেই সংকটকালে এই পুস্তিকার প্রকাশ ছিলো বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। [ভূমিকা দ্র.]

৮ লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকের পর, ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রস্তাব ক'রে এই While Paper প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রস্তাবটি আইনে পরিণত হয় আরো দশ মাস পরে। রবীন্দ্রনাথ ও অমিয় চক্রবর্তীর অনেক চিঠিতে এ-বিষয়ের উল্লেখ এবং মন্তব্য আছে।

৯ 'গল্প' টি 'চার অধ্যায়', ছোটোগল্প নয়, পুরো মাপের উপন্যাসও নয়, novelette বা ছোটো উপন্যাস। 'চিঠিপত্র' ১১শ খণ্ডে ৬৯-সংখ্যক চিঠিতে (২৩ অক্টোবর

১৯৩৪) দেখা যায় —'হাত চালিয়ে' অমিয় চক্রবর্তীকে অনুবাদটা শেষ করতে বলছেন রবীন্দ্রনাথ। এই অনুবাদের বিস্তৃত বিবরণ ভূমিকায় দ্র.।

১০ ম্যাকমিলান ও আনউইনরা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিলিতি প্রকাশক।
(Edward) Thompson (১৮৮৬—১৯৪৬) ইংরেজ 'মাইনর' বা ছোটো মাপের কবি ও ঔপন্যাসিক। এক সময়ে বাঁকুড়া ক্রিশ্চান কলেজের মিশনারি অধ্যক্ষ এবং এদেশ থেকে *Manchester Guardian* পত্রিকার সংবাদদাতা ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উপর সে-সময়ে দুটি গ্রন্থ লেখেন। ভুলভ্রান্তি থাকার ফলে প্রথমটির ( YMCA, ১৯২১) প্রচলন অচিরাৎ নিজেই বন্ধ ক'রে দেন। *Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist* (১৯২৬) নামের দ্বিতীয় গ্রন্থটি প্রকাশ করেন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস। 'প্রবাসী' ১৩৩৪-এর শ্রাবণ সংখ্যায় 'শ্রীবাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়' ছদ্মনামে রবীন্দ্রনাথ নিজেই এ-গ্রন্থের এক তীব্র সমালোচনা লিখেছিলেন। বইটি বিষয়ে অমিয় চক্রবর্তীর মন্তব্য : 'এই বইখানির প্রথম দোষ এই যে তিনি বাংলা প্রায় জানতেন না—ছাত্রদের সাহায্যে তর্জমা ও ভাষ্যের অনধিকার দায়িত্ব নিয়েছিলেন।' —(বর্তমান লেখককে চিঠি, ১৯৭৭)

১১ Collected Poems ছাড়াও ছোটোগল্প ও প্রবন্ধের অনুবাদ একত্র ক'রে আরো দুটি সংগ্রহ প্রকাশের প্রস্তাব করেন অমিয় চক্রবর্তী। এ-বিষয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা চিঠিপত্রের বর্তমান সিরিজে ছড়িয়ে আছে। নিজের অনুবাদ 'revise' করার প্রস্তাব তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই। তাঁর ইচ্ছে ছিলো আর কেউ করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদের মার্জনা বা তা থেকে ভালোমন্দ বাছাই করার দুঃসাহস কারো ছিলো না, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বললেও না। [ভূমিকা দ্র. ]

১২ বক্তৃতা তিনটি রাধাকৃষ্ণানের আগ্রহে শেষ পর্যন্ত অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই *Man* (১৯৩৭) নামে প্রকাশিত হয়।

১৩ General Smuts (১৮৭০—১৯৫০) তখন দক্ষিণ আফ্রিকার বিচার বিভাগের মন্ত্রী, পরে হন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের কোনো হেতু জানা যায় না। 'রিলিজন্ অব ম্যান্' প'ড়ে লিখেছিলেন—সেটি একটি 'great prose poem on God and man' (রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ)। কিন্তু বইটি তাঁকে কেন এন্ড্রুজের কাছে ধার ক'রে পড়তে হয়েছিলো তা জানা নেই।

## ১২

Nov 29. / 34

Balliol College
Oxford

শ্রীচরণকমলেষু,

আপনার বড়ো চিঠিখানি পেলাম।[১] কবিতার তর্জ্জমা এদেশে ছাপাতে বিশেষ লোভ হচ্চে, অনুমতি দেন তো ঐ তিনটি গান কোনো কাগজে ছাপাই।

'চার অধ্যায়' প্রায় শেষ ক'রে এনেচি। একজন Shorthand typist নিযুক্ত করেচি তাতে কাজ দ্রুত এগোচ্চে। এখন term-এর শেষ মুখে বিষম নানা কাজের, সামাজিক দাবীর ভিড়; আর সাত আটদিন পরেই এখান থেকে পালাব। লণ্ডনে খুব নিরালায় থাকা যায়, সেইখানে মাজাঘষা ক'রে আপনার কাছে লেখা পাঠিয়ে দেব। এদেশের লেখক বন্ধু দু'একজন দেখে যা বলেছেন তাতে খুবই উৎসাহ হচ্চে। এর একটি ছোট ভূমিকা দরকার হবে। আপনি ভূমিকা স্বরূপে লিখেচেন এভাবে না হয়ে চিঠির আকারে যদি casually লেখেন তাহলে তার থেকে extracts জুড়ে ছোট একটি ভূমিকা তৈরি করব। Misinterpretation যে হতে পারে সেদিকে emphasis না দিয়েও কেন বাংলা version এখন ছাপাননি এবং সেই সঙ্গে এই গল্পের মূল কথাটুকু দুএক লাইনে আপনি যদি আমাকে লিখে পাঠান তাহলে বড়ো ভালো হয়। Gollancz-কে দিয়েই ছাপাব ভাবচি এবং বই বেরোবার আগে advance copy পাঠিয়ে এদেশের বুদ্ধিসুদ্ধিওলা দুএকজন লেখককে দিয়ে বইয়ের ভিতরের কথা বলাব। একটুকু সামান্য ভিতরের সুর ধরিয়ে দিলে এদের পক্ষে সুবিধে হয়, এই গল্প যে এদের মর্ম্মে প্রবেশ করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এখনো অবধি একটুও জানাজানি হতে দিইনি, এবং বেরোবার ঠিক পূর্ব্বে পর্য্যন্ত হতে দেব না। এন্ড্রুজ সাহেবকেও বলিনি কেননা এটা তাঁর ক্ষেত্র নয় এবং তিনি এখন অন্য কাজে নিযুক্ত।[২] আমার মনে হয় ইংরেজিতে গল্পের রস মাটি হবে না। আপনার কাছ থেকে সাহস পেয়ে একটু মন খুলে অনুবাদ করচি—শেষে আপনি দেখে দিলে তবে প্রকাশ করতে সাহস পাব। ডিসেম্বরের শেষের দিকে সবটা একেবারে তৈরি হয়ে আপনার হাতে পৌঁছবে।

Macmillan-এর জন্যে ইংরেজি কবিতার collected edition সম্বন্ধে আপনাকে লিখেচি। আমি যা শক্তিতে কুলোয় সেইমতো আমার suggestion আপনাকে পাঠাব। Dramatic poems বোধহয় এক বইয়েরেই আলাদা section-এ একত্র করতে হবে। অনুবাদ ( যেমন বৈষ্ণব কবির ; দ্বিজেন্দ্রলাল বা সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা থেকে ) আপনার Collected Poems থেকে বাদ দিতে হবে মনে হয়।[৩] ...যাই হোক, আমার কাজ শেষ হলে একসঙ্গে জানাব। আমার ইচ্ছে একবার A. E.-র সঙ্গে এই নিয়ে দুএক ঘণ্টা বসব[৪] —তিনি এখন লণ্ডনে, তাঁর মন ভারি সহজ এবং গভীর। Yeats-এর সঙ্গে এখন দেখা হবে না, জানুয়ারির পরে একবার Ulster-এ যাব বক্তৃতার জন্যে সেই সময়ে Free States-এ গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা ক'য়ে আসতে পারি। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই বই তৈরি করায় তাঁর পরামর্শ দরকার নেই।

পরের বছরের শেষে আপনার সমস্ত drama এক volume-এ এবং সমস্ত ছোট গল্প আরেক volume-এ ছাপাবার কথা বলে রেখেচি। তার পরের বছর spring-এ আপনার সমস্ত গদ্য প্রবন্ধের একটি সংগ্রহ। এইভাবে এগোলে খুব ভালো sale হবে, এবং final authoritative edition public-এর হাতে তুলে দেওয়া যাবে।

আপনার ছবির exhibition সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কিছু লিখিনি।[৫] তার কারণ আমরা

অনেকরকম negotiations-এ নিযুক্ত আছি। Leicester Gallery-র Mr. Brown-এর সঙ্গে কথা হয়েচে, তার পরের বছর সম্বন্ধে definite offer দেবে। Sir Michael Sadler-এর সবচেয়ে পছন্দ ঐ Gallery ; এবং তারাও অত্যন্ত উৎসুক—কেবল অনেক আগে থেকে ওদের ঘর engaged হয়ে থাকে এই মুস্কিল। Rothenstein-এর সঙ্গে আরো একটু বড়ো রকমের প্রস্তাব চলচে। ব্যবস্থা একটু এগিয়ে গেলে জানাব।

Rothenstein একটা কথা আপনাকে, অবণবাবুকে (sic) এবং নন্দবাবুকে বিশেষ ক'রে জানাতে বলচেন।[৩] আমি তাঁদের আলাদা করে' লেখার সময় পাব না এই Mail-এ, কারণ এখুনি ডাক যাবে, কিন্তু আপনি যদি এক কথা তাঁদের জানিয়ে দেন। এই যে Mr. Solomon ভদ্রলোকটি India Office-এর সঙ্গে এবং আমাদের স্বদেশের Bottomley প্রভৃতি ব্যক্তির সঙ্গে যোগ দিয়ে বাংলার art-কে অপদস্থ ক'রে এদেশে Bombay Art School-এর propaganda এদেশের কাগজে চালাচ্চেন এবং এই যে Empire Exhibition খাড়া করচেন, এর সঙ্গে Rothenstein-এর কিছুমাত্র যোগ নেই। তাঁকে এরা একদিন একবারও consult করেনি, কিছু জানায়নি। Solomon এখন Havell, অবণবাবু (sic) আপনার এবং Rothenstein-এর বিষয় এবং এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষ বিষয়ে অত্যন্ত খারাপ ভাবে propaganda করচেন। যেখানেই ভারতীয়েরা নিজেরা কিছু করতে গেছে সেখানেই তারা অকৃতকার্য্য হয়েচে এবং Bombay School-এর মতো যারা ইংরেজ পদ্ধতি মেনে ধীরে ধীরে এগিয়েচে তারা তবু ভদ্ররকম আঁকচে, লিখচে—এই হলো এদের বুলি। Rothenstein মনের দুঃখে কথাই বলতে পারছিলেন না।— এ দেশের সত্যিকার art critic Michael Sadler, Clive Bell, Eric Gill, Herbert Read প্রভৃতিকে আমরা সব কথা বুঝিয়ে দিচ্চি, তাই ১০ই ডিসেম্বর যখন exhibition খুলবে তারা আমাদের যা তা ছবি দেখে আশ্চর্য্য হবে না, বুঝে সুঝে লিখবে।[৭] যাই হোক, Rothenstein খুব খুশি যে আমাদের শান্তিনিকেতনে সবাই এবং অবণবাবু (sic) সব কথা আগেই বুঝেচেন। তাঁর মতে ওদের ঐ propaganda-র উত্তর দেওয়াও undignified হবে—ওদের official গলার জোর বেশি, যত ইচ্ছে ভুল কথা বলুক। তিনি নিজে নিরুত্তর থাকবেন, exhibition-এ যাবেন না, এবং আমাদের দিক থেকে complete indifference—এই একমাত্র উত্তর। Havell নেহাৎ ভালো লোক, এই বয়সে তাঁকে এইভাবে আমাদের জন্যে অপমান সইতে হল এটা দুঃখের কথা। কিন্তু এ ঝড় ব'য়ে যাবেই। বাংলা এবং বোম্বাই নিয়ে আমরা বিদেশের সামনে প্রাদেশিক রেশারেশির (sic) প্রহসনে যোগ দেব এই ফাঁদ পেতেচে—কিন্তু সেখানে কেউ পা দিচ্চি না।

মোহনলাল দুদিন আমার কাছে এল, বড়ো নম্র ভালো ছেলে ; খুব ভালো আছে, বেশ পড়াশোনা করচে London-এ অবণবাবুকে (sic) একটু জানাবেন।[৮] এখন Hampstead-এ আছে ভালো জায়গায়, ঐ পাড়ার আমার দু-একটি বন্ধুকে জানিয়েচি, তারা ভালো ইংরেজ পরিবারে ওকে নিমন্ত্রণ করবে। য়ুরোপীয় সঙ্গীত ভালো ক'রে জানতে

চায়, তাই সে ব্যবস্থাও করেচি, এরি মধ্যে দু-এক বাড়িতে ডেকে নিয়ে তাকে piano শুনিয়েচেন। তার ব্যবহারে সবাই তাকে ভালোবাসেন। Thompson-এর কাছেও নিয়ে গিয়েছিলাম।

Dr. Maude Royden এরোপ্লেনে ভারতবর্ষে যাচ্চেন Women's Conference-এর জন্যে—Andrews ঠিক সময়ে আপনাকে জানাতে পারবেন, তাঁকে একবার আশ্রমে নিমন্ত্রণ করলে ভালো হবে। আপনার message উনি Guildhouse Sermon-এ পড়ে শুনিয়েছিলেন, তাছাড়া আপনার Philosophy of life সম্বন্ধে সুন্দর ক'রে বললেন। আমার বিশ্বাস খুব কম লোকই আপনাকে অত ভালো করে বুঝেচেন।[৯]

Prof. Murray এ দেশে হঠাৎ আক্রমণের চক্রান্তে পড়ে বিশেষ কষ্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্চেন। Peace Ballot নিয়ে Simon, Baldwin, Chamberlain প্রভৃতি ধুরন্ধর politician ওঁকে ঘিরে ধরেচে[১০]—উনি League of Nations Union-এর President। অথচ Peace Ballot-এর মতো এমন সহজ স্বাভাবিক খাঁটি appeal আর কী হতে পারে? আসল কথা U.S. A.-র মতো এ দেশেও শেষে জনসাধারণ arms enquiry-র জন্যে ক্ষেপে ওঠে এই হল দোষী Government-এর ভয়। স্বয়ং রাজপুত্র থেকে আরম্ভ ক'রে এঁরা সকলেই এতে জড়িত—তিনি গিয়েছিলেন দক্ষিণ আমেরিকায় এই সব কাণ্ডে সাহায্য করতে। U. S. A. Enquiry-তে সে বিষয়ে দু-চারটে কথা বেরিয়ে পড়েচে। যাই হোক, Prof. Murray-র উদ্দেশ্য কেবলমাত্র এই যে দেশের লোককে যুদ্ধ সম্বন্ধে সচেতন করা চাই, কিছুতে তারা যাতে নরঘাতে যোগ না দেয় তার ব্যবস্থা পাকা করচেন। আপনার আর তাঁর চিঠি শীঘ্রই যাতে বেরোয় এ নিয়ে উনি Paris-এ লেখালেখি করচেন কারণ আপনার চিঠি তাঁকে কী গভীর নাড়া দিয়েচে বলা যায় না। এখন যে কোনোদিন বই বোরোবে;[১১] আপনাকে তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দেব।

সঙ্গের cuttings Andrews সাহেবকে পাঠিয়ে দেবেন। তাঁর ঠিকানা জানি না। একদল ইতিমধ্যেই Miss Mayo-কে দিয়ে লিখিয়েচে, এবং বলা বাহুল্য Cornelia Sorabji এখন London-এ হাজির।[১২] তিনি ভারত সম্বন্ধে অতি বাজে বই ঠিক সময়ে বার করেচেন—তার review পাঠালাম। এগুলি আপনি পড়বেন না—দেখাবারই যোগ্য নয়। Andrews একবার দেখলে ভালো, তিনি এই নিয়ে কিছু তৈরি হয়ে থাকতে পারবেন Broadcast talk-এর জন্যে। আমাকে এখন প্রায়ই London যেতে হচ্চে। এ সময়ে চুপ করে থাকা যায় না। কোনো তর্কের মধ্যে, বিশেষত যেখানে তর্ক মানে deliberate অন্যায় করবার ইচ্ছে—একটুও ঢুকি না, কিন্তু নানা জায়গায় বক্তৃতা দিতেই হয়। যদি তেমন অবস্থা দাঁড়ায় Churchill, O'Dwyer-এর দল[১৩] বেশি রকম active হয়ে এ দেশের intellectual-দেরও টানে তা হলে কিছুদিন সব ছেড়ে সত্যি কথা বলবার ভার নিতে হবে।[১৪] কেননা, intellectual যারা তারা এখনো আমাদের একটু বিশ্বাস শ্রদ্ধা করে। আমরা যারা এখানে আছি কীই বা করতে পারি—নিজের শক্তির দৈন্যে লজ্জা পাই, কিন্তু লজ্জা পাবারও সময় নেই, যেটুকু যেখানে করতে পারি শান্তভাবে করতে

চাই। ভয়ানক তাড়াতাড়িতে লিখলাম অনেক কথা বলতে চেয়েছিলাম কিছুই বলা হল না। পরের মেলে লিখব। আপনার চিঠি এ দেশে পেলে প্রাণ ফিরে পাই। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন।

অমিয়

আশা করি *New Statesman* ঠিক মতো যায়? জাহাজের ডাকে General Smuts-এর একখানি বই পাঠাচ্ছি।।[১৭] —অ

---

টীকা

১ রবীন্দ্রনাথের এই 'বড়ো চিঠি'-র তারিখ ১৫ নবেম্বর। ('চিঠিপত্র'১১শ ৭০ দ্র.) ভারত শাসন আইনের বলে ইংরেজের হাত থেকে কতটা কী ক্ষমতা হস্তান্তর হবে তা নিয়ে দেশে তখন প্রবল উত্তেজনা চলছে। তীব্র আক্ষেপ জানিয়ে এ-চিঠিতে কবি লিখেছিলেন : 'দেশকে কোন দিক থেকে রক্ষা করতে হবে আমার তরফ থেকে এ-প্রশ্নের উত্তর এই গ্রামের কাজে। ...এতদিন পরে মহাত্মাজি হঠাৎ এই কাজে পা বাড়িয়েছেন। ...অনেক আগে শুরু করা উচিত ছিল।'

Collected Poems-এর আগে একখণ্ড চয়নিকা (Selected Poems) প্রস্তুত করা বিষয়ে অমিয় চক্রবর্তীর প্রস্তাব মেনে নিয়ে আপাতত তাঁকে 'চার অধ্যায়'-এর অনুবাদ শীঘ্র শেষ করতে বলেছিলেন। সরকারি রোষে নিষিদ্ধ হ'তে পারে ভেবে বাংলা 'চার অধ্যায়' বই ক'রে ছাপানো বিষয়ে তখনো তিনি মনস্থির করতে পারেননি। আগে তাই লণ্ডনে এর একটি অনুবাদ ছাপিয়ে দেবার কথা ভাবছিলেন। ইংরেজের স্বদেশে গ্রন্থপ্রকাশের স্বাধীনতা অনেক বেশি।

২ কখনো-কখনো কবিতা লিখলেও এন্ড্রুজের নিজের ক্ষেত্র ঠিক সাহিত্য ছিলো না, যদিও সাহিত্য বিষয়েও তাঁর মতামত কবির কাছে গুরুত্ব পেতো।

৩ *Fireflies* (১৯২৮) নামে কবিতা-কণিকা সংগ্রহ বাদ দিলে, ম্যাকমিলান-প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের শেষ দুটি স্বতন্ত্র কাব্যগ্রন্থের নাম—*Lover's Gift and Crossing* (১৯১৮) এবং *Fugitive* (১৯২১)। দুটি গ্রন্থেই কবির অনুবাদে বেশ কিছু অন্যের রচনা ছাপা হয়েছিলো। কেন, তা বলা কঠিন। *Collected Poems and Plays* থেকে নিজের বহু কবিতার সঙ্গে এ-সব রচনাও বর্জিত হয়েছে। [ভূমিকা দ্র. ]

৪ 'Æ'—আইরিশ কবি জর্জ রাসেল-এর (George Russell, ১৮৬৭-১৯৩৫) সাহিত্যিক ছদ্মনাম। কবি হিশেবে উত্তম না হ'লেও নিরহঙ্কার সাধু প্রকৃতির ভাবুক ছিলেন তিনি। কৈশোর থেকেইয়েটস-এর বন্ধু ছিলেন। খুবই গুণগ্রাহী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের, কিন্তু উভয়ের কখনো সাক্ষাৎ হ'য়েছে ব'লে শোনা যায়নি।

৫ রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে স্যর মাইকেল স্যাডলার লণ্ডনে লিস্টার (Leicester) গ্যালারিতে কবির চিত্রকলা প্রদর্শনীর আয়োজন করতে চেয়েছিলেন। নানা কারণে সম্ভব হয়নি।

৬ 'এম্পায়ার এক্সিবিশনে'-র সুযোগ নিয়ে ভারতের প্রাদেশিক মনোমালিন্য আরো খানিকটা উস্কে দেবার 'অপচেষ্টা চলছিলো লণ্ডনে।'

অবণবাবু—অবনীন্দ্রনাথ (বানানে বারবার মূর্ধন্য-ণর ব্যবহার কৌতুকজনক)।

নন্দবাবু—নন্দলাল বসু।

Bottomley—তখন বাংলার Director of Public Instruction।

শ্রী শোভন সোম জানিয়েছেন ('দেশ', ২৫ জানুয়ারি ১৯৯২) : প্রথম মহাযুদ্ধের সৈনিক ও পরে ভারতের এডুকেশন সার্ভিসের সদস্য হ'য়ে ১৯১৯ সাল থেকে বম্বাই জে. জে. আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ Solomon (William E. G. Solomon, ১৮৮০—১৯৬৫), লণ্ডনে আগেও একবার বম্বাই স্কুলের চিত্রপ্রদর্শনী করেছিলেন। চৌরঙ্গী স্কুলের ছবির প্রতি বিশেষ বিরাগ ছিলো তাঁর। 'বাঙলার প্রতিপক্ষ হিশেবে বোম্বের শিল্পীদের' তিনি এগিয়ে দিয়েছিলেন। বই আছে—*Bombay Revival of Indian Art* (১৯২৪)।

Clive Bell (১৮৮১—১৯৬৪)—নামকরা ইংরেজ শিল্পসমালোচক। শিল্পবিচারের ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম 'significant form' কথাটার প্রয়োগ করেন।

Eric Gill (১৮৮২-১৯৪০)—ইংরেজ ভাস্কর এবং বিশিষ্ট এনগ্রেভার। Perpetua প্রভৃতি সুশ্রী ছাপার হরফেরও ইনি উদ্ভাবক।

Herbert Read (১৮৯৩-১৯৬৮)—ইংরেজ কবি ও শিল্পসাহিত্য সমালোচক, বহুদিন *Burlington Magazine* সম্পাদনা করেছেন।

৮ অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র, মোহনলাল তখন London School of Economics-এর ছাত্র। বিলিতি ডিগ্রি এবং একটি গুণী চেক্ স্ত্রী নিয়ে দেশে ফিরে প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশের স্ট্যাটিসটিকল্ ল্যাবরেটরিতে যোগ দেন।এঁকে 'জাত লেখক' ব'লে বর্ণনা করেছেন হিরণকুমার সান্যাল। 'দক্ষিণের বারান্দা' এঁরই লেখা বই।

৯ Dr Maud Royden—১০-সংখ্যক চিঠির ৪র্থ টীকা দ্র.।

১০ Prof. Murray—১১-সংখ্যক চিঠির ৭ম টীকা দ্র.।

Simon. (Sir John)—ভারতে সাইমন কমিশনের ইনি কর্তা ছিলন। তিরিশের দশকের ব্রিটেনে হিটলার-তোষণে তৎপর রাষ্ট্রনেতা।

Baldwin. (Stanley Baldwin, ১৮৬৭-১৯৪৭)—এ-সময়ে তিনি তৃতীয়বার ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েরও তিনি চ্যান্সেলার ছিলেন। শান্তিপ্রেমিক ব'লে এঁদের কারোই দুর্নাম ছিলো না।

১১ 'বই'—রবীন্দ্রনাথ ও গিলবার্ট মারের দুটি চিঠি নিয়ে *East and West* নামের পুস্তিকা। লীগ অব নেশন্স-এর প্যারিস কেন্দ্র থেকে বেরিয়েছিলো (১৯৩৬)।

১২ Miss (Katherine) Mayo (১৮৬৮-১৯৪০)—ভারতবিদ্বেষী মার্কিন সাংবাদিক। ভারতে শিশুবিবাহের কলঙ্ক ফলিয়ে বই লিখেছিলেন *Mother India* (১৯২৭) ধনী পার্শি পরিবারের মেয়ে, কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার, Cornelia Sorabji (১৮৬৬-১৯৫৪) ছিলেন অক্সফোর্ডের স্নাতক প্রথম ভারতীয় মহিলা। এই ১৯৩৪ সালেই তাঁর বই বেরোয়—*India Calling.*

১৩ রাজনৈতিক চাতুর্য, প্রখর রণকৌশল এবং অবিরল ভারতবিদ্বেষের জন্য Churchill (Sir Winston, ১৮৭৪-১৯৬৫) সুপরিচিত। ইংরেজিভাষী জাতির ইতিহাস লিখে ইনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান।

O'Dwyer, (Sir Michael) ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবের লেফটেনাণ্ট গবর্নর ছিলেন। এঁর কার্যকালেই জেনারেল Dyer-এর আদেশে জালিয়ানওয়ালাবাগের বীভৎস

হত্যাকাণ্ড ঘটে। স্যর মাইকেল অধীনস্থ জেনারেলের সেই বীরত্বের সমর্থন করেছিলেন। স্বদেশেও এঁরা স্বভাবতই ছিলেন শান্তি আন্দোলনের প্রবল প্রতিপক্ষ।

১৪ বইটি কবির কাছে পৌঁছে থাকলেও বিশ্বভারতীর কোনো গ্রন্থাগারে বর্তমানে তার সন্ধান পাওয়া গেলো না।

## ১৩

Dec 4 [1934]

Balliol College
Oxford

শ্রীচরণকমলেষু

চিঠিতে লিখতে ভুলেচি—আপনার নিজের ইংরেজি-করা Trial of the Horse লেখাটা যদি আমাকে Air Mail-এ পাঠান। (ভবানীবাবু Golden Boat-এ ঐ লেখাটার যে ইংরেজি করেচেন সেটা চলবে না)।[১] এখানে দু-একজন লেখক আপনার অনুবাদ দেখতে চান—ঐ লেখা এদের চমৎকৃত করেচে। Parrot's Training [২] পড়ে London-এ দু-একজন কীরকম আনন্দ পেয়েচেন বলতে পারি না—সকলে বারম্বার অনুরোধ করচেন এ দেশে ছাপাতে। হয়ত ভালো কিছু পাওয়া যাবে। এখনি ছাপালে খুব বিক্রি হবে।

প্রণত
অমিয়

Parrot's Training আমার কাছে আছে—কিন্তু Trial of Horse-এর reprint সঙ্গে নেই। —অ

---

**টীকা**

১ 'লিপিকা'-র (১৯২২) অন্তর্গত 'ঘোড়া' নামে ব্যঙ্গকৌতুককাহিনীর দুটি ইংরেজি অনুবাদ দেখা যায় : এক, অ্যালেন অ্যাণ্ড আনউইন প্রকাশিত *The Golden Boat* (১৯৩২) সংকলনে ভবানী ভট্টাচার্যের করা ; দুই, *Parrot's Training and Other Stories* (বিশ্বভারতী, ১৯৪৪) গ্রন্থে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের করা। তৃতীয় কোনো অনুবাদ আছে কিনা সন্দেহ। *A Tagore Reader* (১৯৬১) সম্পাদনা করার সময় অমিয় চক্রবর্তী নিজে সুরেন্দ্রনাথের অনুবাদটিই নিয়েছেন।

২ 'লিপিকা'-র অন্য একটি কৌতুকজনক ব্যঙ্গ গল্প 'তোতাকাহিনী'র অনুবাদ *The Parrot's Training* (থ্যাকার স্পিঙ্ক, 1918)।

Dec 6 / 34 Oxford

শ্রীচরণকমলেষু,

আপনার চিঠিতে [১] দেশে ভোট এবং কাল্পনিক রাষ্ট্র নিয়ে মাতামাতির বিষয় আরো জানতে পারলাম। আমাদের কাজ এবং মননচেষ্টার ভিত্তি এখনো এত কাঁচা ; অবাস্তবিক উত্তেজনায় আমাদের অর্দ্ধেক শক্তি উবে যায়। য়ুরোপী রাষ্ট্রিক দৃষ্টি দিয়ে ভারতকে দেখলে মরীচিকার মধ্য থেকে আকাশে জাগে মহাত্মাজির চারিত্রস্বরূপ ; দু-চারজন তাঁর বন্ধু কর্ম্মী, বল্লভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ। জওহরলাল। গফর খাঁ। বাংলাদেশে কেউ নেই। বিদেশী দৃষ্টির কথা বলচি, এখানে তার সঙ্গে পরিচয় হয়েচে—আমরা হয়তো আরো দু-চারজনকে জানি কংগ্রেসে এবং তার বাইরে যারা অলক্ষ্যে কাজ করে যাচ্চেন। ভারতবর্ষের আরেক পরিচয় শান্তিনিকেতনে। সেখানে কর্ম্ম এবং ভাবনার স্তরই অন্য। তা এরাও এখানে বোঝে, যারা জানে। মজা এই যে শান্তিনিকেতনকে ঠিক বিদেশের অংশ বলেই এরা ভাবে না, অথচ জানে ঐ জায়গা মূলে পল্লবে ভারতীয়। আমাদের দায়িত্ব তাই বিশেষ ভাবে দুরূহ, এবং মানব সম্বন্ধের উদার ক্ষেত্রে পালনীয়। আজ মহাত্মাজি যেখানে ক্রমেই এসে দাঁড়াচ্চেন সেখান থেকে আশ্রমের ভেদ অত্যল্প, এ কথা এরাও দেখচি অনেক ভেবে বুঝেচে, এবং যথাক্ষেত্রে এজন্যে ভয়ও জেগেচে। [২] হয়তো ভারতবর্ষের বড়ো একটি কর্ম্ম সাধনার প্রবর্ত্তন হবে তার এই সূত্রপাত। এখন গোড়াকার কাজে আপনার সঙ্গে মহাত্মাজির কিছু কথাবার্ত্তা হওয়া দরকার। সেই সময় এসেচে, বেশি দেরি করা চলবে না। মধ্যবর্ত্তী এন্ড্রুজ সাহেব কি এর আয়োজন করবেন না? এখান থেকে বুঝতে পারি আমাদের ইতিহাসের একটি বৃহত্তর পর্ব্ব এসেচে। আপনি ভারতবর্ষকে নবযুগে এনেচেন। মহাত্মাজি আপনারই কাজে যোগ দিয়েচেন। স্বতন্ত্র কর্ম্মক্ষেত্রে কাজ ক'রে আপনারা দেশকে আজ এই সন্ধিস্থলে এনেচেন। এখন তৃতীয় পক্ষ পর্য্যন্ত রাস্তা থেকে ক্রমে সরে দাঁড়াচ্চে। আমাদের সমাজ-রাষ্ট্র সাধনার পথে দেশ পা বাড়িয়েচে—কোন্ দিকে? এ সময়ে সমস্ত মানবসভ্যতার সামনেই বড় পথের মোহানা। আপনারা দুজনে যা বলবেন ভাববেন, আপনারা যাবার আগে যে গতি দিয়ে যাবেন তাতে ভারতেরই নয়, মানুষের ঐতিহাসিক চেষ্টা প্রভাবিত হবে। আপনাদের চারদিকে ধুলো এবং ধোঁয়ার গোধূলি, সেখান থেকে কান্না এবং অভিমানের সুর জাগচে, অপরিণত বাক্য ও কর্ম্মের আবর্ত্তন। দুর্ভাগ্য আমাদের যে এই অভিমানী বয়স্ক শিশুদের বাচালতা এ দেশে পর্য্যন্ত তারযোগে এসে পৌঁছয়। সঙীন্ ইংরেজি ভাষায় রচিত এই ভারতীয় কাগজিক অভিমানের সুর যে সমানী ভারতীয়ের নয় তা এখানে আমাদের হেঁট মাথা উঁচু করবার জন্যেই বলতে হয়। এই নিয়ে একটু মজা হয়েচে। আমার এক খ্যাত লেখকবন্ধুকে সেদিন এই বিষয়ে মনের ক্ষোভে হেসে লিখেছিলাম। কথা দুটো চারটে, কিছুই নয়, কিন্তু তিনি উৎসাহিত হলেন এবং আরো জনকতককে নিয়ে জমিয়ে তুললেন। সামান্য জিনিষকে কতখানি নিবিষ্ট মন নিয়ে এঁরা

তলিয়ে না দেখে পারে না এতে ক্রমাগতই আশ্চর্য্য হই। এঁদের অত বেশি আগ্রহ থেকে হঠাৎ বুঝলাম ভারতীয় অভিমানী সুরের বিরুদ্ধে যেটুকুও বলা যায় তার মূল্য আছে। কিছু নমুনা তুলে দেব—এ নিয়ে আমাকে দেশীয় বিদেশীয় শত্রু-মিত্রের কাছে আজো পত্রপরম্পরা জবাবদিহী করতে হচ্চে। জেনেশুনে অন্যায় কিছু বলিনি,— লিখেছিলাম :—

"So the new Constitution has been diplomatically delivered. I study it ; but I must confess I find something foreign in much of the Indian excitement over it. I am a fundamentalist. (And remember, I am a legion in India, though we are not in the Press.) It is beyond me like children to pretend to ignore and wait with outstretched hands for the gift box, then to fuss and complain that it is more wrapping and safeguard, and only bits of chocolate. Fancy a nation living on gifts and prizes—even if they are chocolates! But that is just our weakness—we are only now being stung out of it. May be, we have trusted in you too much...

And on the other side, my criticism of the White Paper is not so much that it is a blank sheet, but that it is colour-conscious. Little genuine cognition and trustful advance ; forced smiles and niggardly 'concession'. Years of highly expensive and elaborate process and promise of generosity, ending with not even the prospect of half-a-crown (dominion status) ; one white-gloved hand held out in public fraternity—the other firmly fixed in the benefitted person's neck. I mean there is in all this too much of tragic and deliberate 'sport'.—We would have behaved thus if we had a chance, I suppose, but why doesn't England let us prove it by ruling her ?

Gifts are good when friendly equals interchange them, otherwise it is all bound to be a mix-up of threat and graft and make-believe. Must always politics poison blessing with bargaining and flourish in confusion—but why?

And yet the Federation idea has come to stay, the autonomy of provincial units, the stronger centralisation. Inspite of itself the J. S. C. report has implemented it. And we shall see that it is substantiated. At present there is no chance. The parliamentary board version of the Congress has Western logic at its back. I suppose they will follow the lead of hard-boiled moderates and work the new machine for a while, find it ill-assembled and creaking, and also sprinkle some fine sand to study its circumlocution. And then more pressure, boycott, more merry-go-round tables, blue and white papers, and—The Federated States of India ! Only with Bengal in tension, and the police augmented, your British OGPU given more secret powers, the Governors made into Sultans, the administration made costlier at the expense of dying

peasantry, British Trade and the Military armed to the teeth...you will not wonder if I lift up prayers of gratification to a secure Providence... And if by then happen a Pacific War and A War Of The Heavens—then the human drama will be grave indeed...

Well, here we are to prevent all that.

And that is but the external political view a La Anglaise—the realities of Indian life will not follow your logic, neither mine. The deeper forces of our peoples will shape India's civilization in surprises of Indigenous institutions, look out for them..."

আরো কিছু লিখেছিলাম মহাত্মাজির Village Industry Association, শ্রীনিকেতনের এবং আশ্রমের কথা ব'লে, কিন্তু ধারাটা ছিল ঐ। রাজপারিবারিক বিয়ে নিয়ে এরা সত্যই অন্ধ পাগল হয়ে গিয়েছিল। এমন মত্ততা মনে করেছিলাম ইংরেজ পাব্লিক-বিরুদ্ধ। (এ বিষয়ে এক আমেরিকান দর্শকের চিঠি পাঠাচ্ছি জাহাজের ডাকে "Time & Trade" কাগজে।) তবে এদেরও এমন লোক আছে যারা হাসতে জানে। আমার মন্তব্যে এরা খুবই সায় দিয়ে হেসে লিখেচে।

"...I must confess that I feel tired after marrying so much on Thursday. In common with thousands of English women, and English men of course I married Princess Marina—and she is slender and fair—Only I did not go so far as to touch the Divine Alphabet on the Royal Baggage. It reminds me of a sect in India who are supposed to faint at the mention of the letter K, first one in Krishna—the divine lover's name. Frankly I do not know which is worse."[৩]

টমসন সাহেবের সঙ্গে আপনার ইংরেজি কবিতা নিয়ে বসেছিলাম—তাঁর মন্তব্য নোট ক'রে এনেচি, কিছু কাজে লাগবে, যদিও অবশ্য ওঁর মতামত সবই গ্রহণীয় মোটেই নয়। কিন্তু নূতন Edition নিয়ে আমরা সবাই ব্যস্ত এবং উৎসাহিত। Ernest Rhys এবং Æ-র সঙ্গেও বসতে চাই, কিছু কাজের মতো suggestions পাওয়া যাবে।[৪] Daniel Macmillan নিজেও খুব উৎসুক যে এই Edition নূতন কবিতা নিয়ে, কিছু আপনার হাতের মাজা-ঘষার পর বেরোয়।[৫] কেন না নূতন Collected Edition বার করা মানেই public-কে challenge করা। আমার একান্ত দুঃখ যে এই সময়ে আপনার সঙ্গে এ নিয়ে বসতে পারচি না। সাত দিনে সব তৈরি হয়ে উঠত। যাই হোক, এখান থেকে যা পারি সকলের suggestion একত্র করে এই মাসের শেষে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব। পরশু লণ্ডনে যাচ্চি। "চার অধ্যায়" type করা চলচে। একবার এ দেশের দু-একজনকে নিভৃতে পড়তে দিতে হবে এবং ভাষা ইত্যাদি সম্বন্ধে পরামর্শ নেব। তার পর সবটা air mail-এই আপনার কাছে ইংরেজি নববর্ষের মুখে পাঠাব। কঠিন কাজ—এরকম সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, আগুনে-ভরা ভাষায় জ্বলন্ত বই কী ক'রে ভাষান্তরিত হতে পারে? কীরকম যে যুদ্ধ ক'রে এগোতে হয় তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

আপনার ইংরেজি প্রবন্ধাবলী এবং নূতন কবিতার অপেক্ষায় আছি।[৬]

Oxford Book of Bengali Verse-এর কতদূর এগোলো জানতে ব্যস্ত আছি।[৭] আধুনিক অংশ যোগ হল জেনে এখানে সকলেই খুসি হয়েচেন—এতে বইয়ের আকর্ষণ বাড়বে, এবং এদেশীয় আধুনিক কবির দলের ঔৎসুক্য জাগবে। এ বিষয়ে পরের ডাকে আরো লিখচি। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। আশা করি আশ্রমের সব খবর ভালো। রথীবাবুকে আমার নমস্কার দেবেন।

প্রণত

অমিয়

আপনার বাংলা নূতন কবিতার বই কি বেরিয়েচে?

---

টীকা

১ ১৫ নবেম্বরে লেখা ('চিঠিপত্র' ১১শ, ৭০) রবীন্দ্রনাথের চিঠিরই দ্বিতীয় উল্লেখ ব'লে মনে হয়।

২ গান্ধীজির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিবিধ বিষয়ে গুরুতর মতভেদের কথা কয়েক বছর ধ'রেই আন্দোলিত হচ্ছিলো। কিন্তু ক্রমেই এ-কথাও স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিলো যে দুজনের মধ্যে আসলে তেমন কোনো মৌলিক বিরোধের অস্তিত্ব নেই। গান্ধীজির মানসকন্যা মীরা বেন ( Miss Madelain Slade ) ১৯২৯-এর জানুয়ারি মাসে শান্তিনিকেতনে কবির সঙ্গে এ-বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন, এবং সবরমতী ফিরে গিয়ে তাঁকে লিখে জানান যে শান্তিনিকেতন ও সবরমতী 'different to look upon outwardly, & yet with that fundamental likeness which only daughters of the same parent can bear.' রবীন্দ্রনাথ উত্তরে লিখেছিলেন (১৯ ডিসেম্বর ১৯২৯): 'According to the Upanishad the reconciliation of the contradiction between **tapasya** and **ananda** is at the root of creation... and Mahatmaji is the prophet of tapasya and I am the poet of ananda.' (*Visva-Bharati Quarterly*. Vol 50, পৃ ২২-২৩ দ্র.)

৩ White Paper বিষয়ে ইংরেজ বন্ধুকে লেখা চিঠির যেটুকু এখানে তুলে দেওয়া আছে সেটাই যে মূলত রবীন্দ্রনাথেরও মত ছিলো তা 'চিঠিপত্র' ১১শ খণ্ডের ৭০-সংখ্যক চিঠি পড়লেই দেখা যাবে। নতুন ভারত শাসন আইন প্রবর্তনের প্রাক্কালে দেশব্যাপী যে-হট্টগোল চলছিলো তার পরিপ্রেক্ষিতে এটাই ছিলো বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠাতার মূল বক্তব্য।

৪ টমসন ও Æ—১১-সংখ্যক চিঠির ১০ম ও ১২-সংখ্যক চিঠির ৪র্থ টীকা দ্র.। Ernest Rhys (১৮৫৯-১৯৪৬)—জনসন, ডাউসন, হ্যাভেলক এলিস গোষ্ঠীর লেখক, ওয়েলস-এর এই কবিটি বয়সে রবীন্দ্রনাথের অল্প বড়ো, প্রকাশনা জগতে পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা কর্মে কৃতী ছিলেন। ১৯০৬ থেকে Everyman's Library সিরিজের গ্রন্থাদির সম্পাদক। *Rabindranath Tagore: A Biographical Study* (১৯১৭) নামে ছোটোখাটো একটা বই লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে।

৫ দেখা যাচ্ছে, ম্যাকমিলান কোম্পানিরও ইচ্ছে ছিলো যে কবিতার ইংরেজি অনুবাদের সংগ্রহ (Collected Poems) কবির পরিমার্জনা সহ বেরোয়।

৬ প্রবন্ধগুলি, মনে হয়, প্রস্তাবিত Collected Essays গ্রন্থের জন্যে, যে-বই শেষ পর্যন্ত বেরোয়নি।

৭ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের জন্যে ১৯৩৪-এর কাছাকাছি সময়ে রবীন্দ্রনাথ একটি বাংলা কাব্যসঙ্কলন সম্পাদনা করার ভার নিয়েছিলেন, মূল কবিতার না অনুবাদের সঙ্কলন তা বোঝা যায় না। বন্ধু Sadler-কে ১৩.১০.৩৪ তারিখে লেখেন: 'I do hope the publication of the Oxford Book of Bengali Verse will make for better understanding between our people and yours, and specially that young Englishmen, who hope to come out to Bengal, will study the book. I was glad to get Chakravarty's help in editing the modern section of the book.' এই Chakravarty অমিয় চক্রবর্তী, অক্সফোর্ড থেকে তিন মাসের ছুটিতে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে সম্পাদনার কাজে সহায়তা করছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, হয়তো আরো কেউ কেউ। বেশিদিন কারোই উৎসাহ বজায় থাকেনি। কবি অবশেষে নন্দগোপাল সেনগুপ্তকে ভার নিতে বলেন। তারপরে আর কিছু জানা যায় না। এই Oxford Book-এর জন্যে সংকলিত কবিতা নিয়েই পরে বিশ্বভারতীর 'বাংলা কাব্য পরিচয়' প্রকাশিত হ'য়েছিলো ব'লে অনুমান করা যায়। সে-গ্রন্থেরও সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তবে প্রকাশের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বইটি নানা কারণে প্রত্যাহার ক'রে নেওয়া হয়।

## ১৫

Dec 12 / 34

Balliol College
Oxford

শ্রীচরণকমলেষু,

আপনার চিঠি পেলাম—আপনার চিহ্নিত ইংরেজী কবিতার বইয়ের অপেক্ষায় আছি।[১] সমুদ্রের দুই পার থেকে চিঠি পত্রে Collected Edition-এর ব্যাপার ছাপার জন্যে তৈরি করা কঠিন হবে, কিন্তু উপায় নেই। তবে দেরি হোক, যা হোক, বরাবরকার মতো ছাপা হয়ে যাওয়ার পূর্ব্বে এই edition যাতে সর্ব্বতোভাবে নিখুঁৎ হয়, আপনার মনের মতো হয়, তা করতেই হবে। কেননা এই নূতন সংস্করণ বার করা মানেই নূতন ক'রে Europe-কে আহ্বান করা—আবার একটা আন্দোলন জাগবে। যাতে কবিতাগুলিতে তার ধ্রুবমূর্ত্তি সহজেই ধরা পড়ে তর্জ্জমার মধ্য দিয়েও, তা করতে হবে।

*Lover's Gift, Crossing* সম্বন্ধে এত মতভেদ। *Crossing*-এর গান অনেকেরই

ভালো লাগে কিন্তু এঁরা বলেন *Gitanjali*তে ঐ idea-র বেশির ভাগ আছে, অথচ *Lover's Gift*-এর কবিতা নূতন ছাঁচের, আপনি একটু দেখে দিলে আরো উজ্জ্বল হবে। *Gitanjali, Fruit Gathering* এবং *Gardener*-এর মধ্যে কিছুই বদল করার দরকার নেই—সামান্য একটু আধটু textual change-এর যে সব suggestions পাচ্চি তা পাঠাব। উব্বশীর নূতন অনুবাদ আপনার কাছ থেকে চাই এবং সাজাহান কবিতার—ঐ দুটির পুরো effect এখনো এঁদের মনে অনুবাদ থেকে পৌঁছচ্চে না, অনেক idea এবং imagery-র links বাদ প'ড়ে গেছে—আপনি যেটুকু দিয়েচেন তা অনবদ্য, কিন্তু যথেষ্ট নয়। আরেকটু ভ'রে তোলা দরকার original-এর উৎস থেকে। ইংরেজি বইয়ের নাম এবং arrangement রাখাই সকলের মত—কেননা এক একটা বইয়ের character দাঁড়িয়ে গেছে—*Gitanjali, Gardener* প্রভৃতি—তার সমস্ত tradition হঠাৎ ভাঙলে ক্ষতি হবে। তা ছাড়া বহু কবিতা একটানা এক নামে ঢেলে দিলে পড়তে বাধবে, বৈচিত্র্য উপলব্ধি করতে কষ্ট হবে। কেননা তর্জ্জমায় technical surprise কখনোই রাখা যায় না, সবই prose poem, ছোট কি বড়ো। ভিতরকার যে ভাবের surprise তা ধরা পড়বে কিছু ছেদ থাকলে এবং বইয়ের associations রাখলে। হয়তো *Crossing, Lover's Gift* এবং অপ্রকাশিত নূতন কবিতাকে এক সঙ্গে দু তিন Section-এ ভাগ ক'রে দেওয়া ভালো হবে, বইয়ের নাম না রেখে। *Fugitive* বইখানিকে মুখ্যত আখ্যানমূলক রাখলে ভালো হবে, আছেও ওতে বেশির ভাগ চৈতালির Sketches এবং লিপিকার অনুবাদ এবং গল্পের ভাব-লাগা কবিতা। ওর থেকে হিন্দী কবিতা প্রভৃতি বাদ দিতে হবে, (এবং দেবেন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্র রায়, এবং সত্যেন্দ্র দত্তের কবিতার অনুবাদ পূর্ব্বের বই থেকে)।

*Sacrifice* প্রভৃতি নাটিকা এ বইয়ে বার করা কারো ইচ্ছে নয়। আপনার নাটকগুলিকেও ঠিকরকম ক'রে আবার একসঙ্গে বার করতে হবে, একই volume-এ। সেটা পরের volume। এই volume-এ short dramatic pieces যা আছে তা একত্র রাখতে হবে এক Section-এ। *Stray Birds* এবং *Fireflies*-এর selection রাখাই চাই—সবারই কাছে ওর রস পৌঁছয়, কিন্তু একই type-এর যেখানে একটি রাখা চলে সেখানে তাই রাখতে হবে। আমাদের পক্ষে লোভ সংবরণ করা কঠিন, কিন্তু তবু কোনোমতে selections ক'রে আমরা আপনার কাছে approval-এর জন্যে পাঠাবো। আশ্চর্য্য এই যে publisher এবং public-এর মতে সংখ্যায় অনেক কম হলেই effect বেশি হবে। তা ছাড়া original বই তো ছাপানো বন্ধ হবেই না এ বিষয়ে Macmillan দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—সুতরাং যারা চায় তারা মূল বইও কিনবে।

একটা সমস্যা "The Child" নিয়ে। এটিও Collected Edition-এ আসে অনেকেরই ইচ্ছে। কিন্তু Unwin-এর permission-এর জন্যে আপনার নিজের কাছ থেকে অনুরোধ আসা দরকার তাদের কাছে। তাদের কিছু আপত্তি হবারই কথা, কেননা বইখানি অনেক ছাপা হয়ে রয়েচে তাদের কিছু loss হবে। কিন্তু আপনি যদি ঠিক মনে করেন, তাহলে একটু অনুরোধ ক'রে জানালে তারা আর্থিক ক্ষতি এবং নিজেদের নামের পরাভব স্বীকার

ক'রে নেবে। এদের publishing tradition-এর pride একটা মস্ত asset এবং এ বিষয়ে এরা সকলেই অত্যন্ত sensitive।[৩]

আপনার এবং বাংলার অনেক ভালো ছবি এসেচে জেনে ভারত সাম্রাজ্যিক প্রদর্শনী দেখে এলাম লণ্ডনে।[৪] কিছু ভালো ছবি এসেচে বটে কিন্তু সমস্ত Exhibition-এর tone এবং purposeই এত বিসদৃশ যে নকল অঙ্গভঙ্গীময় অত্যন্ত রঙের ভিড়ে তারা চাপা প'ড়ে গেছে। আপনার ছবিখানির দাম কিছু কম হলে নিশ্চয়ই বিক্রি হয়ে যেত—আশা করি এতেও হবে। অবণ (sic) বাবুর Arabian Nights-এর ছবি, গগন বাবুর ছবি এবং নন্দবাবুর ছবি যারা সমঝদার তারা ঐ অদ্ভুত বাজারের মধ্যেও চিনবে। কিন্তু বাংলার ছবি যেমন তেমন পাঠানো হয়েচে, তার বাছাই ঠিক মতো হয়নি, কোনো চেষ্টাই হয়নি representative ছবি পাঠানোর। গবাবাবুর অত উৎকৃষ্ট ভালো ছবি থাকা সত্ত্বেও ঐ অতি রঙীন চন্দ্রালোক চিত্র কেন পাঠালেন।[৫] এতে তাঁর প্রতি অবিচার হয়েচে। তাছাড়া আসল যা আপত্তি তা স্পষ্ট করেই বলব। বাংলার ছবি এসেচে যথেষ্ট শেষ পর্য্যন্ত, অথচ আসেনি। এতে একেবারে confused, weak impression তৈরি হয়েচে ; চৌরঙ্গী স্কুলের ছবি আসুক, মুকুলবাবুর etching প্রভৃতি জোরালো,[৬] কিন্তু তাঁদের একেবারে কাঁচা ছাত্রের অনেক ছবি সমস্ত স্রোতকে ঘোলা ক'রে দিয়েচে। কিন্তু এটাও আসল কথা নয়। আমাদের চিত্রকলা কি নূতন যুগে প্রাণের যাত্রায় চলেচে? আমরা জানি আশ্রমের কলাভবনে জীবনেরই প্রকাশ, অজন্তা বা কাংড়া উপত্যকার নয়, সেখানে নন্দবাবু নিজে চলচেন এবং অন্যকেও কথা কওয়াচ্চেন অন্তর থেকে, চোখ দিয়ে, তুলি দিয়ে। কিন্তু সেই প্রাণবন্ত ভারতীয় চিত্রকলা যে কোথাও আছে তা পাঁচমিশেলি এই ছবিতে একটুও বোঝা যায় না। নন্দবাবুর এবং অবণবাবুর (sic) ছবিতে প্রাণধারা বইচে, তার কেবল দুটোচারটে ঢেউ অত্যন্ত আকস্মিকভাবে তুলে আনা হয়েচে। তাঁদের কথা বাদ দিই কেননা তাঁরা চিত্রজগতে চিরদিনের জায়গা পেয়েচেন। কিন্তু গোড়াকার কথায় যাওয়া দরকার হয়েচে। আজ ভারতবর্ষ জেগেচে শুনতে পাই, অনুভবও করি অন্তরে, কিন্তু কোথায় এই জাগরণের অরুণচ্ছটা আমাদের চিত্রকলায়? Intellectual mind-এর সজীব সহজ প্রবল প্রকাশ কোথায় প্রাণের গভীর তলের সঙ্গে মিশে তার ধ্বজা তুলে ধ'রেচে? কিছু যায় আসে না আমরা কোন্ technique কোন্ tradition মানি বা না মানি—আজকের দিনে হাজার জন এখানে আছে যারা সমস্ত সত্ত্বেও ঠিক জায়গায় পৌঁছে তৎক্ষণাৎ সমাদর সম্ভ্রম করতে জানে, এবং করে। জাপান, মেক্সিকো, তুর্কীর নূতন ছবি এদের গভীর মনে পৌঁছয়। কিন্তু যদি এই exhibition করাই হল তবে সেই জীবন্ত ভারতশিল্পের পরিচয় কেন দেওয়া হল না। কী ক্ষীণ জটিল স্বপ্নাচ্ছন্ন আতিশয্য এবং প্রতিধ্বনির মনোহারী কল্পনার ভিড়, আমাদের বাংলা শিল্প ভারতীয় শিল্পের নাম ধ'রে বৃহৎ জগতের প্রাঙ্গণে মূর্চ্ছাতুরের মতো দাঁড়ালো। কেবলি পুরাতত্ত্ব, ভারতীয়ত্ব এবং আধ্যাত্মিকতার নাম ক'রে তাদের বসবার জায়গা দেওয়া হচ্চে। এর জন্যে দোষী শুধু এরা নয়, এবং ভারতরাষ্ট্র প্রভুরা নয়, আমরাও। রাশিয়ান communism তত্ত্ব বা তাদের যন্ত্রপুজো বা হিংস্রজীবনীতি অনেকেরই পছন্দ নয় সুতরাং তাদের art-এ যখন propaganda দেখা

দেয় তখন এদের পক্ষে তার দূরস্পর্শটুকুও সহ্য করা শক্ত। এরা মানসিক বাধা নিয়েই Soviet art exhibition-এ আসে। কিন্তু সম্প্রতি রাশিয়ান ছবির প্রদর্শনী এখানে হল —কী কাণ্ড ঐ ছোট্ট একটি ঘরের দেয়ালে! কী প্রচণ্ড প্রবল সুন্দর শক্তিমানের অজস্র সৃষ্টি। একজনের নয়, বহুজনের। কোথায় ভেসে গেছে তাদের cult, তাদের tradition, তাদের propaganda-র আকস্মিক পরিচয়। মানুষ দাঁড়িয়েচে চোখ খুলে, দেখচে জীবনকে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে সাড়া দিচ্চে। Local association এবং technique, tradition এবং dogma সব ছাড়িয়ে এই মানুষের কল্পনা ভাবনা সৃষ্টিময় অঙ্গুলির লীলা। ওরা জেগেচে। আমরাও জাগচি, বলতে চাই জেগেচি। আমার ক্ষেত্র নয়, অধিকার নেই ভারতীয় আর্ট সম্বন্ধে বলার। শ্রদ্ধা করেচি গভীর মনের আনন্দে কলাভবনের কাজকে, সেখানকার শিল্পীকে, তাঁদের জাগ্রত অনুপ্রেরণার সামান্যও যেটুকু আমার জীবনে নিতে পেরেচি তার থেকে ছবির জগৎকে জানতে সুযোগ পেয়েচি। কিন্তু আমাদের সকলের বুক যখন সাত হাত নেমে গেল এই সোনার বাংলার চিত্রপ্রদর্শনী দেখে তখন এই সব ক্ষোভের কথাই মনে আবর্ত্তিত হল। বোম্বাই section-এ যে সত্যকার কুশ্রীতা এবং রুচিহীন কিঙ্কর বৃত্তি প্রকাশ পেয়েচে তার কথা তো বললামই না, বলবও না। কিন্তু আমাদের আধুনিক বাংলার এমন দুর্ব্বল এমন অকিঞ্চিৎকর পরিচয় কেন দেওয়া হল?

আমরা যেন বিদেশী কাগজের দুচারটে স্তুতিমন্তব্য বা এমনকি ছবি বিক্রি থেকে আসল কথা না ভুলি। যাঁরা শ্রদ্ধাবশত চুপ ক'রে থাকেন বা disappointment প্রকাশ করেন এদেশে তাঁরাই বন্ধু। কেননা যাঁরা প্রশংসা করেন ভারতীয়ত্বের বা আমাদের কোনো অতি উচ্চ অমানবীয় শিল্পপ্রতিভার চিহ্নকে তাঁদের যদি প্রশ্ন করা যায় এই সব বিশেষণের পরে তাঁরা তাঁদের কোনো বড়োদরের শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে এই জাতীয় শিল্পকে সমাসনে বসাতে রাজি কিনা—তাহলেই সব মুখোস খসে পড়ে। এরকম দুরাশা উন্মত্ততার প্রলাপ বলেই এই স্তুতিবাদকের দল গ্রহণ করবেন। কিন্তু patron হয়ে "ভারতীয়" শিল্পকে অনেকেই সমাদর করতে রাজি। যাঁরা একটু art-এর মর্ম্মগ্রাহী তাঁরা একটুও পরিচয় পাননি এই ঘটা ক'রে সাজানো প্রদর্শনীতে, যে ভারতবর্ষ আজ বেঁচে আছে। (যে কটি ছবি ভিড়ের ভিতরে অক্ষুণ্ণ আত্মমর্য্যাদায় দাঁড়িয়ে আছে তার কথা পূর্ব্বেই বাদ দিয়েচি।) অত্যন্ত তাড়াতাড়িতে আমার যা বলবার ছিল কিছু ঠিক বলা হল না—আমার বিপদই এই যে চিঠি হাওয়া জাহাজে পাঠানোর ঠিক শেষ মুহূর্ত্ত আগে ছাড়া লেখা ঘটে ওঠে না—কিন্তু সমস্ত দ্রুত কথার ভুল ক্ষমা ক'রেই আপনি যথাস্থানে এ বিষয়ে বলবেন জানি।

Exhibition-এর catalogue-এ কীভাবে একটু subtle propaganda মেশানো আছে তা সঙ্গের পাতা দুটো থেকে বুঝবেন। ভারতবর্ষের U. P. Madras প্রভৃতিতে যে "other schools" নেই, সবজায়গাতেই বাংলারই ছাত্রেরা অধ্যক্ষ, অবনীন্দ্রনাথ নন্দবাবুরই শিষ্য, তাঁরা একথাটি ইচ্ছে ক'রে ভুলভাবে বলেচেন। যাই হোক, সবচেয়ে দুঃখ যে নিতান্ত নিরপরাধ Havell-কে এরা নানা কাগজে আক্রমণ করচে—তিনি কী দোষ করেচেন যে Solomon সাহবের বিচারে মৃত্যুর আগে অপমানিত হবেন। এ সবেরই

উত্তর শান্ত হ'য়ে অপেক্ষা করা। বোম্বাইয়ের জয় হোক না কেন, কার তাতে আপত্তি যদি বিজয়ী প্রতিভা সেখানে থাকে?—উপস্থিতমতো বাংলার শিল্পীরা যদি আজ বড়ো ক'রে ভাবেন, স্পষ্ট চোখে দেখেন এবং আপন ব্যক্তিত্বকেই নির্ভয় তেজে প্রকাশ করেন তবে আমাদের পথ খুলে যাবে।

ছুটি হয়েচে, Oxford হঠাৎ নির্জ্জন অন্ধকার, বৃষ্টি পড়চে। কাজের আবর্ত্তে একাকী দিনের চেতনা ঘুরিয়ে চলেচি পাছে নিজের দিকে চেয়ে দেখি। আমার কি দিন অন্ধকার হয়ে এল।

জাগব, জানব, প্রাণকে বারবার প্রণাম করি। কিছুই ব্যর্থ হবে না। হ'তে পারে না। যদিবা কূলের কাছে এসে ভেঙে যায় ভেসে যায় তবু আজ বলব দেখেচি সত্যের মুখকে। অনেক কাজ আজ কিছু কিছু বুঝেচি এবং জানি কী ভাবে করতে পারি, নিজের সাধ্যকে কিছু একটু রূপ দিয়ে যেতাম। কিন্তু ঢেউএর শেষ নেই। এখানে এক বছরের পরে আমার চক্র ঘুরে যাওয়া উচিত ছিল ভারতবর্ষে, আরো একটু সম্পূর্ণতা জয় ক'রে নিয়ে আমার এই সংগ্রামে। তখন আশ্রমেরই কাজ আমার কাজ। কিন্তু কী হবে ভেবে এসব।[৭]

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই।

অমিয়

[প্রথম পুনশ্চ]

গুরুদেব, আপনার কবিতা "আবার জাগিনু আমি" এবং তার ইংরেজি অনুবাদ যদি Chinese কালীতে লিখে কোনো এক সময়ে পাঠাতেন আমি আমার ঘরে বাঁধিয়ে শেষ পর্য্যন্ত রাখি।[৮] এবং আপনার একটু design ঐ লেখার মধ্যে। বারেবারে এই ইচ্ছে মনে জেগেছিল। আজ বললাম। গুরুদেব, এন্ড্রুজ সাহেবের সঙ্গে যেমন ক'রে হয় হৈমন্তীকে আর খুকুকে পাঠিয়ে দিন। তাদের জন্যে সব প্রস্তুত।[৯] আশ্রমের সবাইকে আমার নমস্কার দেবেন।

প্রণত
অমিয়

[দ্বিতীয় পুনশ্চ]

Stalin-Wells-Shaw পুঁথি আলাদা পাঠালাম,—Low-এর চমৎকার আঁকা সমেত।[১০] আপনি প'ড়ে আনন্দ পাবেন। সমস্ত য়ুরোপে আজ ঐ নিয়ে কথা উঠেচে। অনেক প্রশ্ন ছিল আপনার কাছে। মানুষ কি সত্যি একটা নূতনতরো সমন্বয়ের মুখে দাঁড়িয়েচে? অনিলবাবুকে বলবেন তিনি যদি Dunne এর *Serial Universe* এবং Day Lewis এর *A Hope for Poetry* আপনাকে আনিয়ে দেন।[১১] বিশেষরকমের বই—সত্যিকার ভাববার কথা আছে।

১ রবীন্দ্রনাথের চিঠিটি ২৮ নবেম্বরে লেখা।
১৯১২ থেকে ১৯২৮-এর মধ্যে প্রকাশিত ইংরেজিতে অনুবাদ করা কবিতার সমস্ত বই থেকে কোন-কোন অনুবাদ selected বা collected সংস্করণে বাদ যাবে সেগুলি রবীন্দ্রনাথ নিজে হাতে চিহ্নিত ক'রে অমিয় চক্রবর্তীকে অক্সফোর্ডে পাঠান এবং লেখেন : 'আমি যেগুলো চিহ্নিত করেছি তারো অতিরিক্ত কিছু যদি ছাটতে চাও নির্মম ভাবে ছেঁটো।' ('চিঠিপত্র' ১১শ, ৭১)

২ অমিয় চক্রবর্তী প্রস্তাব করেছিলেন অনেক অনুবাদ পরিমার্জনা অথবা বর্জন করা দরকার। বেশ কিছু পুরনো অনুবাদ ছাটাই হয়েছে ঠিকই, অগ্রন্থিত অল্প কিছু অনুবাদ যোগ করাও হয়েছে, আর সব যেমন ছিলো আছে। তবে অন্য লেখকদের রচনার অনুবাদ কোনোটাই Collected Poems-এ নেই। [ভূমিকা দ্র. ]

৩ মূলে ইংরেজিতে লেখা রবীন্দ্রনাথের একমাত্র কবিতা "The Child" (১৯৩১)। "শিশুতীর্থ" নামে এ-কবিতার বাংলা অনুবাদ 'পুনশ্চ' (১৯৩২) গ্রন্থে আছে। ১৯৬১ সালে কবির জন্মশতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কবিতাটি বাংলা অনুবাদ-সহ পুস্তিকা আকারে পুনর্মুদ্রণ করেন। 'আধুনিক বাংলা কবিতা' গ্রন্থে এটি নির্বাচন করায় কবি আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। (বুদ্ধদেব বসুকে কবির চিঠি দ্র.)।

৪ ১০ ডিসেম্বরে লণ্ডনে এই এম্পায়ার এক্সিবিশনের উদ্বোধন হয়। ইচ্ছাকৃত ভাবে বাঙালি শিল্পীদের ছবি এমন ভাবে টাঙানো হয়েছিলো যাতে সহজে দর্শকদের দৃষ্টিগোচর না হয়। তা ছাড়া, অমিয় চক্রবর্তীর মতে, প্রদর্শিত ভারতীয় চিত্রকলায় নবোদ্‌গত জাতীয় চেতনার কোনো প্রতিফলন ছিলো না, যেমন দেখা যায় আফ্রিকা, জাপান, মেক্সিকো বা তুর্কীর চিত্রকলায়। অমিয় চক্রবর্তীর পাঠানো এই প্রতিবেদন খানিকটা অদলবদল ক'রে রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী'-তে পাঠিয়েছিলেন। ('চিঠিপত্র' ১১শ, ৭৩)

৫ গবাবাবু— সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র ব্রতীন্দ্রনাথ, ছবি আঁকতেন।

৬ 'চৌরঙ্গী স্কুলের' অর্থাৎ কলকাতায় চৌরঙ্গীতে গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলে প্রবর্তিত রীতির ছবি। সেখানে য়ুরোপীয় এবং ভারতীয় শিল্পপদ্ধতির মধ্যে একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছিলেন অধ্যক্ষ ই. বি. হ্যাভেল, তাঁর কথা পরে আসবে। এ-চিঠি লেখার সময় সেখানে প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ ছিলেন মুকুল দে। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের ছাত্র মুকুল দে ছবি আঁকতে শেখেন কলকাতায় অবনীন্দ্রনাথের কাছে। ১৯১৬ সালে কবির সঙ্গে জাপানে ও আমেরিকায় যান, এবং পরে শিকাগো আর্ট ইনস্টিটিউটে এচিং পদ্ধতিতে হাত পাকান, যে-বিদ্যা ছিলো ভারতে অভিনব। আরো পরে ১৯২০ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত লণ্ডনে থেকে চিত্রবিদ্যার পাশ্চাত্য রীতি আয়ত্ত করেন। কলকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হন ১৯২৮ সালে। এই বিদ্যালয়ে, ১৯৩২ সালে, তিনি এদেশে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার দ্বিতীয় প্রদর্শনীর বিরাট আয়োজন করেছিলেন। সে-ছবি দেখার চোখ বা মন এদেশে তখনো তৈরি হয়নি। নামমাত্র মূল্যে বিক্রয়ের জন্যে রাখা রবীন্দ্রনাথের অনেক চিত্র এবং হাতের কাজ অবিক্রীত থেকে যায়।

৭ চিঠির শেষে এই বিষাদভরা সন্ধ্যাভাষার মর্ম হয়তো রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, এতদিন পরে অন্য কারো পক্ষে অর্থ অনুমান করা কঠিন।

৮ কবিতাটি 'পরিশেষ' (১৯৩২) গ্রন্থের "বিস্ময়", বহুদিন অবধি অমিয় চক্রবর্তীর ঘরের দেয়ালে টাঙানো ছিলো। পরে চুরি যায়।

৯ স্ত্রী-কন্যার যাওয়া হয়নি।

১০ প্রখ্যাত রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্রী Sir David Low (১৮৯১-১৯৬৩) 'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান', 'নিউ স্টেট্‌সম্যান' প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এঁর একটি মাত্র বই, *This England* বিশ্বভারতীর সংগ্রহে দেখা যায়।

১১ অনিলবাবু—অনিলকুমার চন্দ, তখন কবির ব্যক্তিগত সচিব, এবং কলেজ বিভাগের অধ্যাপক। বই দুটি আনানো হয়েছিলো কিনা জানা যায় না। বিশ্বভারতীর কোনো গ্রন্থাগারে নেই।

## ১৬

Dec. 20 / 34

As from
BALLIOL COLLEGE
OXFORD
লণ্ডন

শ্রীচরণকমলেষু,

আশ্রমে ৭ই পৌষের উৎসব আসন্ন—এখানে থেকে তার ছবি মনকে উতলা ক'রে তোলে। গোরুর গাড়ির সারি চলেছে যাত্রীর ভিড়ে, মেলার দোকানে সাঁওতালি বীরভূম-গ্রামবাসীর জনারণ্য, ভোরের সানাই, আশ্রমের গান, মন্দির, উত্তরায়ণে সারাদিন ধ'রে যাত্রী, আশ্রমবাসীর আনাগোনা, হাসির শব্দ, সন্ধ্যায় শীত-লাগা ধুলোয়-ভরা মাঠের আকাশে মাঝে মাঝে আতস-বাজি, প্রকাণ্ড ভিড়ের অন্ধকারে যাতায়াত। বহুদিন এসবের বাহিরে আছি, হয়তো চিরদিনের মতোই বাহিরে, কিন্তু সমস্ত জীবনের মধ্যে সবই র'য়ে গেল। কারো নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম না এখানকার বড় দিনে, কারণ দেখেছি যতই সমাদর করুন না কেন অতিথিকে, এ সময় হোলো এদের বাড়ির আনন্দের, পরিবার আত্মীয় বন্ধুর নিভৃত আয়োজন। সে সময়ে আমি মধ্যে থাকতে চাই না, কখনোই ঠিক সুর এসে পৌঁছবে না। কিন্তু এদের এই গভীর আনন্দ উৎসবে আমাদের তো বাধা নেই, সমস্ত অন্তর দিয়ে এর সঙ্গে এক হতে পারি। বিশেষতঃ গ্রামের অতিথি যারা উত্তেজিত হয়ে লণ্ডনে আলোর মায়াপুরীতে সন্ধ্যায় ঘুরে বেড়ায়, সাজানো দোকান অগণ্য প্রদর্শনী নাট্যাভিনয় এই সবের মধ্য দিয়ে সহজ খুসি নিয়ে চলে তাদের সঙ্গে এবং এদের হাসি-

মুখী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমাদের প্রাণ আপনি এসে মেলে। কখনো দেখি অনেক রাতে গির্জ্জেতলায় নিরন্ন কোনো দুঃখী Chestnut ভেজে বিক্রি করচে, ভিক্ষে চাইবে না কেবল দেশলাইয়ের বাক্স হাতে কেউ এক দৃষ্টে চেয়ে আছে সামনের দিকে, মুখে ভাগ্যের কাছে পরাভব নেই, একান্ত দৈন্যেও মনের গৌরব জেগে আছে। বোধহয় Maude Royden-এর Guildhouse-এ [১] দরিদ্র ছেলেমেয়েদের Christmas দেখতে যাবো, একবার দেখেছিলাম কখনো ভুলব না। কী ঐশ্বর্য্য ঐ উৎসবে। কত পুরুষ মেয়ে তাদের আরাম উৎসব ছেড়ে দিয়ে সমস্ত দিন অনেক রাত অবধি এই শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্যে নিজেদের Christmasকে এইভাবে কাটিয়ে আনন্দ পায় এইটেই দেখবার জিনিস। অথচ কিছু মাত্র দেখানো নেই—সবটাই স্বাভাবিক। Dr. Royden খুব একটা সত্যকার প্রভাব সৃষ্টি করেচেন—তিনি তো এখন করাচীতে, কিন্তু তাঁদের কাজ ভালোই চলচে। মহাত্মাজি তাঁকে ডেকেচেন Wardhaয় কিন্তু তিনি যেতে পারবেন না —হয়তো তাঁর পঙ্গুতা নিয়ে ( এক পা ব্যবহার করতে পারেন না ) বাংলা অবধি অতদূর রেলগাড়িতে যাওয়া সম্ভব হবে না, কিন্তু তবু আপনি যদি তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে একটা টেলিগ্রাম পাঠান তাহলে বড়ো ভালো হয়। এঁরা হলেন য়ুরোপের সত্যিকার য়ুরোপীয়।

মধ্যে একবার Continent-এ যাব একটা Conference-এ। কিন্তু এখন আমার তর্জ্জমা হয়ে গেছে এবং পরবর্ত্তী মাজাঘষা ভালোই চলচে। এ বিষয়ে পরে লিখব। শশধরবাবুর তর্জ্জমা Thompson-এর হাতে—তাঁকে বলে এসেচি।[২] বোধহয় একটু বেশি বাদ পড়েচে—এতে Original এর জোর অনেকটা চলে গেছে, কতকগুলি linkও একটু অস্পষ্ট হয়ে গেছে মনে হয়। শুধু ইংরেজের বিষয় নয়, আপনার ব্যক্তিগত দু-একটা যা কথা ছিল এবং যার personal interest এদেশের পক্ষে বহুমূল্য তাও বাদ গেছে। যাই হোক, এবিষয়ে দেখা যাক্ এদের লোক কী বলেন, শশধরবাবু যাচাই ক'রে আপনাকে জানাবেন। এতটা বদল দেখে publisher-রা একটু দমে যাবে তিনি ভয় করচেন। কিন্তু আমি এবিষয়ে সব জানি না, যতটুকু সহায়তা করতে পারব করব, শেষ পর্য্যন্ত যা হয় তা শশধরবাবুই সব জানাবেন এবং আপনার মতানুসারে যা কর্ত্তব্য করবেন।

Collected Poems, Collected Dramas, Collected Prose এই তিন Volume আপনার যাতে Macmillan-এর হাত দিয়ে ঠিকমতো বেরোয়—final version European public-এর হাতে পৌঁছয় যথাসাধ্য তাই নিয়ে লেগে থাকব—এতে অনেক খাটুনি আছে এবং এর জন্য অনেক সময় এবং বহু negotiations ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এই কাজ যদি এখন থেকে ঠিকমত এগোয় তবে তার চেয়ে বড় কাজ কিছু হতে পারে না। এই কাজ করতেই হবে এবিষয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ নেই।

আপনার travel literature-এর একটি সুন্দর volumeও এদের হাতে দিতে হবে।[৩]

লণ্ডনের অন্ধকার দিন রাত্রির কুয়াশা বিদ্যুৎ আলোর মরীচিকার মধ্যে ঘুরে বেড়াই,

জানি না কোথায় ঘর। জানি এসবের চারদিকে গ্রহসূর্য্য নির্ম্মল অনন্ত আকাশে চলেছে, প্রাণের ফুল ফুটচে মাটিতে, মৃত্যুর আলো লেগেচে জন্মের ক্ষণিক হাসিতে। সেইখানে পরম সান্ত্বনা—আর কিছু নয়, শুধু ছবি দেখে মনে, মনের উপর-তলে, মনের অতীতে। তার সঙ্গে মেশে এই প্রাণের নৃত্যচঞ্চল চমকিত ছবির চলাচল।

আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আশ্রমের সবাইকে আমার নমস্কার, ৭ই পৌষের অভিবাদন।

প্রণত অমিয়

(ক) *Oxford Book Of Bengali Verse* বিষয়ে কিছুই আর জানি না। আশা করচি তৈরি হয়ে এল। যদি modern section সম্পূর্ণ হয়ে থাকে তাতে আমার একটি কবিতা যেটা আপনার মনে হয় চলবে include করবেন। এঁরা সবাই বলচেন প্রত্যেক anthologistই তা করেন। তাতে আমার আনন্দ এবং গৌরব হবে। এবং বিদেশে এই সংগ্রামে হঠাৎ যদি চরম বিপদে পড়ি কিছু একটু আশ্রয়চিহ্ণ (sic) তবু তাতে পাব। "প্রাণ-মৃত্তিকা" যেটা 'পরিচয়'-এ বেরিয়েছিল, আপনি ভালো বলায় সুধীনবাবু নিয়েছিলেন এবং তাঁরও পছন্দ হয়েছিল সেটা বোধ হয় যেতে পারে। চারদিকে বড়ো একটা অন্ধকার আসন্নতার সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেচি।[৪]

অমিয়

---

**টীকা**

১ Maud Royden—অসামান্য এই ইংরেজ মহিলার কথা পূর্বে ১০ ও ১২-সংখ্যক চিঠিতেও আছে। 'য়ুরোপের সত্যিকার য়ুরোপীয়' এই মানুষটি সে-সময় ভারতবর্ষে গিয়েছেন। দেহের পঙ্গুতা নিয়ে সর্বত্র ইচ্ছেমতো ভ্রমণ করা কঠিন ছিলো, তথাচ সম্মান জানিয়ে এঁকে আশ্রমে আমন্ত্রণ করাও দরকার—সে-কথা কবির প্রাক্তন অথচ সদাসজাগ সাহিত্যসচিব কবিকে মনে করিয়ে দিতে ভুলছেন না।

২ প্রাক্তন শান্তিনিকেতনিক শশধর সিংহ (১৯০১-১৯৭২) লণ্ডনে তখন 'বিবলিওফিল' নামে ভারতীয় এবং বিদেশী বইয়ের চমৎকার একটি দোকান চালাচ্ছিলেন, ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পাড়ায়। প্রবাসী ভারতীয়দের কাছে দোকানটি হ'য়ে উঠেছিলো তীর্থ-বিশেষ। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এখান থেকে অর্ডার দিয়ে বই আনাতেন। শশধর সিংহ 'রাশিয়ার চিঠি'-র (১৯৩১) যে-অনুবাদ করেছিলেন তার গুণাগুণ বিচারের জন্যে, রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে, সেটি অক্সফোর্ডের অধ্যাপক এডোয়ার্ড টম্‌সনের কাছে পাঠানো হয়।

৩ রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধের ইংরেজি অনুবাদ একত্র ক'রে তিনখণ্ডে সমগ্র সংগ্রহ প্রকাশের প্রস্তাব করেছিলেন অমিয় চক্রবর্তী। তার সঙ্গে চতুর্থ আরও একখণ্ড যোগ করতে বলছেন —'সমগ্র ভ্রমণসাহিত্য'। *Collected Poems and Plays* ছাড়া আর কোনো খণ্ডই শেষ পর্যন্ত বেরোয়নি।

৪ প্রস্তাবিত *Oxford Book of Bengali Verse*-এর আধুনিক অংশের কবিতা নির্বাচনে অমিয় চক্রবর্তী সহায়তা করেছিলেন, খুব সম্ভব অক্সফোর্ড থেকে দু মাসের ছুটিতে যখন দেশে ফিরেছিলেন তখন। এ-কথা রবীন্দ্রভবন সংগ্রহের অন্তর্গত স্যর

মাইকেল স্যাডলারকে লেখা কবির চিঠি থেকে জানা যায়। "প্রাণ-মৃত্তিকা" নামে নিজের যে-কবিতাটি সংকলনভুক্ত করার অনুরোধ করছেন সেটি ১৩৪০-এর শ্রাবণ সংখ্যা 'পরিচয়' পত্রিকায় বেরিয়েছিলো। এটি গদ্যকবিতা, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও যে-আঙ্গিকে অমিয় চক্রবর্তী প্রায় কখনোই লেখেননি। তাঁর কোনো কাব্যগ্রন্থেও কবিতাটি স্থান পায়নি। আঙ্গিক হিশেবে গদ্যকবিতার তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন।

কৌতুকজনক ব'লে কথাটা উল্লেখ করা দরকার: অমিয় চক্রবর্তী, হয়তো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে, 'চিহ্ন' লিখতেন ভুল বানানে (চিহ্ন)!

## ১৭

Jan. 9, 1935

Assisi[১]

শ্রীচরণকমলেষু,

গভীর রাত্রে এই পাহাড়ে গ্রামে এসে পৌঁছেচি মধ্যযুগের ইটালীতে। সমস্ত বরফে জমে গেছে, তারা ঝকঝক করচে, প্রার্থনার মতো জেগেচে প্রাচীন পাথরের চূড়া। কোথাও জায়গা পাচ্ছিলাম না, শেষে গ্রামের প্রান্তে কয়েকটি Nun আমাকে আশ্রয় দিয়েচেন তাঁদের পাথরের আঙিনার কোণে একটি ঘরে, বড় আনন্দে আছি। দূরে জানলার তলে পাহাড়ের উঁচু নীচু গ্রামে দু-একটি আলো জ্বলচে। পবিত্র এই জায়গা, শুভ্র জীবনের স্মৃতিতে জড়িত। এখানকার মাধুরীকে কাল স্পর্শ করেনি। গভীর শান্তি পেয়েচি।

কোথাও শব্দ নেই বরফে আচ্ছন্ন হাওয়ায়। ধ্যান জেগে আছে সহজ সাদাসিধে চিরকালের ইটালীয় এই গ্রামের জীবনে।

এইখান থেকে আপনার কাছে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম পাঠালাম।

প্রণত
অমিয়

---

**টীকা**

১ পেরুজিয়ার দক্ষিণ-পূর্বে মধ্য ইতালির গ্রাম আসিসি, খ্রিস্টিয় ফ্রান্সিস্কান সমাজের প্রতিষ্ঠাতা সন্ত ফ্রান্সিস-এর (১১-১২শ শতক) জন্মস্থান।

এই এক আশ্চর্য ব্যাপার অমিয় চক্রবর্তীর জীবনে। প্রথানুসারী ধার্মিক তিনি ছিলেন না, আবার তাঁকে অধার্মিক বা অবিশ্বাসী বললেও অপলাপ করা হয়। কখনো তিনি ব্রাহ্ম হয়েছিলেন ব'লে জানা যায় না, প্রচলিত হিন্দু ধর্মেও তাঁর বিন্দুমাত্র আস্থা ছিলো না, একটু বরং বেশি মাত্রায় তার স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতেন। অথচ সাহিত্যের ডিগ্রি নিয়েও জীবনের বেশির ভাগ সময় তিনি তুলনামূলক ধর্মসংস্কৃতির অধ্যাপনা করেছেন। প্রাচীন মূল সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ থেকে অসংখ্য ভাবনারঞ্জিত শব্দসম্ভার তাঁর

কবিতায় যে-পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে তা একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো রচনায় দেখা যায় না। পৃথিবীতে সর্বত্রগতি এই বাঙালি কবি অবসর পেলেই অন্যের অলক্ষিতে কোনো বৌদ্ধ বা Zen বিহারে, রামকৃষ্ণ মিশনে, অরবিন্দ আশ্রমে, প্রাচীন বা আধুনিক নানান খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মনাস্টারিতে, শিখ গুরুদ্বারে, ইহুদি বা ইসলামী ধর্মকেন্দ্রে একলা মানুষটি হঠাৎ কিছুকালের জন্যে অদৃশ্য হ'য়ে যেতেন। বন্ধু হোল্‌টবি বিষয়ে বলতে গিয়ে এক চিঠিতে এই মনোভাবকেই বোধ করি তিনি 'মডার্ন স্পিরিট' বলেছেন।

## ১৮

13.1.35 Vileneuve [১]

শ্রীচরণকমলেষু,

ফেরবার পথে রলাঁর সঙ্গে দেখা করতে নেমেচি কয়েক ঘণ্টার জন্যে। তিনি Mrs Rolland এবং Mlle Rolland সবাই আপনাকে শ্রদ্ধানমস্কার পাঠাচ্চেন এবং রথীবাবু প্রতিমা দেবীকে প্রীতি অভিবাদন জানাচ্চেন। এখন এখানে সমস্ত বরফে ঢাকা, কী সুন্দর দেখতে হয়েচে। এঁদের সঙ্গে কথাবার্ত্তাতেও এই শুভ্রতা অনুভব করচি। Florence-এ Papini [২]-র সঙ্গে অনেক কথা হল, তিনি আপনাকে গভীর শ্রদ্ধা করেন। সে সব বিষয়ে পরে লিখব। কিছু বই আপনার জন্যে পেয়েচি—ইংলণ্ড থেকে পাঠাব। ইটালীতে সবাই আপনাকে ভালোবাসে এবং আপনার বইএর পাঠক খুব বেশি।

প্রণত
অমিয়

---

টীকা

১ সুইজারল্যাণ্ডের পাহাড়ী গ্রাম ভিল্‌নাভ্, যেখানে সস্ত্রীক রোম্যাঁ রলাঁ (১৮৬৬-১৯৪৪) তাঁর ভগ্নী মাদ্‌মোয়াজেল রলাঁর সঙ্গে স্বদেশ থেকে নির্বাসিতের মতো বাস করতেন। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার ১৯১৫-তে। ১৯২৬ সালে যেখান থেকে লেখা কবির চিঠি পেয়েছিলেন অমিয় চক্রবর্তী, ('চিঠিপত্র' ১১শ, ৩৫) আজ সেই ভিল্‌নাভ্ থেকেই তিনি চিঠি লিখছেন কবিকে। এও একরকমের তীর্থপরিক্রমা।

২ প্রথম জীবনে নৈরাজ্যে ও নিরীশ্বরবাদে বিশ্বাসী ইতালীয় লেখক Papini ( Geovani Papini. ১৮৮১-১৯৫৬ ) ক্রমে ধর্ম ও ফ্যাসিবাদের প্রবক্তা হ'য়ে ওঠেন। *Dante Vivo* গ্রন্থের জন্যে ১৯৩৩ সালে তাঁকে 'মুসোলিনি পুরস্কার' দেওয়া হয়। তাঁর লেখা অন্য দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ—*Story of Christ* (১৯২১) এবং *Gog* (১৯২৯)। লেখকের স্বাক্ষরিত উপহার হিশেবে ফ্লরেন্স থেকে পাঠানো *Gog* বইটি বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারে আছে।

Jan. 18, '35 OXFORD

শ্রীচরণকমলেষু,

রোম থেকে ফিরে আপনার চিঠি পেলাম।[১] typed কবিতাগুলিও এসেচে। কিন্তু আপনার চিহ্নিত (sic) ইংরেজি কবিতার বইগুলি এখনো এল না—প্রতি হপ্তা তার খবর করেচি। এত দেরি কেন হচ্চে বুঝতে পারচি না। সেগুলি এলে সব একত্র ক'রে Daniel Macmillan-এর সঙ্গে বসা যাবে। নূতন কবিতা যোগ হয়ে Collected Edition-এর বিশেষ মর্য্যাদা বেড়ে যাবে।[২]

"রাশিয়ার চিঠি" সম্বন্ধে Thompson-এর চিঠি শশধরবাবু আপনাকে পাঠিয়েচেন। তাঁর তো মত নয় এই ইংরেজি অনুবাদ ছাপানো। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁরই তো শেষ মত নয়—এদিকে publisher-রা তো চাচ্চে। আপনি যা ঠিক করবেন তাই হবে। ব্যক্তিগত উল্লেখ ইত্যাদি বাদ দিয়ে original-এর যতখানি পারা যায় রাখতে হবে। আপনি তো মত দিয়েচেন। ছাপাতে হলে এক হাতের তর্জ্জমাই বোধ হয় থাকা ভালো—Quarterly-র তর্জ্জমার চেয়ে শশধরবাবুর লেখাই বোধ হয় উৎকৃষ্ট।[৩] জিনিষটা জটিল হয়ে উঠেচে—আপনি শশধরবাবুর সব চিঠিপত্র প'ড়ে তাঁকে যা বলবেন সেই মতো ঠিক হবে।

"চার অধ্যায়ে"র বাংলা বেরিয়ে যাচ্চে খুব ভালো হল। মনে হয় না কিছু গোলমাল হবে। এদিকে ইংরেজিও শীঘ্র বেরোবে।[৪] Asia-তে ছাপালে অনেক মাস দেরি হবে বই হতে[৫]—তা ছাড়া publisher-দের গরজ কমবে, বিশেষত American কাগজে বেরোলে। শেষ পর্য্যন্ত তাতে আর্থিক ক্ষতি হবে। ইংরেজি তর্জ্জমা এখন দু-একজন প'ড়ে দেখচেন। তাঁদের মতামত সমেত সব জিনিষটা আপনার হাতে পৌঁছবে। এদিকে তাড়াতাড়ি যাতে ছাপা হয় সব ব্যবস্থা ঠিক হচ্চে। সুভাষবাবুর বই খুব interesting হয়েচে—তবে মতামত তো তাঁর নিজস্ব। C. R. Das যাঁর গুরু, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর আগাগোড়া দৃষ্টি অত্যন্ত বিশেষ রকম হতে বাধ্য। এদেশে বইখানা নিয়ে খুব আলোচনা জমে উঠচে। ভারতবর্ষে ওটা proscribed হবে সন্দেহ নেই। তাই সাহস ক'রে বইটা পাঠাতে পারলাম না—পথে মারা গেলে মিথ্যে চেষ্টা। তবে আশা করি, কোনোভাবে আপনার চোখে পড়বে। এদেশের ভালো publisher ছাপিয়েচে, এবং সর্বত্র review বেরোচ্চে। সুভাষবাবুর ভারতবর্ষে আমাদের culture আমাদের আধুনিক চিত্তজাগরণের জায়গা নেই—এবিষয়ে উনি য়ুরোপীয় party politician—যদিও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে এত প্রাধান্য দিয়েছেন জাতীয় জাগরণের দিক থেকে। অনেক কথা খুবই ঠিক বলেচেন এবং খুব জোরে বলেচেন যা বলা দরকার ছিল।[৬]

Rolland-দের সঙ্গে দেখা করলাম ফেরবার পথে। Montreaux-তে ট্রেন থামল

—হাতে সময় ছিল, হঠাৎ নামবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। সেখান থেকে তো কুড়ি মিনিটের পথ। হাঁটু পর্যন্ত snow-এ ঢাকা পড়েচে চলার রাস্তা —কোনোমতে ঠেলে উঠলাম তাঁর বাড়ি পর্যান্ত। সমস্ত দিন ধরে কথা হল—Madame Rolland-কে বড়ো ভালো লাগল। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ভারি ভালো সহৃদয় মন। Madeline Rolland ছিলেন না—বিকেলে এলেন কিছু কথাবার্ত্তা হোলো। আপনার কথা সবাই কত বল্লেন। আপনার সঙ্গে তোলা Rolland-এর (sic) ছবি ওঁদের কত গর্ব্বের জিনিষ। রথীবাবু প্রতিমা দেবীকে বিশেষ স্নেহঅভিবাদন জানালেন। সেই Hotel Byron এখন ভাঙা দেয়াল নিয়ে চেয়ে আছে—দরজায় caretaker-এর প্রকাণ্ড হিংস্র কুকুর বাঁধা। প্রথমে সেইখানে গিয়েছিলাম পথের সন্ধানে—কিন্তু বরফে ঢাকা রিক্ত ভগ্নাবশেষে কেবল একাকী জন্তুর গর্জ্জনের প্রতিধ্বনি, কোথাও কেউ নেই। Villa Olga দৈবক্রমে দেখতে পেয়ে বাঁচলাম। অত বরফের মধ্যেও সূর্য্যের আলো আকাশে অবশিষ্ট ছিল এই রক্ষা।

Papini-র কথা লিখেচি। Florence-এ তাঁকে ভালো ক'রে জানলাম। Croce-এর [৭] (sic) পর এত বড়ো দরের লোক আধুনিক Italy-তে নেই। তাঁর *Story of Christ* য়ুরোপে classic-এর জায়গা পেয়েচে, কিন্তু অন্য সব বই অতটা জানা নেই জেনে তিনি আপনাকে তার কিছু উপহার দিতে চাইলেন। আমি সানন্দে পাঠাবার ভার নিলাম। Dante-র উপর বইখানি উৎকৃষ্ট। *Gog* বইখানি brilliant। এখানে এসে Unwin-কে দিলাম লণ্ডনে pack করে পাঠিয়ে দেবার জন্যে। আরো বই সঙ্গে রইল। Papini আপনাকে গভীর শ্রদ্ধা করেন। ভারি আশ্চর্য্য রকমের দীপ্তি ওঁর personality-তে, কথাবার্ত্তায়,—ইংরেজি জানেন না কিন্তু বোঝেন এবং ফরাসিতে পারদর্শী। আপনাকে ওঁর নিজের লেখা এবং অন্য Italian বই পাঠাবেন বিশ্বভারতীর জন্যে এই বইগুলি পৌঁছলে। আমাদের ওখানে বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা আছে জেনে মহা উৎসাহিত হলেন। এঁকে আপনার নূতন বই কিছু autograph ক'রে এবং inscribe ক'রে পাঠাবেন—উনি কী চমৎকার লিখে দিয়েচেন প্রত্যেক বইয়ে। এঁর মতো লেখকের চিরদিনের বন্ধুত্ব অর্জ্জন করেচে বিশ্বভারতী। পরের মেলে তাঁর ঠিকানা পাঠাব—কারণ এ চিঠি পৌঁছবে বইয়ের অনেক আগে।[৮]

Croce-এর (sic) Poetry সম্বন্ধে lecture Oxford Press ছাপিয়েচে—তার এক কপি আপনাকে পাঠালাম।

ইটালীর বিষয়ে এত বলবার আছে যে চিঠিতে লেখবার চেষ্টা করলে কষ্ট পাব। ওদের ব্যাপার সব শেষ হলে আমি নিজের মতো ওদের intellectual-দের সঙ্গে দেখা করেচি Rome-এ, Florence-এ, Perugia, Milan ইত্যাদি সহরে। Govoni ওদের বড়ো কবি এবং Lucio D'Amtra গল্পলেখক এই দুজনকে বেশ লাগল।[৯] মোটের উপর বাধ্য হয়ে এঁরা compromise ক'রে টিকে আছেন—মনের ভিতরে অত্যন্ত ভার চেপে আছে।শাসনতন্ত্র বা যুদ্ধমনোবৃত্তি সম্বন্ধে এক কথা বলবার অধিকার নেই কারো—press officer-এর মত এবং বিচার চূড়ান্ত। কিন্তু আজ Italy

ধনে প্রাণে য়ুরোপে এমন একটা জোরালো জায়গা পেয়েচে—যেমন ক'রে হোক আজ এরকম চারিদিক থেকে জেগে উঠচে যে ইটালীয় কারো পক্ষে Mussolini-কে ব্যক্তিগতভাবে অস্বীকার করা শক্ত। Croce-ও অনেকটা বদলেচেন। Rollandও দেখলাম Hitler-এর ব্যাপার দেখে Italy-কে তবু খানিক স্বীকার ক'রে নিতেই রাজি।

(Rome-এ একদিন হঠাৎ ঘটনাচক্রে Major Rapicavoli-র সঙ্গে দেখা হল—তিনি Croce-কে এনেছিলেন আপনার কাছে। আরো কিছুকাল পরে আপনাদের Interview সম্বন্ধে তিনি লিখবেন ঠিক করেচেন, বললেন।)[১০]

আপনার সম্বন্ধে ইটালীতে বিরুদ্ধতা নেই। কোনোকালেই জাগেনি সর্ব্বসাধারণের মনে। রাষ্ট্রনেতারা একটু মুশকিলে পড়েছিলেন, কিন্তু সব শুদ্ধ আপনি যা বলেছিলেন তাতে সবাই আরোই আপনাকে শ্রদ্ধা করেচে—বড়ো য়ুরোপে আপনার আচরণ খুব বড়ো করেই গ্রহণ করেচে। Italy-তে আধুনিক intellectual-দের জায়গা সঙ্কীর্ণ—কিন্তু পরস্পরের মধ্যে যোগ ঘনিষ্ঠ। তাঁদের সঙ্গে আপনার বইয়ের আলোচনা করেচি এবং কিছু ভুল ধারণা দূর করেচি মনে হয়।

—Formichi আজ অবধি সাম্‌লে উঠতে পারেননি—Tucci তবু বাহিরে হৃদ্যতা দেখান, এবং ভারতীয় বিদ্যার চর্চ্চায় সর্ব্বক্ষণ গভীর ভাবে নিযুক্ত। আর Pavolini সত্যিকার পণ্ডিত। Telephone-এ সংস্কৃতভাষায় কথা বলছিলেন। আমার বিদ্যা বুঝিয়ে বলাতে ইংরেজিতে বল্‌লেন।[১১] সব চেয়ে আনন্দ এবং শান্তি পেয়েচি Assisi-তে। কী আশ্চর্য্য জায়গা। মধ্যযুগের ধ্যান জেগে আছে তার পাথরের চূড়ায়, পাহাড়ের গ্রাম্য পথে পথে। মহাজীবনের করুণা ছবিতে, ভাস্কর্য্যে, সহজ ভালোবাসায় ভরা লোকের মুখে প্রাণধারা বহন করে চলেচে। কয়েকটি Nun আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন ঐ শীতের রাতে দূর নিভৃত পল্লীতে—সম্পূর্ণ অচেনা বিদেশী পথিককে চিরদিনের ভালোবাসা তাঁরা দিলেন।

লণ্ডনে একটা বক্তৃতা ছিল তাই বাধ্য হয়ে অমন জায়গা ছেড়ে চলে আসতে হল। কখনো পারি তো আবার যাবো—ওখানে ছবি দেখব, গ্রামে ঘুরে বেড়াব, লিখব। এই তো চিরদিনের ইটালিয়া—সেই দেশ, যেখান থেকে জেগেচেন দান্তে, Michael Angelo সেইখানে আশ্চর্য্য ছবি, বিচিত্র শিল্প, Vinci-র মতো সর্ব্বমুখী প্রশান্ত প্রবল সৃষ্টিশক্তিমান পুরুষ! St. Francis-এর নির্মল সুন্দর পুণ্য কর্ম্মশীল জীবন বয়ে গেছে একদিন এই Assisi-তে।

উদ্যত মুষল মুসোলিনীর সঙ্গে দেখা ও কথা হল—আজকের য়ুরোপে ইনিই নেতা। এখন তো এঁর য়ুরোপকে গড়ে তোলার দিকে চেষ্টা। কিন্তু য়ুরোপের রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়া মানুষের অসাধ্য। রলাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে Hitlerএর দিন আসন্ন। কিন্তু এই Plebiscite-এ Hitler-এর জোর বেড়ে গেল।[১২] খুব একটা তুমুল উত্তেজনার কেন্দ্র জর্ম্মানী এবং ইটালী এবং রাশিয়াকে নিয়ে ঘূর্ণিত হচ্চে—ইংরেজ চিরপ্রথামতো অতি সন্তর্পণে এই ভীষণ খেলায় নিজের দ্বীপে ব'সে যোগ দিয়েচে। কিন্তু ভারতবর্ষ নিয়ে তাদের খেলাটা মর্ম্মান্তিক হয়ে উঠেচে এদের মনে মনে—;

সত্যকার আশঙ্কা এঁদের বুকে জেগেচে এতদিনে। আর যাই হোক অনন্ত ভারতবর্ষ এই নূতন রাষ্ট্রিক চালে এক সঙ্গে বাধা দিল। বোধ হয় Compromise হতে হতে এইবার যথার্থ রাষ্ট্রিক ভিত্তি ভারতবর্ষে গ'ড়ে উঠবে। কিন্তু পল্লীসংগঠন এবং economic boycott-এ ভারতবর্ষ একটু শৈথিল্য করলে ভয়ানক ভুল করবে।

এন্ড্রুজ আপনার কথা বললেন, উৎসবের কথা,—সেদিন দেখা হয়ে আনন্দ পেলাম। কিন্তু উনি তো আবার চলেচেন পশ্চিম আফ্রিকায়। আশা করি ভারতবর্ষে ওঁর নামে অন্যায় আক্রমণের উত্তেজনা থেমেচে—*Bombay Chronicle* কী অশোভন কাজ করল। এতে উনি মর্ম্মাহত হয়েচেন। কিন্তু বড়ো ক্ষেত্রে যাঁর কাজ, বিচলিত হলে তাঁর চলবে কী করে। আমার দেশের এরকম ব্যবহারে মাথা নীচু হয় ; এখনও আমাদের অনেক দুঃখের পরীক্ষা বাকি আছে। এদেশে এসে সব চেয়ে অকেজো যারা তারাই সভায় উঠে কেবলি য়ুরোপকে গাল দেয়—এই কি এনেচেন তাঁরা ভারতবর্ষের চিরদিনের ভাণ্ডার থেকে, আর কিছুই নেই এদেশের মানুষকে দেবার ?

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

অমিয়

P. S. Oxford University-তে Educational Degree নিতে হলে এখন Santiniketan Educational Experiment সম্বন্ধে পড়তে হয়। বিশেষ ক'রে শিশু বিভাগ সম্বন্ধে। ছেলেদের মনে স্বাধীন ব্যক্তিত্ববোধনের জন্যে আপনি যা করচেন তা এদের চোখে বিশেষ মূল্যবান। এ খবরটা আমি জানতাম না—হয়তো দেশে অনেকেই জানেন না যে আপনার educational ideas এবং শিক্ষাকর্ম্মক্ষেত্র এদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আবশ্যিক জ্ঞানের অঙ্গ। একটি ছেলে Educational diploma নিচ্চে সে আমার কাছে এসেছিল, যা literature ছিল তাকে দিয়েচি এবং আপনার লেখা পড়তে বলেচি। শিশু বিভাগের experiment সম্বন্ধে ভালোরকম report বেরোনো উচিত।

---

**টীকা**

১ দুখানা চিঠি এসেছিলো শান্তিনিকেতন থেকে, ১ ও ৬ জানুয়ারিতে লেখা। ('চিঠিপত্র' ১১শ খণ্ডে ভ্রমক্রমে দুটির সংখ্যাই ৭৩-ব'লে ছাপা আছে।)

২ 'typed' কবিতাগুলি থেকে দশটি নতুন অনুবাদ *Collected Poems*-এ যোগ করা হয়। আগেকার কোনো স্বতন্ত্র অনুবাদগ্রন্থে এগুলি ছিলো না। [ ভূমিকা দ্র.]

৩ হিরণকুমার সান্যাল *Visva-Bharati Quarterly*-তে 'রাশিয়ার চিঠি'-র কিছুটা তর্জমা করেছিলেন। তুলনায় শশধর সিংহ-র তর্জমাকেই অমিয় চক্রবর্তীর বেশি ভালো লেগেছিলো, এডোয়ার্ড টমসনের লাগেনি। বোধ করি এই সব মতবিভ্রাটের দরুন কবির জীবৎকালে এবং পরেও বহুদিন 'রাশিয়ার চিঠি'-র কোনো ভাষান্তর ছাপা হয়নি। সরকারি ভাবেও এ-গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশের উপরে নিষেধাজ্ঞা ছিলো।

৪ সরকারি রোষের সম্ভাবনা অগ্রাহ্য ক'রে ১৯৩৪-এর শেষ দিকে মূল বাংলা 'চার

অধ্যায়' বেরিয়ে গেলো। দেখা গেলো, আপত্তি তুললেন একমাত্র তাঁরাই যাঁরা ছিলেন টেররিস্ট রাজনীতির সমথর্ক। অমিয় চক্রবর্তীকে রবীন্দ্রনাথ জানিয়ে দিলেন (১৯৩৫-এর ৬ জানুয়ারি)—মূল বইখানা যখন প্রকাশিত হোলোই তখন ওটা তর্জমা করবার কোনো হেতু রইলো না। অথচ তর্জমার কাজ ততদিনে শেষ হ'য়ে গেছে। তার ফলে নিজের গবেষণা ও অন্য নানা কর্মকাণ্ডের মধ্যেও সময় ক'রে তর্জমা শেষ করার সব পরিশ্রম অমিয় চক্রবর্তীর পক্ষে নিষ্ফল হ'তে চললো। অবশ্য এ-চিঠিতে তখনো তিনি নির্বিকার ভাবে লিখছেন: 'এদিকে ইংরেজিও শীঘ্র বেরোবে।' [ভূমিকা দ্র.]

৫ ন্যুইয়র্কের 'জনপ্রিয়' মাসিক পত্র *Asia* প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৭ সালে। পত্রিকার উপদেষ্টা-সম্পাদক ছিলেন বাঙালি বিজ্ঞানী বশীশ্বর সেনের আমেরিকান পত্নী শ্রীমতী গর্ট্রুড এমার্সন। তিনি চাইছিলেন 'চার অধ্যায়ে'র অনুবাদটি যাতে তাঁদের পত্রিকায় ছাপা হয়। মোটা টাকার প্রতিশ্রুতি ছিলো। [ভূমিকা দ্র.]

৬ সুভাষচন্দ্রের বইটির নাম *The Indian Struggle : 1920-31*। স্বাস্থ্যের কারণে ভারতবর্ষের জেল থেকে মুক্তি পেয়ে, ভিয়েনাতে চিকিৎসাধীন থাকা কালেই বইটি তিনি শেষ করেন। বার্নার্ড শ'-কে দিয়ে ভূমিকা লেখানোর ইচ্ছে ছিলো, এবং সে-ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সহায়তা প্রার্থনা ক'রে সুভাষচন্দ্র ১৯৩৪-এর অগস্ট মাসে চিঠিও লিখেছিলেন। চিঠিটি রবীন্দ্রভবন সংগ্রহে আছে।

৭ ফ্যাসিবাদ-বিরোধী (Benedetto) Croce ( ১৮৬৬–১৯৫২ ), ছিলেন বরেণ্য দার্শনিক, ইতিহাসবিদ, শিল্পভাবুক এবং ইতালির একজন সেনেটর।

৮ ফ্লরেন্স থেকে পাপিনি-র পাঠানো একটি বই শুধু বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে আছে, স্বাক্ষরিত উপহার *Gog*-এর প্রথম সংস্করণ, ন্যু ইয়র্কে হারকোর্ট ব্রেস-এর ছাপা।

৯ ( Corrado ) Govoni-র একটি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ *Broom* পত্রিকার ৩য় বর্ষে ছাপা হয়েছিলো দেখা যায়। কপি আছে ন্যু ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরিতে।

১০ ১৯২৫-এর জানুয়ারি মাসে সরকারের অতিথি হিশেবে রবীন্দ্রনাথ ইতালি ভ্রমণে যান। তিনি ইচ্ছে প্রকাশ করলেও মুসোলিনির ইচ্ছে ছিলো না যে ক্রোচে-র সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। পারস্পরিক কয়েকটি ইতালীয় বন্ধুর সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ক্রোচে দেখা করেন, গোপনে, অনেক রাত্রে। নেপল্‌স্ থেকে সেজন্যে তাঁকে লুকিয়ে রোমে রবীন্দ্রনাথের হোটেলে আসতে হয়েছিলো। সেই সাক্ষাৎকার ঘটিয়েছিলেন এই মেজর রাপিকাভোলি।

১১ (Carlo) Formichi ( ১৮৭১-১৯৪৩ ), রোমে রয়্যাল ইউনিভার্সিটির সংস্কৃত অধ্যাপক। শান্তিনিকেতনে এসে চার-পাঁচ মাস ছিলেন।

(Giuseppe) Tucci (১৮৯৪-১৯৮৪), ছিলেন তিব্বতী ভাষা-ধর্ম-সভ্যতার বিশারদ পণ্ডিত, রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিব্বতী 'মণ্ডল' (Mandala) এবং তান্ত্রিক চিন্তা ও শিল্প বিষয়ে এঁর জ্ঞান ছিলো অদ্বিতীয়।

এঁদের দুজনকেই মুসোলিনি ১৯২৫ সালের নবেম্বরে বিশ্বভারতীতে গবেষণা এবং অধ্যাপনার জন্যে পাঠান। তুচি বিশ্বভারতীতে ইতালীয় এবং চীনা ভাষা শেখাতেন। প্রায় একবছর ছিলেন শান্তিনিকেতনে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বাংলা

শেখাতেন। অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে তখন থেকেই তাঁর বন্ধুতা হয়। তিনিই আমাকে জানিয়েছিলেন যে ১৯৭৬ সালেও তুচি রোমের বিশ্ববিদ্যালয়ে Emeritus অধ্যাপক রূপে বিদ্যমান ছিলেন ।

Pavolini— ইতালীর আর এক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত।

১২ জর্মানিতে এ-সময় হিটলারের অভ্যুত্থান হচ্ছে। ভাইমার রিপাব্লিকের প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে হিটলারের হাতে ক্ষমতা আসে, শুধু 'প্রেসিডেন্ট' নামটা তিনি নেননি। পরিবর্তে নিজেকে Chancellor এবং Führer ব'লে ঘোষণা করেন। গণভোটে (plebiscite) হিটলারের সপক্ষে শতকরা চুরাশিটি ভোট পড়ে, জয় হয় তাঁর 'ন্যাশনাল সোস্যালিজম'-এর। চিঠিতে সেই গণভোটের কথা বলা হয়েছে।

## ২০

BALLIOL COLLEGE
OXFORD

ফেব্রুয়ারি ৪, ১৯৩৫

শ্রীচরণকমলেষু,

আপনার চিঠিখানি[১] প্রবাসী কি পরিচয়ে ছাপানো দরকার, আমাদের লেখকদের চোখ খুলবে। আধুনিক সাহিত্যের ভিতরকার কথা এমন করে বলেচেন। এদিক থেকে এঁরা যা বলতে চান তা বড়ো করে লিখচি, তাড়াতাড়িতে চিঠি শেষ করতে পারলাম না, পরের মেলে পাঠাবো। Yeats-এর এই কবিতাটি বেশ লাগ্ল : তিনি নিজের কথা বলচেন আধুনিক অতিবুদ্ধির সঙ্গে তুলনা করে :

God guard me from those thoughts men think
In the mind alone—
He that sings a lasting song
Thinks in his marrow bone.

From all that makes a wise old man
That can be praised by all—
Of what am I that I should not seem
For the song's sake a fool ?

I pray— for fashion's word is out
And prayer comes round again—
That I may seem though I die old,
A foolish passionate man. [২]

Eliot-পন্থীর উত্তরে এর চেয়ে ভালো এদের কেউ লিখতে পারেননি।[৩] Sturge Moore-এর সঙ্গে একদিন হঠাৎ দেখা হয়েছিলো [৪], আরেকবার গিয়ে ভালো ক'রে কথা কইব। বড়ো ভালো লাগে ওঁর সৌম্য শান্ত ব্যবহার। A. E.ও আপনার বিশেষ বন্ধু, যদিও আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি। তা ছাড়া আজ যাঁরা নূতন ক'রে ভাবচেন তাঁরা আপনাকে কী চোখে দেখেন আপনি জানেন না।— এবিষয়ে আমার চিঠিতে লিখব।

অনিলবাবুর Cable পেয়ে অবধি অশান্তিতে আছি—শেষ পর্য্যন্ত আশা ছিল যে হয়তো বই দেরিতে পাঠানো হয়েছিল তাই এখনো আসেনি। এখন ভারতবর্ষ থেকে পাঠানো ছাপা জিনিষ প্রায় সবই আটকা পড়ে যায় ভারতের সমুদ্রতীরে—কিন্তু বিশ্বাস করতে পারি না আপনার নিজের হাতের চিহ্নিত (sic) আপনার রচনা পথে নষ্ট হতে পারে। ওদিক থেকে পুরোপুরি অনুসন্ধান হওয়া দরকার। ইংলণ্ডে পৌঁছয়নি এরা খোঁজ ক'রে জানিয়েচে। আরো খবর চলচে।[৫] Typed কবিতা সব নূতন ক'রে আবার কপি করাচ্চি। এগুলি যোগ হলে বই আরো বিশেষরকম সমৃদ্ধ হবে।

ছাপানো "চার অধ্যায়" নিয়ে কিছু গোলমাল হয়েচে কিনা জানতে ব্যস্ত থাকব।[৬] তর্জ্জমা দেখচি প্রত্যেকেরই ভালো লাগচে, এইবার আমার হাতে ফিরে আসবে। আগে থাকতে বিশেষ দুচারজনের জানা থাকলে একটু সুবিধা হয়, যদি Book Society-র choice ঠিক করা যায় তাহলে তো আর ভাবনা নেই। হয়তো এখান থেকে ভারতবর্ষে পাঠালে পথে তাও আটকাবে—কিন্তু কপি রেখেই পাঠাবো। এ বই যে য়ুরোপে সর্ব্বত্র নাড়া দেবে এবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। Magazine-এ বার করলে বইয়ের ক্ষতি হবে সবাই বলচেন।[৭] *East & West* তো পেয়েচেন।[৮] এই নিয়ে খুব ব্যস্ত আছি। প্রায় প্রত্যেক Editor এবং news critic-এর সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে হচ্চে। এ না হলে বইয়ের সমুদ্রে শ্রেষ্ঠ জিনিসও চোখে পড়তে দেরি হয়ে যায়। আপনার চিঠি যে আজকের মানব সভ্যতার সমস্ত ভয় ভাবনার মধ্যে নূতন আলো এনে দিয়েচে এ কথা সর্ব্বত্র শুনচি। এর পরিচয় শীঘ্রই দিতে পারব।

*East & West*-এর কপি আপনার য়ুরোপীয় বিশিষ্ট বন্ধুদের কাছে এখান থেকেই পাঠাচ্চি—তাই আশ্রম থেকে আর পাঠাবার দরকার হবে না। সব জায়গায় review করাতে চাই। Unwin-এর সাহায্য পাচ্চি। ভারতবর্ষেরও জানাশোনা দুএকটা খবরের কাগজের কাছে review copies পাঠানো গেল।

'চার অধ্যায়ের' বিষয়ে জানাবেন—কর্ত্তৃপক্ষেরা কী করেন দেখা যাক। New Statesman-এর শেষ সংখ্যায় Andrews-এর চিঠি বেশ জোরালো হয়েচে—Editorial Comment ও ভালো লাগল। এরা বুঝতে আরম্ভ করেচে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এদেশে এখন এত কাজ করবার আছে তা কিছু বলা যায় না। Modern Age এবং আনুষঙ্গিক problems সম্বন্ধে আপনার ইংরেজি প্রবন্ধ দুচারটে এদেশে বার করতে চাই। এখন সময় এসেচে—এদের চিন্তার মোড় ফিরচে। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন।

অমিয়

টীকা

১ রবীন্দ্রনাথের চিঠিটি ১৯৩৫-এর ৬ জানুয়ারিতে লেখা, অমিয় চক্রবর্তীর আগের চিঠিতেও উল্লেখ আছে। চিঠিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী য়ুরোপীয় আধুনিক সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি বিষয়ে কবি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন। অমিয় চক্রবর্তীর সে-বিষয়ে স্পষ্টতই সায় ছিলো না। ততদিনে 'অডেন গোষ্ঠী' এবং অন্য অনেক নবীন লেখকদের সঙ্গে মিশে তাঁর সুস্পষ্ট একটি মত গ'ড়ে উঠেছে এবং নিজের স্বতন্ত্র লেখকসত্তাও তিনি আবিষ্কার করছেন।

২ লণ্ডনের পত্রিকায় সদ্য প্রকাশিত ইয়েটস-এর কবিতাটির প্রথমে নাম ছিলো 'Old Age'। এ-বছরেই ছাপা *A Full Moon In March* গ্রন্থে সেটির নাম দেওয়া হয় 'A Prayer for Old Age'। কবিতার পাঠ থেকে মনে হয় এটি তিন মাস আগেকার *Spectator* পত্রিকা থেকেই সরাসরি কপি ক'রে পাঠানো।

৩ T. S. Eliotকে (১৮৮৮-১৯৬৫) অমিয় চক্রবর্তী কখনোই উপেক্ষার যোগ্য ব'লে ভাবেননি, তবে তাঁর বেশি পছন্দ ছিলো ইয়েট্স এবং বামঘেঁষা তরুণতরদের কবিতা।

৪ Sturge Moore (১৮৭০-১৯৪৪)—ইংরেজ কবি, লেখক, গ্রন্থ অলংকরণের উপযোগী কাঠখোদাই শিল্পে পারদর্শী। ৬ জানুয়ারির চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ এঁর সুখ্যাতি ক'রে লিখেছিলেন: 'আমার পুরাতন বন্ধুদের মধ্যে আমার অন্তরের অনুরাগ সবচেয়ে অক্ষুণ্ণ আছে Sturge Moore-এর প্রতি। ...তাঁর মধ্যে সাহিত্যের আভিজাত্য অম্লান। ...আধুনিকতার কঠোর ঘর্ষণে তাঁর সহৃদয়তায় কড়া পড়ে যায়নি।' কবির পুরাতন ইংরজ বন্ধুদের অনেকের প্রতি অমিয় চক্রবর্তীর ততদূর শ্রদ্ধা ছিলো না। তাঁর স্পষ্টই মনে হয়েছিলো রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা প্রকৃতপক্ষে কিছুই চেনেন না। পরবর্তী কোনো-কোনো চিঠিতে এই মনোভাবের প্রকাশ আছে। আর যাই হোক *Collected Poems* সম্পাদনার কজে স্টার্জ মূরের কিছুমাত্র সহায়তা পাওয়া যায়নি। [ভূমিকা দ্র.]

Æ—পূর্বের ১২-সংখ্যক চিঠির ৪র্থ টীকা দ্র.।

৫ ইংরেজি সমগ্র কবিতা অথবা চয়নিকায় কোন-কোন অনুবাদ বর্জিত হবে সেগুলি রবীন্দ্রনাথ বইয়ে দাগ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। বইয়ের সেই প্যাকেট ভারতবর্ষ থেকে অক্সফোর্ডে পৌঁছতে অস্বাভাবিক দেরি হ'য়ে যায়।

অনিলবাবু—অনিলকুমার চন্দ ; কবির সচিব।

৬ সরকারি গোলমাল কিছু হয়নি, শুধু ঘোর প্রতিবাদ উঠেছিলো স্বদেশেরই সন্ত্রাসবাদ সমর্থকদের কাছ থেকে।

৭ Magazine অর্থাৎ ন্যু ইয়র্কের মাসিকপত্র *Asia*। (অমিয় চক্রবর্তীর ১৯ ও ২৩-সংখ্যাক চিঠি দ্র.)

৮ *East And West*—[ভূমিকা দ্র.]

Feb 11 / 35

BALLIOL COLLEGE
OXFORD

শ্রীচরণকমলেষু,

ইতিমধ্যে Thompson-রা আমার কাছে এসেছিলেন—রাশিয়ার চিঠি ইংরেজিতে রূপ পায়নি, খুবই কাঁচা মাটিতে ঢালাই হয়েচে ওঁদের বিশ্বাস। ছাপালে আপনার প্রতি অবিচার হবে বিশেষ ক'রে জানাতে বললেন। Publisherরা কেবল sensation করতে চায় সোভিয়েটের পক্ষ নিয়েচেন এই ব'লে, অথচ আপনার কবিতা শীঘ্রই নূতন হয়ে বেরোবে এ সময়ে এমনতরো আন্দোলন ক্ষতিকর হবে ব'লে তিনি মনে করেন। আপনার লেখায় যে ভাষার ইন্দ্রজাল আছে তা বাদ দিয়ে অনুবাদ বের করলে সাহিত্যমহলে বিশেষ ভুল ধারণা হবে। —ওঁদের মত আপনাকে শেষবারের মতো জানাই—যা ঠিক মনে করেন করবেন।[১] Thompson filmঅলাদের সঙ্গে দেখা করচেন, চিত্রাঙ্গদা, বিসর্জ্জন এই রকম কোনো নাটিকার সবাক ছবি তৈরি করাবার জন্যে। দেখা যাক কী হয়। Anthony Asquith-এর দ্বারা বিশেষ কিছু হবে না জানাই ছিল, কিন্তু Korda-র imagination আছে। এই হপ্তায় তিনি Korda-র সঙ্গে কথা কইবেন।[২]

Manchester থেকে ফিরে এসে আপনার ইংরেজি কবিতার বই পেলাম![৩] এতদিনে। রওনা হয়েচে ২৯ নবেম্বর, পৌঁছল ৯ই ফেব্রুয়ারি। দুমাস লেগেচে ভারতের বুদ্ধিমানদের তদারকের কাজে, বোধ হয় কবিতা পড়েও বোম্বাইয়ের কাষ্টম কর্ম্মচারীদের সন্দেহ সম্পূর্ণ ঘোচেনি কেননা পুলিশের আইন দিয়েও সব জিনিসের তল পাওয়া যায় না। যাই হোক, এইবার কাজ এগিয়ে চলবে। আপনাকে জানাব।

'চার অধ্যায়ে'র খবর জানতে উৎসুক আছি। যদি ওরা গোলমাল করে তাহলে বই বিক্রির দিক থেকে ইংরেজি Edition-এর কাটতি দ্রুত এগিয়ে যাবে। যদি সত্যিই কিছু করে তাহলে আমাকে cable পাঠাবেন—"Print English Edition "—আমি বুঝব। আমার তর্জ্জমা ফিরে পেয়েচি, কেউ কিছু বদলাননি, এবং এত বেশি সকলের ভালো লেগেচে যে আমার ইংরেজি অনুবাদের ভাবনা অনেকটা কেটেচে। আধুনিক ইংরেজি প্রায় নূতন ইংরেজি ভাষা বললেই হয়—এর ধরণই (sic) আলাদা, সহজে কলমে আনা অসম্ভব। অথচ মূল text-এর থেকে একটুও দূরে গেলে সবই বৃথা। এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অনেক রাত কেটেছে। তিনবার আগাগোড়া লিখেচি, type করিয়েচি।

ওখানে 'চার অধ্যায়ে'র কী হল জানলেই তর্জ্জমাটা পাঠাব। যদি আটকে দেয় তাহলে পাঠানো বৃথা। তাহলে এইখান থেকেই ছাপিয়ে ফেলতে হবে বোধ হয়। জওহরলালের লেখা তাঁর বোন তিন তিনবার পাঠালেন, আমাকে, Miss Harrison-কে, Andrews-কে অথচ ওরা আটকে দিল। অথচ লেখায় কিছুমাত্র কম্যুনিজম্ বা রাজদ্রোহিতা ছিল না—এমন কি ভারতবর্ষে তা proscribed হয়নি। অথচ এদেশে ছাপতে দিতে এত ভয়।

(সুভাষবাবুর বই [৪] বন্ধ করবে জানাই ছিল—এতে অযোগ্য বইয়ের সম্মান বাড়ানো হল। দেশে পৌঁছতে দিলে আপনিই অগোচর হত একসময়ে। বাংলা দেশের সামাজিক, cultural জাগরণের ইতিহাস এঁকেচেন আপনাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে!—ওঁর এই চেষ্টা এতই সচেতন এবং অসাধ্য হয়ে উঠেচে যে ওঁর জন্যে দুঃখ হয়। অথচ বইটাতে অনেক পরিশ্রম আছে এবং পাঠযোগ্য অংশ আছে চিত্তরঞ্জনের অন্ধ স্তুতি বাদ দিলে।)

*Spectator, New Statesman, Time & Tide* সকলেই *East & West* সম্বন্ধে লিখবে—সবার সঙ্গেই কথা হয়েচে। বইয়ের বন্যায় ওরা সত্যিই ডুবে যায়—জোর ক'রে বই ওদের নজরে না আনলে যথাসময় কেটে যায়, জনসাধারণের আসরে প্রবেশ করতে দীর্ঘকাল দেরি হয়ে যায়। Winifred Holtby ভালো লিখবেন। [৫] Sir Norman Angell এবং Bartlett-এর চিঠি নমুনা স্বরূপ পাঠাচ্চি। [৬] Angell-এর কথার দাম আছে—এমনতরো খাঁটি লোক কম দেখেচি। Peace Nobel Prize কখনো যোগ্যতর লোককে দেওয়া হয়নি। এখানে প্রায়ই দেখা হয়। তাঁর লেখা পেলেই পাঠাব। *Manchester Guardian*-এর editor এখন Crozier-Scott-এর তুল্য নয়, কিন্তু লোকটি ভালো। *Times*-এর irresponsible লেখাটাতে কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না—আমরা ভেবে রেখেছিলাম ওরা রীতি অনুসারে বইখানির উল্লেখই করবে না, কিন্তু মধ্যে থেকে ওদের Dawson হঠাৎ দুকলম লিখে বস্‌ল, বেশি না হোক, আপনার এবং Murray-র বিষয় যেটুকু ভুল ধারণা জন্মাতে পারে তা করতে চেষ্টা করেচে। কিন্তু বিক্রির দিক থেকে এতে যত ক্ষতি হোক, *East & West* এদের intellectual circles-এ ছড়িয়ে পড়েচে এবং দুর্লভ সমাদর পাচ্চে।

Murray এতদিন পরে stage-এ জায়গা পেলেন [৭]—তাঁর Greek অনুবাদ নাটক লণ্ডনে Old Vic-এ দেখাচ্চে—Greek Chorus খুবই জমেচে। আমার বারেবারে মনে হচ্ছিল এইরকম blank verse-এ আপনি যদি একটি নাটক লেখেন এবং ঐরকম Chorus-এর একটা impersonal refrain থাকে, যেন নির্ব্যক্তিক বাণী সমস্ত মানবজীবনের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে একটি চরমের সুর গেঁথে চলেচে। Hardy তাঁর *Dynast*-এ [৮] চেষ্টা করেচেন—কোথাও কোথাও খুব উৎরেচে, কিন্তু মোটের উপর জমেনি—বেশি ছড়িয়ে পড়েচে। Eliot-এর *Rock of the Ages* নেহাৎ মন্দ নয়—বোধ হয়, তাঁর কলমের এই লেখাটাই জোরালো। [৯] আপনার নাটকে ঠাকুর্দ্দা, এবং অনেক জায়গায় গ্রামের জনতা এই Chorus-এর সুরই লাগিয়েচে—হয়তো নূতন ধরণে (sic) আবার কোনো নাটকে ব্যবহার করবেন।

আপনার শেষ চিঠিখানি বেরোনো দরকার। সুধীনবাবু আশা করি কপি না রেখে পাঠাননি। [১০] আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্য দ্রুত পরিবর্ত্তনের পথে চলেচে। প্রচণ্ড রাষ্ট্র সামাজিক আন্দোলনে এই সাহিত্য আলোড়িত। অভিজ্ঞতার স্রোতে সহসা বহু ধারা এসে মিশেচে। এই মিশোলের অন্ত নেই। ক্রমাগতই জ্ঞান বিজ্ঞান সমাজবিপ্লবের আবর্ত্তে ঘূর্ণ্যমান এই ঘোলাজলের সাহিত্য শিল্পসৃষ্টির পক্ষে অনুকূল নয়। আমাদের দেশের

লেখকেরা দূর জনসমুদ্রের এই তরঙ্গায়িত বিক্ষুব্ধ চেতনায় যদি অভিভূত হয়ে পড়েন তাহলে আমাদের শক্তির পরিচয় পাব না। —আমাদের সমাজরাষ্ট্রসাহিত্যের tradition এবং এখনকার বিশেষ অবস্থা কখনোই এদের সঙ্গে তুলনীয় নয়, তার বিকাশ আপন পথেই আপনাকে প্রকাশ করবে। কিন্তু য়ুরোপীয় সভ্যতার suggestive force অতি ভয়ানক, তার প্রভাব বিশ্বের মানুষকে জালে জড়িয়েচে তাই অভিভূতির আশঙ্কা যথেষ্ট আছে এবং তার চিহ্ন (sic) তো দেশে দেখে এসেচি। য়ুরোপ তার বোমাবারুদগিজ্জারাষ্ট্রশিক্ষার সহস্র শক্তিতে বিভক্ত দুর্ব্বল ভারতবর্ষকে চেপে ধরেচে, আমাদের সহজাত স্বভাবটাও কি আমরা তাদের মননের ছাঁচে ঢালব? সর্ব্বনাশ শুধু আমাদের নয়, সমস্ত বিশ্বকে তাহলে আমরা বঞ্চিত করব আমাদের বিশিষ্ট দানের ঐশ্বর্য্য হতে। আমাদের আত্মঅপ্রতীতি কি অতদূর পৌঁছবে?

এদের মানসজগতের মধ্যে আছি—কতকটা বুঝতে পারি এদের সাহিত্যের তলে তলে কী শক্তির ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া চলচে। সমগ্র য়ুরোপে যে জীবন সংগঠনের চেষ্টা অবিরত চলচে তার দুঃসহ বেগ এখানে আমাদেরও জীবনে স্পন্দিত না হয়ে পারে না। মোটের উপর এই নূতন সংগঠনের মূল গতি বোধ হয় সমস্ত মানুষসমাজকে মানব অধিকারের উপরে গ'ড়ে তোলবার দিকে। এরা চেতন হয়ে উঠেচে। সমস্ত দেশ জুড়ে এই চেতনার প্রতিষ্ঠা। এর পরে কী ক'রে মানুষ নিত্য ভেদের অসাম্যের শত দুঃখ সহ্য করবে, —বিশেষত যখন স্পষ্টই বোঝা যাচ্চে ন্যায় বিধির প্রবর্ত্তন হলে সর্ব্ব মানুষের পক্ষে যথেষ্ট আলো, অবকাশ, স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্যের উপাদান সমাজের আয়ত্তাধীন। এই অধিকার মানুষমাত্রেরই প্রাপ্য, সর্ব্বসাধারণে তা সঞ্চারিত না হওয়া পর্য্যন্ত কোনোরকম সহজ অবস্থা য়ুরোপে ফিরবে না।

বাহির থেকে দেখতে যতই বিভিন্ন হোক না কেন, লেনিন/স্টালিন হিটলর, মুসোলিনী সবাই ঐ জায়গায় এক। জনসাধারণের উপর তাঁদের একমাত্র জোর এই যে যেমন ক'রে হোক তাঁরা মানুষের অধিকার দেশবাসীকে দেবেন এই আশা দ্বিধাহীন কণ্ঠে প্রচার করেচেন। পথ নানামুখী, বিচিত্র বিরোধী, ভিন্ন দেশের ইতিহাস সংস্কার পরিবেষ্টনের ভিন্নতায় এই পথের গতি বদলেচে, দিক নিয়েচে। কিন্তু আজ ইটালী, জর্ম্মানী, রাশিয়ায় মোহবশত হোক, সত্য বিশ্বাসের জোরে হোক নূতন কালের মানুষ সর্ব্ব দুঃখ সহ্য করবে ব'লে দাঁড়িয়েচে এই সাম্যের ভিত্তি গাঁথবার আশায়। কী দুঃসহ বেদনা মাথা পেতে নিচ্চে আজকের ছেলেমেয়ে তাদের সঙ্গে মিশে সমস্ত অন্তর দিয়ে তা বুঝেচি ; ভিতরে আগুন জ্বেলেচে নূতন সমাজঐক্যের দুরূহ সাধনায়। এই চৈতন্যের আগুনে যা কিছু কাম্য, যা কিছু জীবনের শ্রেষ্ঠ উপকরণ তারা ত্যাগের বীর্য্যে ঢেলে দিচ্চে। এবং এই বীর্য্যই জয়ী হবে। নেতারা ভুল করতে পারে, বহু অন্যায় জমতে পারে শক্তিলোলুপ রাষ্ট্রনেতার প্রবর্ত্তনায়,—কিন্তু যে বীর্য্যের উদ্দীপনায় সমস্ত আন্দোলনের সৃষ্টিবেগ সর্ব্বনাশের মধ্য থেকে তারই জয়পতাকা য়ুরোপের আকাশে উড়বে। হয়তো তার আগে আরেকটা প্রচণ্ড ঝড় নামতে পারে, কিন্তু তাতে পাপের সঞ্চয়ই পুড়বে এই শত লক্ষ নির্ম্মলচিত্ত সংযমী

শুভমননশীল মানুষের শক্তি মরবে না।

যারা দিচ্চে তাদের মধ্যে অনেকেরই দেবার ঐশ্বর্য্য যথেষ্টই ছিল, তারা এগিয়ে এসে মানুষের দুঃখ উপশমের কাজে হাত দিয়েচে, এবং আত্মসুখকে জলাঞ্জলি দিচ্চে। এর মধ্যে উত্তেজনা আছে, কিন্তু সত্যবোধ এবং সত্য সাধনারও অভাব নেই। কয়লার খনিতে যে কাজ করচে সে আজ এদের চোখে কেবলমাত্র Miner নয়, সে মানুষ: জন্তুর জীবনের চাকায় বাঁধা যে শতসহস্র কুলিমজুর সভ্যতার বাহন কেবলমাত্র দিনযাপনের গ্লানি জন্ম হতে মৃত্যু অবধি বহন করতে বাধ্য হচ্চে তারাও আজ চেতন, তারাও অন্য মানুষের মতোই মানবজীবনের আস্বাদ পেয়েচে। তাদের যন্ত্রণা আজ তাদের জীবনকে অতিক্রম ক'রে সমাজের সর্ব্বত্র ঘরে ঘরে পৌঁছেচে। এর ব্যতিক্রম আছে, নানা জায়গায় এখনো অসাড় নিষ্ঠুর লোভ শক্তির মত্ততায় আবর্ত্তিত, কিন্তু তাদের সংখ্যা সামান্য, তাদের দিন আসন্ন। শিরায় শিরায় এদের ঘনিষ্ঠ মানব সমাজে এই অসাম্যের বেদনা টনটন্ করে উঠেচে, হঠাৎ চিরাচরিত সমাজপ্রথা অসহ্য হয়ে পড়ল তাদের কাছে। যে শক্তিমান পুরুষ বলচে আমি অন্তত আমার দেশের নরনারীকে যেমন ক'রে হোক মুক্তির ক্ষেত্রে আনব—তার পথ যতই বাঁকা হোক না কেন দেশের শ্রেষ্ঠ মন তার কাছে মাথা নত করেচে। হিটলের (sic) মতো লোকের পিছনেও যে অগণ্য যুবকযুবতী জনসাধারণ এমন করে দাঁড়িয়েচে, তাকে ঠেলে নিয়ে চলেচে তার কারণ সেখানেও মানুষ স্বাধিকারের আশা দেখতে পেয়েচে। ভুল আশ্বাস, ভুল নেতা, ভুল পথ—কিন্তু যে বেদনা এর মূল শক্তি তারই কি জয় অনিবার্য্য নয়। দেখতে দেখতে ভুলের মধ্য দিয়েও নূতনতর সৌন্দর্য্য শান্তি পদ্মের মতো পঙ্ক ঠেলে উঠছে, মুসোলিনীর শক্তিকে ব্যবহার ক'রে সম্পূর্ণ অন্যায়ের মধ্যে দিয়ে ইটালীর মানুষ গ্রামে গ্রামে সমাজসংস্কার, স্বাস্থ্য, নূতন কৃষিব্যবস্থা, নূতন শিল্প সঙ্গীত সাহিত্যে উৎসারিত হলো। সব চেয়ে গভীরে পৌঁছেচে বোধ হয় রাশিয়া, কিন্তু সেখানেও কী ভয়ানক অন্যায়, অবিচার, মানুষের অধিকারের সম্পূর্ণ নিষ্পেষণের প্রতিক্রিয়া দেখতে পাই। অথচ যে বৈদ্যুৎশক্তি সঞ্চারিত হলো তাদের লক্ষ মানুষের সভ্যতায় তার প্রেরণা বিকশিত হচ্চে সেখানে, আশ্চর্য্য তার রূপ। ইংলণ্ডের অবস্থা নানাকারণে য়ুরোপীয় সব দেশের চেয়ে সমৃদ্ধ—যে মোটর চালক সময় পেলেই খবরের কাগজ পড়ে, গ্রামের লাইব্রেরি থেকে বিজ্ঞান, দর্শনের বই প্রতি হপ্তায় ঘরে নিয়ে আসে এবং পড়ে শোনায়, তার মনুষ্যত্বের, স্বাধীনতার দাবী ইংলণ্ড অন্য দেশের চেয়ে সহজে মেটাতে পারবে। কিন্তু এখানেও সমস্ত সামাজিক পরিমণ্ডল বেদনায় পরিব্যাপ্ত—যে সামাজিক গরিমা অসাম্যের উপর, মানুষে-মানুষে ভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত তার মধ্যে মানুষ আজ শান্তি পাচ্চে না, ব্যক্তিগত সৌভাগ্য তাকে সুধা দিচ্চে না। মানুষের শক্তির ভেদের কথা বলচি না—তা থাকবেই—কিন্তু বাঁচবার প্রথমতম অধিকারগুলি যেখানে মানুষ পায়নি তাতে যে ভেদ সৃষ্টি হয়েচে, তার কথাই বলচি।

সাহিত্যে শিল্পে সমাজে মানুষ তার শ্রেষ্ঠ গরিমাকে প্রকাশ করেচে তা যে যেতে বসেচে এমন কোনো চিহ্ন (sic) দেখি না। সাময়িক মত্ততায় এখানে ওখানে যে-সুরই

বাজুক, আজ য়ুরোপে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত, শিল্প, মহাচিত্তের বিচিত্র সৃষ্টি জ্ঞান ভাবনার প্রতি যেমন সমাদর তেমন কোনোদিন ছিল না। এ বিষয়ে য়ুরোপে সর্ব্বত্র যেরকম সত্যকার উঁচু standard দেখতে পাই তাতে চমকিত হই। মানুষে মানুষে ব্যবহারে যে হৃদ্যতা, যে সহজ বিশ্বাস, পরস্পরের সহযোগে যে ঘনিষ্ঠ মধুর সম্বন্ধ য়ুরোপে যেখানে যাই উপভোগ করি তার তুলনা কোথায় ? এতটা যথার্থ অন্তরের ঔদার্য্য এত ব্যাপকভাবে কখনো য়ুরোপে ছিল না। সমস্ত পৃথিবীর প্রতি এদের জনসাধারণের চিত্ত খুলে গিয়েচে, ছাত্রদলের মধ্যে, ব্যবসায়ী কর্ম্মীদের সঙ্গে যে অকুণ্ঠিত মানবিকতা দেখা যায় তা বিস্মিত আনন্দের বিষয়। বাহির থেকে দেখতে আশ্চর্য্য লাগে যে ঠিক এই সময়েই য়ুরোপীয় সভ্যতার বহুধা সঙ্কট আসন্ন হয়ে উঠ্‌ল। প্রভৃত বলশালী মূর্ত্তিমান অন্যায় রাষ্ট্রনেতা হয়ে দেশে দেশে হঠাৎ দেখা দিল। কিন্তু তাদের শক্তির মূল কোথায় তা বুঝতে চেষ্টা করেচি।

সাহিত্যের আদর্শ, সাহিত্যের আপন সৃষ্টিমণ্ডল এই প্রচণ্ড জনধারার আবর্ত্তনের বাহিরে। তার বিচার এই সাময়িক আলোড়নের অশান্ত আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে করা চলবে না। কিন্তু আজ য়ুরোপে সাহিত্যে যে বহুধা স্রোতের ঘূর্ণি জেগেচে তা বোঝা যায় এদের এই সামাজিক জীবনের দিকে চেয়ে দেখ্‌লে। তার মধ্যে বিচিত্র সুরের সংঘাত, বিচিত্র চেষ্টার বেগ। এদের গদ্য সাহিত্য তাই আজ এত বড়ো। কী শক্তি, কী চিত্ত সম্পদ, উন্নত মনের গরিমা আজ এদের ভাবনাকে গদ্যের বিচিত্র ধারায় বইয়ে নিয়ে চলেচে। সামান্য দুচার ছত্রের লেখাও সংবাদপত্রে, সাপ্তাহিকে জাগ্রত মনের standard রক্ষা করে ; বহু লেখকের কলমেই আজ এই সাধনা সহজ হয়ে উঠেচে। কিন্তু পদ্যে, বা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিসাহিত্যের কোঠায় এখনো মনের ঐশ্বর্য্য পৌঁছে দেবার অবস্থা এদের নয়। আজকের সাহিত্য সমাজের আকস্মিকতার অনুগামী—এখনও তার আপন স্বরূপে আপন ভিত্তি বাঁধা হয়নি।

আমাদের দেশে এই বিক্ষুব্ধ নেশার ঢেউই কি পৌঁছল—মানবসম্বন্ধের চেতনা কি জাগল না? তা না হলে সাংঘাতিক ধর্ম্মব্যবস্থা, অধম জাত এবং কুলের প্রথার বিরুদ্ধে আমাদের কলম শাণিত হোলো না কেন ; কেবলমাত্র ভাবরসের মধ্যে যে মানবমৈত্রীর বিভোরতা দেশমাতার জন্যে ক্রন্দিত তার মধ্যে চৈতন্যের সত্যতা কোথায়? কেবলমাত্র 'গরীবের দুঃখ', 'ধনীর অন্যায়'—প্রভৃতি বুলি যদি উগ্র হয়ে পরদেশের রাষ্ট্রমতের প্রতিধ্বনি করে এবং অতিশয়োক্তির আশ্রয় নিয়ে জীবনের অতি সঙ্কীর্ণ কোনো এক অংশমাত্রের ছবি আঁকে তাহলে বুঝব আমরা আজ জাগিনি—সাহিত্যের কথা তো দূরে থাক।[১১]

কিন্তু হয়তো আমি ভুল বলচি। সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে কী চলচে তা আমার জানা নেই।

অন্তত বছর দশেকের মতো এদেশের লোকের কাছে আমাদের আর্টের মাথা নীচু হোলো। সাংঘাতিক exhibition-এর ধাক্কা সামলাতে আমাদের দেরি লাগবে।[১২] ক্ষতি হবে না যদি আমরা ঘরে ব'সে ভালো ছবি আঁকি আমাদের নিজের প্রেরণায়। এবং একমাত্র পথই তো তাই। কিন্তু বিদেশে এসে এ প্রহসনের দরকার ছিল না। সেবারে

বলিনি যে অবনীন্দ্রনাথের আরব্য উপন্যাসের ছবিগুলি এমন ভাবে দেয়ালের নীচের দিকে ঝুলিয়েছিল যে মাটিতে বেঁকে না পড়লে ছবি দেখা সম্ভবই ছিল না। দেশে যদিবা প্রদর্শনীতে এসে মেঝেতে বসা সম্ভব হোতো, এদেশীয় পোষাক প'রে তা চলে না। সুতরাং ঐ ছবিগুলিও সমূহ চাপা পড়ে গেল। কোনো একজন সৌন্দর্য্য পিপাসু ঐ ছবির জটলায় গিয়ে আনন্দ পাননি। আজ Adonis Gallery-তে আফ্রিকার ছবি এসেচে। কী প্রাণবন্ত ছবি এবং শিল্পকাজ। এ বিষয়ে Michael Sadler-এর বই কিনেচি—আপনাকে পাঠালাম।[১৫] বলতে পারা যাবে না যে আফ্রিকা সম্বন্ধে এদের মন উদার। কিন্তু আফ্রিকায় এখনো অতি আধুনিক আফ্রিকান কর্ম্মচারী জাগেননি প্রভুদের সঙ্গে যোগ দিয়ে নিজেদের চিত্রীশিল্পীকে নিয়ে প্রহসন জমাবার জন্যে। তা ছাড়া আফ্রিকান চিত্রকর সহজ প্রাণের সম্পর্ক বঞ্চিত নন, সমস্ত পরিমণ্ডলের সঙ্গে তাঁর প্রেরণার যোগ আছে, দূর অতীতে গিয়ে মন দিয়ে সচেষ্ট সাধন উৎসের সন্ধানে তিনি যাননি, নিজের চারদিকে চোখ মেলে স্পষ্ট ক'রে বিচিত্র ক'রে দেখচেন এবং দেখাচ্চেন।

অনেক বাজে লিখলাম—অথচ ফিরে পড়বারও সময় নেই—এখুনি ডাক যাবে। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

প্রণত
অমিয়

---

টীকা

১ শশধর সিংহ 'রাশিয়ার চিঠি'র যে-তর্জমা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে তার পাণ্ডুলিপি পাঠ ক'রে এডোয়ার্ড টমসন তর্জমাটি ছাপার অনুপযুক্ত হয়েছে ব'লে রায় দেন। অন্য কারণেও ঠিক সে-সময় এ-গ্রন্থের কোনো তর্জমা প্রকাশ না-করতে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন: 'To be frank. I think the book's publication a mistake. (sic) It dates badly with its references to Simon Commission... Also English thinking about the Soviet experiment has greatly changed since 1930, and Tagore's comments...ring queerly now.... But the worst is the letter form.'

২ টমসন হয়তো চেষ্টা ঠিকই করেছিলেন কিন্তু তার ফলে রবীন্দ্রনাথের নাটক অবলম্বনে সে-সময় কোনো চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছিলো ব'লে জানা যায় না।

৩ *Collected Poems*-এ যে-সব কবিতা বর্জিত হবে সেগুলিতে দাগ দিয়ে, রবীন্দ্রনাথের পাঠানো বইগুলি এতদিনে অক্সফোর্ডে পৌঁছলো।

৪ 'সুভাষবাবুর বই'— *The Indian Struggle*, যার কথা ১৯-সংখ্যক চিঠিতে বলা হয়েছে।

৫ অমিয় চক্রবর্তীর বন্ধু *Winifred Holtby* (১৮৯৮-১৯৩৫) অক্সফোর্ডে সমারভিল কলেজের স্নাতক, প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন তরুণ কবি ও ঔপন্যাসিক, এবং Lady Rhonda-র পত্রিকা *Time and Tide*—এর ডিরেক্টর ছিলেন। কবি ও সাংবাদিক বন্ধু ভেরা ব্রিটেন-এর ( Vera Brittain ) সঙ্গে একত্র লণ্ডনে থাকতেন। সেখানে

এক কমনওয়েলথ কনফারেন্সে আফ্রিকার দুর্দশা বিষয়ে তাঁর দরদী বক্তৃতা শুনে অমিয় চক্রবর্তী আকৃষ্ট হন। সেই থেকে বন্ধুতার সূত্রপাত। অল্পদিন পরেই মাত্র ৩৭ বছর বয়সে হঠাৎ কঠিন রোগে শ্রীমতী হোল্‌টবি-র মৃত্যু হয়। তাঁর লেখা আফ্রিকা সংক্রান্ত ছোটোগল্পের বই—*Truth is not Sober*, উপন্যাস—*South Riding*। এঁর মৃত্যু জানিয়ে রবীন্দ্রনাথকে লেখা ৩৪-সংখ্যক চিঠি দ্রষ্টব্য। Holtby-র লেখা*Women* নামে একটি প্রবন্ধের বই রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে, বইটি অমিয় চক্রবর্তী পাঠিয়েছিলেন। বাঙালি কবির 'অভিজ্ঞান বসন্ত' (১৩৫০) নামে কাব্যগ্রন্থটি এই উইনিফ্রেড হোলটবি-র স্মৃতিতে উৎসর্গিত।

৬ অর্থনীতিবিদ, প্রভাবশালী যুদ্ধবিরোধী লেখক হিশেবে ১৯৩৩ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পান Sir Norman Angell (১৮৭৪-১৯৬৭)। পার্লামেন্টে কিছুদিন তিনি শ্রমিকদলের সদস্য ছিলেন। ১৯১০ সালে লেখা তাঁর প্রধান গ্রন্থ *The Great Illusion* ১৯৩৩ সালে দ্বিতীয়বার ছাপা হয়। গ্রন্থের বহু-ব্যবহৃত একটি কপি আছে রবীন্দ্রভবনে।

Bartlett (Vernon. 1894-?) লণ্ডনে League of Nations Secretariat-এর ডিরেক্টর ছিলেন। পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে বিবিসি-তে (১৯২৮-১৯৩৪) তাঁর বেতার-বক্তৃতাগুলির খুব সুখ্যাতি হয়েছিলো।

৭ Murray—গিল্‌বার্ট মারে, ১১-সংখ্যক চিঠির ৭ম টীকা দ্র.।

৮ Hardy—(Thomas, ১৮৪০-১৯২৮), ইংরেজ কবি ও ঔপন্যাসিক। *Jude the Obscure* উপন্যাস নিয়ে পাঠকদের বিরূপ তীব্র সমালোচনায় বিরক্ত হ'য়ে ১৮৯৬ সালের পর থেকে কবিতা ছাড়া কিছু লেখেননি। তিন খণ্ডে তাঁর মহাকাব্যতুল্য বিশাল নাটক *The Dynasts* (১৯০৩-১৯০৮) অবলম্বনে, আধুনিক কাব্যে যুদ্ধের প্রসঙ্গ বিষয়ে অমিয় চক্রবর্তী তখন অক্সফোর্ডের বেলিয়ল কলেজে গবেষণা করছিলেন।

৯ বলতে গেলে *The Rock*-ই (১৯৩৪) এলিয়টের প্রথম কাব্যনাটক, Sadler's Wells Theatre-এ ১৯৩৪-এর মে-জুন মাসে অভিনীত হয়। হয়তো প্রথম অভিনয় কালে এটির নাম ছিলো *The Rock of the Ages*। একটি সম্পূর্ণ দৃশ্য এবং কোরাসের অংশগুলি ছাড়া নাটকের বাকি অংশ E. Martin Brown-এর সহযোগিতায় রচিত। এলিয়ট *Spectator* পত্রিকায় চিঠি লিখে (১৯৩৪, ৮ জুন) জানিয়েছিলেন : 'My only serious dramatic aim was to show that there is a possible role for the chorus.' আধুনিক কালে প্রাচীন গ্রীক নাটকের কোরাসের এই অভিনব পুনর্ব্যবহার নাটকের ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ।

১০ রবীন্দ্রনাথের 'শেষ চিঠিখানি'তে ('চিঠিপত্র' ১১শ, ৭৩) আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্যের কঠোর সমালোচনা ছিলো। সেই নিন্দার উত্তরে অমিয় চক্রবর্তীর এই বিস্তারিত উত্তর।

১১ আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্যের তুলনায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রতি অমিয় চক্রবর্তীর আগ্রহ এবং সমর্থন খুব বেশি ছিলো ব'লে মনে হয় না। ১৯৭৬ সালে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করলে বর্তমান লেখককে তিনি লিখেছিলেন : ' "কল্লোল" যুগের বা ঠিক তার পরবর্তী যুগের বাংলা কাব্যের সঙ্গে আমার যোগ ঘনিষ্ঠ ছিল না। যদিও

অনেক পড়তাম, কিছু কিছু ভালো লাগত। কিন্তু যথার্থ স্বদৃষ্টি তৈরি হয়নি, বা সমদৃষ্টির যোগ ঘটেনি। বলা বাহুল্য "শনিবারের চিঠি"-র উদ্যোক্তা বা অন্যান্য পৃষ্ঠপোষক সম্বন্ধে প্রথম থেকেই বিরোধিতা অনুভব করেছি। রবীন্দ্রনাথ ক্রমাগতই তাঁদের লেখায় ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হতেন, তাঁকে অত রুষ্ট হতে দেখিনি অন্য কোনো সাহিত্য সম্পর্কিত প্রশ্নে।'

১২ এটি ১৯৩৪-এর ডিসেম্বরে লণ্ডনে আয়োজিত সেই এম্পায়ার এক্সিবিশন। পূর্বের ১০, ১২, ১৫-সংখ্যক চিঠি দ্র.।

১৩ Michael Sadler-এর বই—*The Art of West Africa* (১৯৩৪), যার সম্পাদক ছিলেন স্যর মাইকেল।

## ২২

March 14 / 35

Balliol College,
Oxford

শ্রীচরণকমলেষু

Publisher-রা বলছে আপনার হাতের আঁকা black & white নক্‌সা পেলে তারা চার অধ্যায়ের ইংরেজিতে ব্যবহার করবে [1]—এবং বইখানি যাতে Artistic এবং literary surprise রূপে য়ুরোপে প্রকাশ পায় তার ব্যবস্থা করবে। Introductionটি বাদ দেওয়াই সবার মত—কেননা ওতে প্রথম থেকেই political এবং utilitarian প্রশ্ন লোকের মনে জাগবে, কিন্তু এই বই চিরন্তন humanities-এর প্রকাশ এই কথাই এর সত্য পরিচয়। পূরবী গোছের size হবে—যদিও পাৎলা বই হবে, তবু spacing দিয়ে এবং প্রত্যেক chapter-এর আগে এক পাতা design দিয়ে ফলিয়ে তুলবে। pure design-এর দিকেই এদের ঝোঁক—Eric Gill বা Clare Leighton-এর block[2] পাওয়া যেতে পারে কিন্তু তাঁদের হাতের চেয়ে আপনার হাতের জোরালো design পেলেই শতগুণে সবাই আনন্দিত এবং বিস্মিত হবে। সব সুদ্ধ ছ'খানি design চাই—তবে দুচারটে বেশি হলেই ঠিকমতো বাছাই করে সাজাবার সুবিধা হয়। যদি designগুলির মধ্যে কোনো ভাবার্থ থাকে তাহলে এই বইয়ের সঙ্গে মানানসই হলে ভালো হয়, তাতে সবটাই সমৃদ্ধ হবে—গঙ্গার ধারের পোড়ো বাড়ি, অদ্ভুত সিঁড়ি, নানারকমের ছায়া মূর্তির আনাগোনা। কিন্তু design-এর কোনো রূপকার্থ থাকার বিশেষ দরকার নেই—বিশুদ্ধ designও চলবে। কথাটা সবার মনে জেগেচে আর উৎসাহিত করে তুলেচে তাই সকলেরই ইচ্ছে আপনার হাতের আঁকা কিছু এই বইয়ে যায়। যদি বেশি না হয় অন্তত cover-এর জন্যে এবং প্রথম পৃষ্ঠার জন্যে দুটো design হলেও চলে। মাস খানেক সময় আছে। এখানকার সমবেত প্রার্থনা আপনার কাছে জানালাম।

বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিকের জন্যে যথাসাধ্য করব।[৩] আশা করচি এর যোগ্য standard গড়ে উঠবে। আমার দৃঢ় ধারণা Editorial Office-এর কাছাকাছি কোনো ইংরেজ থাকা দরকার—(বা American) ; বেশি কিছু জানার দরকার নেই, কেবলমাত্র ভাষার মর্ম্মস্থানে দুটো একটা মারাত্মক ত্রুটি সংশোধনের কাজ যে-কোনো ইংরেজই ক'রে দিতে পারবে। মাতৃভাষা যার ইংরেজি নয় তার দ্বারা এটা সম্ভব নয়—হয়তো কখনো দৈবক্রমে দুর্লভ ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। এ বিষয়ে আমাদের কোনো মোহ বা লজ্জা থাকা আমার কাছে অদ্ভুত বোধ হয়। অথচ জানি আমাদের দেশের অনভিজ্ঞ লেখক, মাতৃভাষা যাঁদের ইংরেজি নয়, যাঁদের কলম প্রায়ই কথার ভারে জড়িয়ে শেষটা ব্যাকরণের প্রহসন ঘটিয়ে তোলে তাঁরাও এ বিষয়ে নিতান্ত অভিমানী। *V.B. News* প'ড়ে এই ভয় কিছু কমেনি। কৃপালানীকে এ বিষয়ে লিখেচি—তিনি যোগ্য সম্পাদক হবেন আমার বিশ্বাস, কিন্তু তবু আমার suggestionটুকু জানিয়েচি। এদেশে প্রতিষ্ঠা করতে হলে কাগজের পূর্ণ মর্য্যাদা রাখতে হবে, বিশেষত যখন আপনার লেখা ওতে থাকবে এবং আপনার দায়িত্বে বেরোবে।

Danielou-র চিঠি পাঠাই।[৪] মোটরে ক'রে Beirut দিয়ে দুই বন্ধু পারস্য দেশ হয়ে শান্তিনিকেতনে যাচ্চে। চিঠিতে অনেক দরকারী কথা আছে ; আপনার পড়া হলে রথীবাবুকে দেবেন।[৫] ওদের আপনারা যা বলবেন তাই করবে। Paris-এ প্রায়ই দেখা হয়েচে, এতো ভালো লাগে ওদের কী বলব। আপনাকে কী রকম শ্রদ্ধা করে এবং সর্ব্বক্ষণ কিছু করতে চায়।

Bakéরা এখন লণ্ডনে আছেন—Fox Strangways-এর একটি flat তিনি এদের দিয়েচেন।[৬] কাল এখানে আমার কাছে আসবেন দুজনে আপনার গানের এবং দুচারটে গ্রাম্য গানের তর্জ্জমার জন্যে। আপনাকে শ্রদ্ধানমস্কার জানাতে বলেচেন।। সূর্য্য সেনের বেশ নাম হয়েচে ; আমাদের দেশী গান তাঁর কণ্ঠেই লোকে শুনতে চায়। শীঘ্রই "সাবিত্রী" অভিনয় হবে লণ্ডনে (আলাদা ডাকে literature পাঠাচ্ছি) তাতে সূর্য্য সেনের গান থাকবে।[৭]

এখানকার term শেষ হোলো তবু Bodleian-এর[৮] কাছে ছোট্ট ঘর নিয়ে Easter ছুটির বেশির ভাগ এখানেই কাটাব। অমন জায়গা নেই। কী একাগ্র জীবন নিরন্তর চলেচে Bodleian-এর ভিতর—সমস্ত য়ুরোপ থেকে জ্ঞানপিপাসুর দল ওখানে সকাল থেকে রাত্রি নীরবে সাধনা করচেন—কত তরুণ ছেলেমেয়ে—একটু শব্দ নেই, সবার মুখে একান্ত উৎসাহ, সুন্দর ঘরের প্রাচীনতা মনকে শান্ত একাগ্র ক'রে রেখেচে।

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন।

প্রণত
অমিয়

১ 'চার অধ্যায়ে'র তর্জমা ছাপতে দেবেন কি দেবেন না সে-বিষয়ে কবির মন তখনো দোদুল্যমান। 'জোরালো design'-এর দাবি জানতে পেরে তিনি সত্যি-সত্যি বইয়ের মলাট এঁকে ফেললেন, black and white নক্শা নয়, রীতিমতো রঙের design : 'তোমার অনুরোধমতো design আঁকতে বসেছি। সাদাকালো করিনি—রং দিয়েছি, তাতে ক্ষতি নেই—রং বাদ দিলে আপনিই ওগুলো হবে সাদাকালো। রঙের জন্যে আমার হাত নিশপিস্ করে।' (চিঠিপত্র ১১শ, ৭৫)। কিন্তু বই তো ছাপা হ'লো না, তবে designটি গেলো কোথায়? রবীন্দ্রভবন সংগ্রহে নেই।

২ Eric Gill— ১২-সংখ্যক চিঠির ৭ম টীকা দ্র.।

Clare Leighton (১৮৯৯—?) স্যার নরমান এঞ্জেলের স্ত্রী। এঁর কাঠখোদাই ছবি বিশেষ সমাদরযোগ্য। টমাস হার্ডির *Return of the Native* উপন্যাসের এক বিশিষ্ট সংস্করণে ক্লেয়ার লাইটন্-এর উৎকৃষ্ট কাঠখোদাই কাজ আছে। উইনিফ্রেড হোল্‌টবির বন্ধু ছিলেন।

৩ *Visva-Bharati Quarterly* ১৯২৩ সালে বেরিয়ে ১৯৩১-এ একবার বন্ধ হ'য়ে যায়। কৃষ্ণ কৃপালনীর সম্পাদনায় দ্বিতীয় সিরিজ প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে। এই সিরিজের কথাই বলা হচ্ছে।

৪ রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণে রোম্যাঁ রলাঁর তরুণ বন্ধু আল্যাঁ দানিয়েলু (Allain Danielou) তাঁর বন্ধু, —প্রখ্যাত আলোকচিত্রশিল্পী রেমোঁ বুর্নিয়ে-র (Reymond Burnier) সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের ভিতর দিয়ে অভিযান ক'রে স্থলপথে য়ুরোপ থেকে শান্তিনিকেতনে চ'লে এসেছিলেন ১৯৩২ সালের অক্টোবর মাসে। দেশে ফিরে বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে Association des Amis de Tagore (রবীন্দ্রসুহৃদ সমিতি) স্থাপন করেন। অভিপ্রায় ছিলো শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন কাজে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করা। পরে ইনি বেনারসে নিজের 'আশ্রম' প্রতিষ্ঠা ক'রে দশ বছর ভারতচর্চা করেন, চার-পাঁচটি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত নিয়ে প্রত্যহ সেখানে আলোচনাসভা বসতো। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন। *Northern Indian Music : Theory and Technique* নামে এঁর লেখা বই আছে। য়ুনেস্কো -প্রকাশিত আর একটি বই : *A Catalogue of Recorded Classical and Traditional Indian Music* (1952)। তাঁর বন্ধু বুর্নিয়ে-র তোলা রবীন্দ্রনাথ ও তখনকার শান্তিনিকেতনের বহু শিল্পসুষমামণ্ডিত আলোকচিত্র রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত হয়েছে।

৫ রথীবাবু—রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৬ Baké— হল্যাণ্ডের Kern Institute থেকে আর্নল্ড বাকে ভারতীয় সংগীতশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্যে ১৯২৬ সাল থেকে আট বছর শান্তিনিকেতনে ছিলেন। পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভ্রমণের সময় (১৯২৭) ডাচ্ এলাকায় এঁর মাতৃভাষা কাজে লাগবে ভেবে রবীন্দ্রনাথ এঁকে সঙ্গী করেন। সংগীতজ্ঞ হিশেবে রবীন্দ্রনাথের ছাব্বিশটি বাংলা গান (*Twenty Six Songs of Rabindranath Tagore*) য়ুরোপীয় staff notation বা স্বরলিপিতে বসিয়ে অনুবাদ-সহ বই ক'রে ছাপান। 'কিন্তু যথার্থ ভারতীয় সঙ্গীতে প্রবেশলাভ করেননি—রবীন্দ্রসঙ্গীতেও নয়। অনেকটা ছিলেন

পল্লবগ্রাহী মানুষ।' (১৯৭৬ সালে বর্তমান লেখককে অমিয় চক্রবর্তীর চিঠি।)

FoxStrangways (১৮৫৯-১৯১৮) ইংরেজ সংগীতশাস্ত্রী। ভারতীয় সংগীতের মর্ম প্রথম যাঁরা প্রতীচ্যে বিস্তার করেছিলেন ইনি তাঁদের অগ্রণী। ভারতীয় সংগীত বিষয়ে গ্রন্থ লিখেছেন। লণ্ডনে ইণ্ডিয়া সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতাসদস্য। ১৯১২ সালেই ইনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রবীন্দ্রনাথকে সম্মানসূচক ডিগ্রি দেবার প্রস্তাব করেছিলেন। শোনা যায়, লর্ড কার্জনের প্রতিবন্ধকতার জন্যে সেটা তখন হ'তে পারেনি।

'সাবিত্রী'—কোনো ভারতীয়ের লেখা নাটক নয়, মহাভারতের সাবিত্রী-কাহিনী অবলম্বনে Gustav Holst একটি Chamber Opera লিখেছিলেন। য়ুরোপীয় অভিনেতারা সেই opera-র অনুষ্ঠান করেছিলেন ১৯৩৫-এর ২ এপ্রিল তারিখে, লণ্ডনের West End Playhouse-এ। শ্রীমতী রিচার্ড সেলিগ্‌ম্যান, যিনি বৌদ্ধধর্মের চর্চা ক'রে বই লিখেছিলেন, এবং পরে আবার যাঁর কথা আসবে, তাঁরই পরামর্শে Playhouse-এ এক 'ভারতরজনী'-র আয়োজন করা হয়েছিলো। উপলক্ষ ছিলো ইস্তাম্বুলে International Alliance of Women সংস্থার আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশনের সহায়তাকল্পে কিছু অর্থ সংগ্রহ করা।

সূর্য্য সেন— নামের এই বানান থেকে মনে হ'তে পারে বাঙালি, আসলে ইনি সিংহলী, প্রকৃত নাম সূর্যসেনা। ইংরেজ সাংবাদিকের হাতে সেনা হ'য়ে দাঁড়ায় সেন। শান্তিনিকেতনে কখনো এসেছিলেন কিনা জানা যায় না, কিন্তু চিঠির উল্লেখ থেকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ এঁকে চিনতেন। দেশবিদেশের, প্রধানত পশ্চিম দেশের, লোকসংগীত গেয়ে খ্যাতি পেয়েছিলেন, দু-চারটি রবীন্দ্রসংগীতও গাইতেন, লণ্ডনের 'ভারতরজনী'-তে গেয়েও ছিলেন। খুব সম্ভব আগের বছর (১৯৩৪) মে মাসে 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যের দল নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন এক মাস সিংহল ভ্রমণ করেন তখন এঁর সঙ্গে পরিচয় হয়। রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় যথার্থ আধুনিক ভারতীয় নৃত্য-সংগীত-অভিনয়কলা তখন পর্যন্ত শুধু পাশ্চাত্য সংগীত-নৃত্য অভিনয়ে অভ্যস্ত সিংহল অবধি পৌঁচেছিলো। ভারত-প্রেমিক পাশ্চাত্য মানুষদের পক্ষে বিরল কোনো 'ভারতরজনী'-তে 'সাবিত্রী' জাতীয় অপেরা দেখেই সন্তুষ্ট থকতে হতো। সত্তর পেরিয়ে হৃতস্বাস্থ্য রবীন্দ্রনাথের পক্ষে শান্তিনিকেতনের দল নিয়ে পাশ্চাত্য দেশে পাড়ি দেওয়া সম্ভব ছিলো না। অর্থবলও ছিলো না।

Bodleian—অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যময় বিশাল গ্রন্থাগার, স্যার টমাস বড়লি যেটিকে ষোড়শ শতকে পুনরায় 'সংস্থাপিত' করেন। গবেষণার কাজে বডলিয়ান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগারগুলির অন্যতম, কোনো-কোনো বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ।

March 1835

Balliol College,
Oxford

শ্রীচরণকমলেষু

আপনার cable পেয়েচি, Publisher-দের কথা পাকা হয়ে গেলে আপনাকে manuscript পাঠাব ঠিকই করে রেখেছিলাম কেননা আপনার final approval না পেলে আমি কোনোদিনই ছাপাতে ভরসা পাই না। আপনার cable পেয়ে এদের সঙ্গে negotiations বন্ধ করেচি।[১] Gertrude Emerson Sen-এর চিঠিও পেয়েচি—চার মাসের মতো সব থামানোই ঠিক মনে করচেন।[২] এখান থেকে আমার পক্ষে মতামত প্রকাশ করা ঠিক হবে না—যা আপনারা বলবেন তাই করব। আমার কাজ আমি যথাসাধ্য করেচি, চারবার তর্জ্জমা করেচি এবং যতদূর পারি মূল গল্পের সমস্ত রেখেও ইংরেজি সাহিত্যের আধুনিক আসরের কাছে আনতে চেষ্টার ত্রুটি করিনি। Mss. সাধারণ ডাকে আপনার হাতে পৌঁছবে। আপনার দেখা হলে যা বলবেন সেইমতো ব্যবস্থা করব। *Asia*-য় পাঠাতে হলে ঐখান থেকে পাঠাতে বলবেন, কিংবা যদি কোনো revisions alterations-এর কথা জানান তদনুযায়ী পরিবর্ত্তন ক'রে এইখান থেকে New York-এ *Asia*-র অফিসে পাঠাতে পারি—মাস খানেক সময় বাঁচবে। এদিকে Publisher-দের ব'লে দেব এখন কিছুই করবার নেই—চার মাস পরে হলে আবার নূতন ক'রে চেষ্টা দেখতে হবে। তখন আবার চেষ্টা করব আপনাদের নির্দ্দেশমতো।

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন।

প্রণত
অমিয়

পুনশ্চ

'বিচিত্রা'র এক খণ্ড হঠাৎ চোখে পড়ল, তাতে "আদিতম" কবিতাটিতে আপনি নূতনভাবে ছন্দের যতি নিয়ে experiment করেচেন,—Hopkinsএর Sprung rhythm নিয়ে এরা এখনো উৎসাহিত, আপনার ছন্দে তারি আশ্চর্য্য রূপ রয়েচে অথচ ভাবে ভাষায় এক হয়ে দেখা দিয়েচে। 'পরিচয়ে' একটি ছোট প্রবন্ধ পাঠিয়েছি, তাতে এর উল্লেখ না ক'রে পারিনি।।[৩]

---

টীকা

১ রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে লণ্ডনে 'চার অধ্যায়ে'র অনুবাদ প্রকাশ করা স্থগিত হ'য়ে গেলো, সাব্যস্ত হ'লো যে তর্জমাটি ন্যু ইয়র্কের *Asia* নামক মাসিক-পত্রেই প্রকাশিত হবে। বার্তা পেয়ে অনুবাদক খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন সন্দেহ নেই। স্পষ্ট অসন্তোষ জানাবার মতো ক'রে এমন থমথমে ভাষার ব্যবহার তাঁর আর কোনো চিঠিতে দেখা যায় না। পরবর্তী চিঠিটি এই সূত্রে দ্রষ্টব্য।

Gertrude Emerson Sen—১৯-সংখ্যক চিঠির ৫ম টীকা দ্র.।

২ মাসিকপত্র 'বিচিত্রা'-য় প্রকাশিত (১৩৪১) "আদিতম" ('কে আমার ভাষাহীন অন্তরে') কবিতাটি পরে 'বীথিকা'-য় (১৯৩৫) যায়। কবিতাটির ছন্দে যে-অভিনবত্ব আছে তার সঙ্গে হপকিন্স-উদ্ভাবিত স্প্রাং-রীদ্‌ম ছন্দের সাদৃশ্য দেখেছিলেন অমিয় চক্রবর্তী।

৩ Hopkins, (Gerard Manley, ১৮৪৪-১৮৮৯) ছিলেন জেসুইট কবি, শেষ জীবনে ডাবলিনের ইউনিভার্সিটি কলেজে পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সাহিত্যের প্রফেসর হয়েছিলেন। তিনি যে কবিও সে-কথা তাঁর মৃত্যুর পূর্বে একজনই শুধু জানতেন—সমবয়সী কবিবন্ধু রবার্ট ব্রিজেস। হপকিন্সের মৃত্যুর পর তিনি কবিতাগুলি প্রথম প্রকাশ করেন।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০)-সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকায় (১৩৪২ বৈশাখ) অমিয় চক্রবর্তীর যে 'ছোটো প্রবন্ধ' ছাপা হয় তার নাম 'দুটি ইংরেজি কবিতা'। বাংলা অনুবাদসহ স্টিফেন স্পেণ্ডার ("এক্সপ্রেস ট্রেন") ও উইনিফ্রেড হোল্‌টবি-র ("ফ্রান্সের ট্রেন") দুটি কবিতা অবলম্বন ক'রে এই প্রবন্ধে দেখানো হয়েছিলো বিজ্ঞানের উদ্ভাবনা, সাম্প্রতিক জীবনের অঙ্গ হিশেবে আধুনিক ইংরেজি কবিতায় কী রকম অনায়াসে অনুপ্রবেশ করছে: 'আধুনিক রেলগাড়ি বা জাহাজ বিশেষভাবে কবিতার বিষয় বা বিশেষ ভাবে কাব্যে অপাংক্তেয় এমনতরো বচন বিচারে অগ্রাহ্য। অনুভূতির পরিমণ্ডলে যখনই অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে কোনো বাস্তব ঘটনা, কোনো প্রাত্যহিক জীবন-সামগ্রী, কাব্যে তখন তার প্রবেশ অপ্রতিহত। দূরগামী জাহাজ নানা কল্পনায় বেদনায় মিশ্রিত হয়ে চিদ্‌-সমুদ্রের তরঙ্গে দুলে ওঠে কখনো দেশের কখনো সুদূর প্রাণ-তটের আহ্বানে—হয়তো আমাদের অনেকের সহজ জীবনের অভিজ্ঞতায় তারি ছবি সত্য গ্রামের খেয়াতরীর চেয়ে।' প্রবন্ধের পাদটীকায় রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত "আদিতম" কবিতার উল্লেখ ছিলো।

আপাতদৃষ্টিতে প্রবন্ধে কোনো তর্কের সুর নেই, কিন্তু বিজ্ঞান ও সাহিত্য নিয়ে অমিমাংসিত তর্ক একটা বহুদিন ধ'রেই তো ছিলো। ইঙ্গিতটা রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন। ('ভূমিকা' এবং ২-সংখ্যক চিঠির ১০ম টীকা দ্র.)

## ২৪

London

25th March 1935

শ্রীচরণকমলেষু,

শেষ চিঠিতে অত্যন্ত মনের ক্ষোভে কী লিখেছি জানি না—যদি অন্যায় কিছু লিখে থাকি আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।[১] এক হিসাবে দেখতে গেলে এতদিন ধ'রে এখানে প্রকাশক এবং সাহিত্য সমালোচক মহলে 'চার অধ্যায়'-এর জন্যে যে ক্ষেত্র তৈরি

করেছিলাম তা নষ্ট হল। বিশেষ কারণে ঐ বই-এর ইংরেজি প্রথম আমেরিকায় বেরোলে এরা সত্যিই তা কোনোদিন সহজভাবে গ্রহণ করতে পারবে না। এবং এ কথা ঠিক যে ইংরেজি সাহিত্যের বিচার ইংলণ্ডে, আমেরিকায় নয়। আমেরিকায় প্রথম বেরোলে বইয়ের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক এই কথাটাই প্রচারিত হবে সর্ব্বত্র—এবং আমার একান্ত চেষ্টা ব্যর্থ হবে অমন অপূর্ব্ব সাহিত্য রচনা সাহিত্য হিসাবেই যাতে সমাদৃত হয়। তা ছাড়া চারমাস ধ'রে serially বেরোলে ওর surprise ও থাকবে না, প্রকাশকের সব উৎসাহ চাপা পড়ে যাবে। এরা চেয়েছিল আপনার হাতের design দিয়ে অবিলম্বে সুন্দর করে বইখানি নূতন সাহিত্যমহলে উপহার দিতে।।

অবশেষে মুসলমান রাজভক্তের প্রতি অনুকম্পায় Churchill পর্য্যন্ত খাঁটি কথা বলেচেন। এই প্রথম তাঁর সঙ্গে আমাদের মন সম্পূর্ণ মিলেচে।[২] এত বড়ো ব্যাপার কখনো জমে উঠতেই পারে না প্রথম থেকে পুলিশ সাবধান থাকলে।—তার পর ভিড় সামলাবার এমন অমোঘ উপায়ও পৃথিবীতে অন্য কোথাও ব্যবহার হয় না। এক পক্ষকে অত্যধিক বাড়িয়ে তুললে কী অবস্থা হয় তা এঁরাও বুঝচেন। যাই হোক, এদের দোষ দেওয়া বৃথা আমাদের বর্ব্বরতার জন্যে।

হৈমন্তীর কাছ থেকে খবর পাবেন লণ্ডনে 'সাবিত্রী' অভিনয়ের বিষয়।[৩] খুব হৈ-চৈ করচে, জানি না কতদূর কী হয়ে উঠবে। চীনে নাটক 'Lady Precious Stream' অপূর্ব্ব হয়েচে—এমন জিনিষ জীবনে কমই দেখেচি। Hsing-এর সঙ্গে ভাব হয়েচে —অতি সহৃদয় প্রতিভাবান যুবক। Nancy Price তাঁর People's National Theatre-এ এই নাটক সম্পূর্ণ চীন বেশ ভূষা গান এবং নাট্যরূপ রেখে তুলেছিলেন। সমস্ত য়ুরোপ থেকে ভিড় জমচে—তিন মাস হয়ে গেল অথচ এই নাটক বন্ধ করতেই পারচে না। মধ্যে থেকে আমাদের চীনে কবি দশ হাজার পাউণ্ড পেয়েচেন—এক বছর পূর্ব্বে এসেছিলেন ছোট একটি suitcase এবং নিঃসহায়তা সঙ্গে করে! কবে শান্তিনিকেতনের অভিনয় এখানে দেখাবেন? 'নটীর পূজা'ই হয়তো সব চেয়ে জমত। এরা বুঝত অভিনয় কোথায় পৌঁছতে পারে।

আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

প্রণত
অমিয়

এইমাত্র আপনার চিঠি পেলাম—পরের ডাকে লিখচি।

[ চিঠির সঙ্গে সংবাদপত্রের কর্তিত অংশ ]

MR. CHURCHILL'S PROTEST

MR. CHURCHILL (Epping, U.).—Will the right hon. gentleman say why it is that the Government of India, in dispersing these crowds of excited people, do not use lachrymatory gas capsules, such as were

used in America, instead of firing these bullets which pierce three or four bodies at the same time; and why humanity and common sense should not lead to a reform in the matter of dealing with crowds of this character? (Cheers.)

SIR S. HOARE—The Government of India have already considered that possibility, and, so far as I can remember, lachrymatory gas has been used in the Punjab. I will communicate the right hon. gentleman's suggestion, but I will say nothing that would lead the House to suppose that I have not full confidence in the troops and the police in Bombay to deal with the situation. (Cheers.)

MR. CHURCHILL—May I ask whether the right hon. gentleman will most carefully distinguish between any suggestion that there is a lack of confidence in the troops or in the judgement of the people on the spot and a decision required in a high matter of policy by the Imperial Government?

Sir S. Hoare—Certainly.

---

টীকা

১ 'চার অধ্যায়ে'-র তর্জমা ছাপা না হওয়াতে পূর্ব পত্রে অমিয় চক্রবর্তী যে-অশোভন ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন তার উল্লেখ।

২ পার্লামেন্টের সাধারণ সদস্য হিশেবে চার্চিল জানতে চেয়েছিলেন দাঙ্গাহাঙ্গামা থামাতে ভারত সরকার খুনী বুলেটের পরিবর্তে খানিকটা ভদ্র কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করেন না কেন। চিঠির সঙ্গে পাঠানো লণ্ডনের *Times* পত্রিকার কর্তিকাটি কৌতুকজনক।

৩ 'সাবিত্রী' বিষয়ে ২৩-সংখ্যক চিঠির ৭ম টীকা দ্র.।

## ২৫

April 1/35
London

As from
Balliol College
Oxford

শ্রীচরণকমলেষু

Air Mail-এ চার অধ্যায়ের ইংরেজি পাঠিয়েচি—আপনার সংশোধন হয়ে গেলে যদি Air Mailএই আমাকে ফেরৎ পাঠান তাহলে অনেক সপ্তাহ সময় বাঁচবে। তর্জ্জমার অনেক জায়গা এখনো কাঁচা রেখেচি—'fix' করার আগে আপনার revision দরকার। তা না হলে কিছুতেই আমরা তো সাহস পাই না। প্রথম পৃষ্ঠাতেই এক জায়গায় দুচার লাইন tentatively যোগ করা হয়েচে বন্ধুদের অনুরোধে—তাঁরা বলেন ওতে ইংরেজি পাঠকের কাছে ছবি পরিষ্কার হবে, কিন্তু আমার আপত্তি ছিল। আমি নিজের থেকে এক অক্ষরও

যোগ করতে চাই না যা মূল লেখায় নেই। আপনি যা ঠিক মনে করেন করবেন। জিনিষটা সামান্য।

তাড়াতাড়িতে আরো দু-একটা জায়গায় type-র (sic) ভুল রয়ে গেছে এবং দুএকটা কথা যা পরে বদ্‌লেচি। যেমন:

x১) page 2, line 6, dependence (not independence)

২) page 3, Line 2, Contention (not complaint)

পড়তে পড়তে এ সবই আপনার চোখে বাধবে। আপনার অনুমোদন পেলেই জানব আমার এত দিনের পরিশ্রম সার্থক হল। বিদেশী ভাষায় এতবার ক'রে বদ্‌লাতে হয় ঠিক জোর পৌঁছিয়ে দিতে।

আজ *Asia*-র কাছ থেকে cable পেয়েচি mss-এর জন্যে। কিন্তু আপনার revision না এলে কোনো negotiations সম্ভব নয় তাই জানাচ্চি। *Asia* কাগজটা ভালো—কিন্তু উঁচুদরের সাহিত্য বেরোবার কাগজ় নয়। Oriental গোছের প্রবন্ধ বা গল্প চলে—এমন কি জওহরলালের চিঠি, কিন্তু creative literature কখনো ওতে বেরিয়েচে বলে জানি না। তা ছাড়া এ বইয়ে প্রসঙ্গক্রমে যখন ইংরেজের বিষয় অনেক কথা আছে তখন আমেরিকার popular journal-এ তা প্রথম বেরোলে এদেশে আপনার যথার্থ যাঁরা বন্ধু তাঁরা সত্যিই ব্যথিত হবেন। এ বিষয়ে আর বলতে চাই না। আপনার final মতামত cable-এ আমাকে জানাবেন এবং আপনার revision হলেই air mail-এ পাঠাবেন আমি এখানে expert typist-এর কাছে দুতিন কপি করিয়ে, reader দুএকজনকে পড়িয়ে আপনাকে পাঠাব, এখানেও কপি রাখ্‌ব।[১]

Sturge Moore-এর সঙ্গে অনেক কথা হয়েচে কবিতাগুলির সম্বন্ধে—তাঁর কাছে নূতন কবিতার typed কপিও পাঠিয়েচি। পরে জানাব তাঁদের suggestions প্রভৃতি।[২] Rothenstein তাঁর exhibition নিয়ে মহা ব্যস্ত। কিন্তু ছবিগুলি জমেনি। Epstein-এর bronze গুলির প্রশংসায় য়ুরোপ মুখরিত— 'Behold the Man' পাথরের মূর্ত্তিটা অদ্ভূৎ (sic) ব্যাপার।[৩]

আপনার Parrot's Training আমার কাছে দুএক কপি ছিল। বন্ধুরা সেটা পড়ে সবাই কী আনন্দ যে পান তা কি বলব। Vera Brittain এবং তাঁদের লেখকলেখিকার দল এই নিয়ে এত জমিয়ে তুলেছিলেন।[৪] যদি আপনি কখনো আরো দুচারটে এই রকমের ছোট ছোট Satire (Trial of the Horse আমার কাছে আছে) আপনার নিজের sketch দিয়ে ছাপাতেন তো নূতন লেখকেরা মহা খুসি হয়ে উঠত। [এবং এরাই আপনার পাঠক—পুরোনো generationদের দিয়ে কিছু হবে না[৫]]

Dr. Ghosh-এর[৬] সঙ্গে পূর্ব্বেও চিঠিপত্র চলেছিল বিশ্বভারতী publication সম্বন্ধে। League of Nations কোথাও কখনো free literature পাঠায় না—League থেকে special sanction হয়েছিল একমাত্র কেবল বিশ্বভারতীর সম্বন্ধে। প্রায় দশ বছর থেকে ওরা আমাদের কাছে literature পাঠাচ্চে নিয়ম ক'রে অথচ কিছুকাল হোলো

বিশ্বভারতীর কোনো pamphlet, কোনো annual report, এক পৃষ্ঠা Publication ওদের কাছে আর পাঠানো হয়নি। এতে ওরা দুঃখিত হয়েচে, এবং আগেও জানিয়েচে কিন্তু আশ্রম থেকে উত্তর পায়নি। আমার কাছে যা কিছু literature ছিল অবিলম্বে এক কপি ক'রে পাঠিয়েচি, যাতে আমাদের সঙ্গে যোগ থাকে, এবং quarterly বেরোবে তাও জানিয়েচি।[৭] Quarterly যেন ওদের Secretary Information Section League of Nations Geneva—এই ঠিকানায় বরাবর পাঠানো হয় এইমতো আদেশ ক'রে দেবেন। এবং এক set Annual Reports এবং pamphlets প্রভৃতি এখনই পাঠাতে বলবেন। আপনার কাজের সঙ্গে যখন ওরা যোগ রাখতে এত উৎসুক তখন বন্ধ করা ঠিক মনে হয় না। সুধীনবাবুর একটা চিঠি পাঠাচ্ছি এই সঙ্গে। ওঁরা চাচ্চেন ভারতীয় মহিলা representative কিন্তু এ দেশে সেরকম ভারতীয় মেয়ে কাউকে পাচ্চি না যিনি League-এ গিয়ে বলতে পারেন। Mrs Rama Rao চমৎকার বলেন কিন্তু নানা কাজে আটকা পড়েচেন। সবচেয়ে brilliant এখানকার ভারতীয়ের মধ্যে Miss Mehra Masani—London School of Economics-এর ছাত্রী, Laski-র ভালো student-এর একজন কিন্তু uncompromising communist—যদিও Russia League-এ এসেচে এবং হঠাৎ এই সপ্তাহ থেকে ইংলণ্ডের একান্ত বন্ধু হয়ে উঠেচে জার্ম্মানীর ভয়ে, তবু এখনও অত বেশি সইবে না। এবং এইসব বন্ধুত্বর বিষয়ে না বলাই ভালো।[৮]

কাল 'সাবিত্রী' অভিনয় হবে—আপনার ইংরেজি কবিতা Mrs Keble পড়বেন, সবাই পেয়ে খুব আনন্দিত হয়েচেন। চেষ্টা করচেন ভালো কিন্তু কী ক'রে বলি এই সব অভিনয় ভালো বা ভারতীয়!—এক সূর্য্য সেনের গান চলনসই, ডাক্তার পার্ডির মেয়ের নাচ কোনোমতে চলে, কিন্তু সবসুদ্ধ কিছুই হয়নি।[৯] নিতান্ত ভালোমানুষী ক'রে চুপ ক'রে থাকতে হয় কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কাল Wimbledon-এ গিয়েছিলাম একবার final arrangements দেখবার জন্যে—নীরবে দুটো ঘণ্টা কাটল। বসন্তকাল এসেচে ইংলণ্ডের বাগানে, কাল দুপুরে রোদ্দুরও উঠেছিল তাই অভিনয়ের চারপাশে মন ভোলাবার আয়োজন ছিল। দুর্ভাগা ভারতবর্ষ যথাসাধ্য চেষ্টা করছিল ভারতপ্রেমিক ইংরেজের কণ্ঠে গান করতে এবং ভুল তালের সহযোগে নাচতে,—মনে পড়ছিল অনেক হাজার মাইল দূরের কথা। কিন্তু এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে যাঁরা এই ব্যাপারে নেমেচেন তাঁরা সত্যিই ভালোবাসেন ভারতবর্ষকে। কখনো কি খাঁটি দেশের গান নৃত্য নাটক এখানে এদের দেখানো হবে না?

Joad-এর[১০] *Return to Philosophy* পড়েচেন কিনা জানতে খুব ঔৎসুক্য হয়। আধুনিক পন্থীদের উপর তীব্র আক্রমণ করেচেন ; লিখেচেন চমৎকার। লোক হিসাবেও উনি অতি সহৃদয় এবং ওর সঙ্গে কথাবার্তা ক'য়ে সুখ হয়। সবচেয়ে ভালো লাগে আধুনিক ইংলণ্ডে *New Statesman* , এবং *Time & Tide*-এর group-কে —যতদিন য়ুরোপে এই রকমের সব আলোভরা মন জেগে থাকবে ততদিন ভয় নেই। এদেরই জয় হবে। আপনি তো এই কথাই বলেচেন। আমাদের দেশেও এই মনের আলো আপনি

জ্বালিয়েচেন—আমরা তাই দিয়েই পথ খুঁজে পাব, মিলব মহামানুষের লোকালয়ে—আমরাই বাঁচাবো মানুষকে। এত বেদনা, এত দুঃখ, এত চেষ্টা—নিরন্তর আমরা সংগ্রাম করচি এই আলোজ্বালা মিলনের জন্যে, কিছুতেই হার স্বীকার করব না মিথ্যের কছে, জাতীয়তার কাছে যতদিন আমাদের চিত্তে আপনাদের দেওয়া সত্যের এতটুকুও অবশিষ্ট থাকে।

আপনার চিঠিখানি পেয়ে কত শক্তি এবং সান্ত্বনা পেয়েচি বলতে পারি না।[১১] আশ্চর্য্য এই যে Karachi visit-এর কত আগে আপনি অনুভব করছিলেন উত্তর ভারতে হিন্দুমুসলমানের সংগ্রাম আবার আসন্ন হয়ে উঠেচে। ঐ চিঠি ছাপিয়ে এবং হিন্দুমুসলমানকে কড়া কথা শুনিয়ে আপনি যদি কোথাও লেখেন তো ভালো হয়। ইংরেজিতে লেখেন তো বাহিরের পৃথিবীতে পৌঁছবে! সব চেয়ে বেশী ভাবচে সবাই আমাদের ঐ সাংঘাতিক ভিতরকার ভিতরকার বিরোধের কথা।—এ বিষয়ে আপনার মতামত কি, এবং আপনি কি চেষ্টা করচেন, করেচেন তা এদের জানা দরকার। এটা অন্তত জানা থাকুক আপনি এক সময়ে ঠিক কথা বলতে দ্বিধা করেননি—বর্ব্বর জনসাধারণ পৃথিবীতে কোন্ কথা শোনে বা শোনে না তাতে ততটা যায় আসবে না। পৃথিবীতে সর্ব্বত্র যে অন্য এক মানুষ জাতি জাগচে তারা শুনবে—শুনবে এখানে, শুনবে রাশিয়ায়, শুনবে চীনদেশে, ভারতবর্ষেও। তাদের জন্যে কিছু লেখেন তো বড়ো উপকার হয়। এবং কেউ যদি তর্জ্জমা করেন আপনার পূর্ব্ব প্রকাশিত "সমস্যা" "সমাধান" প্রভৃতি হিন্দুমুসলমান সম্পর্কীয় প্রবন্ধ। "মরমিয়া" প্রবন্ধও ইংরেজি করা বিশেষ দরকার, কেননা ওতে আরেকটা মস্ত বড়ো কথা আছে যা সবাই চাপা দিতে চায়। আমাদের সাধকেরা যে synthesis করেছিলেন—সুফী সাধনার ধর্ম্মতত্ত্ব যে হিন্দুমুসলমান মিলন হতে উদ্ভূত তার কথা আপনার কাছ থেকে লোকে শুনুক। বাংলাতেও ঐ প্রবন্ধগুলি (রাজনৈতিক এবং সমাজনৈতিক অপ্রকাশিত প্রবন্ধগুলি) বই হয়ে এখন অবিলম্বে বেরোনো দরকার।[১২]

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

প্রণত
অমিয়

---

**টীকা**

১ 'চার অধ্যায়' অনুবাদকের আর্জি টিকলো না, দেশ থেকে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের করা অন্য একটি অনুবাদ ন্যু ইয়র্কে *Asia* পত্রিকায় পাঠানো স্থির হ'লো। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত অমিয় চক্রবর্তীর পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠায় কবির হাতে পরিমার্জনা স্পষ্ট বোঝা যায়। কেন অমিয় চক্রবর্তীর অনুবাদ না ছাপিয়ে অন্য একটি অনুবাদ ছাপানো স্থির হ'লো তা বোঝা যায় না।

২ Sturge Moore—২০-সংখ্যক চিঠির ৪র্থ টীকা দ্র.।

৩ (Sir Jacob) Epstein (১৮৮০-১৯৫৯) ঈষৎ বামপন্থী, প্রসিদ্ধ কিন্তু বিতর্কিত ইংরেজ ভাস্কর। মাতাপিতা রুশ-পোল ইহুদী, জন্ম ন্যুইয়র্কে। শহরের উন্মুক্ত প্রকাশ্য স্থানে বৃহদাকার ভাস্কর্য স্থাপনের ব্যাপারে ইংলণ্ডে ইনি অগ্রণী ছিলেন। আইনস্টাইন, শ', কনরাড প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতিকৃতি গড়েছেন। এঁর করা রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তির কপি আছে রবীন্দ্রভবনে, মূল কাজটি আছে বার্মিংহামের সিটি মিউজিয়ামে। দাড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো এই আবক্ষমূর্তির ধরনটা অনেকের পছন্দ নয়। তুলনায় রামকিংকরের গড়া আবক্ষ মূর্তিটি অনেক বেশি শক্তিশালী এবং চরিত্রবান।

এপস্টাইনের গড়া ভাস্কর্যের নিন্দা এবং প্রশংসায় ইংলণ্ডের সংবাদপত্রে এক সময় বিরাট হৈচৈ হয়েছিলো। চিঠিতে উল্লিখিত 'Behold the Man' এগারো ফুট উঁচু মার্বেল পাথরে খোদাই করা খ্রিস্টমূর্তি। *Catholic Times* এটিকে বলেছিলেন 'ugly and vile', রোমান ক্যাথলিক লেখক চেস্টারটনের মতে 'an outrage', আর *Manchester Guardian* উচ্ছ্বসিত হ'য়ে লিখেছিলেন —'It is the most impressive of Mr. Epstein's great stone figures.' আধুনিক শিল্প বিষয়ে লোকের রুচি ও মতের ঐক্য আশা করা যায় না।

৪ Vera Brittain (১৮৯৬-১৯৭০) ছিলেন স্বাধীনচেতা সাংবাদিক, ঔপন্যাসিক, নির্ভীক শান্তিবাদী প্রবন্ধলেখক, এবং উইনিফ্রেড হোল্‌টবি-র বন্ধু। গ্রন্থ : *Testament of Youth* (১৯৩৩), *Testament of Friendship* (১৯৪০)।

৫ স্টার্জ মূর, আর্নেস্ট রীজ প্রমুখ বর্ষীয়ান ইংরেজ লেখকদের মতামতের প্রতি কবির আস্থা একটু হয়তো বেশি ছিলো। ('চিঠিপত্র' ১১শ,—পৃষ্ঠা ১৩৮, ১৫৬, ১৬১, ১৭২ দ্রষ্টব্য)। বয়ঃকনিষ্ঠ অমিয় চক্রবর্তীর তেমন আস্থা একেবারেই ছিলো না। তাঁর বেশি মিল ছিলো নতুন প্রজন্মের তরুণ ইংরেজ লেখদের সঙ্গে। এবং তাঁদের সঙ্গেই কবির পরিচয় ও সৌহার্দ্য গ'ড়ে তুলতে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। নতুনদের অন্তত একটি অংশ—খানিকটা বাম ঘেঁষা —রবীন্দ্রনাথকে যথার্থ কবি ব'লেই গণ্য করতেন, শুধুই মিস্টিক সন্তসংগীতের উদ্‌গাতা ব'লে নয়। এ-প্রসঙ্গে পরবর্তী ২৭-সংখ্যক চিঠি এবং ভূমিকা দ্র.।

৬ Dr. Ghosh—য়ুরোপ-প্রবাসী বাঙালি ঔপন্যাসিক Sudhin Ghosh, যাঁর লেখার ভাষা ছিলো ইংরেজি। সঙ্গত কারণেই তাঁর অনেক রচনার সুখ্যাতি হয়েছিলো। লীগ অব নেশন্সেও কর্ম করতেন, জেনেভায়। বিজ্ঞানী সত্যেন বসু উপাচার্য থাকাকালীন এঁকে বিশ্বভারতীতে ইংরেজি সাহিত্যের প্রধানের পদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিছুদিন ছিলেন এদেশে। বছর কয়েক আগে বিদেশেই মৃত্যু হয়েছে। ডেভিড ম্যাকাচেন এঁর উপন্যাসের প্রভূত সুখ্যাতি ক'রে প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

৭ *Quarterly*—নতুন সিরিজের *Visva-Bharati Quarterly*, যার সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণ কৃপালনি।

৮ লীগ অব নেশন্সে দাঁড়িয়ে ভালো বক্তৃতা করার মতো যোগ্যতা ইংলণ্ড-প্রবাসী ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে তখন দু-চারজনের মাত্র ছিলো। বামপন্থী Miss Mehra Masani, হ্যারল্ড লাস্কির ছাত্রী, মিনু মাসানীর ভগ্নী, ছিলেন এঁদের একজন। পরে ভারতে আকাশবাণীর প্রোগ্রাম ডিরেক্টর হয়েছিলেন। ঔপন্যাসিক শান্তা রমা রাও,

স্যর বেনেগালের কন্যা, ছিলেন এই রকম আরেকজন। বিশ্বে জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের ইনি একজন নেত্রী হয়েছিলেন।

Laski—(Harold, ১৮৯৩-১৯৫০) ছিলেন লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এর প্রখ্যাত অধ্যাপক, লেবার পার্টির নেতৃস্থানীয় সদস্য, পরে চেয়ারম্যান।

৯ 'সাবিত্রী' ও সূর্য সেনের পরিচয় পূর্বেকার ২২-সংখ্যক চিঠির টীকায় দ্রষ্টব্য। ২ এপ্রিলের এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে বিশ্বের নারী-প্রগতি-আন্দোলন জড়িত থাকায় রবীন্দ্রনাথ, খুব সম্ভব অমিয় চক্রবর্তীর আগ্রহে, 'Woman' নামে একটি কবিতা তখনকার দিনের হাওয়াই ডাকে এঁদের পাঠিয়ে দেন। তাঁদের চেনা এই 'সন্ত' কবি যে আবার নারী-প্রগতিতেও উৎসাহী সে-কথা ওখানে কম লোকেরই জানা ছিলো। ইণ্ডিয়া সোসাইটি থেকে ১৯১৩ সালে যখন 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকের অনুবাদ *Chitra* নামে বেরিয়েছিলো তাতেও কোথাও উল্লেখ ছিলো না যে সেটি দুই দশক আগে ১৮৯২ সালে রচিত নারী-স্বাধীনতা বিষয়ক এক বাংলা নাটকের অনুবাদ!

১০ (C.E. M.) Joad (১৮৯১-১৯৫৩) ছিলেন সমাজতন্ত্রী শান্তিবাদী ব্রিটিশ দার্শনিক, কিন্তু মার্ক্সবাদী নন। এ-চিঠি লেখার অল্প কিছুদিন আগেই জোড়-এর *Return to Philosophy* (১৯৩৩) বইটি বেরোয়।

১১ ব্রিটিশের কূটকৌশলে স্বাধীনতাকামী ভারতবর্ষে বিরাট এক সাম্প্রদায়িক সমস্যা গজিয়ে ওঠে। সে-বিষয় বেদনা ও ক্রোধের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীকে দীর্ঘ, প্রায় প্রবন্ধের মাপের, এক চিঠি লেখেন রবীন্দ্রনাথ। তাতে এমন কথাও ছিলো—'ওরা যে গ্রহের আমরা সে গ্রহের নই। যখন এ কথাটা বুঝি তখন সমুদ্রের ওপারের খ্যাতি প্রতিপত্তির জন্যে আমার আকাঙ্ক্ষা একেবারেই চলে যায়।' কাজেই সে-সময় Collected Poems বের করার যে-আয়োজন চলছিলো তাতেও রবীন্দ্রনাথ উৎসাহ হারিয়ে ফেলছিলেন। চিঠিটির মূল অংশ 'প্রবাসী'-তে (১৩৪২ বৈশাখ) যায়, এবং এ-সময়কার বেদনাবিদীর্ণ অথচ তেজোদ্দীপ্ত প্রবন্ধাদি একত্র ক'রে পরে 'কালান্তর' (১৯৩৭) গ্রন্থে ছাপা হয়।

১২ হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কীয় প্রবন্ধ "সমস্যা" ও "সমাধান" 'কালান্তর' গ্রন্থে আছে। 'মরমিয়া' প্রবন্ধটি আসলে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের 'দাদূ' গ্রন্থের ভূমিকা হিশেবে লেখা, 'প্রবাসী' ১৩৩২-এর ভাদ্র সংখ্যায় বেরিয়েছিলো।

## ২৬

April 14 [1935] London

শ্রীচরণকমলেষু,

এইমাত্র Andrews এসেছেন আফ্রিকা থেকে, টেলিফোনে কথা হল। তিনি এই হপ্তায় চলে যাচ্ছিলেন ভারতবর্ষের জাহাজে, কিন্তু আমি বলচি একবার রথীবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে, কথা কয়ে যেতে। তাঁদের পৌঁছনর খবর এখনো পাইনি—আঁদ্রে[১] সেদিন

লিখেছিলেন, কিন্তু তখনো তাঁরা পৌঁছননি —আশা করি শীঘ্রই খবর পাব। কাল এণ্ড্রুজের সঙ্গে সব কথাবার্ত্তা হবে—তার পর আবার লিখব। Andrews পথে রথীবাবুর সঙ্গে দেখা করে Marseilles-এ পরের জাহাজে যেতে পারবেন।

ভারতবর্ষের রাজাগুলি এসে পৌঁছচ্চেন —এরি মধ্যে তাদের কীর্তি-কলাপের সঙ্গে যোগ হয়ে দেশের হিন্দুমুসলমান ভ্রাতৃহত্যাকাণ্ড আরো অদ্ভুৎ (sic) আবহাওয়া সৃষ্টি করচে এই দেশে—দেখে শুনে আর কথা বলতে ইচ্ছে করে না। মনে প'ড়ে যায় একটা ভারতবর্ষ এখনো অবশিষ্ট আছে আপনার গানের, কর্ম্মের ভারতবর্ষ, আপনার সৃষ্টির ; যে ভারতবর্ষে মানুষের কাজে মহাত্মাজি গ্রামে গ্রামে হেঁটে বেড়াচ্চেন। আর একান্ত প্রার্থনায় ইচ্ছে জাগে যে আমাদের নতুন ছেলেমেয়েদের জীবনে এই ভারতবর্ষই প্রাণের বীর্য্যে দেখা দিচ্চে, আরো দেখা দেবে। এই মূর্ত্তি মনে না থাকলে একটুও ইচ্ছে করে না কোনোদিন নিজেরা কিছু করতে।

Oxford-এর একটি ভালো মেয়েদের স্কুলের teacher সেদিন আমার সঙ্গে দেখা করলেন, ভারতবর্ষে যেতে চান। বছর খানেক ছুটি নিয়ে ভারতবর্ষে শিক্ষার কাজে কিছু সেবা করতে তিনি উৎসুক। বোধ হয় তাঁদের পরিবারের সঙ্গে কোনো কালে ভারতবর্ষের কর্ম্ম সম্পর্কে কিছু যোগ ছিল। নিজের কিছু অর্থ আছে তাই খরচ চান না।—মাস ছয়েক শান্তিনিকেতনে মেয়েদের, ছেলেদের, ইংরেজি পড়ানোর ভার নিতে চান। কেবল থাকবার জায়গা পেলেই চলবে। ছমাসে বিশেষ কিছু করতে পারবেন না।—কিন্তু ইংরেজি শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে তোলবার কাজে তাঁর সাহায্য ব্যর্থ হবে না এই তাঁকে বললাম। এণ্ড্রুজের সঙ্গে কথা ক'য়ে দেখব। তিনি পরে আপনার মতামত জানতে পারবেন এবং ভদ্রমহিলাকে জানাতে পারবেন। Dr. Royden [২] তাঁর প্রশংসা করছিলেন, তাতে বুঝতে পারি এঁর দক্ষতা আছে শিক্ষার কাজে, তা ছাড়া Somerville-এর graduate, পড়াশোনা আছে। শান্তিনিকেতনে কাজের অবকাশ পেলে Autumn-এ যেতে চান।।

'Four Chapters'-এর বিষয় cable করেচি। ছবি এবং Mss. পেলেই ছাপানো এগিয়ে দিতে চাই। Serialise করলে একটু একটু ক'রে চার পাঁচ মাস ধ'রে বেরোলে হয়ত উৎসাহ জুড়িয়ে যাবে। যাই হোক এ বিষয়ে শেষ যা বলেন তার জন্যে উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করচি। [৩]

আপনার চিঠিগুলি একসময়ে ইংরেজি ক'রে একত্র আপনাকে পাঠাতে চাই—এর থেকে একদিন য়ুরোপ আপনাকে আরো স্পষ্ট চিনতে পারবে। এরকম ক'রে এসব বিষয়ে কোথাও তো বলেননি। [৪]

Virginia Woolf-এর মন্তব্য সমেত তাঁর একটা বই আপনাকে সাধারণ ডাকে পাঠাচ্চি। নারীকে কর্ম্মজগতে আপনি কী জায়গা দেন তা নিয়ে এঁদের মনে একটু খটকা আছে—"Woman" কবিতা প'ড়ে এঁরা অনেকে এবিষয়ে আলোচনা করছিলেন। আরো একটু জানতে চান। এবিষয়ে ঐ বইয়ের সঙ্গে চিঠিতে লিখেচি। আপনি যে জ্ঞানের ক্ষেত্রে, সমাজের ক্ষেত্রে মেয়েদের মুক্তি দিয়েচেন কত ভাবে তা বলেচি। [৫]

এখুনি যাব Airway Terminus-এ এই চিঠি শেষ মুহূর্তে দিতে—ওখানে আধঘণ্টা পরেও দেওয়া চলে। আজই Malvern থেকে ফিরেচি। 'বিচিত্রিতা'র দ্বিতীয় কি বেরিয়েচে? [৬] আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নেবেন।

অমিয়

---

**টীকা**

১ রথীবাবু—(রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর) তখন (মার্চ ১৯৩৫) এলমহার্স্ট-এর সঙ্গে শ্রীনিকেতনের সমস্যাদি আলোচনার জন্যে প্রতিমা দেবীকে নিয়ে ইংল্যাণ্ডে যাচ্ছিলেন। আশ্রমের সমস্যা ছিলো প্রধানত আর্থিক।
আঁদ্রে—আঁদ্রে কার্পেলেস। ৫-সংখ্যক চিঠির টীকা ৪ দ্র.।

২ Dr. Royden—১০-সংখ্যাক চিঠির টীকা ৬ দ্র.।

৩ 'চার অধ্যায়ে'র তর্জমার ভবিষ্যৎ তখনো অনিশ্চিত। *Asia* মাসিকপত্রে ধারাবাহিক প্রকাশ করা বিষয়ে অমিয় চক্রবর্তী তখনো অনিচ্ছুক।

৪ অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা গভীরভাবে মূল্যবান রবীন্দ্রনাথের এই সব চিঠির কয়েকটি মাত্র অনুবাদ *Visva-Bharati Quarterly* এবং *Modern Review* পত্রিকায় বেরিয়েছিলো। মূল বাংলা চিঠির অধিকাংশই ১৯৭৪ সালে 'চিঠিপত্র' ১১শ খণ্ডরূপে প্রকাশিত হয়েছে, পত্রপরিচিতি ছাড়াই । দুঃখের বিষয় গ্রন্থনের কাজও যত্ন নিয়ে করা হয়নি।

৫ Virginia Woolf (1882-1941) ছিলেন নারী প্রগতির বড়ো সমর্থক এবং ব্লুমসবেরি গ্রুপ নামক উন্নাসিক, শক্তিশালী, লেখকদলের বিশিষ্ট সদস্য, উজ্জ্বল উপন্যাস ও প্রবন্ধের লেখিকা। হোগার্থ প্রেস প্রকাশনসংস্থারও তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে হঠাৎ আত্মহত্যা করেন।

মন্তব্য সমেত রবীন্দ্রনাথকে পাঠানো এঁর কোনো বইয়ের কিংবা সে-বিষয়ে অমিয় চক্রবর্তীর লেখা কোনো চিঠির সন্ধান পাওয়া যায়নি।

"Woman" কবিতাটি 'মহুয়া' গ্রন্থের (১৯২৯) "সবলা" কবিতার কবিকৃত অনুবাদ। *A Tagore Reader*-এ নির্বাচিত কবিতার মধ্যে অনুপস্থিত। *Poems* গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (1965-)আংশিক অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

এ-চিঠি লেখার দিন কয়েক আগেই লণ্ডনের Playhouse-এ 'ভারতরজনী' অনুষ্ঠানে কবিতাটি আবৃত্তি করা হয়। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ হয়তো সেখানেই কবিতাটি শুনে থাকবেন।

৬ রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও আঁকা ছবি সমেত, নন্দলাল বসুর প্রতি 'আশীর্বাদ' স্বরূপ 'বিচিত্রিতা' নামে (১৯৩৩) একটি গ্রন্থ বেরোয়। পূর্বের ৭-সংখ্যক চিঠিতে এ-প্রসঙ্গ আছে। সম্ভবত এই নামে আরো কিছু খণ্ড পরে বেরোবার কথা হয়েছিলো, বেরোয়নি। অমিয় চক্রবর্তী জানতেন, কেননা অক্সফোর্ডে যাওয়ার আগে ১৯৩৩ সাল অব্দি বিশ্বভারতী 'পাবলিশিং বোর্ডে'রও তিনি সদস্য ছিলেন।

April 26 [1935]

Union Society
Oxford

শ্রীচরণকমলেষু

আপনার জন্মদিনের উৎসবে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

এমন সময়ে আশ্রমে থাকতে পারলাম না এই নির্ব্বাসন একান্ত অনুভব করচি। জানি এবারকার পঁচিশে বৈশাখ কী সুন্দর শুভ্র হয়ে দেখা দিয়েচে শান্তিনিকেতনের আনন্দিত দিনে। কোনো.বিবরণ যদি কাগজে বেরোয় তার থেকে কিছু জানতে পারব।

কয়েকটি বই পাঠিয়েচি—আমাদের দুজনের প্রণাম অর্ঘ্যের সঙ্গে হৈমন্তী নিবেদন করবে।[১]

এণ্ড্রুজ কাল চলে গেলেন। ভিক্‌টোরিয়া স্টেসনে বিদায় দিয়ে এলাম। সঙ্গে যেতে পারলাম না, স্টেসনেই পড়ে রইলাম ভিড়ের মধ্যে। সমস্ত ভারতবর্ষের আহ্বান দূরের ছবিতে জেগে উঠল জন্মকালের বেদনায়। এখানে আমাদের কাজের দেশ। কোথাও বাড়ি ফেরা হয় না। রাত্রে ঘুম সে কেবল শারীরিক বিশ্রাম ; ঘরে থাকা, প্রাত্যহিক ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে।

রথীবাবু-রা নিশ্চয়ই এতদিনে য়ুরোপে এসে পৌঁছেচেন, এবং ভালো আছেন। বোধ হয় Continent-এ আছেন। এণ্ড্রুজ যদি খবর পেতেন তাহলে পথে কোথাও দেখা ক'রে যেতে পারতেন। ২৫শে অবধি অপেক্ষা করলাম আমরা। নিশ্চয়ই কোনো সময়ে খবর পাব।

আপনাকে চেনে এবং জানে, ভালোবাসে, আধুনিক য়ুরোপে তারাই যারা নূতন প্রাণের সন্ধানে বেরিয়েচে। প্রবীণ সাহিত্যিক যাঁরা তাঁরাই সব চেয়ে কম বোঝেন—আপনার অতীত বন্ধু যাঁরা তাঁদের ভিকটোরীয় মনে হঠাৎ একটু ছোঁয়া লেগেছিল কিন্তু তার বিশেষ মূল্য নেই।[২] তাঁরা জীবনের একান্ত প্রয়োজনে কোনো জিনিষ যাচাই ক'রে দেখেননি। Sturge Moore প্রভৃতি লেখকের কথা বলচি—যাঁদের কিছু প্রতিভাও ছিল। কিন্তু সে প্রতিভা সাবেক কল্পনার রাজ্যে বিচরণ ক'রে বহুকাল পূর্ব্বেই ক্লান্ত হয়ে পড়েচে।[৩] —আজ যখন পৃথিবীর নবযুগ নির্মাণ করবার কাজে দিকে দিকে শুভ্র সতেজ হৃদয়বান মেয়ে পুরুষ বেরিয়ে পড়েচে তার মধ্যে এঁরা যোগ দেননি, একবারও সাড়া দেননি। আপনি নূতন প্রাণের পূজারী—চিরদিনই অম্লান বিস্ময়ে মানুষকে ভালোবেসেচেন, শ্রদ্ধা করেচেন, নব নব বাণীর বন্দনায় মানুষের যাত্রাপথে মুক্তির নির্দ্দেশ ধ্বনিত হয়েচে আপনার সৃষ্টিতে। আজকের নবীনেরা এ কথা বোঝে—(অন্তত য়ুরোপে)—যদিও উপযুক্ত সমালোচনা, পরিচয়-পুঁথি এবং জীবনীর অভাবে অনেকে এখনো সমস্ত background জানে না। Sturge Moore প্রভৃতি আপনার গোটা কয়েক "শিশু" কবিতা এবং প্রার্থনাপূর্ণ রচনাকে ঠিক সাহিত্য হিসাবে নয় ভারতবর্ষীয় মনের পরিচয় স্বরূপে গ্রহণ করতে রাজি—তার বেশি দাবী করলে অবাক হয়ে যান। কেননা কোনোদিনই তাঁরা বড়ো

পৃথিবীর ভূমিকায়, চেতনার উদ্দীপনায়, চিন্তা এবং কর্ম্মের বিচিত্রমুখী সংঘর্ষে, আলোড়নে, মানব সভ্যতাকে জানেননি। এ বিষয়ে বেশি ব'লে সময় নষ্ট করব না। আপনার তো কিছুরই দরকার নেই—কিন্তু আমাদের কাজ তো করতে হবে। আমার কাজ ব'লে বলচি না— এই কাজকে আধুনিক পৃথিবীরই কাজের অঙ্গ ব'লে জানি। তাই এত অসংখ্যবার লণ্ডন্ যাত্রা এবং প্রবীণদের সঙ্গে আলোচনা একদিক থেকে ব্যর্থ হলেও অভিজ্ঞতার দিক থেকে তার মূল্য আছে। Collected Edition-এর আগে একটি বাছাই-করা নূতনে পুরোনোয় মেশানো ইংরেজি চয়নিকা বার করাই ঠিক হল। Macmillan এ বিষয়ে উৎসাহী।[৪] Julian Huxley, Vera Brittain, Spender, Blunden, Holtby, Joad, Priestley কত জনের নাম করব?[৫]—তাঁদের সমসাময়িক, এবং তাঁদেরও পরবর্তী সাহিত্য মহলে আপনার রচনার যখন আলোচনা চলে তখন দেখি আপনাকে তারা সহযাত্রী বলেই জানে, আপনার চিন্তার পরিচয় পেলে চমৎকৃত হয়। আপনার কবিতার আলোচনা ক'রে আনন্দ পেয়েচি বারে বারে তাদের সঙ্গে। এণ্ড্রুজ যে Selection বার করেছিলেন Indian Edition-এ তা ভারতবর্ষের কলেজ পাঠ্য বইয়ের দিক দিয়ে—আমরা বার করতে চাই আপনার নূতন পাঠানো ইংরেজি কবিতা এবং পূর্বে ছাপা ইংরেজি বই থেকে বাছাই করা তর্জ্জমা একত্র করে শ' খানেক কবিতার সঞ্চয়। ইতিমধ্যে আপনার ইংরেজি বইগুলি এতবার পড়েচি এবং এত আলোচনা হয়েচে যে এই কাজ আমি বোধ হয় এখন ঠিকভাবে করতে পারব। এবং অবশ্যই সাহায্য নেব আমার বন্ধুদের কাছ থেকে যাঁরা আপনাকে একান্ত শ্রদ্ধা ক'রে তাঁদেরই শ্রেষ্ঠ ব'লে মানেন। Thompson-এর সঙ্গে প্রায়ই দেখা এবং কথা হয়।[৬] তবে তিনি নিজে বিশেষ সাহায্য করতে পারবেন না।

Wyndham Lewis বাঙালীদের কেন, সবার শরীরেই হুল বেঁধানোর ব্যবসা চালাচ্চেন। তাঁকে লোকে পাগল ব'লে জানে।[৭] আপনার 'চার অধ্যায়' ঠিক জায়গাতেই পৌঁছবে। যেসব গুণী ইংরেজ ভদ্রলোক আপনার কবিতা প্রথম প'ড়ে (Bradley বা Stopford Brooke বা Prof Murray বা এমন কি Rothenstein-এর মতো লোকের কথা বলচি না)[৮] বিজ্ঞ মাথা নেড়েছিলেন এবং Knighthood ত্যাগ করায় আবার উল্টো দিকে ঘন ঘন মাথা নাড়লেন তাঁরা এ বই বুঝবেন না, তাঁরা এর মধ্যে Oriental বিনয় এবং নিরাপদ আধ্যাত্মিক ভারতীয়তা না পেয়ে অতিশয় ব্যথিত হতেও পারেন। কিন্তু কয়েকজনের নাম করেচি—এবং এঁরাই আজকের ইংরেজ—( G. D. H. Cole, Pound, Maccarthy এঁদের নামও বিশেষভাবে করতে চাই)—তাঁরা আপনার গল্পে গভীরতম আনন্দ পাবেন।[৯] আমার দুএকজন বন্ধু—*Time & Tide*-এর দলের—যাঁরাই দেখেচেন তাঁরা বলেচেন এতদিনে তোমাদের মানুষকে জানলাম, তোমাদের বাঙালী ছেলেকে, বাঙালী মেয়েকে—সমস্ত হৃদয়মন দিয়ে তাদের কাছে পেয়েচি এই গল্পে। Political মতামতে কিছুই আসে যায় না—অন্তু এবং এলার কথা, তাদের সাধনা তাদের সংগ্রাম তাদের চারদিকের জীবনের উচ্ছ্বসিত বিচিত্রগামী প্রাণস্রোত এদের অভিজ্ঞতায় এসে মিশেচে। (Vera Brittain-এর মতো অতি আধুনিক লেখকের পক্ষে এই গল্প সম্পূর্ণ

রূপেই বোঝা শক্ত নয়।) সাহিত্য হিসাবেই "চার অধ্যায়" এদেশে স্থান পাবে—বাঙালী রাজনীতি বা অরাজনীতির ছোট দিক থেকে তারা আপনার রচনার বিচার করতে যাবে না।

"Four Chapters" revision হলে Air Mail-এই পাঠাতে বলবেন। এবং অনিলবাবুকে আপনি যদি মুখে মুখে ব'লে দেন Noteগুলির অল্প কথায় Explanation তিনি যোগ ক'রে দেবেন। আস-সেওড়া প্রভৃতি গাছের ইংরেজি নাম যেখানে নেই বা আছে তার সঙ্গে অল্প একটু পরিচয় যোগ হলে appendix-এ Glossary-র মধ্যে যাবে। তাতে পাঠক রস পাবে। তা ছাড়া আরো দুটো চারটে footnotes আছে,—পারিভাষিক শব্দেরও দরকার আছে। যেখানে সামাজিক বিশেষ অনুষ্ঠানের উল্লেখ দরকার সেখানে আপনার কাছ থেকে যথাযথ তাৎপর্য্য এবং তথ্য পেলে অনেক ভুল ধারণার সম্ভাবনা দূর হবে। সবসুদ্ধ অল্পই footnote-এর দরকার আছে—আমি প্রতি পৃষ্ঠার তলে তালিকা দিয়েচি দুএকটা ক'রে।

বইখানি আপনার কাছে থেকে পেলেই ছাপার কাজ আরম্ভ হবে এবং publisher-রা যা কিছু technical ব্যবস্থা terms প্রভৃতি আপনাকে জানাবে যথা নিয়মে।

আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

অমিয়

---

টীকা

১ 'শেষ সপ্তকে'-র ৪৩-সংখ্যক কবিতা, "পঁচিশে বৈশাখ" নিজের ৭৪তম জন্মদিনে অমিয় চক্রবর্তীকে কবি উপহার পাঠিয়েছিলেন। শিশুকন্যা নিয়ে হৈমন্তীদেবী তখন শান্তিনিকেতনে আছেন।

২ য়ুরোপে নবীন-প্রবীণের এই দ্বন্দ্বপ্রসঙ্গ শুরু হয়েছিলো পূর্বেকার ২৫-সংখ্যক চিঠিতে: 'পুরোনো generation-দের দিয়ে কিছু হবে না।' বর্তমান চিঠিতে কথাটা আরো বিস্তারিত হয়েছে। নতুন generation-এর লেখকদের সপক্ষে এই লড়াই খুবই কার্যকরী হয়েছিলো। লীগ অব নেশন্স থেকে প্রকাশিত *East and West* পুস্তিকায় ইতিমধ্যেই রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছিলেন: "When I read some of the outstanding modern books published after the war I realize how the brighter spirit of young Europe are now alive to the challenge of the times. ... I feel proud that I have been born in this great age."

৩ Sturge Moore—২০.৪ এবং ২৫.৫ টীকা দ্র.।
বছর খানেক পরে প্রকাশিত *Oxford Book of Modern Verse* গ্রন্থের ভূমিকায় W. B. Yeats স্টার্জ মূর বিষয়ে একই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন : (He wrote) 'of centaurs amazons gazelles copied from a Persian picture.'

৪ এতদিনে অমিয় চক্রবর্তী মোটামুটি মেনে নিয়েছেন যে 'চার অধ্যায়ে'-র তর্জমা লণ্ডনে ছাপা হবে না। পরিবর্তে সমগ্র সংগ্রহের পূর্বে শ' খানেক বাছাই করা কবিতার অনুবাদ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের একখণ্ড Selected Poems বা চয়নিকা প্রকাশ করার

উপযোগিতার উপরে তিনি জোর দিচ্ছেন। এ-বই সম্পাদনা করতেও তিনি আগ্রহী ব'লে জানালেন। এ-প্রস্তাবে কবির আপত্তি ছিলো না, কিন্তু এ-পরিকল্পনাও শেষ পর্যন্ত বাতিল হ'য়ে গেলো।

৫ Julian Huxley— ১১.৪ টীকা দ্র.।

Vera Brittain—২৪.৪ টীকা দ্র.।

(Stephen) Spender (১৯০৯—)—'অডেন গোষ্ঠী'র সাড়া জাগানো নব্য কবি এবং প্রবন্ধকার। অক্সফোর্ডে ছাত্র থাকাকালীন নিজেকে কমিউনিস্ট ব'লে ঘোষণা করেছিলেন, পরে হন ঘোরতর কমিউনিজম-বিরোধী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় Cyril Connoly-র সঙ্গে একত্রে উৎকৃষ্ট মানের 'হরাইজন' পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন।

কবি, সমালোচক (Edmund) Blunden (১৮৯৬-১৯৭৪) দীর্ঘকাল জাপানে অধ্যাপনা করেন। অমিয় চক্রবর্তীর সময়ে ছিলেন অক্সফোর্ডে মার্টন কলেজের ফেলো এবং টিউটর।

Holtby—২১.৫ টীকা দ্র.।

Joad—২৫.১০ টীকা দ্র.।

(J. B.) Priestley (১৮৯৪—?)—বামপন্থী, কিন্তু মার্ক্সবাদ-বিরোধী ইংরেজ ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সাহিত্য সমালোচক।

৬ Thompson—১১.১০ টীকা দ্র.।

৭ Wyndham Lewis (১৮৮৪-১৯৫৭)—শিল্পকর্মে ইম্প্রেশনিজম-বিরোধী কিউবিজম, ডাডা এবং সুররিয়ালিজম-এর সমকালীন ইংল্যাণ্ডে Vorticist Movement-এর নেতৃস্থানীয় চিত্রশিল্পী, এবং উপন্যাস ও প্রবন্ধের লেখক। উগ্র, উৎকট ব্যঙ্গরচনায় পারদর্শী এঁর সম্পাদিত *Blast* পত্রিকায় পাউণ্ড, এলিয়ট, গোদিয়ের-ব্রেজ্‌কা-রা লিখেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে এই পত্রিকার দুটি মাত্র সংখ্যা বেরিয়েছিলো। প্রথম দিকে ফ্যাসিবাদের প্রশংসা ক'রে পরে ইনি অনুতাপ প্রকাশ করেছিলেন।

৮ অক্সফোর্ডের Professor of Poetry ছিলেন (A. C.) Bradley (১৮৫১-১৯৩৫)। ইংরেজি *Gitanjali*-র পাণ্ডুলিপি প'ড়ে যাঁরা গভীর ভাবে অভিভূত হয়েছিলেন ইনি তাঁদের অন্যতম।

অক্সফোর্ডের স্নাতক, গ্রীক-লাতিন সাহিত্যে পণ্ডিত Stopford Brooke (১৮৩২-১৯১৬)-এর সুখ্যাতি ক'রে রবীন্দ্রনাথ ১৯১২ সালে ছোটো একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ('পথের সঞ্চয়' দ্র.)।

Prof (Gilbert) Murray—১১.৭ টীকা দ্র.।

Rothenstein—১০.৪ টীকা দ্র.।

G. D. H. Cole—১১.৪ টীকা দ্র.।

(Ezra) Pound (১৮৮৫—১৯৭২) ছিলেন প্রবল প্রতিভাবান, আশ্চর্যভাষী আমেরিকান কবি, যৌবনে দেশত্যাগী হ'য়ে স্বেচ্ছায় যিনি স্বদেশে ফেরেননি। শতাধিক অংশ সমেত *Cantos* নামে সুবৃহৎ কাব্যগ্রন্থের লেখক। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আগেই উদ্যোগী হ'য়ে শিকাগোর *Poetry* নামক মাসিক পত্রিকায় (১৯১২, ডিসেম্বর) ইনি তাঁর একগুচ্ছ কবিতা ছাপিয়ে ঘোষণা করেছিলেন

রবীন্দ্রনাথ মহাকবি। নবাবিষ্কৃত এই প্রাচ্য কবি বিষয়ে লেখা পাউণ্ডের দুটি প্রবন্ধ এখনও মূল্যবান। বর্তমান চিঠির দীর্ঘকাল পরে ওয়াশিংটন ডি.সি-র নিকটবর্তী 'আরোগ্য ভবনে' (বুদ্ধদেব বসু বলেছেন 'উন্মাদ ভবনে') বন্দী পাউণ্ডের সঙ্গে দুটি সাক্ষাৎকার ও সেইসঙ্গে তাঁর কাব্যের আলোচনা 'কবিতা' পত্রিকায় ছাপা হয় : (১) ১৩৫৫ সনের পৌষ সংখ্যায় অমিয় চক্রবর্তীর লেখা 'এজরা পাউণ্ড: কবিতার দরবারে পত্রাঘাত' (মোট ২২ পৃষ্ঠা), প্রধানত *Pisan Cantos* বিষয়ে, (২) ঐ বছরের চৈত্র সংখ্যায় বুদ্ধদেব বসুর লেখা 'পাউণ্ড প্রসঙ্গে আরো' (মোট ১০ পৃষ্ঠা)। অনেকেরই জানা নেই যে এরই কাছাকাছি সময় কবিতা ভবনের পক্ষে কলকাতার ওরিয়েণ্ট লংম্যানস থেকে প্রকাশিত হয়েছিলো পাউণ্ডের করা সটীক কনফ্যুসিয়াসের অনুবাদ—*The Unwobbling Pivot & The Great Digest*, (১৯৪৮) দাম আড়াই টাকা। এদেশে য়ুরোপের কোনো বড়ো মাপের আধুনিক লেখকের বই প্রকাশের দৃষ্টান্ত এই প্রথম। বর্তমান লেখক সেই গ্রন্থের প্রুফ দেখেছিলেন। পাউণ্ড পরে চীনা হরফ সম্বলিত কয়েক লাইন লিখে স্বাক্ষরিত বইটির এক কপি তাকে দান করেছিলেন।

(Desmond) Maccarthy (১৮৭৮-?) ছিলেন লণ্ডনে *New Statesman* পত্রিকার তৎকালীন সাহিত্য-সম্পাদক।

## ২৮

May 13 / 35 — The Union Society.
Cambridge.

শ্রীচরণকমলেষু

আপনার চিঠি পেলাম—সঙ্গে সঙ্গে আপনার হাতে-লেখা কবিতা দুটিও এসে পৌঁছল। ইংরেজি তর্জ্জমা কী সুন্দর হয়েচে—সকলেরই লাভ হয়ে গেল। এর চেয়ে ভালো তো কিছু হতেই পারে না ; ইংরেজিতে পড়েও সকলে এর মন্ত্রের মতো ধ্বনি, এর সম্পূর্ণ lyrical মাধুর্য্য উপভোগ করবে। শেষ দুটি লাইনও কিন্তু যোগ হলে আরো ভালো হয়—

> জানি এ দিনের মাঝে
> কালের অদৃশ্য চক্র শব্দহীন বাজে।।[১]

কারণ এতে একদিনের বিস্ময়কে অতীত এবং ভবিষ্যতের সঙ্গে অন্তহীন গতির সূত্রে বেঁধেচে—কবিতাটি থেমেও তার চলার পথে এগিয়ে চলেচে। ইংরেজিতেও এই দুলাইনের dynamic গতি সৃষ্টিবেগ যোগ হলে বিস্ময়ের মন্ত্রে আরো একটু ব্যাপক আকাশের ডাক এসে পৌঁছবে। যদিও যারা বাংলা জানে না তারা হয়তো একটুও অভাববোধ করবে না অনুবাদ প'ড়ে। কেননা যেখানে শেষ হয়েচে ইংরেজিতেও সেখানে সমের পূর্ণতা আছে।

রথীবাবু প্রতিমা দেবীর সঙ্গে দেখা হয়েচে—দুবার লণ্ডনে গিয়েছিলাম। তাঁরা ভালোই আছেন। Dartington-এ গেলেন। বুড়ী দিন কয়েক পরেই যাবে।[২] তেজবাহাদুর এই সময়ে আসায় ভালোই হয়েচে—তাঁকে এবং Polak-কে ধ'রে পাতিয়ালার কাছে চেষ্টা করা যাচ্চে ; কিছু আশা হচ্চে।[৩] পাতিয়ালার মন্ত্রী বড়ো চমৎকার লোক এবং মহারাজার আর যাই ব্যাধি থাকুক দানের দিকে তিনি মুক্তহস্ত ব'লে শোনা যাচ্ছে। সপ্রু বল্লেন চেষ্টা করবেন। বরোদাকেও তিনি বলবেন ; ভূপেন মিত্রও বল্‌বেন।[৪] আমরা কিছু চেষ্টায় আছি—ফল একেবারে ফলবে না মনে হয় না। সপ্রুকে আমি Oxford-এও নিমন্ত্রণ করেচি একদিনের জন্যে—দুচার জনের সঙ্গে তাঁর কথাবার্ত্তা জমাতে চাই। সে সময়ে আরো বলতে পারব।

দুদিনের কাজে Cambridge-এ এসেচি—বড়ো চমৎকার লাগচে। এখানকার সৌন্দর্য্য দেখলে Oxford-এর লোকের ঈর্ষা হয়—এরা নদীকে আরো আপন ক'রে পেয়েচে। বসন্তের ফুলে সবুজে সূর্য্যের আলোয় ইংলণ্ডের গ্রামগুলি মায়াপুরী হয়ে উঠেচে। এদের জীবনেও বাজ্‌নার সুর লেগেচে।

চার অধ্যায়ের ইংরেজি সম্বন্ধে রথীবাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়েচে। এখন আপনার revision হলেই অনিলবাবুকে বলবেন যেন Air Mail-এই Manuscript পাঠান Balliol-এর ঠিকানায়। এই সময়ে ছাপবার সুবিধা আছে। গল্পে আপনি দুপক্ষের প্রতি কীরকম সম্পূর্ণ সুবিচার করেচেন, কোথাও এতটুকু বাড়াননি, কমাননি, এতে এরা আশ্চর্য্য হয়ে গেছে। ঐ গল্পের text-এ এতটুকুও বদল সইবে না। আপনি-যে কোনো পক্ষই নেননি, সমস্তটাই একেবারে human এবং তার বেদনা, ঘাত প্রতিঘাতের চিত্র নিখুঁৎ আঁকা হয়েচে সবাই তাই বলচেন। ঐ গল্পকে এরা brilliant short story ভাবে নিয়েচে—নভেল ভাবে নয়। এবং সেইটেই সত্যি। ওর political problem এদের কাছে একেবারে গৌণ এবং আকস্মিক—গল্পটির lyrical এবং dramatic quality-ই আসল ; যদিও আধুনিক জীবনের পরিমণ্ডলে তার রস আরো জমে উঠেচে। বইখানি ছাপাতে দেরি করতে চাই না।। ছবিগুলি এখনো এসে পৌঁছয়নি—তবে এখন দুএকদিনেই নিশ্চয়ই আসবে। দেশ থেকে cuttings পেয়েচি অজ্ঞাত লোকের কাছ থেকে 'চার অধ্যায়' সম্বন্ধে।[৫] মূঢ়তা, হীনতার চরম পরিচয় তাতে আছে। ইস্কুলের ছেলেরও যতটুকু মগজ পদার্থ থাকা উচিত "হিন্দু" এবং "দেশাত্মবোধী" এই সব পাঠকদের তা নেই। আপনি জন্মেছিলেন আমাদের মূর্খতা মূঢ়তার মধ্যে—আমরা আপনাকে যথাশক্তি চেষ্টা করলাম ধুলো দিয়ে ঢাকতে, কিন্তু সে ধুলো আমাদেরই। কোথাও তার কোনো চিহ্ন (sic) থাকবে না।

প্রণত
অমিয়

---

**টীকা**

১ 'কবিতা দুটি'— 'পরিশেষে'-র (১৯৩২) "বিস্ময়" ('আবার জাগিনু আমি') এবং

তার ইংরেজি অনুবাদ। মূলের শেষ দুটি পঙ্‌ক্তি অনুবাদে বাদ গিয়েছিলো। অমিয় চক্রবর্তী দৃষ্টি আকর্ষণ করলে কবি উত্তরে লিখেছিলেন : 'তোমাকে আমার কবিতার যে তর্জমা পাঠিয়েছি তার শেষ দুটি লাইন বাদ পড়েছে ব'লে নালিশ করেছ। বইখানা হাতের কাছে নেই—তাই ওটাকে সম্পূর্ণ করা শক্ত।

In the heart of the day allowed to me
I feel the invisible role of
Time's chariot wheel rushing in silence.

কিন্তু এটা ঠিক জোড়া লাগবে কিনা তা তো আন্দাজে বলতে পারচিনে।'

বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'চিঠিপত্র' ১১শ খণ্ড অনুযায়ী এ-চিঠির তারিখ হচ্ছে 'মে ২৬/ ১৯৩৪,' কাজেই ক্রমিক সংখ্যা বসেছে ৬৮। দুটোই ভুল। তারিখ বসাতে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমের দৃষ্টান্ত আরো আছে। চন্দননগর থেকে ঐ তারিখে চিঠি লেখা সম্ভব ছিলো না, কারণ কবি তখন ছিলেন সিংহলে। চন্দননগরে নৌকোবাস করতে যান পরের বছর। তারিখটি তাই হবে 'মে ২৬/১৯৩৫', চিঠির ক্রমিক সংখ্যা হবে ৭৯।

২ Dartington— ডিভনশায়ারের টট্‌নেস-এ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শে-পরিচালিত এল্‌মহর্স্টের বিদ্যালয় Dartington Hall.

বুড়ি—মীরাদেবীর কন্যা নন্দিতা (গাঙ্গুলী, পরে কৃপালনী)।

৩ এ-সময় তেজবাহাদুর (সাপ্রু)-ও চেষ্টা করছিলেন যাতে পাতিয়ালা এবং বরোদার মহারাজা বিশ্বভারতীকে কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্য করেন।

৪ (স্যর) ভূপেন মিত্র (১৮৭৫-১৯৪৩) তখন ইংল্যাণ্ডে ভারতের হাই কমিশনার (১৯৩১-১৯৩৬)।

৫ 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের বিরুদ্ধে বাংলায় তখন বহু কটু সমালোচনা বেরোচ্ছিলো।

## ২৯

June 9 / 35

BALLIOL COLLEGE
OXFORD

শ্রীচরণকমলেষু,

"শেষ সপ্তক" প'ড়ে যে কীরকম লাগচে বলতে পারি না। সমস্ত আকাশ রঙে ভ'রে উঠেছে, সব রাগিণী বেজে উঠেচে, দিগন্তে দিগন্তে ভাবে কল্পনায় ভাষার ধ্বনিতে ছবিতে মহাসৃষ্টির কবিতা এই শেষ সপ্তক। আরো সপ্তকে সপ্তকে আপনি সৃষ্টি থেকে সৃষ্টি রচনা করবেন, শেষ সপ্তক এ নয়, কিন্তু আপনার কবিতার পর্য্যায় বারে বারেই শেষ, বারেবারে নতুন—কোথাও তার অবসান নেই। "জন্মদিনের" কবিতাটি উপহার পেয়ে ধন্য মনে করচি নিজেকে।[১] এই বই আপনার ডায়েরির মতো, দিনের প্রহরে প্রহরে ভাবের আনাগোনা পরিচয় রেখে গেছে কবিতার স্তবকে স্তবকে। এক সঙ্গে বেশি

পড়ি না ; মধ্যে মধ্যে নানা কর্ম্মের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে একটি কবিতা পড়লে তাকে সমস্ত দিয়ে পাই।

অন্য যে সব ছন্দ-মিলের কবিতা নানাজায়গায় ছড়িয়ে আছে তারও তো বই হবে? এবং "বিচিত্রিতার" দ্বিতীয় খণ্ড?[২]

ইংরেজি কবিতার চয়নে সকলেরই পরামর্শ নেব। Sturge Moore আপনার নূতন কবিতার একটাও দেখেননি—তিনি বলেছিলেন ছটি কি সাতটি কবিতাও যদি একেবারে literal অনুবাদ ক'রে notes এবং annotation শুদ্ধ ইংরেজিতে বেরোয়, এবং original-এর Structure ঠিক বজায় রাখা যায় তবেই কবিতার তর্জ্জমা বা নূতন Collection বা Selection বার করা চলবে। তা যখন করা হয়নি তখন এ বিষয়ে তাঁর উৎসাহ নেই, তিনি কবিতা দেখেনইনি। তাঁর কথায় সত্য আছে। কিন্তু যা হয়েছে তার মধ্যেও যে বিশেষ কাব্যরস আছে তা অনেকেরই কাছে চিরন্তন মূল্যবান ব'লেই মনে হয়েচে—আমরা তাই চয়নিকার প্রয়োজন আছে মনে করি। নূতন কবিতার অনেকই এতে থাকবে ; সবসুদ্ধ ছোটোই Selection হবে খুব বাছাই ক'রে নূতনে পূরাতনে ; যাতে পাঠক সহজে, ঘনভাবে রস উপভোগ করতে পারে এবং চঞ্চলিত ঔৎসুক্যে সমগ্র রচনা সংগ্রহের জন্যে তার মন উৎসাহী হয়। Prose poem-এর পক্ষে বিশেষ ভাবে এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণের দরকার, কেননা এতে ছন্দের বৈচিত্র্য নেই, ভাবের গভীরতর বৈচিত্র্যে প্রবেশ করবার জন্য স্বল্পপরিসরের অবকাশ মূল্যবান হবে। সব কবিতার বইয়ের বিষয়েই এই কথা খাটে। এখনকার পদ্ধতি Keats-এর গুটি ছয়েক Ode এক সঙ্গে বার করা। দীর্ঘায়তন Prose poem সংগ্রহ বের করলে এ সময়ে ভুল হবে। এই Selection লোকের মনে আনন্দ দিলে আরো একটি দ্বিতীয় Selection বার করতে দোষ নেই। আপনিই লোকে দাবী করবে। দোষ দেবে কেন কবিতা বাদ দেওয়া হয়েচে।[৩]

Thompson আপনার গল্পের বিষয়ে যা লিখেছিলেন তা কত সত্য। গল্পের Selection এখন বার করবার একমাত্র বাধা এই যে বইয়ের মস্ত stock এখনও Macmillan-এর কাছে রয়েচে—সেটা একটু কমলে ওদের পক্ষে সম্ভব হবে। Daniel Macmillan-কে সব বলা হয়েচে, তিনি সময় বুঝে আমাদের জানাবেন বলেচেন।[৪] মধ্যে সুরেন্দ্র দাশগুপ্ত এসেছিলেন ভালো লাগল—কিন্তু কেমন যেন দলীয় আবহাওয়া সৃষ্টি করে তোলেন।[৫]

*Quarterly* চমৎকার লাগল। আমার দুটো বক্তব্য আছে। ১০৩ পৃষ্ঠার তৃতীয় প্যারাগ্রাফের শেষ সাত লাইন কিছুতেই ছাপা উচিত ছিল না। যাই হোক্ কৃপালানী অসাধ্য সাধন করেচেন। কত কঠিন আমাদের দেশে ভালো কিছু গড়ে তোলা তা তো জানি। প্রথম প্রবন্ধ ঝলমল করচে—তার তো তুলনা নেই। 'সাহিত্য' থেকে তর্জ্জমা করে আপনার আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধীয় ( University lecture ইত্যাদি ) প্রবন্ধের তর্জ্জমা আগে বেরোলে ভালো হত। সব জায়গায় প্রথম প্রবন্ধের সঙ্গে 'সাহিত্যের' প্রবন্ধটি মিলচে না।[৬]

আপনার এখনকার Standpoint অনেকখানি স'রে গেছে। এই সংখ্যার দুই প্রবন্ধে রীতিমত ভেদ আছে বলে মনে হয়। যদিও দ্বিতীয় প্রবন্ধ পড়েও অনেক কিছুই নূতন পাওয়া যায়। কিন্তু এর methodology, এমন কি মূল প্রসঙ্গও আপনি এখনকার লেখায় একেবারে নূতন জায়গা থেকে দেখেচেন। Andrée-রা কাল Oxford-এ আসচেন। সপ্রুও শীঘ্রই তো আসচেন। তিনি ভালোই আশা দিচ্চেন।' চার অধ্যায়ের ইংরেজি পেলেই এদিকে কাজ আরম্ভ হবে। লোকে উৎসুক হয়ে উঠেচে।

প্রণত

অমিয়

---

টীকা

১ "জন্মদিনের" কবিতা—'শেষ সপ্তকে'-র ৪৩-সংখ্যক রচনা, অন্যত্র যেটি "পঁচিশে বৈশাখ" শিরোনামে ছাপা হ'য়ে আসছে। (২৭.১ টীকা দ্র.)

২ গদ্যকবিতা কদাচিৎ ভালো লাগলেও, অমিয় চক্রবর্তীর একান্ত পক্ষপাত ছিলো ছন্দমিলের কবিতার দিকে। 'পরিচয়'-সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে এ-বিষয়ে তাঁর মিল লক্ষণীয়। অন্নদাশঙ্কর রায়ও গদ্যকবিতার বিরোধী ছিলেন। অন্যপক্ষে কবিতার গদ্যপ্রকরণের প্রতি সোৎসাহ সমর্থন ছিলো বুদ্ধদেব বসুর। গোড়ার দিককার 'কবিতা' পত্রিকায় তার প্রভূত দৃষ্টান্ত আছে। নিজেও তিনি জীবনের বিভিন্ন সময়ে অনেক গদ্যকবিতা লিখেছেন। 'বিচিত্রিতা' বিষয়ে ২৬.৬ টীকা দ্র.।

৩ কবি ভেবেছিলেন collected বা selected ইংরেজি কবিতার বই বেরোবার আগে পূর্বেকার অনুবাদ পরিমার্জনার কাজে Sturge Moore বা অন্য কোনো আস্থাভাজন 'যোগ্য' ইংরেজের সহায়তা পাওয়া যাবে। কিছুই পাওয়া যায়নি, যদিও অনুবাদের আদর্শ বিষয়ে স্টার্জ মূর যা বলেছিলেন তার মধ্যে "সত্য আছে"। পেঙ্গুইন থেকে আজকাল এই আদর্শ মেনেই অনুবাদ কবিতার বই ছাপা হয়। রবীন্দ্রনাথের অনুবাদকর্মে এক সময় যাঁদের সাগ্রহ সহায়তা পাওয়া কঠিন হ'তো না, গত কুড়ি-পঁচিশ বছরে ক্রমে তাঁরা দূরে সরে গেছেন।

তখনো ম্যাক্‌মিলান থেকে 'খুব বাছাই করে নূতনে পুরাতনে' মিশিয়ে একখণ্ড চয়নিকা বা selected poems প্রকাশ করার চেষ্টা চলছে। শেষ পর্যন্ত এ-ব্যাপারে অমিয় চক্রবর্তী সফল হননি।

৪ (Edward) Thompson রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন যে তিনি জগতের 'best short story writer'—('চিঠিপত্র' ১১শ, পৃ. ১১৩ দ্র.)। কলকাতা থেকে প্রকাশিত *Stories from Tagore* বইটি নিয়ে ম্যাক্‌মিলানরা রবীন্দ্রনাথের মোট চারটি গল্পসংগ্রহ ছাপেন। হয়তো ভালো বিক্রি হয়নি, তাই ১৯৩৫ সালেও 'বইয়ের মস্ত Stock' জ'মে ছিলো। যে-কারণেই হোক, পরিকল্পিত collected stories বইটি কোনোদিনই আর বেরুলো না।

৫ সুরেন্দ্র দাসগুপ্ত (১৮৮৫-১৯৫২) ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক। ১৯৩৬ সালে লণ্ডনে আন্তর্জাতিক

'কংগ্রেস অফ রিলিজনে' তিনি ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন। ১৯৩৮ সালে ইতালিতে যান ক্রোচের আমন্ত্রণে। পাঁচ খণ্ডে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস লিখেছিলেন। শেষ জীবনে বহুদিন অক্সফোর্ডে বাস করেন।

৬ নতুন সিরিজ *Visva-Bharati Quarterly* প্রথম সংখ্যার যে-অংশটুকু নিয়ে অমিয় চক্রবর্তী আপত্তি জানান তা নতুন সম্পাদকের লেখা এক প্রবন্ধের অংশ। 'The Intellectual' নামের এই প্রবন্ধে যৌন প্রসঙ্গের একটি-দুটি বাক্য ছিলো, রসিকতা ক'রে লেখা : 'Fool, mark the gasping of the heated lungs and the ridiculous gymnastics of these hunches and these buttocks. Some mischievous sperm has made a fool of you.'

দ্বিতীয় আপত্তি ছিলো, দীর্ঘদিনের ব্যবধানে লেখা সাহিত্যতত্ত্ব-বিষয়ক কবির দুটি প্রবন্ধের অনুবাদ একই সংখ্যায় প্রকাশ করা সংক্রান্ত। প্রথমটি—'Art and Tradition', সাম্প্রতিক একটি প্রবন্ধের কবিকৃত অনুবাদ; দ্বিতীয়টি—'The Function of Literature'—'সাহিত্য' (১৯০৭) গ্রন্থ থেকে 'সাহিত্যের তাৎপর্যে'-র অনুবাদ, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের করা। অমিয় চক্রবর্তীর মনে হয়েছিলো কালের ব্যবধানে দুই প্রবন্ধের অন্তর্গত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ঘ'টে গেছে। তিনি চাইছিলেন আরো বেশি সাম্প্রতিক প্রবন্ধের অনুবাদ।

৭ আঁদ্রে—৫.৪ টীকা দ্র.।

সপ্রু (তেজবাহাদুর)—২৮.৩ টীকা দ্র.।

## ৩০

July 22nd [1935]. HOTEL KONIGSVILLA

Carlsbad [১]

শ্রীচরণকমলেষু,

জার্ম্মানীতে আশ্রমের জন্যে একটা Scholarship-এর ব্যবস্থা করেচি—এখন ওদের প্রস্তাব তাজা থাকতেই যদি আশ্রম থেকে আপনার নামে চিঠি আসে ওদের কাছে তাহলে জিনিসটা সুসম্পন্ন হয়। নাটসি জার্ম্মানীর উন্মত্ততার সঙ্গে এদের বিশুদ্ধ জ্ঞানবিভাগের কোনো যোগ নেই—এরা সত্যই চায় আমাদের সঙ্গে Cultural যোগ ঘনিষ্ঠ রাখতে। চিঠির একটা rough draft পাঠালাম। Air Mail-এই চিঠি পাঠালে ভালো হবে। [২]

Lesny এখন নুতন Czechoslovakia-র বিদ্যাবিভাগে সর্ব্বেসর্ব্বা—শুধু তাই নয়, Masaryk এবং Benes-এর বন্ধু হিসাবে এবং নূতন জাতীয়তার উদ্যোগী কর্ম্মীরূপে তাঁর প্রভাব এখন দ্রুত বেড়ে চলেচে। তাঁর সঙ্গে অনেক কথা হল। তিনি অনেক কিছু করতে চান শান্তিনিকেতনের জন্যে এই নূতন Government-এর অর্থবল আছে। এরা নরঘাতক রাজনীতির কবলে পড়েনি প্রতিবেশীদের মতো—তাই এদের সাহায্য বেশ একটু

কাজে লাগবে, গড়ে উঠবে। উনি আর একবার শান্তিনিকেতনে যেতে চান—অবশ্য যাওয়া থাকা সমস্ত খরচই এখান থেকে দেবে, আশ্রমকে কিছুই করতে হবে না—তাই আমাকে বললেন আপনার কাছ থেকে Minister of Education-এর কাছে এই চিঠি এলে সব পথ খুলে যাবে। তাঁর পরামর্শ মতো এই চিঠির draft পাঠাচ্চি। Regtd. Air Mail-এ চিঠি এলে ভালো হতো।[৫]

পরে আরো লিখব—এখন পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্চি। বোধ হয় মধ্য য়ুরোপ থেকে অনেক কিছু ক'রে তুলতে পারব আশ্রমের জন্যে—যদিও আমার আপন কেন্দ্র থাকবে Oxford-এই।

আপনি যদি অধ্যাপক Lesny-কেও একখানি চিঠি লেখেন তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে (formal invitation) তাহলে বড়োই ভালো হয়। তাঁর ঠিকানা :

Professor Dr. V. Lesny
Dienzenhofferovy Sady 2
Prague (Czechoslovakia)

আমার কাছে যে তিনি আপনার সম্বন্ধে এবং আশ্রম সম্বন্ধে শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা প্রকাশ করেচেন তারও একটু উল্লেখ করলে সুখী হব।

সুভাষবাবু operation-এর পর ভালো আছেন।[৪] তাঁর সবদিক দিয়েই বেশ একটু বদল হয়েচে—দৃষ্টি প্রসারিত হয়েচে—দেখে ভালো লাগ্‌ল। আপনাকে অন্তরের শ্রদ্ধা জানাতে বললেন।

কমলা নেহেরু এখন Black Forest-এ Nursing Home-এ —তাঁর বিশেষ আশা নেই। কিন্তু মনের জোর অসাধারণ—হয়ত জওহরলাল আসা পর্য্যন্ত যেমন ক'রে হয় টিঁকে থাকবেন।[৫]

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানুন। Andrewsকে আমার শ্রদ্ধা দেবেন।

আপনাদের
অমিয়

গদ্যের Selection হয়ে গেছে। Typed copy তৈরি হচ্চে London-এ।[৬]

অমিয়

---

টীকা

১ পশ্চিম চেকোশ্লোভাকিয়ার Carlsbad স্বাস্থ্যপ্রদ প্রস্রবণের জন্যে বিখ্যাত। ইন্দো-চেকোশ্লোভাক সমিতির প্রেসিডেন্ট হিশেবে অক্সফোর্ড থেকে অমিয় চক্রবর্তী সেখানে গিয়েছিলেন।

২ নাটশি জার্মানী থেকে শান্তিনিকেতন আশ্রমের জন্যে বৃত্তি সংগ্রহের কথা শুনতে একটু কেমন লাগে। কিন্তু সরকারি রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে সমগ্র জাতিকে মিশিয়ে ফেলা হচ্ছে না, সেটা লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথও তা করতেন না। দরকারী চিঠির খশড়া ক'রে রবীন্দ্রনাথকে পাঠানো অমিয় চক্রবর্তীর প্রকৃতিগত হ'য়ে গিয়েছিলো। এই চিঠিতেই

এরকম দুটি চিঠির খশড়া পাঠানোর কথা আছে।

৩ প্রাগ্-এর (প্রাহা-র) চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারততত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন Vincene Lesny (১৮৮২-১৯৫৩)। মাসারিক ও বেনেস্-এর আমলে তাঁর পদোন্নতি হয়েছিলো। শান্তিনিকেতনে দুবার এসে থেকেছেন (১৯২৩, ১৯২৮)। Winternitz-এর কাছে তিনি সংস্কৃত এবং স্বয়ং কবির কাছে ভালো বাংলা শিখেছিলেন। অমিয় চক্রবর্তীর পরামর্শে রবীন্দ্রনাথ চেক্ শিক্ষামন্ত্রী এবং লেজ্‌নি—দুজনকেই লিখেছিলেন যাতে লেজ্‌নি তৃতীয়বার শান্তিনিকেতনে আসতে পারেন। কী কারণে সে-চিঠি লেজ্‌নির হাতে পৌঁছয়নি।

প্রাহা-র চেক বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক T. G. Masaryk (১৮৫৩-১৯৩৭)-কে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী চেকোশ্লোভাকিয়া রাষ্ট্রের জনক বলা হয়। ১৯৩৫ সাল অব্দি পরপর চারবার তিনি দেশের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হন মাসারিক্-এর পররাষ্ট্রমন্ত্রী Benes (১৮৮৪-১৯৪৮)।

৪ সুভাষবাবু—সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯.৬ টীকা দ্র.।

৫ যক্ষ্মা রোগে পত্নী কমলা যখন মৃত্যুশয্যায়, জওহরলাল তখন আলমোড়া জেলে বন্দী, কন্যা ইন্দিরা রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়ে বিশ্বভারতীর ছাত্রী। কমলার মৃত্যু আসন্ন জেনে, অন্তত সাময়িকভাবে জওহরলালকে মুক্তি দিতে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি ভারত সরকারকে অনুরোধ জানান, যাতে অন্তত শেষ সময়ে তিনি পত্নীর পাশে উপস্থিত থাকতে পারেন। মুক্তি পেয়ে জওহরলাল কন্যাসহ তখনকার ক্ষুদ্রাকার ডাচ্ ডাকবিমানে জায়গা ক'রে তৎক্ষণাৎ জর্মানীর ব্ল্যাক ফরেস্ট অঞ্চলে বাডেনভাইলার স্যানাটোরিয়ামে পত্নীর কাছে চ'লে যান। রবীন্দ্রনাথ-নেহরুর মধ্যে এই সময়কার প্রাণস্পর্শী চিঠিপত্র রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত হয়েছে। নেহরু-পরিবারের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর নিবিড় সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিলো।

৬ পরিকল্পিত Collected বা Selected essays গ্রন্থটির কাজ এতদূর এগিয়েও কেন শেষ পর্যন্ত বেরোলো না তা জানা যায় না। আসন্ন বিশ্বযুদ্ধ অন্তরায় হ'য়ে থাকতে পারে।

## ৩১

August 2 [1935] The Hague[১]

শ্রীচরণকমলেষু,

Ernest Rhys[২]-কে লিখেচি—এখান থেকে ফিরে দেখা করব। তাঁর সাহায্য খুবই কাজে লাগবে। "চার অধ্যায়ে"র তর্জ্জমা এখনো পৌঁছয়নি— Oxford থেকে খবর পেয়েচি—বোধ হয় ফিরে গিয়েই পাবো। এখানে redirect করতে বারণ করেচি।

Mrs. Datta জন পনেরো ভারতীয় মেয়েদের নিয়ে য়ুরোপ ঘুরচেন।[৩] লণ্ডনে এবং সেদিন Holland-এর Wondschoten Conference-এ তাঁদের সঙ্গে দেখা হল।

তাঁরা শকুন্তলার tableau অভিনয় করেছিলেন—য়ুরোপের নানা University-র ছাত্র অধ্যাপক যাঁরা উপস্থিত ছিলেন অভিনয় দেখে চমৎকৃত হয়েছেন। তা ছাড়া দু-একটি মেয়ে, বিশেষ ভালো বলতে পারেন—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁরা য়ুরোপের সর্ব্বত্র যে কীরকম ভালো ধারণা জাগাচ্চেন তা বলা যায় না। Mrs. Datta-র এই অধ্যবসায় যথার্থই প্রশংসনীয়—এজন্যে তাঁকে কত পরিশ্রম করতে হয় কষ্ট পেতে হয় তা দেখেচি। তিনি আপনার কাছ থেকে উৎসাহ পেলে কাজ সার্থক মনে করবেন। এবং তাঁর এই বাৎসরিক Cultural Tour গড়ে তোলায় বিশেষ সহায়তা হবে। আমি একখানি চিঠির rough draft পাঠালাম—যদি এই রকম কিছু তাঁকে লিখে Air Mail-এ পাঠান তাহলে তাঁর এবং ভারতীয় ছাত্রীদের খুবই উপকার হবে। ভারতের নানা জায়গা থেকে এই মেয়েরা এসেচেন—স্বদেশ সম্বন্ধে তাঁদের উৎসাহ অপরিসীম—ফিরে গিয়ে নতুন প্রেরণা নিয়ে এঁরা আমাদের শিশু বিদ্যালয়ে, সেবা সদনে এবং সমাজসংস্কার কাজে নামবেন আশা করচেন। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে এঁদের যোগ হলে বিশেষ আনন্দের বিষয় হয়—য়ুরোপে এঁরা যা দেখলেন তা বলতে পারবেন, তা ছাড়া শান্তিনিকেতন দেখতে এবং ওখানকার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পরিচিত হতে এঁরা একান্ত আগ্রহান্বিত। শান্তিনিকেতন ভারতীয়, অথচ তাতে আধুনিককালের সমন্বয় আছে ভারতীয় আদর্শের নূতন প্রকাশ আছে—তাই শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে এঁদের এত গর্ব্ব, নিজেদেরই জিনিষ ব'লে মনে করেন। আপনাকে প্রণাম ক'রে আসতে চান। এই নিমন্ত্রণ পেলে হয়তো ওখানে গিয়ে দুএকদিন থেকে আসা ওঁদের পক্ষে সম্ভব হতে পারে।

Abyssinia সম্বন্ধে আর যাই হোক য়ুরোপের চেতনা আলোড়িত হয়েচে। এ সময়ে আপনার কাছ থেকে কোনো কথা শুনতে পেলে সকলেই আনন্দিত হবেন।[৪] যদি দেশী কোনো কাগজে দুচার ছত্র interview দেন। রাজনীতির দিক থেকে তো আলোচনার শেষ নেই, কিন্তু আবিসীনিয়ার দেশবাসীর প্রতি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ আশার কথা কেউ বলচেন না। মহাত্মাজির উক্তি স্পষ্ট বোঝা গেল না।[৫] যদি সামান্য কিছু টাকাও ভারতবর্ষের জনসাধারণ আবিসীনীয় নারী সংঘকে পাঠায়, বা ঐরকম কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে তাহলে জগতের চক্ষে আমাদের গৌরব বাড়বে। আমাদের আত্ম-সম্মানবোধও এতে প্রকাশিত হবে।

Leiden-এ অনেকের কাছে আপনার কথা শুনলাম। Prof. Vogel নমস্কার জানালেন। Baké-র বোনকে দেখে বড়ো আনন্দ হল।[৬] যেমন gifted তেমনি মধুর স্বভাব। Hague-এ Peace Court-কে কেন্দ্র করে অনেকগুলি আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান গ'ড়ে উঠচে। এখানে অনেকের সঙ্গে কথা কয়ে বিশেষ উৎসাহ বোধ করেচি। আলো এখনো নেবেনি। অসংখ্য individual মানুষ এখন য়ুরোপের সর্ব্বত্র জেগে উঠেচে—তাঁদের স্বার্থত্যাগ, চরিত্রের দৃঢ়তা, বুদ্ধির উজ্জ্বল প্রখর সাম্যদৃষ্টি হয়তো নূতন ক'রে য়ুরোপের ভিত্তি গড়ে তুলবে। আর যাই হোক, সাম্রাজ্য ব্যাপারে যুগে যুগে দেশে দেশে যত অবর্ণনীয় অত্যাচার ঘটেচে তাতে জনমত কিছু সাড়া দেয়নি—আজ য়ুরোপের অলিতে গলিতে

এ নিয়ে ইটালীকে লোকে বর্ব্বর ব'লে গাল দিচ্ছে—যদি বা এই যুদ্ধ না থামাতে পারে সংঘবদ্ধ চেষ্টার অভাবে, তবুও এই জনমত পৃথিবীতে নূতন। এমন একটি কাগজ নেই যাতে প্রত্যহ বিশেষভাবে ইটালীয় মত্ততার প্রতি লাঞ্ছনা প্রকাশিত হচ্চে না—যদি বা য়ুরোপে শক্তিমত্ত রাষ্ট্রিক নরঘাতকেরা প্রলয় ডেকে আনে, এই মানুষের জয় হবেই। আবিসীনীয়াও হু হু ক'রে জেগে উঠচে—যদি রক্তপাত থেকে রক্ষা পায় তাহলে কেউ তাদের ঠেকাতে পারবে না—রক্তপাত করেও তাদের ঠেকাতে পারবে না।

আমার ভক্তপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

অমিয়

---

টীকা

১ হল্যাণ্ড বা নেদারল্যাণ্ডের রাজধানী হাগ্ থেকে লেখা চিঠি।

২ Ernest Rhys—১৪.৪ টীকা দ্র.।

৩ লাহোরে ১৯৪০ সালে International Student Service-এর অঙ্গ ভারতীয় শাখার যে-অধিবেশন হয়েছিলো অমিয় চক্রবর্তী *Visva-Bharati News* ফেব্রুয়ারি ১৯৪০ সংখ্যায় তার প্রতিবেদন লিখেছিলেন। সেখানে লাহোর অধিবেশনের আয়োজক হিশেবে Mrs S. K. Dutta-র নাম আছে। তিনিই হয়তো Mrs Dutta।

৪ বিষাক্ত গ্যাসসহ বর্বর আক্রমণ ক'রে ১৯৩৬ সাল থেকে মুসোলিনি উত্তর-আফ্রিকার আবিসিনিয়া (বর্তমানে ইথিওপিয়া) রাজ্য ইতালীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ক'রে নেন। ফ্যাসিবাদের এই অপকীর্তির প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বিশ্বনাগরিক হিশেবে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে অনুরোধ করেছেন অমিয় চক্রবর্তী। উত্তরে কবি লেখেন : 'আজ আমার মন সমুদ্রমুখে, কর্তব্যের দোহাই পাড়লে ফল হবে না। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের বোঝা সম্পূর্ণ হালকা করতে পারিনি, চেষ্টায় আছি নূতন কর্ম্ম বাড়াব না।' ('চিঠিপত্র' ১১শ, ৮২ দ্র.)

৫ দি হাগ্ থেকে চিঠিটি ২ অগস্ট তারিখে লেখা। ঐ দিনই ভারতবর্ষে *Hindusthan Times* পত্রিকায় গান্ধীজির সঙ্গে আবিসিনিয়াকে জড়িয়ে একটা খবর ছিলো : রেড ক্রস্ সেবাকর্মে গান্ধীজি ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী পাঠাতে চান, এবং ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি আর্থিক সাহায্যের আবেদন প্রকাশ করেছেন। গান্ধীজির পক্ষ থেকে অবিলম্বে এই সংবাদের সত্যতা অস্বীকার ক'রে বলা হয়: 'Gandhiji refuses to be interviewed on the Italo-Abissinian question on the ground that a verbal expression of opinion would be valueless unless he was able to follow it up by action'। আবিসিনিয়ার ঘটনা বিষয়ে গান্ধীজির সংক্ষিপ্ত একটি বার্তাও এই সঙ্গে সংবাদপত্রে ছাপা হয় : 'I can only pray and hope for peace.'। এর আগে বা পরে এ-যুদ্ধ বিষয়ে তিনি নীরব ছিলেন। অমিয় চক্রবর্তীর চিঠিতে নিশ্চয়ই এই বার্তার উল্লেখ আছে। (*Collected works of Mahatma Gandhi,* vol. 61.pp. 301-2 দ্র.)

৬ শিল্পী রেমব্রান্টের জন্মস্থান লাইডেন (Leiden) পশ্চিম-হল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়-

শহর। Prof. Vogel ছিলেন এখানকার Kern Institute-এ ভারততত্ত্বের (Indology-র) প্রখ্যাত পণ্ডিত। এঁর সম্পাদিত *Annual Bibliography of Indian Archaeology*-র জগৎজোড়া খ্যাতি ছিলো।

## ৩২

Rome[১]
August 15 [1935]

Balliol College
Oxford

শ্রীচরণকমলেষু,

আপনার চিঠিখানি পেলাম। Andrews আসুন—কবিতা সংগ্রহের বিষয়ে তিনি আপনার নির্দ্দেশানুসারে যা ঠিক করবেন তাই হবে। Type copy প্রস্তুত রয়েচে—কিন্তু selections না বের ক'রে Collected poems বার করাই যদি ভালো হয় তাহলে সেটার আর দরকার নেই। Macmillan-দেরও লিখে দিচ্চি। Andrews-এর সঙ্গে আলোচনা ক'রে তারা আপনাকে লিখবে। এ বিষয়ে Oxford থেকে জানাব।।[২]

পূর্ব্বদেশীয় ছাত্রদের আহ্বানে বাধ্য হয়ে এখানে এসেচি—শেষ মুহূর্ত্তে জানতে এবং জানাতে চাই এদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কোথায় এসে ঠেকেচে। এ বিষয়ে এখন লিখব না—জানি না এ চিঠিও পৌঁছবে কিনা। বিপুল নরহত্যার আয়োজন চলচে দিনরাত্রি—দুর্ব্বল অসহায় পরজাতিকে সমূহ ধ্বংস করবার অধ্যবসায় চতুর্দ্দিকে।

আমার একান্ত মনে হয় Andrews যদি এই প্রলয়ের আগে একবার এডিস্ এবেবায় সেখানকার মিশন সম্প্রদায় এবং আবিসীনীয় নারীসঙ্ঘের সঙ্গে দেখা ক'রে আসেন তাঁর উপযুক্ত কাজ হবে। এতে সব দিক থেকেই কল্যাণ হবে। আপনি যদি তাঁকে বলেন। এ সময়ে এখনই আপনার এবং মহাত্মাজির সম্মিলিত কোনো পত্র ভারতবর্ষে বেরোনো উচিত এবং রয়টার যাতে বিদেশেও সেটা পাঠায় তার ব্যবস্থা করা দরকার।[৩] সামান্য অর্থও যদি আবিসীনীয়ার নারীসংঘের জন্যে ভাবতবর্ষ থেকে ওঠে তাতে ইতিহাসে আমাদের গৌরব হবে। ওদেশের মেয়েরা আসন্ন মৃত্যুর আগে [illegible] শক্তি দেখিয়েছেন— শান্ত বীর্য্যের মহিমায় তাঁদের এই পরিচয় পেয়ে য়ুরোপে সর্ব্বত্র নূতন দায়িত্বজ্ঞান জেগেচে। কিন্তু ফ্রান্সের চাতুরীতে য়ুরোপের পক্ষে কোনো দ্রুত এবং সংঘবদ্ধ কাজ করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেচে। একটা ধারণা এখানে জেগেচে যে অদ্ভুত [illegible] চরিত্র মহাত্মাজি ছাড়া ভারতবর্ষের লোক মোটের উপর এই হত্যানীতিকে মেনে নিয়েচে এবং এই যুদ্ধ ঘটলে আমাদের জনমত ইটালীর বীর্য্যে অভিভূত হবে, বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করবে না। স্তম্ভিত হয়েচি একথা শুনে—এমন কি কাগজেও এই কথা এরা লিখেচে। আমাদের ভারতীয় "ফ্যাসিষ্ট"রা কি এইরকম কিছু লিখেচেন তাঁদের অত্যাশ্চর্য্য কাগজে?

[8] জানি না। কিন্তু এখন তো আর ভারতীয় প্রহসনের সময় নয়—এই যুদ্ধ ঘট্‌লে সমস্ত মানব সভ্যতার পরাজয়। ভারতবর্ষের বাণী কোথায়? আপনার কথা কোথাও কোনোভাবে এখনই বেরোনো দরকার। সুভাষবাবু আমার কথামতো *New Statesman*দের পত্র পাঠিয়েছেন—Andrews-কে বলবেন। এতে সুফল হবে।।

সুভাষবাবুর একটা চিঠি পাঠাই ; তাঁকে লিখেচি খবরটা যথার্থ নয়, কিন্তু তিনি যে বিষয়ে সাবধান করেচেন তা মনে রাখব।[৫]

প্রণত

অমিয়

---

**টীকা**

১ শুনেছি ইংলণ্ড-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্র সমিতির এই সময় প্রেসিডেন্ট ছিলেন অমিয় চক্রবর্তী। সেই সূত্রে তাঁর রোমে আসা।

২ রবীন্দ্রনাথের চিঠির তারিখ ৪ আগস্ট ১৯৩৫। ('চিঠিপত্র' ১১শ, ৮১ দ্র.)। চিঠিতে লিখেছিলেন যে প্রথমে ইংরেজি চয়নিকা বা Selected Poems বের করার চাইতে পরিশোধিত অনুবাদ নিয়ে একবারেই সমগ্র সংকলন বা Collected Poems বের করাই চার্লস এণ্ড্রুজের মতে সমীচীন। কবিতা বিষয়েও এণ্ড্রুজের বিচারকেই কবি বেশি নির্ভরযোগ্য মনে করছেন ব'লে স্পষ্টতই অমিয় চক্রবর্তীর চিঠিতে ক্ষোভ এবং অভিমান প্রকাশ পেয়েছে।

৩ এ-রকম কোনো যৌথ বিবৃতি বেরোয়নি।

৪ অনুমান করা কঠিন, এই ভারতীয় 'ফ্যাসিস্ট' বলতে কাদের বোঝানো হচ্ছে।

৫ সুভাষচন্দ্রের এরকম কোনো চিঠির সন্ধান করা যায়নি।

## ৩৩

August 24 / 35

Hotel Palace Ambassadeurs
Rome

শ্রীচরণকমলেষু,

এখান থেকে কিছু এখন লিখতে চাই না। আজ আসামের রাষ্ট্রনেতা চালিহা-র সঙ্গে দেখা হল। তিনি কাল দেশের মুখে রওনা হচ্চেন। কলকাতায় পৌঁছেই তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। তাঁর মারফৎ কিছু জরুরি খবর পাঠাচ্চি।[১]

বিপুল নরহত্যার আয়োজন এখানে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ভারতবর্ষ থেকে মানুষের বাণী কি ভাবে প্রকাশ পাবে আপনারা ঠিক করবেন। কাল এখান থেকে যাচ্চি। এখানকার কাজ শেষ হল। ভাববার অনুভব করবার শক্তি আমরা হারাতে বসেচি—আশীর্ব্বাদ করুন

যেন এখনও অন্তরে বিশুদ্ধতা রক্ষা পায়, মানুষের সমাজে বিশ্বাস রেখে বেঁচে থাকতে পারি।

ইংরেজ অনেক কিছু অন্যায় করেচে এবং করচে। কিন্তু তাদের অনেকের মধ্যে মানুষের স্বাধীন আত্মা আজও জেগে আছে, মধ্যে মধ্যে তা প্রকাশ পায়। মধ্য য়ুরোপে এবং এই সব দেশে মনুষ্যত্বের বড়োরকমের স্বাধীন প্রকাশ আজ একেবারে অবরুদ্ধ। অক্সফোর্ডে লর্ড অ্যালেনের মন্তব্য প'ড়ে আনন্দ পেয়েচি।[২] অথচ তিনি কনসরভেটিভদেরই একজন, চরিত্রবলে বরাবরই তাঁর অসামান্যতা প্রকাশ পেয়েচে। বোধ হয় এই cutting মডর্ন রিভ্যুয়ে বেরোনো ভালো। London "Times" থেকে তুলে দিলাম। অসংখ্য অসহায় নরনারীর কান্না এসে পৌঁছচে সমুদ্রপার আবিসীনীয়া থেকে—কে তাদের উদ্ধার করবে? এই কি আধুনিক মানুষের শক্তি। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে তারা শেষ মুহূর্ত্তে সহায় খুঁজচে—দলে দলে ভয়ঙ্কর নরঘাতকের আগুনে বারুদে বিষে তাঁদের জ্বলে মরতে হবে।[৩] খুবই দ্রুত তারা এগিয়ে চলেছিল—এই সময়ে সাহায্য পেলে শীঘ্রই সবার সঙ্গে সমান হয়ে চলত। এখানে বিশেষজ্ঞ এবং বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে কথা ক'য়ে দেখেচি—এরা রক্তের নেশায় মত্ত হয়ে উঠেচে। সহজ জনসাধারণের কথা বলচি না। কিন্তু এত কথা বলবার আছে যে বলবার চেষ্টামাত্র করব না।

প্রণত

অমিয়

"Times"-এর ইটালীয়ের চিঠি পাঠাই।[৪] মিথ্যে কথায় ভরা। কিন্তু এর মধ্যে যে আত্মস্বীকার আছে তা এদের মনস্তত্ত্বের বিশেষ পরিচয় দিচ্চে। আশ্চর্য্য চিঠি।

---

টীকা

১ ফ্যাসিস্ট ইতালি থেকে মন খুলে চিঠিতে সব কিছু লেখা বিপজ্জনক ছিলো। চালিহার একটি মাত্র চিঠি রবীন্দ্রভবন সংগ্রহে দেখা যায়, সেটি ইতালি সংক্রান্ত নয়। তিনি হয়তো মৌখিক ভাবে রবীন্দ্রনাথকে কোনো বার্তা জানিয়ে থাকবেন।

২ Lord (Reginald Clifford) Allen (১৮৮৯-১৯৩৯) ছিলেন ইংলণ্ডে শ্রমিক দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। যুদ্ধ বিবেকসম্মত নয় ব'লে যুদ্ধের বিরোধিতা ক'রে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনবার জেলে যান, এমন-কি অনশন করেন। ১৯৩১-এর পরে প্রধানমন্ত্রী র‍্যাম্জে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের সঙ্গে যোগ দেন। যুদ্ধ আসন্ন দেখে ১৯৩৫ সালে বার্লিনে গিয়ে হিটলার ও গোয়েরিং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। শান্তির সপক্ষে এঁর লেখা পুস্তিকা : *Peace in Our Time : An Appeal to the International Peace Conference* (১৯৩৬)।

৩ চিঠির সঙ্গে পাঠানো লর্ড অ্যালেনের মন্তব্য সহ সংবাদপত্রের কর্তিকাংশ রক্ষা পায়নি।
আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে ফ্যাসিস্ত সৈন্যদল বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করে। তা নিয়ে তখন কোনো প্রতিবাদ শোনা যায়নি য়ুরোপে।

৪ আবিসিনীয়রা যুদ্ধ চায়নি, যুদ্ধ তাদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিলো—এই ইতালীয় স্বীকারোক্তি লক্ষ্য করার মতো।

## ৩৪

Oct 14 / 35

Balliol College
Oxford

শ্রীচরণকমলেষু,

আপনার চিঠি পেলাম।[১] আপনি সমস্ত সংসার জুড়ে আছেন, কত সহস্রভাবে সর্ব্বক্ষণ বিশ্বের ভাবনা এবং বিশ্বের কর্ম্মকে আপনি সার্থকতা দিচ্চেন। তাই এক মুহূর্ত্তও মনে করতে পারি না আপনি কর্ম্মের বাহিরে আছেন, সমস্ত সৃষ্টিকর্ম্মের মূলে বিশ্বের দুঃখে, বিশ্বের বিচিত্র চেষ্টায় শক্তি দিয়ে আমাদের উদ্ধারের পথে নিয়ে যাচ্চেন না। যদিও একথা বুঝতে পারি যে বাহিরের দিক থেকে কর্ম্মের ক্ষুদ্র রূপ আপনাকে জড়িয়ে নেই এবং আপনি আবদ্ধ নেই। কিন্তু তাও নয়, ছোট বড়ো সব কর্ম্মেরই মধ্যেই আপনি চিরদিনই সমান ভাবে রয়েচেন। আমরা সব সময়ে ঠিক বুঝতে পারি না, ভুল করি, অশান্ত উদভ্রান্ত হৃদয়ে আপনাকে বিরক্ত করি কিন্তু এও জানি আপনার ক্ষমার মধ্যেই আমরা রয়েচি।

মৃত্যুকে খুব কাছে দেখলাম—এক প্রিয় বন্ধুর মৃত্যুতে ।[২] *Time & Tide*-এ Lady Rhondda-র লেখা পাঠালাম, তাতে এই আশ্চর্য্য এক জীবনের দীপ্তিময় সমাপনের কিছু পরিচয় আছে। আমি সম্পূর্ণ দূর জগতের লোক হলেও আত্মীয় বন্ধু পরিজন সকলেই শোকে এবং শান্তিতে আমাকে কাছে নিয়েছিলেন ; কোথায় মিলিয়ে যায় দেশ দেশান্তর রাজনীতি এবং নানা খণ্ড পরিচয়ের ব্যবধান। Winifred Holtby (*Truth is Not Sober* কি আপনি পেয়েছিলেন কয়েক মাস আগে? ) জানতেন দুবছর থেকেই যে মৃত্যু আসন্ন, কিন্তু কাউকে বলেননি, সেবায় সাহিত্যসৃষ্টিতে বিমল আনন্দিত দানে মাধুর্য্যে জাগিয়ে রেখেছিলেন। জেনেও জানতে চাই না, তাই মৃত্যুর ক্ষণে অন্ধকার ঘনিয়ে ওঠে বুকের তলায়, ঠিক মতো ক'রে মিলিয়ে দেখতে শিখি না। মৃত্যু এবং জীবনের মিলনকে সত্তার পরিব্যাপ্ত সম্পূর্ণ সত্যের মধ্যে। টলমল ক'রে ওঠে পায়ের তলার সংসার, চোখ দেখতে চায় মন জানতে চায় বিশেষ পরিচয়ের মধ্যে বিশেষকে, কিছুতেই হার মানতে চায় না তারও চেয়ে সত্য পরিচয়ের কাছে। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব কি ঘোচানো যায়? অস্বীকার করতে পারি এই হৃদয় মন এই চেনা এই বিশেষ জীবনের মায়াকে—এ মায়াও তো সত্য, পরম সত্য—যেখানে যাই, যা কিছু পাই না কেন এই যে ক্ষণিকের আশ্চর্য্য ভুবন এই যে জীবন এর অনন্ত অস্তিত্বও নিশ্চয়ই বিশেষ প্রাণের বিশেষ রূপ নিয়েই সমস্তের মধ্যে বিরাজ করছে এ দাবীকে অস্বীকার করলে সত্যের মুলেই তো আঘাত করা হয়। আত্মীয় স্বজন বন্ধুকে কাঁদিয়ে যখন আলোময় প্রিয়জনের দেহ তাঁর মন তাঁর ব্যক্তিরূপ সহসা অন্তর্হিত হয় কেমন ক'রে বলব বেদনা আমাদের দুর্ব্বলতা। এই বেদনারও শেষ নেই. যদিও জানি বেদনা ক্ষণে ক্ষণে আলোকিত স্পর্শ পায়, জ্বলে ওঠে দৃষ্টিময়তায়। আপনি আকাশ মাটির নিয়ত আবর্ত্তিত ঋতুচক্রের মধ্যে সত্তার সমগ্রকে নানারূপে দেখিয়েচেন, অখণ্ড ঐক্যের আনন্দ আপনার গানে গানে কত ক্ষণিকের সুখদুঃখ উৎসব অধ্যবসায়ের

মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েচে। মৃত্যু এসে মিলেচে জীবনে এবং সেই মিলন উৎসবেরই গান আপনার কত গীত সৃষ্টিতে। জেনেচি যে "এখনো মরণ ব্রত জীবনে হলো না সাধা"[৩] —এরই অভাবে আমাদের জীবনকে সত্য থেকে সরিয়ে নিয়ে খণ্ডের সাধনায় যন্ত্রণায় পথভ্রষ্ট করে—জানি না কেমন ক'রে সমস্তের মধ্যেই সমস্তকে বিশেষকে চাইতে শিখব। বুদ্ধি বলচে প্রতি মুহূর্ত্তেই গণনাহীন মৃত্যু ঘটচে পৃথিবীতে, নব জীবনেরও অভ্যুদয় ক্ষণে ক্ষণে—এরি মধ্যে আছি। বিশ্ব আছে। কিন্তু তবু বলি—কোথায় তুমি, দেখতে পাচ্চি না। জানি যে-চোখ, যে-ক্ষুধা আজ কাঁদচে তাও একদিন মাটিতে নীরব হয়ে যাবে, আকাশে পৃথিবীতে দিয়ে যাবে তার বিশেষ রূপকে। অথচ এই সম্বন্ধের লীলার মধ্যে অনন্তকে পেয়েচি, এই সম্বন্ধকেই চাই—এবং যেভাবেই আমরা রূপান্তরিত হই না কেন এই সম্বন্ধের সত্য থাকবেই। কিন্তু কী ক'রে থাকবে? আরো প্রশ্ন জাগে যখন দেখি কারো অসামান্য জীবনে দেহ মন প্রাণ এক হয়ে উঠল—যে দেহকে বাধা মনে করি সেই হয়েচে জ্যোতির্ম্ময় বাহন জ্যোতির্ম্ময় প্রাণমনের—তখন আরো কঠিন হয় এই সার্থক ব্যক্তিস্বরূপের কিছুমাত্র ধ্বংস কল্পনা করা। কারণ ধ্বংস তো হল, দেহ তো গেল। কেন? যে পরম ঐক্য শুভমূর্ত্তি নিল কেন তা আমাদের দশজনের মতো পঞ্চভূতের একটুও শাসন মানবে?

জানি যে-পরিচয় সৃষ্টির পৃথিবীতে রয়ে গেল তার তো শেষ নেই। পৃথিবীতে সেই তো অমরতা অমর জীবনের। কিন্তু এতো হলো একটা দিক। এই তো সব নয়। এবং একভাবে বলতে গেলে পৃথিবীতেও অমর জীবনের স্বতন্ত্র চিহ্ন (sic) একদিন না একদিন বিলুপ্ত হয়—যদিও সে বিলুপ্তি বিলুপ্তি নয় কেননা সমস্তকে বদলিয়ে বিশুদ্ধ ক'রে সেই অমর জীবন পৃথিবীর প্রাণ যাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে চলেচে। কিন্তু পৃথিবীর প্রাণযাত্রাই কি সব? এ তো দুই-আমির এক-আমি —আপনার গানে আপনি দুই ধারাকে দেখিয়েচেন। চাই দুয়েরই পরম যোগ, পরম অস্তিত্ব এবং বিশেষ সম্বন্ধের চিরন্তনত্ব বিশেষ রূপের আনন্দে। বিশেষকে একটুমাত্র ছাড়তে পারি না।

তাই মেলাতে পারি না সংসারের কাজকে এবং চেতনার ক্রন্দনকে। বুদ্ধি ভাবনা চেষ্টা সব ছেড়ে দিয়ে সহজ ক'রে চোখে দেখতে চাই সত্যকে যেমন ক'রে শিশু দেখে বিশ্বকে। কিন্তু এও দেখেচি সংসারে যে শিশুর সহজ বিশ্বাসকে সংসার চূর্ণ চূর্ণ ক'রে দিতে পারে, তার অবুঝ সহজ করুণ প্রাণের প্রতি সংসার সহসা নির্দ্দয় হয়ে উঠেচে। আবিসীনিয়া আমাদের "সভ্য" পৃথিবীর সব লোককে বিশ্বাস ক'রে সবাইকেই বারে বারে ডাক দিয়ে কী পেল? হয়তো এই মৃত্যুর দারুণ অভিনয়ের ফলে সমগ্র মানব চেতনা আরো একটু খুলে যাবে—কিন্তু সে হল এক দিক। অন্য দিকের শোক ভুলতে পারি না।[৪]

Mrs. Havell-এর সঙ্গে দেখা করেছিলাম।[৫] তিনি কিছু কিছু ছবি এবং বই এখনো রাখতে চান, হঠাৎ সব চলে গেলে দেয়ালের শূন্যতা, ঘরের শূন্যতা সহ্য করতে পারবেন না ভয় পাচ্চেন—আর তো এখন কিছুই নেই। মনের জোর তিনি হারিয়েচেন। কিন্তু গোটা ত্রিশেক ছবি ( তার মধ্যে অবণবাবুদের (sic) ছবি গোটা ২০ এবং বাকি Mr. Havell-

এর আঁকা ), news cuttings-এর বইগুলি, এবং অন্যান্য বইয়ের সংগ্রহ তিনি পাঠাতে প্রস্তুত এবং তাঁর বিশেষ ইচ্ছে যে-Desk এবং যে Chair-এ Havell কাজ করতেন তা যেন তাঁর Collection-এর সঙ্গে একই ঘরে রাখা হয়। ( Mrs. Havell-এর হাতে তৈরি দুএকটি sculpture pieces আছে—তার কিছু আপনি এই সঙ্গে চাইলে তিনি বিশেষ কৃতজ্ঞ হবেন। বুঝতে পারলাম আপনার কাছ থেকে এই দাবী জানলে তাঁর মনে অপরিসীম শান্তি পাবেন। ) পাঠানোর ব্যবস্থা এবং খরচ আশ্রম থেকেই করা হবে এই তাঁর মনোভাব। নিশ্চয়ই এ দেশে professional packers আছে যারা ভালো ক'রে pack ক'রে insure ক'রে shipping-এর বন্দোবস্ত করতে পারে। আপনাদের কাছ থেকে খবর পেলে এইরকম packer-এর অনুসন্ধান ক'রে তাদের বলতে পারি estimate পাঠিয়ে দেবে। ইতিমধ্যে আপনি নিজে যদি তাঁর শেষ চিঠির উত্তরে Mrs. Havell-কে দুচার কথা লেখেন এবং বলেন যে তিনি কিছু সংগ্রহ এখনো নিজের কাছে রেখে বাকি আশ্রমকে দিতে চাচ্চেন, এবং Mr. Havell-এর ডেস্ক এবং চেয়ার দিচ্চেন এতে আপনি আনন্দিত হয়েচেন—তাহলে তিনি কতদূর শান্তি পাবেন বলা যায় না। এত বেশি কষ্ট পাচ্চেন এবং অসহায় অবস্থায় রয়েচেন কী বল্‌ব—আমরাই বা কী করতে পারি। আপনার কাছ থেকে চিঠি পাবেন এই আশার কথা বারম্বার বললেন।

Collected Edition Macmillan ছাপাচ্ছে—সব কথাবার্ত্তা হয়েচে। নূতন এবং পুরাতন কবিতার যে selection আপনি ক'রে দিয়েচেন এবং যেভাবে Andrews-এর সঙ্গে কথা হয়েচে সেই অনুসারেই সব হবে। Text কিছু বদল করা ঠিক হবে না—আপনি যা বাদ দিয়েচেন শুধু তাই বাদ যাবে। যখন Collected Edition বেরোচ্চে—এবং তা বেরোনোই উচিত—তখন এই ব্যবস্থাই যে হওয়ার দরকার ছিল সকলেরই তাই মত। ( পরে একটি Selection-ও বের করা যেতে পারে কিন্তু সে পরের কথা। )[৬]

"বীথিকা" পাবার এবং পড়বার জন্যে উৎসুক হয়ে আছি।[৭]

বন্ধুর অকস্মাৎ মৃত্যুর শোকে মন আচ্ছন্ন রয়েছে, এরি মধ্যে Mrs. Holtby—তাঁর বয়স ৮০র কাছে—আমাদের কাছে আসেন প্রতিভাবান একমাত্র মেয়ের মৃত্যুর বেদনায় সান্ত্বনা চাইতে।[৮] যে জীবনে দেহ মন এবং কর্ম্ম এক হয়ে উঠেচে, যাঁরা ক্ষণে ক্ষণে পৃথিবীর সংসারকে সর্ব্বভাবেই আনন্দ দিতে পারেন অথচ চলে গেলেন—সেরকম জীবন কেন মানবে কিছুমাত্র বিনাশের নিয়ম?—এমন কিছুই নেই এ দেশের দর্শনে বা ধর্ম্মতত্ত্বে যার থেকে এর উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়। চরম বেদনাও তো মানুষকে সব সময়ে ঠিক উত্তর দেয় না।

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

অমিয়

---

**টীকা**

১ ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫-এ লেখা এই চিঠিতে ('চিঠিপত্র' ১১শ, ৮৩ দ্র.) রবীন্দ্রনাথ

লিখেছিলেন যে আবিসিনিয়ার সমস্যা বিষয়ে এ-বয়সে জড়িয়ে পড়তে তিনি নিতান্ত অনিচ্ছুক: 'তোমরা আছো যৌবনজোয়ারের উদ্দাম টানের মধ্যে, আমাদের এই ঘাটের মনোবৃত্তি ঠিক মতো বুঝতেই পারবে না।...জলে ঝাঁপ দিয়ে তোমাদের চলতি নৌকোয় চড়ে বসব এমন আশা কোরো না।' কিন্তু ২ অক্টোবর তারিখে মুসোলিনি সত্যি-সত্যি আবিসিনিয়া আক্রমণ করার পর ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানে (১ নভেম্বর ১৯৩৫) কবির এক তীব্র প্রতিবাদপত্র ছাপা হয়েছিলো। তিনি নীরব থাকতে পারেননি।

২৩ সেপ্টেম্বরের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ আরো লিখেছিলেন—'ইংরেজি চার অধ্যায় সম্বন্ধে আমার মনে বিশেষ উৎসাহ নেই।'

২ 'প্রিয়বন্ধু'—উইনিফ্রেড হোল্‌টবি। (২১.৫ টীকা দ্র.)

৩ 'এখনো মরণব্রত...' গীতবিতানে 'পূজা'র গান ('এখনো গেল না আঁধার' দ্র.)।

৪ বন্ধুমৃত্যুর ব্যক্তিগত শোক এখানে ধর্ষিত আবিসিনিয়ার মৃত্যুবেদনার মধ্যে চারিয়ে গেছে।

৫ প্রথমে মাদ্রাজে, পরে কলকাতায় গবর্মেণ্ট স্কুল অব আর্টের অধ্যক্ষ ছিলেন E. B. Havell, পাশ্চাত্য শিল্পের পরিবর্তে এদেশের আর্ট স্কুলে তিনি ভারতশিল্পের স্থান ক'রে দিতে উদ্যোগী হন। কলকাতার আর্ট স্কুলে গ্রামীণ তাঁতশিল্পের জন্যেও স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হয়েছিলো। দেশীয় শিল্পী লালা ঈশ্বরীপ্রসাদকে তিনি চিত্রবিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত করেন। গ্যালারিতে রাজপুত ও মোগল চিত্রের সংগ্রহ রেখেছিলেন। নয়াদিল্লী নতুন রাজধানী হিশেবে তৈরি করার ব্যাপারেও তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে ভারতীয় শিল্পী, কারিগর এবং বাস্তুবিদদের নিয়োগ করা উচিত। পরামর্শ বৃথা হয়েছিলো। এদেশের লোকও প্রথম-প্রথম তাঁর বিরোধিতাই করেছেন। সমর্থকদের মধ্যে ছিলেন ভগ্নী নিবেদিতা, অবনীন্দ্রনাথ এবং বিচারপতি স্যর জন উড্রফ। মৃত্যুর পরে শোকসংবাদ লিখেছিলেন বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। (*Visva-Bharati Quarterly*. New Series, voll. III দ্র.)

অমিয় চক্রবর্তীর পরামর্শে শ্রীমতী লিলি হ্যাভেলকে সান্ত্বনা জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন কবি। শ্রীমতী হ্যাভেলের পাঠানো অমূল্য সংগ্রহ রক্ষার জন্যে শান্তিনিকেতনে 'হ্যাভেল হল' নির্মাণ করা সহজ হয়নি। শেষ পর্যন্ত গান্ধীজির সহায়তায় প্রয়োজনীয় টাকা ওঠে। ১৯৩৮ সালের ১১ ডিসেম্বর হল উদ্বোধনের খবর জানিয়েও শ্রীমতী হ্যাভেলকে কবি চিঠি লেখেন। রবীন্দ্রভবনে সব চিঠিপত্র রক্ষিত আছে।

৬ Collected Edition থেকে কী পরিমাণ পুরোনো কবিতা বাদ গেছে, ক'টি নতুন অনুবাদ যোগ হয়েছে তা বর্তমান লেখকের 'ভূমিকা'য় উল্লেখ করা হয়েছে। Selected Poems কখনো বেরোয়নি।

৭ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'চিনির অংশ যাতে কম' সেই রকমের কিছু গদ্যকবিতা নিয়ে 'শেষ সপ্তক' (১৯৩৫) তৈরি হয়েছিলো, এ-বই বেরোবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেরোয় ছন্দমিলের কবিতা নিয়ে 'বীথিকা' (১৯৩৫): ('জানিনে তাতে গুড়ের অংশ কী পরিমাণে আছে'।—রবীন্দ্রনাথ।)

৮ Mrs. Holtby—সদ্যমৃত বন্ধু উইনিফ্রেডের বৃদ্ধা জননী।

Oct 23 [1935]

Union Society
Oxford.

শ্রীচরণকমলেষু,

জাহাজের ডাকে আজ তিনখানি বই পাঠালাম—এই চিঠির সঙ্গে পৌঁছবে। আমার মনে হল *The Land* আপনার ভাল লাগবে—ওতে মাটির কথা আছে, ঋতুপর্যায়ের কাহিনী।[১] "বীথিকা"-র দুএকটি সুর ওতে বেজেচে। লেখিকা এখনকার কবিদের মধ্যে অন্যতম। Eliot-এর সঙ্গে সেদিন সভায় তর্কবির্তক হল—তিনি 'pure poetry'-র সন্ধানে সমস্ত জীবনকে অস্বীকার করতে চান। *The Land* জাতীয় কাব্য ওঁর কাছে কাহিনীর মূল্য পাবে, কাব্যের নয়। বিশ্লেষণের ঐ বিশেষ পদ্ধতি বাদ দিয়ে এইটে স্পষ্ট বুঝেচি ইংরেজি কাব্যের মোড় ফিরেচে। Eliot-এর নূতন Drama "Murder in the Cathedral"-এও[২] Chorusগুলিতে জীবনের বিচিত্র সুরকে তিনি ঠেকিয়ে রাখতে পারেননি। বন্ধু যিনি মারা গেলেন তার শেষের দিকের একটি কবিতা আপনাকে পাঠাই। নিশ্চিত মৃত্যুকে তিনি জীবনের খেলার অঙ্গ জেনে শেষ পর্যন্ত আনন্দিত সৃষ্টিকর্ম্মে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন। সেই আনন্দ মৃত্যুর মূল্যে কেনা—যার কথা আপনি নূতন "বিরোধ" কবিতায় বলেচেন ।[৩] নিরন্তর শরীরের যন্ত্রণা তাঁর ছিল—কাউকে জানাননি। আমি Winifred Holtby-র বিষয়ে একটি বই লিখচি—আধুনিক যুগে আমরা যাকে "Modern Spirit" বলচি তার তিনি তরুণ উজ্জ্বল মূর্ত্তি। তাঁর মৃত্যুর বেদনা বন্ধুদের অন্তরে ঘুচবে না। *The Land* কবিতায় যে মাটির কথা আছে Winifred-এর Novel-এ তার ছবি আঁকা পড়েচে। এই মিশ্রিত সুর প্রাণের পৃথিবীর, জীবনের, মাটির জীবনের ; এই সুর, আবার দেখা দিয়েচে য়ুরোপীয় সাহিত্যে। এতে বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা সহজ হয়ে মিলেচে। *World of Nature* বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের দিক থেকে লেখা, বইখানা পাঠাচ্চি, কিন্তু এতেও জীবনের ঐক্য ব্যাপকতার বোধ আছে। Day Lewis-এর[৪] বই reactionary—যদিও ওঁরা বলবেন revolutionary—তবে ওতেও মানুষের কাব্যচেষ্টাকে সমাজের রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশধর্ম্মী বিচিত্র ব্যাকুলতার সঙ্গে উনি এক করতে চেয়েচেন। এতেও দেখি এই সত্তার সামীপ্য, সাযুজ্য এবং ঐক্যচেতনার অনুভূতি। Dogma-র বাড়াবাড়ি আছে ; কিন্তু এদের সাহিত্য আজ রং-এ রসে নূতন রূপে সমৃদ্ধ হয়ে উঠচে মনে হয়। এই বইগুলি আপনাকে পাঠাবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

Winifred Holtby-র কবিতা নিদ্রাহীন যন্ত্রণায় লেখা,—নিজের কথা গোপন করবার জন্যে নাম দিয়েছিলেন "For the Ghost of *Elinor Wylie*."

Escort

Not when you glittered, royally attended,
    Gallant and Debonaire,
By brilliant wards and dancing mirth befriended ;
    I was not with you there.

But roused by pain, in the abyssmal hour
    When angry pulses leap,
And black blood lashes its frustrated power
    Against tall cliffs of sleep ;

Then, when the hounds of fear sprang from the shadows,
    In horror's hue and cry
Hot on your heels, through the grey morning meadows
    hunting you down to die ;

Then, when you thought that there was none beside you,
    No prince nor poet near,
Only the silver sunrise to deride you
    And your pulsating fear ;

Then, when you turned, by livid moonlight sickened,
    Seeking the hidden sigh—
My breath it was upon your breath that quickened ;
    The fear, the pain, were mine.

আরেক জায়গায় তিনি বলেচেন Pinecone-এর কথা—গাছ থেকে ঝ'রে পড়চে 'Back to Earth they cried, Back to the dark mortality of Earth'—কিন্তু এই মাটির বেদনা তিনি বড়ো ক'রে দেখেননি—মাটি হতে জেগে -ওঠা প্রাণের আশ্চর্য্য অভিযানকেই বরণ করে নিয়ে চলে গেছেন।

প্রণত

অমিয়

---

**টীকা**

১ কবি ঔপন্যাসিক Victoria Sackville-West-এর (১৮৯২-১৯৬২) রচিত *The Land* (১৯২৬) নামের দীর্ঘ কবিতায় বিধৃত হয়েছে ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব কেণ্ট অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। বইটি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। শোনা যায় ভার্জিনিয়া উল্ফ্-এর লেখা *Orlando* উপন্যাসের Orlando চরিত্রটি এই মহিলা কবিরই প্রতিকৃতি।

ঐতিহ্য প্রাণবন্ত থাকলে কাব্য-সাহিত্যের পরিধি-বিষয়ক ধারণা যুগে-যুগে পালটায়। বিশ শতকী 'আধুনিক' য়ুরোপীয় কাব্য বা pure poetry থেকে কাহিনী, বর্ণনা ইত্যাদি একসময়ে বিদায় নিয়েছিলো। ভিন্ন চেহারায় সে সব খানিক-খানিক ইদানীং আবার ফিরেও এসেছে। অমিয় চক্রবর্তী নিজেও শেষদিকে কাহিনী-ঘেঁষা উৎকৃষ্ট কিছু কবিতা লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের পরে বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় ছাড়া অন্যত্র কাহিনী বর্ণনার আকাল চলছিলো।

২ ক্যানটারবেরি ফেস্টিভ্যালের জন্য রচিত এলিয়টের *Murder in the Cathedral* (১৯৩৫) নাটকটিতে প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজেডির আদল দেখা যায়। সমাজের পুনরুজ্জীবনে সন্ত ও সন্তপ্রতিম মানুষ কীভাবে সহায় হন সেটাই নাটকের কেন্দ্রীয় ভাবনা। আধুনিক কালের এই নাটকে কোরাসের ব্যবহার খুবই বৈশিষ্ট্যময়।

৩ 'বীথিকা'য় "বিরোধ" ('এ সংসারে আছে বহু অপরাধ') কবিতার সঙ্গে মৃত বন্ধু হোল্টবির লেখা শেষদিকের কবিতা 'Escort'-এর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মৌলিক মিল দেখেছিলেন অমিয় চক্রবর্তী, যাকে তিনি বলেছেন 'জীবনের ঐক্য ব্যাপকতার বোধ'। যে-জন্যে সমসাময়িক নবীন ইংরেজ কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ ঘটাতে তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন তার এটিও একটি কারণ।

৪ 'অডেন গোষ্ঠীর' বামমার্গী আইরিশ কবি ডে লুইস (C. Day Lewis, ১৯০৪-১৯৭২) ছিলেন অক্সফোর্ডে Wadham কলেজের স্নাতক। *Hope for Poetry* লেখেন ১৯৩৪ সালে, যখন অমিয় চক্রবর্তীও অক্সফোর্ডে। ডে লুইস পরে, ১৯৫১ সালে, ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মানসূচক Professor of Poetry এবং Masefield-এর মৃত্যুর পরে ১৯৬৮ সাল থেকে ইংলণ্ডের Poet Laureate বা রাজকবি হয়েছিলেন। Nicholas Blake ছদ্মনামে কিছু গোয়েন্দাকাহিনীও লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথকে পাঠানো ওঁর কোনো বইয়ের হদিশ করা যায়নি।

## ৩৬

July 3 / 36

Balliol College
Oxford
Telephone No. 2254

শ্রীচরণকমলেষু

"পত্রপুট" পেয়েচি— এখানকার কাজ শেষ করে অনেক পরিশ্রমের শেষে শান্তি খুঁজচি এমন সময়ে বইখানি এসে পৌঁছল।[১] মনে হল যেন ষোলোটি Ode একত্র করা হয়েচে সমস্ত বিশ্বসাহিত্য থেকে বাছাই ক'রে—এই বইখানির বিরলতায় কবিতাগুলির প্রসারিত রূপ বিশেষ ভাবেই ধরা দিয়েচে। আধুনিক ক্যাব্যজগৎ সহরের রাস্তায় ভিড়ের মধ্যে ইমারৎ গেঁথেচে, হয়তো তার দুচারটে ঘরে নিপুণ বুদ্ধি এবং রুচির পরিচয় কখনও কখনও মনকে মুগ্ধ করে। কিন্তু বেশির ভাগই প্রাণের সুধা হতে বঞ্চিত, সমস্ত বৃহৎ আকাশ নক্ষত্রলোক দূরে রেখে এরা মনের সমুদ্র মন্থন করচে। জীবনের শিকড় যখন শুকিয়ে এসেচে এবং আবার ভারতবর্ষের দিকে ফিরে চলেচি তখন পত্রপুটে চিরদিনের জীবন হঠাৎ অনুভব করতে পেলাম। মধ্যে সুরেন দাশগুপ্ত [২] মহাশয় এসেছিলেন, তিনি নানা বিষয়ে নানারকম লোক, কিন্তু আপনার কবিতায় যে গভীরভাবেই মুগ্ধ হন তাতে সন্দেহ নেই। তাই ঐ কাব্যের সহযোগে ভারতবর্ষের কথা জমে উঠল ; আপনার

'বীথিকা' 'শেষসপ্তক' এবং 'পত্রপুটে'র আনন্দ আমাদের প্রবাসকে ভুলিয়ে দিল। দুঃখের বিষয়, ফিরিয়ে দেব ব'লে বইখানি তিনি লণ্ডনে নিয়ে গেলেন, আর ফিরে পাবার আশা রাখি না।

লণ্ডনে মধ্যে মধ্যে যাবো Conference of Faith-এর ব্যাপার শুনতে। Suzuki-র বক্তৃতা শুনতে চাই।[৩] দুর্ভাগ্যক্রমে আগা খাঁ অশ্বতত্ত্ব এবং ঘোড়দৌড়ের ধর্ম্মকথা না ব'লে ইসলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলবেন ;[৪] তা ছাড়া যত বণিক, মহারাজা, এবং রাজকর্ম্মচারীর ভিড়। সব মিলিয়ে থিওসফির হাওয়া সৃষ্টি হবে, এবং অর্থসম্পন্ন ধার্ম্মিক ইংরেজ নরনারী কয়েকদিন ধ'রে এশিয়ার আধ্যাত্মিকতায় নিমগ্ন হবেন। এই জাতীয় জিনিস মোটের উপর আমাদের বিশেষ ক্ষতি করে। যারা সত্যকার জ্ঞানপিপাসু তারা এই সব গোলমেলে আধ্যাত্মিক সভায় যাওয়া বন্ধ করেচে। Younghusband[৫] যখন Everest সম্বন্ধে বলেন তখন শোনা যায়, অন্য কোনো বিষয়ে যখন লেখেন বা বলেন তখন সময় থাকতে পালানো ছাড়া উপায় নেই।

( Dr. Beldon-এর চিঠি এই সঙ্গে পাঠাই। তাঁকে আপনি নিজে হাতে এক লাইন লিখে জানালে তিনি বিশেষ কৃতজ্ঞ হবেন—ভূমিকা লেখার সময় কখনোই আপনার নেই।[৬] ইনি আধুনিক intellectual Clergy-দের মধ্যে নাম করেচেন ; এঁর বই এবং বক্তৃতা Oxford-এ এবং অন্যত্র খুবই সমাদর পেয়েচে। নিশ্চয়ই কোনো ভ্রমবশত তাঁর চিঠি এবং বইয়ের প্রাপ্তিস্বীকার এসে পৌঁছয়নি। )

লাহোরে কাজ করবার জন্যে Research Scholarship পেয়েচি এখান থেকে ;[৭] তিন বছর পরে এই University আমাকে ফিরিয়ে এনে এখানে কোনো ভালো কাজ দেবে প্রতিশ্রুতি জানিয়েচে। আমার বইটা শেষ ক'রে কর্তৃপক্ষের হাতে দিয়েছি—ডিগ্রি সম্বন্ধে এখন ছুটিতে কিছু ঠিক করবে না, পরের term-এ October-এর মাঝামাঝি আমাকে Cable ক'রে জানাবে।[৮] আমি আগস্টের শেষে দেশে পৌঁছব। মধ্যে Sweden-এ যাচ্চি Conference-এ। তার আগে Prague-এ আমাদের বৃহৎ সভা বসবে। বহুদিন ঘোরাঘুরি ক'রে কাটল ; ঠিক কি নিয়ে দেশে ফিরচি জানি না। মনে হয়ে জন্মান্তর হয়েচে, কিন্তু কল্পনায় যা ভাবি আকাশ আলো দেশের প্রাণের নিত্যতায় তার অনেকখানিই অলীক প্রমাণিত হয়। এদেশের প্রাণলোকে বাস করেচি, এদের সঙ্গে ভেবেচি, কাজ করেচি, দুঃখ সুখে ঐক্য পেয়েচি—এইটেই রইল মনে ; যখন দেশের রৌদ্রতলে কাজে নামব কিছু নিশ্চয়ই জীবনের গভীরতায় থেকে যাবে—দুর থেকে বেদনায়, কখনো নূতন প্রত্যাশায় বৃহৎ কোনো অস্তিত্বের সুর বাজবে।

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

প্রণত
অমিয়

টীকা

১ পনেরোটি গদ্যকবিতা, এবং নিয়মভাঙা যতি সহ আঠেরো মাত্রার একটি সমিল কবিতা নিয়ে 'পত্রপুট' বেরোয় ১৯৩৬ সালে। কবিতাগুলিকে কেন ode বলা হয়েছে সেটা আলোচিত হওয়া দরকার।

২ সুরেন দাশগুপ্ত—২৯.৫ টীকা দ্র.।

৩ জাপানী মনীষী ( Shosan Daisetsu ) Suzuki (১৮৭০-১৯৬৬) বৌদ্ধধর্ম ও Zen-বিষয়ে বহু গ্রন্থ লিখে ও বক্তৃতা ক'রে আধুনিক বিশ্বের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেছিলেন। ন্যু-ইয়র্কে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুদিন অধ্যাপনা করেছেন। অমিয় চক্রবর্তী বর্তমান লেখককে চিঠিতে জানিয়েছিলেন: 'জেন-শ্রেষ্ঠ সুজুকিকে অন্তরঙ্গ ভাবে চিনেছিলাম ; দুবার গেছি জাপানে কামাকুরায় তাঁর ধ্যানকক্ষে, গ্রন্থালয়ে, উদ্যানে—বস্টনেও তাঁকে পেয়েছি। একবার আমার ক্লাশেও এনেছিলাম। জেন-এর মধ্যে হয়তো সমগ্র বৌদ্ধধর্মের ব্যাপ্তি নেই কিন্তু দীপ্তি আছে।'

৪ আগা খাঁ বিষয়ে অমিয় চক্রবর্তী বর্তমান লেখককে বলেছেন—'অনেক কম বয়েস, কোটিপতি। রবীন্দ্রনাথকে কী কারণে cultivate করছিলেন, কিন্তু বিশ্বভারতীকে কিছু দেননি।' (ক্যাসেট থেকে)

৫ *The Epic of Mount Everest* (১৯২৬), *Everest the Challenge* (১৯৩৬) প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক (Francis) Younghusband (১৮৬৩-১৯৪২) কার্জনের আমলে তিব্বত মিশনে গিয়েছিলেন সেনাদলের অধিনায়ক হ'য়ে। তাঁর আগে একমাত্র আর যিনি লাসা পরিদর্শন করেছিলেন, তিনি একজন বাঙালি, শরৎচন্দ্র দাশ। তাঁর সঙ্গে কোনো সেনাদল ছিলো না।

৬ বলার ভঙ্গি থেকেই বোঝা যায় 'intellectual clergy'-র বইয়ের ভূমিকা লিখতে কবিকে তিনি সত্যি সত্যি অনুরোধ করছেন না।

৭ অক্সফোর্ডের ব্রেজনোস কলেজ থেকে তিন বছরের জন্যে গবেষণা-বৃত্তি নিয়ে অমিয় চক্রবর্তী ১৯৩৭ সালে দেশে ফেরেন। দায়িত্ব ছিলো ভারত-ইরান-আফগানিস্থান ভ্রমণ ক'রে আধুনিককালের প্রাচ্যদেশে নতুন ধর্ম্মআন্দোলন বিষয়ে গবেষণা করা। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত লাহোরে আমেরিকান মেথডিস্টদের পরিচালিত ফরমান ক্রিশ্চিয়ান কলেজে অনারারি প্রফেসর হিশেবে নিযুক্ত থেকে এই গবেষণা তিনি শেষ করেছিলেন। তারপর যোগ দেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে।

৮ 'বইটা' আসলে অক্সফোর্ডে ডক্টরেট ডিগ্রির জন্যে Thomas Hardy-র নাটক *The Dynast*-এর সঙ্গে যুদ্ধোত্তর ইংরেজি কবিতার সম্পর্ক নিয়ে লেখা থিসিস: *The Dynasts and the Post-war Age in Poetry* নামের এই বই অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে ছাপা হয়েছিলো।

July 23 [1936]

Tempelkof Aerodrome
Berlin [১]

শ্রীচরণকমলেষু,

আজ সকালে প্রাগ থেকে এসেচি—আমাদের Conference হয়ে গেল। Lesny-র বই প্রায় শেষ হয়েচে—আপনার কাব্য এবং গদ্যরচনা সম্বন্ধে বোধ হয় এর চেয়ে ভালো বই এ অবধি বেরোয়নি। পাঁচ বছর একান্ত পরিশ্রম করে এবং মূল রচনা প'ড়ে উনি এই বই লিখেচেন। ওঁর বই ছাপা আরম্ভ হবে দুমাস পরে [২]—তার মধ্যে যদি 'পত্রপুট', 'বীথিকা' এবং 'চণ্ডালিকা' উনি পান তাহলে উনি বিশেষ কৃতজ্ঞ হবেন —আর সমস্ত বইই উনি পেয়েচেন, আমিও কিছু দিয়েচি। আমার 'পত্রপুট' 'বীথিকা' অন্যকে দিয়েচি, দেশে গিয়ে নূতন বই পাব। যদি অনিলবাবুকে বলে দেন Lesny-কে ঐ তিনটে বই পাঠাতে তাহলে বড়ো উপকার হয়।[৩]

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

প্রণত
অমিয়

---

**টীকা**

১ অক্সফোর্ডে থিসিস জমা দিয়ে দেশে ফেরার আগে য়ুরোপে ঘুরছেন।

২ মূল বাংলায় রবীন্দ্রনাথ প'ড়ে বিদেশীদের মধ্যে যাঁরা তাঁর বিষয়ে বই লিখেছেন চেকোশ্লোভাকিয়ার লেজ্‌নি তাঁদের মধ্যে দ্বিতীয়। তাঁর বইটি ১৯৩৯ সালে *Rabindranath Tagore, his Personality and Work* নামে ইংরেজি অনুবাদে লণ্ডনের অ্যালেন অ্যাণ্ড আনুইন থেকে প্রকাশিত হয়। চেক ভাষায় লেখা মূল বইয়ে (১৯৩৭) কবির বাংলা হস্তাক্ষরে ছাপা হয়েছিলো —'প্রিয় আচার্য্য লেজ্‌নি, শান্তিনিকেতনে একদিন তোমার সঙ্গে আমাদের মিলন হয়েছিল সে আমি সৌভাগ্য বলে মনে করি। নানা জাতির বিদ্যাসম্মিলনের মধ্য দিয়ে পরস্পরের হৃদয়ের যোগস্থাপন শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনে তোমার সহায়তা ও সৌহৃদ্য আমরা মূল্যবান বলে মনে করি। অল্প কালের মধ্যে বাংলাভাষার অন্তরে প্রবেশ ক'রে আমার রচনার উপরে তুমি যে রকম অধিকার লাভ করেছ, সে আমার কাছে আশ্চর্য বোধ হয়। এমন ধারণা এবং বিচারের শক্তি আর কোনো বিদেশীর মধ্যে আমি দেখিনি। আমার লেখার সঙ্গে তোমাদের দেশের পাঠকদের যে পরিচয় সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছ সে জন্যে তুমি আমার সাদর কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করো। ইতি ৫ই অগস্ট ১৯৩৬ স্নেহানুগত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।' ইংরেজী সংস্করণের ভূমিকায় সি এফ অ্যাণ্ড্রুজ লিখেছিলেন 'It makes us see Rabindranath Tagore through European eyes in all the vast range of his genius.' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জর্মান বোমায় এই গ্রন্থের প্রায় সব কপি লণ্ডনে ধ্বংস হ'য়ে যায়।

৩ অনিলবাবু—অনিলকুমার চন্দ।

August 5 [1936] Sigtuna
[পোস্টমার্ক Berlin]

শ্রীচরণকমলেষু

এইখানে এসে আপনার চিঠি পেলাম[১]—সব কীরকম আশ্চর্য্য লাগচে বলতে পারি না। এখানে আমাদের Conference হয়ে গেল—আজ Finland-এ যাচ্ছি, সেখান থেকে লিখব।[২] এসব দেশে সবাই আপনার খবর জানতে চায়—কতদিন এরা শুনতে পায়নি। আশ্রমের বিষয়ে এরা জানতে উৎসুক—আমাদের literature এবং publication কিছু পাঠানো দরকার। আমি গিয়ে এ বিষয়ে বিশ্বভারতী আপিসে বলতে চাই। বোধহয় আশ্রমে এখন একটা foreign publicity Dept. খোলা দরকার। আমরা বোধহয় সেদিকটা তেমন ক'রে ভাবিনি—অবশ্য ইতিমধ্যে এবিষয়ে ব্যবস্থা কতদূর এগিয়েচে তা আমি জানি না।

Prof Milles[৩] আপনাকে নমস্কার জানালেন—তাঁর নূতন Sculpture piece 'Orpheus' চারদিকে প্রশংসা পাচ্ছে।

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন।

প্রণত
অমিয়

---

টীকা

১ শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ ১৩ জুলাই চিঠিটি লিখেছিলেন। ('চিঠিপত্র' ১১শ, ৮৮ দ্র.)

২ 'এখানে' মানে জর্মানির হামবুর্গে, ২৩ থেকে ৩০ জুলাই সেখানে 'Leisure, Time and Recreation' প্রসঙ্গে বিশ্বসম্মেলন হয়, অমিয় চক্রবর্তী সেখানে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৯৩৬-এর নবেম্বর-সংখ্যা 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি'-তে এই সম্মেলনের একটি প্রতিবেদনও তিনি লিখেছিলেন।

৩ Professor (Carl) Milles (১৮৭৫–১৯৫৫) ছিলেন সুইডেনের যশস্বী ভাস্কর। জর্মানির Expressionist ভাস্করদের উপর এঁর বিস্তর প্রভাব ছিলো। রাজধানী স্টকহোমে স্থাপিত অর্ফিয়ুস প্রস্রবণের বিখ্যাত ভাস্কর্যটি এঁর হাতে গড়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইনি মার্কিন নাগরিকত্ব নেন।

August 16 [1936] Gulf of Finland

শ্রীচরণকমলেষু

রাশিয়ায় গিয়েছিলাম ; বহু কষ্টে ফেরবার পথে শেষ মুহূর্ত্তে লেনিনগ্রাডে Prof Stcherbatsky-র সঙ্গে দেখা করেচি।[১] এত আনন্দ হল বলতে পারি না। অনেক কথা বলেচেন, দেশে গিয়ে জানাতে পারব। Jacobi [২] আর তিনি Darmstadt-এ আপনার সঙ্গে একটা দিন কাটিয়েছিলেন সে-কথা কখনো ভুলতে পারবেন না বললেন। এ চিঠি ইচ্ছে করেই রাশিয়ায় পোষ্ট না ক'রে এখান থেকে পাঠাচ্চি।

মস্কৌ আবার দেখে এলাম। এই ছয় বৎসরে যে কী পরিবর্ত্তন ঘটেচে তা বিশ্বাস করাই শক্ত। অথচ বুঝতে পারি না বিরাট সঙ্ঘ চেতনায় চালিত মানুষের জীবন ধ্রুবকেন্দ্রের বাইরে ধূমকেতুর মতো কোথায় গিয়ে পৌঁছবে। মানবসেবার এত বড়ো ধ্যানশক্তি আর কোথাও তো কখনো এমনভাবে দেখা দেয়নি। —কী প্রচণ্ড এই কল্যাণকর্ম্মের ব্যবস্থা, কত ত্যাগ, কত বীর্য্য, জ্ঞানবুদ্ধির কী তপস্যা। সার্থক সাধনার ফল চতুর্দ্দিকে। কিন্তু মানুষের চেয়ে বড়ো কিছুকে মানবে না, ব্যক্তি বিশেষত্বকে কোথাও নিভৃত অবসর দেবে না। অন্তরের যেখানে সার্থকতার মূল তা উচ্ছেদ করে ঐক্যের মঙ্গল আয়োজন। হয়তো প্রতিক্রিয়ার এই পর্ব্ব আরো কিছুকাল চলবে—এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য বোঝা শক্ত নয়। বহু অনুষ্ঠান বিশেষ ভাবে দেখেচি—Collective Farm এবং Culture Communal-ই সবচেয়ে দ্রুত এগিয়েছে মনে হল। এত ভাল লেগেচে— এখানে আপনি একবার আসবেন—এরা কত কাল আশা করে আছে। এখন এরোপ্লেনে বিশেষ আরামে এবং সহজে য়ুরোপে যেখানে ইচ্ছে আসতে পারবেন। ফিরে গিয়ে এ বিষয়ে আমার বিশেষ বলবার আছে।

প্রণত
অমিয়

---

**টীকা**

১ রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০ সালে রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন অমিয় চক্রবর্তী। ১৯৩০-এর ছ'বছর পরেই অমিয় চক্রবর্তী আরো একবার রাশিয়া ভ্রমণে গিয়েছিলেন, যে-বিষয়ে কিছুই প্রায় জানা যায় না। পরেও অবশ্য আরো দু-একবার তিনি রাশিয়াতে গিয়েছেন, প্রধানত পাস্টেরনাকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

লেনিনগ্রাডে Institute for the Study of Buddhist Literature নামক প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক ছিলেন Academician Professor (Fyodor) Stcherbatsky। সংস্কৃতজ্ঞ বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ পণ্ডিত। কবির সঙ্গে প্রথম দেখা জর্মানির ডার্মস্টাডে (জুন ১৯২১) কাউন্ট কাইজারলিং-আয়োজিত 'Tagore Week' অনুষ্ঠানে। Martin Kämpchen-এর *Rabindranath Tagore and Germany* (১৯৯২) গ্রন্থে এই

অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ আছে। ১৯৩০ সালে নিজে অসুস্থ হ'য়ে স্বাস্থ্যনিবাসে ছিলেন ব'লে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাশিয়ায় তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি। অমিয় চক্রবর্তীর হাতে এবার তিনি রবীন্দ্রনাথকে সংক্ষিপ্ত যে-বার্তা পাঠান সেটি খানিকটা রহস্যময়। তাড়াতাড়ি লাইন টানা খাতার পাতা ছিঁড়ে দ্রুত লেখা চিঠি। কাগজের উলটো পিঠে অমিয় চক্রবর্তীর নিজের চিঠি, রবীন্দ্রনাথকে। 'ইচ্ছে করেই' এ-চিঠি রাশিয়াতে ডাকে দেওয়া হয়নি, ডাকে দিয়েছেন রাশিয়ার বাইরে এসে গাল্‌ফ অব ফিনল্যাণ্ড থেকে। রাশিয়ায় ডাকে দিলে সে-চিঠি যথাস্থানে পৌঁছতো কিনা সন্দেহ। গোঁড়া মার্ক্সবাদীরা যাই বলুন, রুশ বিপ্লবের চরম পরিণাম নিয়ে রবীন্দ্রনাথেরও এই রকমের সন্দেহ ছিলো। সেটা যে কল্পিত নয় তার প্রমাণ হ'লো ১৯৯০ সালে এসে। পাঁচ কি ছয় দশকের মধ্যেই কী প্রকাণ্ড রকমের ওলোটপালোট ঘ'টে গেলো সাম্যবাদী রাশিয়ায়।

২ (Herman Georg) Jacobi-ও (১৮৫০-১৯৩৭) আরেকজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, জর্মানির। The Sacred Books গ্রন্থমালার ২২ এবং ৪৫ খণ্ডের অন্তর্গত প্রাচীন সংস্কৃত থেকে অনুবাদগুলি এঁর করা। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে এঁর কোনো লেখা নেই।

## ৪০

19th Sept, [1936]

Balliol College
Oxford

শ্রীচরণকমলেষু

Basil Mathews [১] ভারতবর্ষে যাচ্চেন—আমাদের দেশের আধুনিক চিন্তার ধারা সম্বন্ধে লিখবেন। এদেশের PEN এবং এথেনিয়ম্ ক্লাবের ইনি সভ্য ; বর্ণভেদ এবং আন্তর্জাতিক সমস্যার উপর ওঁর বইখানা এদেশে সমাদৃত হয়েচে। আপনাকে একবার এদেশে দেখেছিলেন, কিন্তু আপনার মনে থাকবার কথা নয়। ভারতবর্ষে গিয়ে আপনাকে শ্রদ্ধা জানাতে চান, এবং শান্তিনিকেতনে সব ভালো ক'রে দেখতে, বুঝতে চান। ইনি বিশেষ ভালো বক্তা—আধুনিক য়ুরোপীয় সমস্যা সম্বন্ধে শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের কাছে কিছু বলতে, আলোচনা করতে রাজি হবেন মনে হয়। বিশ্বভারতীর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আধুনিক জগতের চিন্তাধারার কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে কথা কইবার সুযোগ পেলে আনন্দিত হবেন।

সম্প্রতি সেজমামা-মামীমা এসেচেন,[২] কাল এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে গেলেন। তাঁদের কাছ থেকে আপনার খবর পেয়ে কীরকম আনন্দ হল বলতে পারি না—'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয় এবং আপনার 'গদ্য-কবিতা' পাঠের বিষয়ে অনেক বললেন।

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

প্রণত
অমিয়

টীকা

১ Basil Mathews-এর (১৮৭৯-?) লেখা বই *The Clash of World Forces : a Study in Nationalism, Bolshevism and Christianity* (১৯৩১), *Consider Africa* (১৯৩৫), *India Reveals Herself* (১৯৩৭)। হয়তো এই শেষ গ্রন্থ লেখার উপাদান সংগ্রহ করতে ১৯৩৬ সালে তিনি ভারতে আসেন। কলকাতায় সেণ্ট পলস কলেজে অধ্যক্ষের আতিথ্য নিয়েছিলেন, এবং শান্তিনিকেতনে গিয়ে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। এঁর লেখা নিচের চিঠিটি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত হয়েছে।

St. Paul's College,
33, Amherst Street,
Calcutta,
November 16, 1936

Dear Mr. Tagore,

Mr. Chakravarti has written the enclosed note for me to forward to you. I greatly hope that I may have the privilege of meeting you at Santiniketan. You will hardly remember our meeting in London in your flat when you kindly gave me two unpublished poems to produce in a Magazine, which I was then editing, called " Outward Bound". I am anxious to get some real understanding of the cultures of Bengal, both in writing and the Fine Arts.

I should be glad if I could have an opportunity of meeting Mr. Nandalal Bose. I trust that it would be convenient for you if I come on the evening of Tuesday, the 17th. ( tomorrow, arriving Bolpur at 10 ). Unfortunately it looks as though on account of pressure of time I should be obliged to leave in the afternoon of the following day, the 18th. It is possible that Mrs. Milford of St. Paul's College will be coming to Santiniketan at the same time.

Sincerely Yours
Basil Mathews

Rabindranath Tagore, Esq.
Santiniketan, P.O.,
Bengal

এঁর চিঠিতে যে 'Enclosed note'-এর কথা আছে সেটিই সম্ভবত ৪০-সংখ্যক চিঠি।

২ সেজমামা-মামীমা—অধ্যাপক সোমনাথ মৈত্র ও পুষ্পময়ী দেবী। য়োহান বয়ারকে নিয়ে লণ্ডনে এঁদের গৃহে তোলা সুন্দর একটি পারিবারিক আলোকচিত্র আছে।

Oct 13 [1936]

Balliol College
Oxford

শ্রীচরণেষু

Manchester Guardian-এর কাছ থেকে চিঠি পাঠাই: শীঘ্রই তাদের কাগজের copy আপনার হাত পৌঁছবে। ওদের Editorial এবং ঐ প্রসঙ্গে পরে যে-সব চিঠি বেরোচ্চে তাতে বোঝা যায় আপনার লেখা এদেশে নাড়া দিয়েচে—এই সময়ে তার বিশেষ রকম দরকার ছিল। Aldous Huxley, Lord Allen, Gerald Heard, Irish Senator Douglas Alexander, Prof Stephens এবং অন্যান্য কয়েকজন আমরা মিলে এখানে একটা নতুন অনুষ্ঠান গড়ে তুলচি—ছোট বাড়ি কোনো নিরালা জায়গায় ; সহরে আলোচনার একটি কেন্দ্র—শুধু এইটুকু ; যাতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে আধুনিক জগতের কোনো কোনো সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবার সুযোগ হয়। Seer Green গ্রামে সেদিন আমরা একত্র হয়েছিলাম; —ঠিক তারই আগে আপনার চিঠি বেরিয়েছিল, এতে আমাদের আলোচনার খুব সুবিধে হল [১]। Johan Bojer এদেশে এসেচেন কয়েকদিনের জন্যে [২]—তাঁকেও নিয়ে গিয়েছিলাম। (Bojer-কে বলেচি বিশ্বভারতী Quarterly-র জন্যে লেখা দিতে—তিনি রাজি হয়েচেন। আপনাকে তিনি যে কীরকম শ্রদ্ধা করেন ভালোবাসেন বলা যায় না।)

য়ুরোপে অনেকদিন থেকেই যুদ্ধ ঘনিয়ে আসচে— কিন্তু এখন চারিদিকে অন্ধকার এবং ভয় অত্যন্ত আসন্ন হয়েচে, এরা যে কীভাবে বাস করচে, পথ খোঁজবার চেষ্টা করচে তা দেখে স্থির থাকা যায় না। আমাদেরই আপন আত্মীয়মানুষ—সকলে মিলে তাই চেষ্টা করতে হবে যাতে যুদ্ধের বিভীষিকা না নামে এবং তার প্রধান পথ হচ্চে এই প্রলয়ের মূলে কী আছে তা আবিষ্কার করা। য়ুরোপীয় সমস্যার সঙ্গে এশিয়া আফ্রিকায় এদের কৃত যুগব্যাপী অন্যায়ের কীরকম ঘনিষ্ঠ যোগ তা এরা এবারে কিছু বুঝতে পারচে। কোনো সমাধান হতেই পারে না সমগ্র মানবজাতিকে এক ভূমিকায় না দেখতে পারলে। আপনার রচনা তাই আমাদের পথ দেখাবে—বারে বারেই সেইখানে ফিরে আসতে হচ্চে। ('জাপানে-পারস্যে' বইখানি [৩] চমৎকার হয়েচে—এর ইংরেজি বেরোলে এরা আরো বুঝতে পারত য়ুরোপ-এশিয়ার সম্বন্ধ কোন্ দিক থেকে দেখা দরকার আজকের দিনে।)

Carl Heath এদের Quaker সম্প্রদায়ের একজন নেতা [৪]—বহুকাল Friends House-এর অধ্যক্ষ ছিলেন। এঁর স্ত্রী কবি—দুচারটে লেখা কিছু সমাদর পেয়েচে। এঁরা দুজনেই লণ্ডনে আপনার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। Carl Heath-এর চিঠি পাঠাই—আমি তাঁকে বলেচি আশ্রমে নিশ্চয়ই তাঁরা অতিথিরূপে দু-চারদিনের জন্যে যেতে পারবেন। আপনাকে তিনি লিখবেন যাওয়ার দিন ঠিক হলে।

'শ্যামলী' কী সুন্দর হয়েচে। [৫] শশধরবাবুর দোকানে আপনার ইংরেজি বই খুবই

ভালো বিক্রি হচ্চে—দোকানটি বেশ জমে উঠেচে। বাংলা বই আরো ঢের বেশি বিক্রি হোত যদি কলকাতা আফিস আরেকটু commission দিতেন—শশধরবাবু বলছিলেন অন্য সব publisher 15%-এর চেয়ে বেশি commission দিয়ে থাকে। আমি অবশ্য এ সব বিষয়ে কিছুই জানি না—শুধু কথাটা কানে এসেছিল বলে উল্লেখ করলাম।৬ আমরা সবাই উৎসুক হয়ে আছি আপনার ইংরেজি Collected Edition-এর জন্যে। আর তো দুচার দিনেই পাব।

এখনই দেশে যেতে মন চলেচে—কিন্তু আরো একটা শীত এখানে কাটিবে। আমাদের English Board-এর কাছ থেকে যে ছাড়-পত্র পেয়েচি তার কপি পাঠালাম ৭—এঁরা খুবই চমৎকার ব্যবহার করেচেন। কেবল একজন অধ্যাপকের জন্যে degree-র দিনটা পেছিয়ে গেল—একটা অংশে কিছু বদল করাতে চান। প্রাচীন অধ্যাপকেরা এখনো কবিতায় Communism-এর এতটুকু নাম শুনলেই ভয় পান—আমরা 'Communist'কেউ নই কিন্তু যেখানে তার মধ্যে মানবসত্যের প্রকাশ পাই সেখানে অস্বীকার করি কী করে? Social Conscience বাদ দিয়ে আধুনিক কবিতার বিষয়ে লেখা অনেকটা রাম-হীন রামায়ণের মতো। কী করব ঠিক জানি না—নিজের উপলব্ধির কথা তো বদলাতে পারি না—দেখি যদি দু-চার প্যারাগ্রাফ বাদ দিতে পারি কিনা। যুদ্ধ চলেচে।

এমন সময় 'শ্যামলী'র শান্তিবাণী পেলাম—কী গভীর, কত সত্য, কত মধুর এবং বীর্য্যময় এই বাণী। কোনো দেশের কোনা সাহিত্যেই তো এর তুলনা কোথাও পাই না—তা কী করব। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

প্রণত

অমিয়

এখানেও শ্রীঅরবিন্দের এক ভক্তদল (ভারতীয়) আবির্ভূত হয়েচেন—এঁদের নিয়ে মুস্কিলে পড়েচি। যতই বেশি আলোচনা করি সত্যিই মনে হচ্চে যে শ্রীঅরবিন্দের tradition মুখ্যত un-spiritual—অন্তত আমার ধরনের মানুষ যাকে প্রাণে জীবনে ধ্যানে বুদ্ধিতে spiritual—অর্থাৎ সমগ্র সত্যের উপলব্ধি ব'লে মনে করি—তার বিরুদ্ধ। রামকৃষ্ণকেও অকুণ্ঠিত ভাবে গ্রহণ করতে পারি না—যদিও তাঁর দশাগ্রস্থ (sic) 'আধ্যাত্মিক' নেশার বাহিরেও তিনি অনেক কিছু করেচেন যার কল্যাণময় ফল দেখেচি। এদেশে ঐ সম্প্রদায়ও বড়ো বেশি ভারতীয় 'Spiritual Propaganda' করচেন। অথচ আমরা যে ভারতবর্ষকে এদেশে আনতে চাই তা সম্পূর্ণ অন্যরকম। উপনিষদে তার রূপ আছ, সাহিত্যে সভ্যতায় তার একটি ধারা কখনো হারায়নি—'শ্যামলী' পড়তে পড়তে এই কথাই মনে এল।।

অমিয় চক্রবর্তীর এই চিঠির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে প্রেরিত অক্সফোর্ড থেকে পাওয়া চিঠি:

Copy

The Athenaeum,
Pall Mall, S.W. 1.
16 Aug. 1936

Oxford-University

Dear Mr. Chakravarty,

I may not see you again before you return to India, but I should like to tell you somehow—though you must already know it —that I have greatly enjoyed our association during the last two years. It has been an unusual pleasure to me to hear you talk about recent English poetry. From the first I was impressed with your gift of sensitive appreciation, but you soon came to impress me no less with the thoroughness of your knowledge. I should think that few will claim that what we call 'post-war' poetry has succeeded in being what it hoped to be, but its perplexities, and even its failures, make it a fruitful subject of study, and I am not familiar with anyone who knows it so well as you do, or has been so anxious to view it in its historical place and to relate it to the older traditions. Few of us have yet tried to see it in perspective, and most, I should say, have failed. You have not been deterred by the difficulty of your investigation, nor have you ever permitted yourself to believe that you were dealing with an isolated phenomenon. In particular I have been struck with what you have told me about the relation of this 'post-war' poetry to Hardy's *Dynasts*. But at all stages I have admired the originality of your work, and your skill in recognising connexions which are easily missed.

In all our talks I am not aware of having ever regarded myself as your senior. That has been an uncommon experience for me in my work with younger men at Oxford, and I am grateful for it. You must always have my very best wishes.

Yours very sincerely,
D. Nichol Smith.
(Chairman of the English Board, Oxford
University & Senior Professor
of English Language & Literature)

---

টীকা

১ ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানে কবির চিঠি খোঁজ করা যায়নি।
য়ুরোপে তখন মহাযুদ্ধ ঘনিয়ে আসছে, চারদিকে ভয় আর অন্ধকার। এই অস্থিরতার মধ্যে কেউ-কেউ সাম্যবাদে আস্থা খুঁজছিলেন, যেমন তিরিশের যুগের গোড়ায়, অন্তত কিছুকালের জন্যে, অডেন গোষ্ঠীর কবিরা। তাঁদের সঙ্গেও অমিয় চক্রবর্তীর যোগ ছিলো না তা নয়, তবে তিনি আরো বোধ করি ঘনিষ্ঠ ছিলেন তাঁদের সঙ্গে যাঁরা

বেছে নিয়েছিলেন আধ্যাত্মিকতার পুনর্বিবেচনার পথ। চিঠিতে উল্লিখিত এঁদের আলোচনাকেন্দ্রের স্পষ্টতই প্রধান ছিলেন অল্‌ডাস হাক্সলি (Aldous Huxley, ১৮৯৪-১৯৬৩) এবং জেরাল্ড হার্ড (Gerald Heard ১৮৮৯-১৯৭২)। হাক্সলি প্রথমে ভক্ত ছিলেন ডি. এইচ, লরেন্সের, পরে জেরাল্ড হার্ডের। ১৯৪০-এ ক্যালিফোর্নিয়ায় গিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী প্রভবানন্দর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। সেখানকার *Vedanta and the West* পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন। স্বামী নিখিলানন্দর *Gospel of Shri Ramkrishna* গ্রন্থের তিনি ভূমিকা লিখেছিলেন। জেরাল্ড হার্ডের বই *The Social Substance of Religion* ১৯৩১ সালে লেখা। তিনি এবং অল্‌ডাস দুজনেই ছিলেন যুদ্ধবিরোধী শান্তিবাদী, দুজনেই প্রথম দিকে Dick Shephard-পরিচালিত 'Peace Pledge Union'-এর হ'য়ে পুস্তিকা রচনা করেন। এই আন্দোলনের কথা অমিয় চক্রবর্তীর ১১-সংখ্যক চিঠিতে আছে। এঁদের অহিংসনীতি এবং আসন্ন যুদ্ধে অসহযোগিতার সিদ্ধান্তের কথা গান্ধীজিও জানতেন। জেরাল্ড হার্ড ও অল্‌ডাস হাক্সলি ক্রমে নিউটন-ডারুইন-ফ্রয়েড প্রভাবিত প্রতীচ্য ধার্মিকতার পথ ছেড়ে সামগ্রিক কল্যাণমুখী প্রাচ্য ধ্যানধারণার বশবর্তী হন। মহাযুদ্ধের দু'বছর আগেই ইংলণ্ড ত্যাগ ক'রে দুজনেই ক্যালিফোর্নিয়ায় চ'লে যান এবং প্রায় একই সঙ্গে দুখানি উৎকৃষ্ট বই লেখেন। হাক্সলি লেখেন *Ends and Means* (১৯৩৮), জেরাল্ড হার্ড লেখেন *The Third Morality* (১৯৩৭)। হাক্সলির বইটি কবিকে উপহার দেন মার্জরি সাইক্‌স, বইটি বিশ্বভারতী সংগ্রহে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প'ড়ে খুব খুশি হয়েছিলেন এহং চিঠি লিখে লেখককে সে কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। (৬২.৪ টীকা দ্র.)

অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে এঁদের যোগাযোগ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিলো।

Lord Allen—৩৩.২ টীকা দ্র.।

২ নরোয়ের যশস্বী ঔপন্যাসিক য়োহান বোয়ারকে (Johan Bojer, ১৮৭২-১৯৫৯) কমিউনিস্টরা বলতেন 'প্রতিক্রিয়াশীল', রক্ষণশীলরা বলতেন 'র‍্যাডিক্যাল' বা বামপ্রগতিপন্থী। অমিয় চক্রবর্তী বর্তমান লেখককে জানিয়েছিলেন : 'যোহান বোয়ারের সবল হৃদয়বান রচনা আমাকে নরোয়ের প্রান্ত থেকে যেন আহ্বান করত, কী চিত্রময়, চিত্তময় তাঁর আখ্যান ; মস্ত একটি আকাশ-পৃথিবীর পরিধি যেন তাঁর স্বভাবে মিলে গেছে। বোয়ারের সঙ্গে লণ্ডনে বিশেষ পরিচয় ঘটেছিল এবং পরিশেষে নরোয়েতে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে তাঁকে আরো ভালো চিনেছিলাম। একাধারে সহজ অথচ সূক্ষ্ম গুণময়, মনোময় শিল্পী।' 'দি গ্রেট হাঙ্গার' উপন্যাসের (ইংরেজি অনুবাদ ১৯১৯) লেখক। বোয়ারের স্বদেশেই ১৯২৭ সালে কবির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিলো।

৩ পূর্বে প্রকাশিত 'জাপান-যাত্রী' (১৯১৯) বইটি খানিক বদলিয়ে পারস্য-ভ্রমণকাহিনীর সঙ্গে একত্র ক'রে 'জাপানে-পারস্যে' গ্রন্থখানি ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়।

৪ অমিয় চক্রবর্তীর বোধ হয় জানা ছিলো না যে শান্তিবাদী Friends Service Council-এর যুগ্মসম্পাদক Carl Heath-এর সঙ্গে আগে থেকেই ভারতের

রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপ ছিলো। রবীন্দ্রভবনে কিছু চিঠিপত্র রক্ষিত আছে। এবার (অক্টোবর ১৯৩৬) Heath ভারতে আসছিলেন 'for a more free and intelligent relationship between India and Gt. Britain.'

৫ গদ্য কবিতার সংগ্রহ 'শ্যামলী' ১৯৩৬ সালেই বেরোয়।

৬ শশধর সিংহ—১৬.২ টীকা দ্র.।

৭ সাম্প্রতিক কোনো বাংলা লেখায় ইঙ্গিত আছে যে অক্সফোর্ডে অমিয় চক্রবর্তীর থিসিস একবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলো। এদেশে অবশ্য তাঁর প্রধান পরিচয় তিনি কবি। তা হলেও তাঁর গবেষণাকর্মের মৌলিকতা এবং উৎকর্ষ বিষয়ে অস্পষ্ট অথবা ভুল ধারণা না থাকলেও ক্ষতি নেই। যে-জন্যে তাঁকে এক টার্ম বেশি অপেক্ষা করতে হয় তার সঙ্গে গবেষণার মানের কোনো সম্পর্ক নেই। ৪১-সংখ্যক চিঠির সঙ্গে English Board-এর চেয়ারম্যান Nichol Smith-এর চিঠিটি দ্রষ্টব্য। হিবার্ট ট্রাস্টের সম্পাদক Drummond ('He has taken his degree at Oxford with flying colours.'), স্যর মাইকেল স্যাডলার ('[He] has now completed with brilliant success his course of graduate study in Oxford.'), নেভিল কগহিল ('I hope and believe that India will be as quick to recognise Dr. Chakravarty's distinction of mind and character as Oxford has been') এবং আরো অনেকে তাঁর এবং তাঁর কাজের সুখ্যাতি ক'রে যা লিখেছিলেন সে-সবই রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। রবীন্দ্রনাথের তা অগোচর ছিলো না। যে-অধ্যাপকের কারণে 'degree-র দিনটা পেছিয়ে' গিয়েছিলো তাঁর নাম Abercrombie। (পরবর্তী ৪৮-সংখ্যক চিঠি দ্র.)।

থিসিস অবলম্বনে অমিয় চক্রবর্তীর লেখা এই বইয়ের *Visva-Bharati Quarterly*-তে (vol.4, 1940) আলোচনা প্রসঙ্গে মার্জরি সাইক্‌স লিখেছিলেন: 'We are indebted to Dr. Chakravarty for an Original and convincingly presented study of the 'first of the moderns' which, one hopes, will lead its readers to a renewed and enlightened study of Thomas Hardy's achievement.'

## ৪২

Nov. 10 [1936] Balliol College

শ্রীচরণকমলেষু

'সাহিত্যের পথে' পেয়ে অবধি কীরকম আনন্দে আছি বলতে পারি না, বিদেশের জীবন হঠাৎ আলো হয়ে উঠল।[১]

আমাদের দায়িত্ব বাড়ল ; আপনার সাহিত্য বিচার সম্বন্ধে প্রবন্ধ এবং আলোচনা হতে একখানি ইংরেজি বই করতেই হবে—তারই সঙ্গে বিদেশী পাঠকের জন্যে খুব কম কথায় আপনার গদ্যসাহিত্য এবং সমালোচনার কিছু পরিচয় ভূমিকারূপে দেওয়া দরকার। এদেশে ঐ দিকটার বিষয়ে লোকে কম জানে।

গোড়ার রচনায় কয়েক ছত্রে আপনি যেমন ক'রে সাহিত্যের মূল কথা ধরিয়ে দিয়েচেন, তাতে বইখানি বোঝবার পক্ষে বিশেষ সুবিধে হল : তা ছাড়া সাহিত্যসৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আপনার প্রথম দিকের এবং আধুনিক লেখার মধ্যে বাহিরের সংস্কার যেটুকু বৈষম্য আমাদের মনে প্রশ্ন জাগাতো সেটা ঘুচল।[২] 'সুন্দর' কথাটা লোকে ঠিকভাবে ব্যবহার করে না ব'লেই আপনার মনোভাব সম্পূর্ণ ধরতে পারেনি: আশা করচি এবারে আপনার রচনা পড়ে মহা-আধুনিকেরাও চোখ খুলে দেখবেন।

'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রে'র সঙ্গে পরে-লেখা দুই পর্য্যায়ের য়ুরোপযাত্রীর চিঠি একই বইয়ে বেরোলে বোধ হয় ভালো হ'ত—এখনো তো মাসিকপত্রের পাতায় আবদ্ধ রয়েচে, বই হয়ে বেরোয়নি।[৩] ( কাঁচি-কাটা সংগ্রহ উত্তরায়ণ আপিসে রয়েচে )। বোধ হয় শীঘ্রই বই হয়ে বেরোবে—কিন্তু এই সংগ্রহে যোগ হলেও হয়ত ক্ষতি হত না। অনেক সময় মনে হয় এদেশের 'সমগ্র খণ্ড'-বইয়ের আকারে আপনার বিদেশেযাত্রার রচনাবলী 'ভ্রমণ' বা এমনি কোনো নাম নিয়ে বেরোলে পাঠকের সুবিধা হত।

Collected Edition সকলেরই ভালো লাগচে, চারিদিকে সমাদর পাচ্চে। Blunden-কে সমালোচনা করতে দিয়েচি—এখানে Sadler ও Binyonকে দেওয়ার জন্যে Macmillanকে বলতে চাই।[৪] এঁরা আপনার অকৃত্রিম বন্ধু। অনিলবাবুর কাছ থেকে তালিকা পেলে অন্য কয়েকজন যাঁদের হাতে বই দিতে চান পাঠানো হবে। Continent-এও দু-চারজন—( যেমন Winternitz, Sten Konow ) ওঁদের স্বদেশী কাগজে লেখেন তো পাঠকেরা আবার নতুন ক'রে এই সংগ্রহকে দেখতে পারবে।[৫]

এর পরে Collected Essays বেরোনো দরকার—অথবা প্রথমে Collected Stories। দুটোরই সংগ্রহ-কাজ এগিয়ে আছে।[৬] আজ সহরের বাহিরে এসেচি লেখার কাজে—এখানে বসে Oxford-কে একটু দূর থেকে দেখা যায় যেমন দেখা যায় তার শত-চূড়া বাহিরের রূপকে আকাশের কোণায়।

*Enigmas of Nature* আপনাকে পাঠালাম—'Nature' ব'লে যাকে বুদ্ধি দিয়ে দেখতে চাই তার রহস্যের তল নেই—এবং রহস্যের অনেকখানিই দর্শকের মনে। মানুষ যা মনে করচে দেখচে, বুঝচে তার কতখানি জীবজগতে সত্য? বিশেষ করে আনন্দ বেদনার ক্ষেত্রে? তবু এর আশ্চর্য্য মূল্য আছে। আমাদের দেশে প্রাণ সম্বন্ধে আগ্রহ চৈতন্যের জ্যোতিতে প্রকাশ পেয়েচে পারমার্থিক কাব্যে উপনিষদে। কিন্তু প্রাণের বিশ্বগত অশেষ বৈচিত্র (Sic) সম্বন্ধে কেন সেরকম সাহিত্য নেই। নিশ্চয়ই ছিল, হারিয়েচে। চীনদেশে তো আছে। রাধাকৃষ্ণন[৭] পারমার্থিক তর্কে ব্যুৎপন্ন—কিন্তু তাঁর কাছে এসব তর্কের বিষয় ; যখন যে-মত তুলে নেন তার স্বপক্ষে যুক্তির আশ্চর্য্য নৈপুণ্য উজ্জ্বলতা দেখাতে পারেন। এতে ক্ষতি হয়। ভারতবর্ষের আদর্শের সঙ্গে পাশ্চাত্য কর্ম্মচেষ্টার তুলনা করে হার-জিতের চেষ্টা করা ভারতবর্ষের দিক দিয়ে সত্য-সাধনার পরিচয় নয়। তাঁর Inaugural পাঠিয়েছি। য়ুরোপের যথার্থ Mysitc সাহিত্যসাধনাকে উনি বাদ দেন। আজকের দিনে সবাই জানতে চায় সত্যকে কর্ম্মে রূপ দেবার চেষ্টা মানুষ কোথায় কী

ভাবে করেচে—যাতে আমাদের সামনের পথে আলো পড়ে। অল্প একটু অশোক বা আকবরের নাম দু-চারজন করেন তাও অতি অস্পষ্ট ভাবে। এই কাজ কবে আমরা করব।

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

প্রণত

অমিয়

---

**টীকা**

১ 'সাহিত্য' (১৯০৭) গ্রন্থের প্রায় তিরিশ বছর পরে প্রকাশিত সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনার নতুন বই 'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬) রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীকে উৎসর্গ করেন। অক্সফোর্ডে গবেষণার কাজ সাঙ্গ হ'লে এই উপহার পাঠিয়ে কবি তাঁকে সাহিত্যের পথে নতুন ক'রে আহ্বান করলেন বললে হয়তো ভুল হয় না। আধুনিক দু'জন বাঙালি কবিকে তিনি গ্রন্থ উৎসর্গ করেছিলেন। অমিয় চক্রবর্তীকে 'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬), সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে 'আকাশপ্রদীপ' (১৯৩৯)।—কেন একজনকে প্রবন্ধ, আর একজনকে কবিতা, তার কি কোনো কারণ ছিলো? রবীন্দ্রনাথ তখনো অবশ্য জানতেন না যে অক্সফোর্ড-কবিদের সংস্পর্শে থেকে আগেকার ধরনে গান এবং কবিতার লেখক অমিয় চক্রবর্তীর মধ্যে ইতিমধ্যে এক বাঙ্ময়-বিপ্লব ঘ'টে গেছে। অক্সফোর্ড থেকে তিনি শুধু পাণ্ডিত্যের ডিগ্রি নিয়ে ফিরছেন না, অচেনা এক বিস্ময়কর কবি হ'য়ে ফিরছেন।

২ 'সাহিত্যের পথে'-র 'গোড়ার রচনা'-টি আসলে অমিয় চক্রবর্তীকে উদ্দেশ্য ক'রে চিঠির আকারে লেখা আশ্চর্য একটি ভূমিকা। সাহিত্য সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে পূর্বেকার 'সাহিত্য' গ্রন্থের সঙ্গে পরেকার 'সাহিত্যের পথে'-র বৈষম্য বোধ করি ঘুচলো না।

৩ হয়তো 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে'র পরে লেখা 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' এবং 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি'র কথা বলছেন। এই তিনটি ছাড়াও ভ্রমণ কাহিনীর মধ্যে রয়েছে 'জাপান-যাত্রী', 'যাত্রী', 'জাভা-যাত্রীর পত্র', 'রাশিয়ার চিঠি', 'জাপানে পারস্যে', 'পথে ও পথের প্রান্তে', 'পথের সঞ্চয়', ও 'পারস্যযাত্রী'। 'সমগ্র খণ্ড' আকারে এসব রচনা আজ পর্যন্ত প্রকাশ হয়নি। পূর্বে ১৬-সংখ্যক চিঠিতেও অনুরূপ প্রস্তাব ছিলো।

৪ (Edmund) Blunden—২৭.৫ টীকা দ্র.।

(Michael) Sadler—১০.৩ টীকা দ্র.।

দূর প্রাচ্যের শিল্পে বিশেষ আগ্রহী (Laurence) Binyon (১৮৬৯-১৯৪৩) ছিলেন কবি, নাট্যকার এবং শিল্পআলোচক। ১৯১৩ থেকে একাদিক্রমে কুড়ি বছর ব্রিটিশ মিউজিয়ামে তিনি Oriental Paintings and Prints বিভাগের প্রধান ছিলেন। দান্তের *Divine Comedy*-র ইনি এক অনুবাদক।

৫ ভিন্টারনিৎস-এর (Winternitz, মৃত্যু ১৯৩৭) তুল্য সংস্কৃতজ্ঞ এবং ভারতীয় সভ্যতার মর্মদর্শী বিদেশী কোনো জ্ঞানী কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ। তাঁকে রবীন্দ্রনাথ প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করতেন। শান্তিনিকেতনে বিধুশেখর শাস্ত্রীর সঙ্গে একত্রে তিনি

মহাভারতের বিবিধ পাঠ সংকলন ও সম্পাদনার কাজ শুরু করেন। পরে পুণা সংস্করণ মহাভারত নামে বহু খণ্ডে কাজটি অন্যদের দ্বারা সম্পন্ন হয়। এঁর বিষয়ে বর্তমান লেখককে অমিয় চক্রবর্তী লিখেছিলেন: "তিনি শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা শেষ ক'রে (১৯২২) যখন তাঁর পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয় ও শহরে (Prague-এ) ফিরে গেলেন তখন সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি। আশ্চর্য নম্র, উজ্জ্বল মনস্বী; অনেকটা যেন বৈদিক ঋষি পণ্ডিতের সংজ্ঞা মনে পড়ত। তাঁর চার ভল্যুম ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস বৈদিক যুগ থেকে শুরু ক'রে রবীন্দ্রনাথে শেষ হয়েছিল—রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর দার্শনিক বিবৃতি একটি প্রগাঢ় সম্পদ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সে বইয়ের মাত্র দুইখণ্ড ইংরেজি তর্জমায় মুদ্রিত করেন—সবটাই অনূদিত হওয়া দরকার।"

নরোয়ের ক্রিশ্চিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন লিপিবিশারদ স্টেন কোনো ( Sten Konow, ১৮৬৪-?) ১৯২৪ সালে কয়েক মাস বিশ্বভারতীর অতিথি-অধ্যাপক ছিলেন। সেখানে ভারতীয় পরিচ্ছদ ব্যবহার করতেন। তাঁর আশ্রমিক নাম হয়েছিলো 'শৈল কণ্ব', রবীন্দ্রনাথ সেই নামে নাকি ডাকতেন।

৬ *Collected Poems and Plays* ছাড়া গল্প বা প্রবন্ধের অনুবাদ নিয়ে কোনো সমগ্র খণ্ড বেরোয়নি।

৭ অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের কার্যকাল শেষ হ'লে, ১৯৩৬ সালে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান অক্সফোর্ডে দর্শন শাস্ত্রের Spalding Professor হন। পদ গ্রহণ ক'রে প্রথম যে আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা করেন সেই বক্তৃতার ছাপানো পুস্তিকা, Inaugural, রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন অমিয় চক্রবর্তী। রক্ষিত হয়নি।

## ৪৩

17/11/36 Oxford

শ্রীচরণকমলেষু

তরুণ কবি Stephen Spender-এর সঙ্গে কথা হচ্ছিল;[১] তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আধুনিক free verse-এর যুগে Yeats-এর মতো আপনি আবার নূতন করে poetry of wit লিখচেন কিনা। এদের অনেক experimentation-এর পরে এই সংহত, মিলান্ত, ছোট কবিতার দরকার এরা অনুভব করচে। আমার মনে হল বাংলা কাব্যেও দরকার epigrammatic style-এ লেখা অথচ ভাবের ঘনীভূত মাধুর্য্যে ভরা কবিতা সৃষ্টি করা। আপনিই পথ দেখাতে পারবেন।[২] Housman-এর কবিতা আমার ভালো লাগে না—এখানেও তার সমাদর নেই—কিন্তু তাঁর নূতন ( posthumous ) কবিতার বই সবাইকে ভাবিয়েচে।[৩] আমি বললাম আপনি গানে এই কবিতা দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন, কিন্তু গানের কবিতায় ঠিক poetry of wit-এর স্থান নেই। সাত আট

দশ লাইনের "intellectual কবিতা" (এই বর্ণনার কোনো মানে নেই জানি, তবু epigrammatic, deliberate, poetry of wit-এর কথা বলতে চাচ্ছিলেন Spender) —আপনি যদি আমাদের দেন। Yeats-এর anthology খুব সাড়া তুলেচে—বালাঙ্‌কুরা আপনাকে বইখানা পাঠাচ্চে তাই আমি আর পাঠালাম না।[৪]

প্রণত

অমিয়

Edward Thompson তো ভারতবর্ষে—তাঁকে আশ্রমে একবার আপনি ডাকেন তো ভালো হয়।।[৫]

---

**টীকা**

১ Stephen Spender—২৭.৫ টীকা দ্র.।

২ গদ্য কবিতা নয়, 'সংহত, মিলান্ত ছোট কবিতা'-র জন্যে এই দাবি ব্যর্থ হয়নি। শেষের দিকে লেখা রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাই 'ভাবের ঘনীভূত মাধুর্যে-ভরা' মননধর্মী কবিতা। ভাষায়, ভঙ্গিতে, গড়নের বৈশিষ্ট্যে এ-সব কবিতার সঙ্গে পূর্বেকার কবিতার আকারে প্রকারে প্রায় কোনো মিল নেই, যেমন "প্রজাপতি" বা "রাতের গাড়ি"। বিশেষত 'নবজাতক' (১৯৪০) থেকেই এই বদল লক্ষ করা যায়। 'নবজাতক' গ্রন্থের আলোচনা করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন : এসব কবিতার দুটি বিশেষত্ব —এক, এরা স্বল্পভাষী, মননপ্রধান, 'গভীর অভিনিবেশের সহিত বহুবার আত্মপ্রয়োগ করলে তবে পাঠক পারবেন এর সুরের সঙ্গে সুর মেলাতে।' দুই, 'কবিতাগুলি সবই বিশ শতকের যন্ত্রসভ্যতাপীড়িত মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে লেখা।' তবে এসব রচনাতেও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রতি কবির অরুচির কথা তিনি না ব'লে পারেননি: 'রেডিওর প্রতি কবির যে-অনুকম্পা, বিজ্ঞানের অন্যান্য কীর্তির প্রতি তা অনুপস্থিত। ... মানুষ যে পাতালে নেমেছে কি আকাশে উড়েছে তা থেকে জগৎবাসীর কত বড়ো ও কত বিচিত্র সুখের উদ্ভব হয়েছে ও আরো কত হ'তে পারে সে-কথাটা উপেক্ষা ক'রে কবি তার হত্যাকারী দিকটাই শুধু দেখেছেন।' ('কবিতা', আষাঢ় ১৩৪৭)।

৩ য়ুরোপীয় ধ্রুপদী সাহিত্যে সুপণ্ডিত (A. E.) Housman (১৮৫৯-১৯৩৬) ছিলেন উৎকৃষ্ট ইংরেজ 'মাইনর' বা ছোটো মাপের কবি।

৪ ইয়েট্‌স -সম্পাদিত Oxford Book of Modern Verse, 1892-1935 বেরোয় ১৯৩৬ সালের নবেম্বর মাসে, এবং এক মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বার ছাপতে হয়, পরবর্তী কুড়ি বছরে আরো আটবার, তারপরেও নিশ্চয়ই আরো বহুবার। তিন ভারতীয় কবির রচনা আছে এ-বইটিতে: মনোমোহন ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ আর শ্রীপুরোহিত স্বামী। রবীন্দ্রনাথের সমসংখ্যক কবিতা আছে আর মাত্র তিনজনের —Hopkins, Æ. আর T. S. Eliot-এর। Auden, Spender, Louis Macniece-এর

কবিতার সংখ্যা ৪টি ক'রে। সব চাইতে বেশি কবিতা সম্পাদকের নিজের, চোদ্দটি। যুদ্ধের আরোপিত যন্ত্রণা কবিতার সঙ্গত বিষয় হ'তে পারে না বিবেচনা ক'রে Wilfred Owenকে সরাসরি বাদ দিয়েছেন সম্পাদক, তা নিয়ে হৈ চৈ হ'লেও বিচলিত হননি। সম্পাদক যদি হন ইয়েট্স-এর মতো প্রখর ব্যক্তিত্বশালী কোনো কবি, তাহলে তাঁর কাব্যরুচি অনেকের কাছে বাতিকগ্রস্ত মনে হ'লেও তার সপক্ষে-বিপক্ষে তর্ক তুলে কাব্যপাঠকেরই বরং বোধশক্তি বৃদ্ধি পায়, এই সংকলন গ্রন্থই তার প্রমাণ।

বালাঙ্কুরা কে ছিলেন জানা যায়নি। অক্সফোর্ড থেকে তাঁরই পাঠানো কপিটি বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে আছে।

৫ Edward Thompson—১১.১০ টীকা দ্র.

অমিয় চক্রবর্তীর চিঠি পাবার পূর্বেই ১৮ অক্টোবর তারিখে রবীন্দ্রনাথ টমসনকে শান্তিনিকেতনে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। এবার ভারতবর্ষে এসে টমসন নানা জায়গায় ঘুরেছেন, কলকাতাতেও এসেছিলেন, কিন্তু কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি। কেন করেননি তার একটা কারণ অনুমান করা যায়। নতুন ভারতশাসন আইন প্রসঙ্গে একটি খসড়া বিবৃতি তৈরি ক'রে ঐ ১৬ অক্টোবর তারিখেই তিনি রবীন্দ্রনাথকে তার কপি পাঠান, এবং অনুরোধ করেন যেন বিশিষ্ট কয়েকটি ভারতীয়ের সঙ্গে একত্রে তিনিও ঐ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন। অথচ এবিষয়ে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা সুদীর্ঘ পত্রের ('চিঠিপত্র' ১১শ, ৮৯) সারাংশ ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকায় আগেই ছাপা হ'য়ে গেছে। সে-বিষয়ে স্বতন্ত্র কোনো বক্তব্য সমর্থন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। টমসনকে তাই ২৪শে অক্টোবর কবি জানিয়েছিলেন : 'There are sentiments in the manifesto which are not mine...I do not want tobe identified with any political groupings.' উত্তর পেয়ে টমসন চ'টে গিয়ে থাকবেন, কেননা এর পরে শান্তিনিকেতনে যাওয়ার সংকল্প তিনি ত্যাগ করেন। উভয়ের সম্পর্কেরও বোধ করি সেখানেই ইতি হয়। রবীন্দ্রভবনে এসব চিঠিপত্র রক্ষিত আছে।

## ৪৪

ডিসেম্বর ৩১, ১৯৩৬

Newbattle Abbey
Dalkeith
Scotland

শ্রীচরণকমলেষু

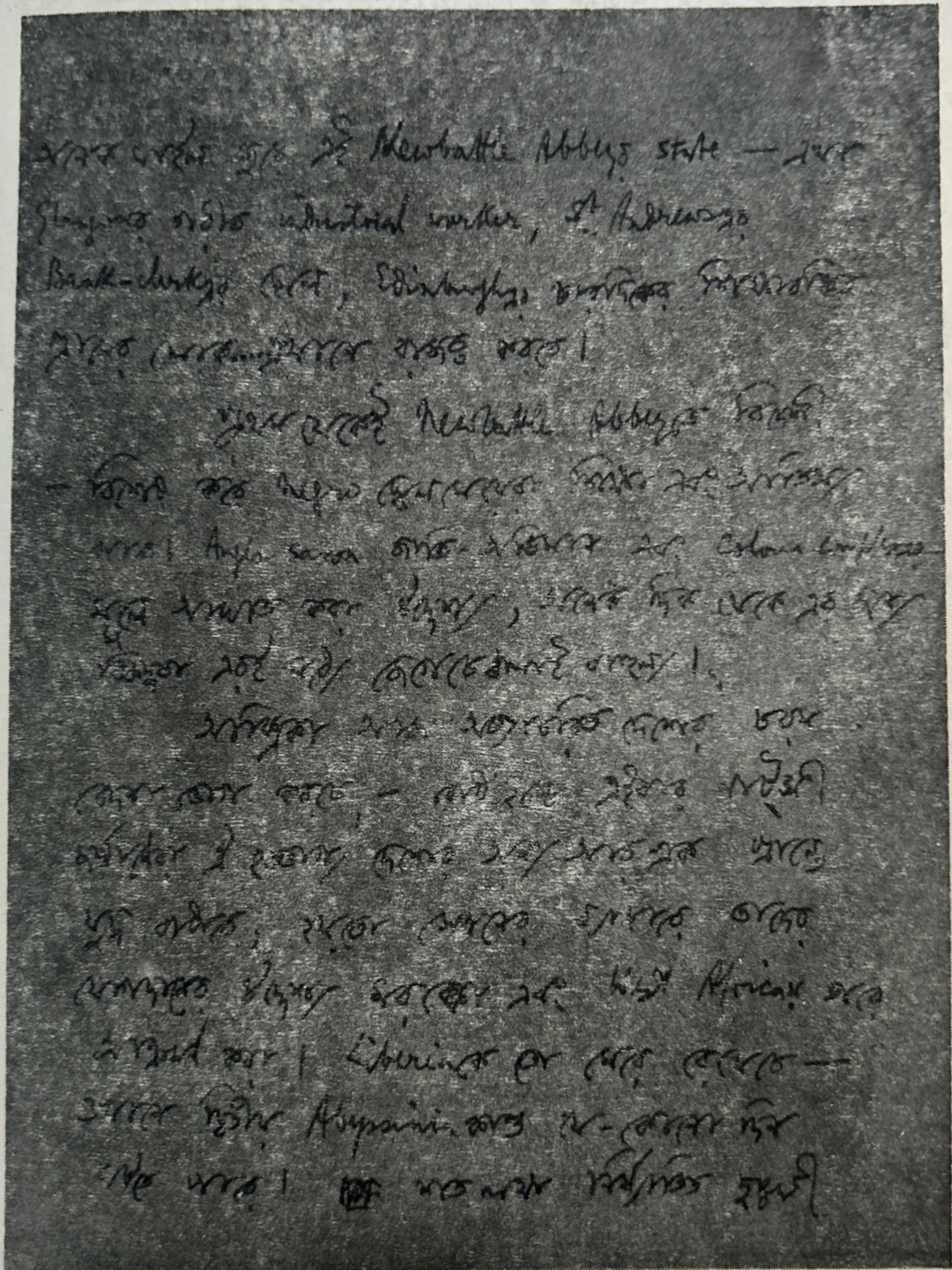
স্কটল্যাণ্ডে নতুন শিক্ষাসমবায়কেন্দ্র দেখতে গিয়েছিলাম। Fraser এবং Lothian নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে অনেক বিষয়ে কথা হোলো। Dartington Hall প্রভৃতি শিক্ষাকেন্দ্রে যে-সব আকস্মিকতা এবং ব্যক্তিগত ধনের অবাধ অপচয় ঘটচে এখানে তা হবার সম্ভাবনা নেই ; ওঁরা চান আশ্রমের মতো অনুষ্ঠানের আদর্শ সামনে রেখে দরিদ্র জনসাধারণের জন্যে শিক্ষা বিতরণ করতে— Lothian-এর নিজের এ-বিষয়ে অন্যের

চেয়ে কিছুমাত্র বেশি অধিকার থাকবে না। Warden হয়েচেন Fraser—যিনি Achimota-য় আফ্রিকাবাসীদের জন্যে আশ্চর্য্য বিদ্যায়তন গ'ড়ে তুলেচেন।[১] যেমন সুন্দর এই প্রাচীন যুগের সৌধ, তেমনি রমণীয় এখানকার পরিবেষ্টন—অনেক মাইল জুড়ে এই Newbattle Abbey-র State— এখন Glasgow-র গরীব industrial worker, St. Andrews-এর bank-clerk-এর ছেলে, Edinburgh-এর চারদিকের শিক্ষাবঞ্চিত গ্রামের লোক—এখানে রাজত্ব করবে।

প্রথম থেকেই Newbattle Abbey-তে বিদেশী—বিশেষ ক'রে negro—ছেলেমেয়েরা শিক্ষা এবং আতিথ্য পাবে। Anglo-Saxon জাতি-অভিমান এবং colour complex-এর মূলে আঘাত করা উদ্দেশ্য, অনেক দিক থেকে এর জন্যে বিরুদ্ধতা এরই মধ্যে জেগেচে বলাই বাহুল্য।

আফ্রিকা আজ অত্যাচারিত দেশের চরম বেদনা ভোগ করচে, —বোধ হচ্চে এইবার নাট্‌সী জর্ম্মাণেরা ঐ হতভাগ্য দেশের অন্য আর-এক প্রান্তে যুদ্ধ বাধাবে, হয়তো স্পেনের ব্যাপারে তাদের যোগদানের উদ্দেশ্য মরক্‌কো এবং West Africa-য় পরে আক্রমণ করা। Liberia-কে তো মেরে রেখেচে—ওখানে দ্বিতীয় Abyssinia কাণ্ড যে-কোনো দিন ঘটতে পারে। শত লক্ষ নির্যাতিত দুঃখী আফ্রিকাবাসী আজ য়ুরোপীয় রাষ্ট্রের সম্মিলিত চক্রান্ত এবং সাংঘাতিক যন্ত্রের আঘাতে জর্জ্জরিত।

অথচ আফ্রিকা তো বর্ব্বরতার আশ্রয় নয়—ওখানেও মানবদেবতা আদিম যুগ থেকে আত্মপ্রকাশিত। য়ুরোপের সব চেয়ে বড়ো কলঙ্কের যুগ—ভিক্টোরীয় যুগ—পৃথিবী জুড়ে অতি ভয়ানক Imperialism-এর দখল পাকা করেছিল; সেই Nineteenth Century-র ধার্ম্মিকেরা কাব্য এবং বিজ্ঞানের সহযোগে প্রমাণ করতে ব্যস্ত ছিলেন যে আফ্রিকাবাসী কেবলমাত্র জন্তুশ্রেণীর জীব; এবং আজ পর্য্যন্ত পুরোনো আমলের বৃদ্ধ anthropologistগুলিকে দূর ক'রে নবীন সত্যপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের আফ্রিকায় পাঠিয়ে তথ্য আবিষ্কার করানো কঠিন ব্যাপার। কিন্তু আজকের দিনে যেমন একদিকে military cast প্রলয়ের সাধনায় মত্ত, তেম্‌নি অন্য দিকে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানতপস্বী করুণাশীল লক্ষ লক্ষ পুরুষ মেয়ে য়ুরোপ জুড়ে জেগে উঠ্‌চে—এদেরই হবে জয়, যদিবা যুদ্ধে এদেরই রাষ্ট্র এদের টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে মারতে চেয়েচে, এবং আরো মারবে। নূতন য়ুরোপের anthropologist, কর্ম্মী, কবি, চিত্রী আজ দেশে-বাহিরে শত শত্রুর জাল ভেদ ক'রে এগিয়ে চলেচে—বিশেষ করে British Imperialism এবং য়ুরোপের অন্য দেশের Imperialism সমস্ত Nineteenth Century জুড়ে সব চেয়ে বেশি late 'nineties-এ—যে-পাপের ভিত্তি দেশে পাকা করেছিল আজ তারই অনিবার্য্য ফল দেখা যাচ্চে Colonial readjustment-এর জন্যে নূতন যুদ্ধে, Imperialism-এর নানা দলের সংঘাতে। কিন্তু এ না হয়ে এখন উপায় নেই—আশার কথা এই যে মিথ্যা সাধুতার policy ভাঙ্‌চে, বিশুদ্ধ সত্যের অভিযানে বেরিয়েচে বহুলোক। Newbattle Abbey-ও যাতে এদেরই কেন্দ্র হয় তাই প্রতিষ্ঠাতাদের উদ্দেশ্য। পৃথিবী জুড়ে আত্ম-



রবীন্দ্রনাথকে লিখিত অমিয় চক্রবর্তীর পত্রাংশ
৩১ ডিসেম্বর ১৯৩৬

এবং পররাষ্ট্রনিপীড়িত জনসাধারণের মুক্তির সাধনা এখনকার নূতন বিদ্যাকেন্দ্রগুলির সর্ব্বপ্রধান সাধনার অঙ্গ ব'লে মেনে নিচ্চে এ দেখে মনে ভারি উৎসাহ বোধ হয়– রাশিয়ায় তো কথাই নেই –এমন কি Fascist দেশেও নূতন যুগের চেষ্টা আর বেশি দিন চাপা দিতে পারবে না। কিন্তু বাণী আসচে ভারতবর্ষ থেকে, আফ্রিকা থেকে—এদেরও শ্রেষ্ঠ চেষ্টা আজ প্রেরণার জন্যে মুখ ফিরিয়েচে য়ুরোপের বাহিরে। কোনো বড়োরকমের উৎকর্ষের সমবায় আজ কেবলমাত্র য়ুরোপীয় আত্মচর্চ্চা ক'রে তৃপ্তি পাচ্চে না।

কত বড়ো বাণী এসে পৌঁছচ্চে আফ্রিকার ব্যথিত অন্ধকার চিত্ত হতে ;—সেখানে যে-আগুন যুগ যুগ ধ'রে জ্বলেচে তার দীপ্তি এতদিনে আমরা কত ভাবে দেখতে শিখচি। আফ্রিকার আর্ট, এবং বিশেষভাবে তাদের সমাজগঠনের প্রণালী, তাদের tribal ethics আজ আমাদের বিস্মিত করচে। কত ঐশ্বর্য্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক এবং শিল্পীর সহযোগিতায় আজ আফ্রিকা হতে সমাগত। এর মধ্যে ওদের একটি সব চেয়ে বড়ো Idea—ওদের সমাজগঠন এবং ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগের মূলে কাজ করচে—সেদিন মনকে গভীর নাড়া দিল। সেই বিষয়ে সামান্য একটু উদ্ধৃত করি এই বছরের "Africa & Peace" নামে Burge Memorial Lecture থেকে। Fraser-এর সমগ্র বক্তৃতা আলাদা পাঠাচ্চি।

"The Great Tribe", "The Tribe Eternal"-এর এই আদর্শ আফ্রিকার মগ্নচেতনায় কত যুগ ধ'রে রয়েচে ; তার কর্ম্মে কতভাবে প্রকাশ পেয়েচে।

> "The other idea is connected with the future life. No member of the tribe dies but he passes into the broader room of the Tribe Eternal. The present tribe which we see is but the connecting link between the great reality of the Tribe Eternal and the Tribe Which Is Yet To Be. This again affects ethics. To steal from a man a thing that he himself has bought, say his watch or his knife, is a matter of small importance— if he has bought a good watch he ought to be able to defend it— but to steal from him say his crops, or to encroach on his land, these things which have come down in his heritage from the Tribe Eternal, that is heinous crime ; it is sacrilege. And when we take the land of the African, we take from him that which is sacred, that which it is duty to guard and to prize above all else, that which he must pass on unimpaired to the Tribe Yet To Be, and we are depriving him of his hope of a glad welcome into the Tribe Eternal, for he has failed to guard that which was committed unto him in trust..."

আমার কেবলি মনে হচ্ছিল আফ্রিকার এই Tribe Eternal নিয়ে আপনি যদি একটি কবিতা লেখেন। আফ্রিকার সম্পর্কে আপনার কোনো কবিতা নেই—এইরকম কবিতা পেলে কীরকম আনন্দ হবে বলতে পারি না। পরে ইংরাজি হ'য়ে বেরোতে পারে Quarterly- তে।[২]

Tribe Eternal-এর বিষয়ে আপনার একটি কবিতা পাবার আশায় একান্ত উৎসুক হয়ে রইলাম।

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

প্রণত
অমিয়

এইমাত্র এণ্ড্রুজের সঙ্গে দেখা হল।—তিনি (জর্ম্মানিতে দুদিন কাটিয়ে) Marseilles থেকে এই এলেন। তাঁর কাছ থেকে আপনার এবং আশ্রমের কত খবর পেয়ে কীরকম বোধ হচ্চে বলতে পারি না।।

---

**টীকা**

১ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস অনুবাদ ও বিদেশে তাঁর গ্রন্থাদি প্রকাশ, আসন্ন যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তি আন্দোলন, য়ুরোপের ভবিষ্যৎ, আবিসিনিয়ার পরাভব, বিশ্বে নারীজাগরণ, ইংরেজি আধুনিক কাব্য ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর চিঠিতে নতুন একটি প্রসঙ্গ যোগ হ'লো : আফ্রিকায় এবং অন্যত্র আধুনিক অভিনব প্রণালীতে শিক্ষাবিস্তারের আভিযান, যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-আদর্শের অমিল ছিলো না।

ইংলণ্ডে এই নতুন প্রণালীর শিক্ষা আন্দোলনের অগ্রণী ছিলেন ( Alexander Garden ) Fraser (১৮৭৩—?)। স্কটল্যাণ্ডে Newbattle Abbey বিদ্যালয়ের ভার নেবার পূর্বে তিনি আফ্রিকায় Ghana-র রাজধানী Accra-র সন্নিকটে Achimota-য় Prince of Wales College-এর Principal ছিলেন। Gold Coast-এর প্রাক্তন গবর্নর Sir Gordon Guggisburg-এর সঙ্গে যুগ্মভাবে *The Future of the Negro* (১৯২৯) নামে তখন একটি বই লেখেন। ১৯৩৬ সালে বেরোয় তাঁর অন্য বই *Africa and Peace*।

রবীন্দ্রনাথকে আফ্রিকার সমস্যা বিষয়ে উৎসাহিত করার ব্যাপারে অমিয় চক্রবর্তীর উদ্যমের কথা আর একটু বিস্তারিতভাবে 'ভূমিকা'য় আলোচিত হয়েছে। (Lord) Lothian (১৮৮২-১৯৪০) কিছুদিন ছিলেন ভারত সাম্রাজ্যের দায়িত্বে ইংলণ্ডে পার্লামেণ্টারি আণ্ডার সেক্রেটারি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে মার্কিন দেশে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রদূত হন। ১৯৩৭-এর ডিসেম্বর মাসে, এই চিঠির এক বছর পরে, কলকাতায় এসেছিলেন New Education Fellowship-এর সম্মেলনে যোগ দিতে। শান্তিনিকেতনে গিয়ে তখন কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন।

২ Tribe Eternal প্রসঙ্গ মনে রেখে আফ্রিকার উপর কবিতা রচনার এই অনুরোধ কবি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করেছিলেন, একটু ভিন্নভাবে।

Balliol College
Oxford

Jan 27 [1937]

শ্রীচরণকমলেষু

একান্ত আশা ক'রে রয়েচি 'External Tribe' সম্বন্ধে আপনি একটি কবিতা লিখবেন। বিশেষভাবে আমরা এই কবিতা আপনার কাছ থেকে চাচ্চি—কীরকম উৎসুক হয়ে আছি কিছু বলতে পারি না।[১]

Ossietsky-র বিষয়ে খুবই ভাবনার কারণ হয়েচে—জর্মাণেরা তাঁকে ছাড়চে না।[২] Murray এ বিষয়ে আপনাকে লিখবেন।[৩]

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন ।

অমিয়

---

টীকা

১ কবিতার জন্যে এই দ্বিতীয় আবেদন পৌঁছবার পূর্বেই কবি ৮ ফেব্রুয়ারি "আফ্রিকা" নামে গদ্য কবিতাটি লিখে ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পরে সেটি 'পত্রপুটে' যায়। সঙ্গের চিঠিতে লেখেন: 'বাংলাভাষার কুলুপমারা এই কবিতা নিয়ে ওদের কী কাজে লাগবে?' ('চিঠিপত্র' ১১শ, ৯০)। ফ্রেজার কিন্তু অনুবাদে কবিতাটি প'ড়ে কবিকে লিখেছিলেন (১৭ এপ্রিল ১৯৩৭) 'I am grateful and glad that you have written for them. The days will soon come when they will repay your generosity in a great gratitude,'। কবিতাটি ঠিক Eternal Tribe বিষয়ে নয়, কিন্তু এতে নির্জিত আফ্রিকার প্রতি যে বেদনা আছে তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয়নি। নবেম্বর ১৯৩৯-এ বুদ্ধদেব বসুর 'ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা' কবিতাটি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

২ হিটলারের জর্মানিতে শান্তি আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি (Carl V.) Ossietsky (১৮৮৯-১৯৩৭/৮) ছিলেন সে দেশের 'Friedens-gesellschaft' বা শান্তিসমিতির সেক্রেটারি, এবং *Wiltlühne* নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক। অসীম সাহসের সঙ্গে নাট্‌শি জর্মানিতে তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতির বিরোধিতা করেছেন, এবং এজন্যে একাধিকবার জেলে নির্যাতিত হয়েছেন। ১৯৩৩ সালে আবার বন্দী ক'রে তাঁকে Sonnenburg-এর কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে রাখা হয়। লণ্ডনের উদারপন্থী পত্রিকা ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান ১৯৩৪-এর ৩ অগস্ট তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তার উল্লেখ ক'রে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ন্যু ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরিতে রক্ষিত, অপ্রকাশিত ৫৬ পৃষ্ঠার একটি পাণ্ডুলিপি থেকে দেখা যায়, ১৯৩৫ সালে ওসিট্‌স্কিকে শান্তির জন্যে নোবেল পুরস্কার দেবার সুপারিশ করেছিলেন টোমাস্ মান্, হাইনরিশ মান, রোম্যাঁ রলাঁ, আপটন সিনক্লেয়ার প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। দলিলটি তৈরি করেছিলেন 'Circle of Carl V. Ossietsky's friends'-রা। এ-দলিলে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর নেই বটে, কিন্তু অমিয় চক্রবর্তীর চিঠির ভাষা থেকে মনে হয়, তাঁকে কারাগার

থেকে উদ্ধার করার ব্যাপারে গিলবার্ট মারে-দের সঙ্গে কবিও সচেষ্ট ছিলেন। পরের বছরই ওসিট্স্কির মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর পরে পঁচিশ বছর অতিক্রম করার বিষয় স্মরণ ক'রে ১৯৬৩ সালে তাঁর সম্মানে *Ossietsky, ein deutscher Patriot* নামে সুবৃহৎ গ্রন্থ বেরিয়েছে, Kurt Grossmann-এর লেখা।

৩ Murray—১১.৭ টীকা দ্র.।

## ৪৬

Feb. 24 [1937]

MEDEHAMSTEDE
SHANKLIN, I.O.W.
Isle of Wight

শ্রীচরণকমলেষু

আফ্রিকার কবিতাটি পেয়ে আমরা কতদূর আনন্দিত হয়েচি কিছুই বলতে পারব না—উগাণ্ডার Chief, Prince Nyabongo এখন অক্সফোর্ডে Queen's College-এ research করচেন, তিনি এই কবিতার ভাবার্থ শুনে অত্যন্ত বিচলিত এবং মুগ্ধ হলেন : আপনাকে তাঁর একটি বই পাঠাচ্চেন এবং চিঠি লিখচেন। [১] যদিও এম্পায়ার-দস্যুবর্গ দেশে দেশে অন্যায় এবং লুঠের ব্যবসা চালাচ্চে, য়ুরোপের সহজ মানুষ ক্রমেই দিগন্তচক্রে ঘন অন্ধকার আসন্ন দেখে মানবসভ্যতার গুপ্ত পাপ এবং অসামঞ্জস্য সম্বন্ধে আশঙ্কিত সচেতন হয়ে উঠচে—এরাই আজ আপনার বাণী শুনে বুঝতে পারে, গভীরতলে চেয়ে দেখে। সম্প্রতি এর প্রমাণ পেলাম এদেশের সব চেয়ে পুরোনো এবং বড়ো Women's Training College-এ—কাল Portsmouth-এ তাদের সঙ্গে আধুনিক সাম্রাজ্যবিভাগসমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করতে হয়েছিল। একই পৃথিবীবাসী লক্ষকোটি নরনারী শিশুকে আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতা কোথায় চেপে রেখেচে তা দেখলাম অনেকেই এখন বুঝেচে —আপনার Nationalism কতজনে মন দিয়ে পড়েচে দেখে আশ্চর্য্য হলাম—মানুষের অপমানে তারা নিজেদের অপমানিত এবং একান্ত দোষী মনে করে। এই নূতন rearmament এদের অনেকের চোখ খুলচে—Fascist দেশগুলো যুদ্ধবিষে মত্ত তা জানি, কিন্তু ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সে যেমন করে হোক্ status quo রাখবে ব'লে মরীয়া হয়ে উঠেচে, এবং তারই জন্যে এই প্রলয়যুদ্ধআয়োজন অস্ত্ররচনা। অথচ আজকের আফ্রিকায় ভারতবর্ষে এবং আরো অন্য সব দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ ইংরেজ নির্মিত এই Status Quo-এর (sic) যন্ত্রে নিপীড়িত হ'য়ে মরচে, প্রাণ দিয়েও তারা দু তিনটে Imperial দস্যুর তৈরি Status Quo-কে চৌচীর ক'রে ভাঙবে—আজকের ওদের এই অশুভ ব্যবস্থা যে বিশ্ববিধাতার চিরদিনের বিধান এ কথা কেউ মানবে না। য়ুরোপেও

একদিকে Revisionist-এর দল জর্ম্মানী, ইটালিতে উগ্র হয়ে উঠচে; অন্য দিকে ডিমক্রাসির নাম ক'রে ইম্পীরিয়ালিষ্টরা নিজেদের চোরাইমাল সংরক্ষণে ব্যস্ত—মুস্কিল এই যে, দুদিকেই পাপ-লিপ্সা এবং আংশিক সত্য ও তথ্য মিশ্রিত। যদি সময় থাকতে আধুনিক সমস্যার ভালোরকম বিচার এবং ব্যবস্থা না হয় তাহলে গুটিকতক গুণ্ডাদলপতি সাম্রাজ্যিকদের হাত থেকে অসহায়, নিরপরাধী য়ুরোপীয় জনসাধারণকে রক্তবন্যা থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। এদের প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, যেখানে যাই সহজ, প্রিয়দর্শন, প্রিয়ভাষী এই ইংরেজ ছেলেমেয়ে তরুণদের আকর্ষণে বাঁধা পড়ি—কিছুতেই এদের পর ব'লে মনেও করতে পারি না। এরা আপনা হতেই পরস্পরকে মানবসম্বন্ধের প্রেমে বেঁধে নিতে জানে, ভবিষ্যতের সমবেত চেষ্টায় আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়। যদি যুদ্ধ নামে তাহলে এবারের য়ুরোপ জুড়ে বহু শত সহস্র এরা বিরুদ্ধে দাঁড়াবে সমস্ত যুদ্ধযন্ত্রের সম্মুখে—এরা মরবে, পুড়বে, নিরস্ত্র এরা যুদ্ধে যোগ দেবে না। এরা আমাদের আপন। ভারতবর্ষে, আফ্রিকায় এবং আমেরিকা য়ুরোপে Peoples-দের মিলন হতে দিচ্চে না সাম্রাজ্যতন্ত্র—কিন্তু আপনি তো আমাদের দেখিয়েচেন Peoples এবং Nations এক নয়—Nation-এর নরঘাতক নেতাদের অপরাধে Peoples-দের প্রতি আমাদের যেন ঘৃণা না জন্মায়, অবিচার না করি। আজকের রাশিয়ার মৈত্রীমন্ত্র, মৈত্রীবিধান, সাংঘাতিক নরহত্যানীতির বিষে দুষ্ট, তাদের অনেক কিছুই আমাদের শত হস্ত দূরে রেখে চলতে হবে—কিন্তু ঐ রাশিয়ায় আজ প্রথম Peoples-দের নিয়েই দেশের সমস্ত ব্যবস্থা গ'ড়ে উঠ্চে। ভারতবর্ষে আমরা অনেক আদর্শ বলেচি লিখেচি কিন্তু করেচি খুবই কম, পদে পদে আত্মবিরোধে জাতিনির্য্যাতনে পরমসত্যকে পথের কাদায় এবং মন্দিরের অন্ধকারে মিশিয়েচি—আজ রাশিয়া আদর্শকে পরীক্ষা করচে মাটিতে বীজ বপন করে তাতে জলসেচন ক'রে—ফসল ফলবেই।[২] আপনি আবার যদি একবার য়ুরোপের 'peoples'-দের প্রতি আপনার বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা জানান তাহলে বড়ো ভালো হয়, কারণ তারা অনেকে আপনার আধুনিক লেখায় কোনোই আশার কথা পায়নি তাদের নিজেদের সম্বন্ধে। তাদের এ দাবী জানি আপনি অগ্রাহ্য করতে পারবেন না এই আসন্ন মৃত্যুদিনে।[৩] স্পেনে মানুষের যে দুঃখ আজ বিশ্বের মানুষের মর্ম্মে হানচে সেই দুঃখের দুরাশায় আপনার কাছ থেকে য়ুরোপ চায় একই সঙ্গে য়ুরোপীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে অগ্নিময় বাক্য এবং য়ুরোপীয় সহজ মানুষের প্রতি ভালোবাসা, ভালোবাসার স্মৃতি।[৪]

এই সম্পর্কে আমার একটি প্রস্তাব আছে। প্রশান্তবাবুর প্রবন্ধটি অতি চমৎকার হয়েচে—আপনার humanism সম্বন্ধে উনি বই লেখেন তো আজকে বড়োই উপকার হবে—কিন্তু যদি প্রবন্ধকে বাড়িয়ে তোলা এখন সম্ভবপর না হয় তাহলে ঐ প্রবন্ধটিকেই pamphlet আকারে ছাপানো দারকার।[৫] এবং তাতে ভূমিকাস্বরূপে আপনি দুচারকথা বললে বড়ো ভালো হত। Isle of Wight-এ বক্তৃতা দিচ্চি League of Nations-এর তরফ থেকে, শীঘ্রই Oxford-এ ফিরে আবার লিখব। বড়ো তাড়াতাড়িতে হোটেলের ভিড়ে যেমন-তেমন ক'রে এই চিঠি লিখলাম। চারিদিকে সমুদ্র; বড়ো সুন্দর এই পাহাড়ের

একদিকে Revisionist-এর দল জর্ম্মানী, ইটালিতে উগ্র হয়ে উঠচে ; অন্য দিকে ডিমক্রাসির নাম ক'রে ইম্পীরিয়ালিষ্টরা নিজেদের চোরাইমাল সংরক্ষণে ব্যস্ত—মুস্কিল এই যে, দুদিকেই পাপ-লিপ্সা এবং আংশিক সত্য ও তথ্য মিশ্রিত। যদি সময় থাকতে আধুনিক সমস্যার ভালোরকম বিচার এবং ব্যবস্থা না হয় তাহলে গুটিকতক গুণ্ডাদলপতি সাম্রাজ্যিকদের হাত থেকে অসহায়, নিরপরাধী য়ুরোপীয় জনসাধারণকে রক্তবন্যা থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। এদের প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, যেখানে যাই সহজ, প্রিয়দর্শন, প্রিয়ভাষী এই ইংরেজ ছেলেমেয়ে তরুণদের আকর্ষণে বাঁধা পড়ি—কিছুতেই এদের পর ব'লে মনেও করতে পারি না। এরা আপনা হতেই পরস্পরকে মানবসম্বন্ধের প্রেমে বেঁধে নিতে জানে, ভবিষ্যতের সমবেত চেষ্টায় আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়। যদি যুদ্ধ নামে তাহলে এবারের য়ুরোপ জুড়ে বহু শত সহস্র এরা বিরুদ্ধে দাঁড়াবে সমস্ত যুদ্ধযন্ত্রের সম্মুখে—এরা মরবে, পুড়বে, নিরস্ত্র এরা যুদ্ধে যোগ দেবে না। এরা আমাদের আপন। ভারতবর্ষে, আফ্রিকায় এবং আমেরিকা য়ুরোপে Peoples-দের মিলন হতে দিচ্চে না সাম্রাজ্যতন্ত্র—কিন্তু আপনি তো আমাদের দেখিয়েচেন Peoples এবং Nations এক নয়—Nation-এর নরঘাতক নেতাদের অপরাধে Peoples-দের প্রতি আমাদের যেন ঘৃণা না জন্মায়, অবিচার না করি। আজকের রাশিয়ার মৈত্রীমন্ত্র, মৈত্রীবিধান, সাংঘাতিক নরহত্যানীতির বিষে দুষ্ট, তাদের অনেক কিছুই আমাদের শত হস্ত দূরে রেখে চলতে হবে—কিন্তু ঐ রাশিয়ায় আজ প্রথম Peoples-দের নিয়েই দেশের সমস্ত ব্যবস্থা গ'ড়ে উঠচে। ভারতবর্ষে আমরা অনেক আদর্শ বলেচি লিখেচি কিন্তু করেচি খুবই কম, পদে পদে আত্মবিরোধে জাতিনির্য্যাতনে পরমসত্যকে পথের কাদায় এবং মন্দিরের অন্ধকারে মিশিয়েচি—আজ রাশিয়া আদর্শকে পরীক্ষা করচে মাটিতে বীজ বপন করে তাতে জলসেচন ক'রে—ফসল ফলবেই।[২] আপনি আবার যদি একবার য়ুরোপের 'peoples'-দের প্রতি আপনার বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা জানান তাহলে বড়ো ভালো হয়, কারণ তারা অনেকে আপনার আধুনিক লেখায় কোনোই আশার কথা পায়নি তাদের নিজেদের সম্বন্ধে। তাদের এ দাবী জানি আপনি অগ্রাহ্য করতে পারবেন না এই আসন্ন মৃত্যুদিনে।[৩] স্পেনে মানুষের যে দুঃখ আজ বিশ্বের মানুষের মর্ম্মে হানচে সেই দুঃখের দুরাশায় আপনার কাছ থেকে য়ুরোপ চায় একই সঙ্গে য়ুরোপীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে অগ্নিময় বাক্য এবং য়ুরোপীয় সহজ মানুষের প্রতি ভালোবাসা, ভালোবাসার স্মৃতি।[৪]

এই সম্পর্কে আমার একটি প্রস্তাব আছে। প্রশান্তবাবুর প্রবন্ধটি অতি চমৎকার হয়েচে—আপনার humanism সম্বন্ধে উনি বই লেখেন তো আজকে বড়োই উপকার হবে—কিন্তু যদি প্রবন্ধকে বাড়িয়ে তোলা এখন সম্ভবপর না হয় তাহলে ঐ প্রবন্ধটিকেই pamphlet আকারে ছাপানো দারকার।[৫] এবং তাতে ভূমিকাস্বরূপে আপনি দুচারকথা বললে বড়ো ভালো হত। Isle of Wight-এ বক্তৃতা দিচ্চি League of Nations-এর তরফ থেকে, শীঘ্রই Oxford-এ ফিরে আবার লিখব। বড়ো তাড়াতাড়িতে হোটেলের ভিড়ে যেমন-তেমন ক'রে এই চিঠি লিখলাম। চারিদিকে সমুদ্র ; বড়ো সুন্দর এই পাহাড়ের

কোণায় আমার এই বন্ধুর পান্থশালা ।।

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

অমিয়

---

টীকা

১ অমিয় চক্রবর্তীর বন্ধু, বুগাণ্ডার রাজপুত্র এবং সাহিত্যিক H. H. Prince Akiki K. Nyabongo (১৯০৫-?) সে-সময় অক্সফোর্ডে গবেষণা করছিলেন। পরে চ'লে যান আমেরিকার Yale বিশ্ববিদ্যালয়ে। আফ্রিকার ঘনিষ্ঠ জীবন ও সংস্কৃতি বিষয়ে লেখা তাঁর গ্রন্থগুলি (*Africa Answers Back*, 1936 ; তিন খণ্ডে *Bisoro Stories*, 1937 ; দুখণ্ডে *Hadithi za Wanyane*, 1961) বিশেষ সমাদর পেয়েছিলো।

সদ্য লেখা রবীন্দ্রনাথের "আফ্রিকা" কবিতাটি অমিয় চক্রবর্তীর সাহায্যে বুঝে নিয়ে, কবিকে তাঁর দেশবাসীর পক্ষ থেকে তিনি কৃতজ্ঞতা জানান, এবং কবিতার একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রার্থনা করেন, 'so that we can bring it before our people who may read your message.'। কবিকে পাঠানো প্রিন্স নিয়াবঙ্গোর লেখা কোনো গ্রন্থ বিশ্বভারতীতে রক্ষা পায়নি।

২ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রলয় যখন আসন্ন হ'য়ে উঠেছে ঠিক তখন শান্তি-মৈত্রীতে আস্থাশীল শুভ্রচিত্ত কিছু য়ুরোপীয় মানুষের প্রতি এবং গণরাষ্ট্রবিধির প্রথম বীক্ষণাগার রাশিয়ার প্রতি এ-ধরনের সরল ভরসা রাখা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক ছিলো না। পরের ইতিহাস সবাই জানেন।

৩ 'বড়ো' ইংরেজ, 'ছোটো' ইংরেজের কথা রবীন্দ্রনাথ পূর্বে বলেছেন। 'ইংরেজদের মধ্যে যাঁরা মহৎ', যাঁরা 'স্বজাতিকৃত বা পরজাতিকৃত অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে কুণ্ঠিত হন না' তাঁদের প্রতি সম্মান ভালোবাসা জানাতে কবি কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু এ-চিঠিতে অমিয় চক্রবর্তী স্পষ্টতই অন্য কিছু দাবি করেছেন : 'জনগণ' বা 'Peoples'-দের প্রতি তিনি কবিকে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা জানাতে বলছেন, কেননা রবীন্দ্রনাথের সাম্প্রতিক লেখায় তারা কোনো আশার বাণী শুনতে পায়নি, অথচ বিশ্বে তাদেরই জয় অনিবার্য। তিরিশের যুগের অক্সফোর্ডে অডেন গোষ্ঠীর মতো অমিয় চক্রবর্তীর কবিমানসেও মার্কসীয় হাওয়া লেগেছিলো বইকি। তবে সে-হাওয়া রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করেনি। এই ১৯৩৭ সালেরই শেষ দিকে লেখা 'প্রান্তিক'-এর কবিতায় তিনি অন্যভাবে তাদের ধন্য বলেছিলেন—ঘরে-ঘরে যারা দানবের সঙ্গে সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

৪ স্পেইনে তখন গৃহযুদ্ধ চলছিলো।

৫ প্রতিভাবান পরিসংখ্যানবিশারদ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের (১৮৯৩-১৯৭২) নিজের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান 'ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিকল ইনস্টিটিউট'। কিন্তু কেমব্রিজ থেকে ফিরে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার সঙ্গে-সঙ্গে ১৯২১ থেকে দশ বৎসরকাল বিশ্বভারতীরও তিনি ছিলেন যুগ্ম সম্পাদক। তাঁর পদ্ধতি মেনেই পাঠকের ভোটে স্থির করা রবীন্দ্রনাথের প্রধান-প্রধান কবিতাগুলি

'চয়নিকা'-তে সংকলিত হয়েছিলো। পরে 'চয়নিকা'র বদলে কবির নিজের বাছাই করা কবিতার সংকলন তৈরি হয় 'সঞ্চয়িতা'। প্রশান্তচন্দ্রর লেখা 'Rabindranath Tagore the Humanist' প্রবন্ধটি নতুন সিরিজ *Visva-Bharati Quarterly* পত্রিকায় বেরিয়েছিলো (২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা), সেই প্রবন্ধের উল্লেখ করছেন অমিয় চক্রবর্তী। প্রবন্ধের বক্তব্য: 'Rabindranath has placed his faith in the Kingdom of Man on Earth, rich with the variety of human relationships. ... The universe has Significance only in terms of human values.' এ-বিষয়ে অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর মতের সম্পূর্ণ মিল ছিলো।

## ৪৭

7th March [1937]

Zeist
Holland

শ্রীচরণকমলেষু

এখানে Dutch-Indonesian Conference-এ এসেচি— জাপানের কল্যাণে এরা এখন জাভায় সুমাত্রায় একটু রাশ ঢিলে দিয়ে প্রজাদের সন্তুষ্ট করতে চাচ্চে। চীনে মাইনরিটিও ( এই কথার বাংলা প্রতিশব্দ দরকার ) জাভায় বেশ একটু জেগেছে। Prof. Winternitz-এর বিষয়ে আপনার চিঠি ও মন্তব্য Quarterlyতেও বেরোনো দরকার।[১] সমস্ত য়ুরোপে Indologist এবং ভারতবন্ধু সকলে তাঁর মৃত্যুতে কাতর। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানুন।

প্রণত
অমিয়

---

টীকা

১ ভিন্টারনিৎস্-এর মৃত্যু হয় ১৯৩৭-এর জানুয়ারি মাসে। তার আগের বছরই (১৯৩৬) রবীন্দ্রনাথের ৭৫তম জন্মদিনে কবিকে তাঁর উপরেই নিজের লেখা বই তিনি উপহার পাঠিয়েছিলেন। মৃত্যুর খবর পেয়ে অমিয় চক্রবর্তীর চিঠি আসার আগেই রবীন্দ্রনাথ এঁর ভগ্নীকে লেখেন : 'During my long life and extensive travels, I never met a savant more worthy of respect than the learned doctor. ...In him I have lost a faithful comrade, India has lost one of its truest Pandits and best friends, and humanity one of its sincere champions.' (*Visva-Bharati News*, Feb. 1937)

March 16th [1937]

Balliol College
Oxford

শ্রীচরণকমলেষু

এইমাত্র 'খাপছাড়া' পেয়েচি—এরকম নতুন, এরকম আশ্চর্য্য জিনিষ কল্পনা করতে পারি না![১] সাহিত্য সৃষ্টির কোনো প্রচলিত পর্য্যায়ে এর স্থান দেওয়া চলবে না—'খাপছাড়া' সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র; ছবিতে, স্বপ্নে. অদ্ভুতে, রহস্যে, রসে, রসিকতায় প্রহসনে জ্বলন্ত নূতন জগৎ নিয়ে দেখা দিল। সবে মাত্র পাতা উল্টে দেখেচি; ঠিক আমার ছুটির মুখে এসে পৌঁছল, এখন আগুনের সামনে ব'সে সমস্ত সন্ধ্যারাত্রি রহস্যপুরীতে কাটবে। এখানকার আর্টিস্ট এবং সাহিত্যিকদের ছবি দেখাব—আর কিছু না বুঝলেও ছবির ভাষায় চমৎকৃত হবে। যদি পারি লণ্ডনে Low-এর[২] কাছে এই বই নিয়ে যাব। তিনি বুঝবেন।

আমার ডিগ্রির সাধনা শেষ হয়েচে—প্রাণ নিয়ে বেঁচেচি। সত্যিকার বই লেখা আর thesis manufacture করা একেবারে আলাদা জিনিষ—দুই কূল বাঁচিয়ে চলতে গিয়ে বিপন্ন হয়েছিলাম। ক্রমাগত যুদ্ধ ক'রে এদের চারজন কঠিন ভিক্টোরীয় পণ্ডিত-প্রফেসারকে আমার দিকে আনতে পেরেচি এতেই মনে যা শান্তি পেয়েচি—তা না হলে এতদিন দেরি হল, অনেক পূর্ব্বে বই ছাপাতে পারতাম। কিন্তু এ কথা স্বীকার করব যে এই যুদ্ধ ক'রেও আনন্দ আছে—যতই মতের অমিল হোক্ এদের stubborn honesty-কে বহুমান না দিয়ে পারি না—সত্যের সন্ধানে বেরিয়ে যারা সম্পূর্ণ প্রত্যয় না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই হার মানতে নারাজ তাদের বিরুদ্ধতাও শ্রদ্ধেয়, এর মধ্যে ব্যক্তিগত সব কিছুর চেয়ে জ্ঞানের প্রয়াসই বড়ো হয়ে উঠেচে। শেষটায় যখন Abercrombie পর্য্যন্ত আমার দিকে এলেন তখন আশ্চর্য্য হলাম। Public Examination-এর সময় তিনি বল্লেন আমার একটাও প্রশ্ন নেই—দাঁড়িয়ে উঠে টুপি খুলে অভিবাদন জানালেন। পর দিন সকালে দেখি আমার ডেস্কে তাঁর এক সেট বই, সঙ্গে সুন্দর চিঠি—বই ছাপানো বা অন্য বিষয়ে অকুণ্ঠিত সাহায্য করতে তিনি উৎসুক। ইংরেজের চরিত্রের একটা দিক থেকে বারে বারে বিস্মিত হতে হয়—এই যা করলেন তা কিছুই করা দরকার ছিল না। এতে আমার সম্মান তাঁরই মহত্ত্বের মূল্য পেল।[৩]

কিন্তু আজ সমস্ত জীবন ক্লান্তিতে ভরে উঠেচে—আর এক মুহূর্ত্ত এই নির্ব্বাসনে থাকতে পারচি না। বাহিরের ছাপ-মার্কার সঙ্গে অন্তরের তপস্যার যোগ ঘটলে জীবন ভিতর থেকে বিষিয়ে ওঠে—বিদেশে বৃহৎ মানবলোকে ভারতীয় অতিথি কি এসেচি টিকিটের লোভে। জানলা দিয়ে ডিগ্রিটা এখন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাঁচলাম। কিন্তু ভাগ্যের পরীক্ষায় যে পণ নিয়ে নেমেছিলাম তাতে এতদিন পর্য্যন্ত এই স্বাধীনতার যোগ্যতা আমার ছিল না। —এখন দেশে গিয়ে কোনো সহজ কাজ নিয়ে এই হাটবাজারের দরদামের কথা ভুলতে পারলে বাঁচব।

আপনার কাছে স্বীকার করব, লাহোরের কাজটায় নানারকম বিঘ্ন আমার মনে জেগে

আছে : জায়গাটা মনের অনুকূল নয়, research-এর বিষয়টা আমার পক্ষে আকস্মিক, বৃত্তিটা কোনোমতে বেঁচে চলবার মতো। তা ছাড়া আগে থাকতে হাত-পা বেঁধে তিনচার বছরের মতো কোনো ধনী বা গুণীর ব্যক্তিগত কেনা হয়ে যেতে কিছুতেই ইচ্ছে হচ্ছে না। যদিও হাতের সামনে তৈরি চাকরির লোভ নিরর্থের পক্ষে কম নয়।[৪] কিন্তু যদি বাংলায় থাকতে পারতাম তাহলে যতদিন আর বাঁচব হয়তো কিছু লিখতে বলতে পারতাম, অন্তত পক্ষে নূতন জেগে-ওঠা বাংলার প্রাণের যোগে যুক্ত হয়ে বেঁচে আনন্দ পেতাম। বাংলার দুঃখের ভাগ মাথায় নিয়ে কিছু সেবার কাজ, জ্ঞান প্রচারের কাজ, ছাত্রসম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলে উদ্বোধনের কাজ মেনে নিতাম। আশ্রমের কাছে থাকতাম, কলকাতায় যদি ভালো কাজ পাই, বিশ্বভারতীতে প্রায়ই গিয়ে কিছু কাজ অর্ঘ্য দিতে পারি। গুরুদেব, যদি আপনি আমার হয়ে শ্যামাপ্রসাদবাবুকে লেখেন তাহলে হয়তো আমি উদ্ধার পাই।[৫] শুনচি Presidency College-এ ইংরেজি অধ্যাপকের পদ খালি হচ্চে—ইংরেজ অধ্যাপক চ'লে আসচেন। যোগ্যতার কথা জানি না, অহঙ্কার বোধ হয় আমার বেশি নেই, কিন্তু অন্তত বাঙালী হয়েও আজকের য়ুরোপ এবং য়ুরোপীয় সাহিত্যের ধারা কিছু বুঝেচি —আপনার কাছ থেকে যেটুকুও ভূমিকা গ্রহণ করতে পেরেচি তার ফলে হয়তো সাহিত্য, ইংরেজি সাহিত্যকে, বাঙালী ছাত্রের কাছে অনেকটা যৌগিক ক'রে, প্রাণে মিশিয়ে বিতরণ করতে পারব। আমার আর্থিক সঙ্কট হঠাৎ ভয়ানক কঠিন হয়ে উঠেচে—যতদিন ডিগ্রি পাওয়া বাকি ছিল সহায়তা নানাভাবে পেয়েচি খুবই আশ্চর্য্য সহৃদয়তায়—কিন্তু দেখচি এখন এক রাত্রেই সবার বিশ্বাস এখন আমার একা দাঁড়াতে হবে। মন কেমন আচ্ছন্ন হয়ে উঠচে—কঠিন পরিশ্রমের পর অবসাদও আছে—দেশের কূলের খুব কাছে এসেও হঠাৎ তলিয়ে যাই এই ভয়ে কীরকম বোধ হচ্চে। এদেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী অধ্যাপকের প্রশস্তিপত্র দেশে সঙ্গে নিয়ে যেতে কোনো বাধা হবে না—কিন্তু তার ফলে কি কলকাতায় কাজ পাব। আজ একান্ত ভাবেই আপনার স্নেহের উপর দাবী করচি যদি শেষ পর্য্যন্ত একটা বরাবরকার নির্ভরযোগ্য কাজ কলকাতায় পাই তাহলে সব দিক থেকে বাঁচব।

প্রণত

অমিয়

---

টীকা

১ রবীন্দ্রনাথেরই আঁকা ছবি এবং লেখা ছড়ার মিলিত সম্পদ 'খাপছাড়া' বইটি বেরোয় এ-চিঠির অল্পদিন আগেই।

২ (স্যর ডেভিড) লো—১৫.১০ টীকা দ্র.।

৩ এ-চিঠির সঙ্গে ৪১-সংখ্যক চিঠি এবং টীকা মিলিয়ে পড়লে বোঝা যাবে অক্সফোর্ডে ডিগ্রি পেতে কেন এক টার্ম দেরি হয়েছিলো।

৪ আগের বছর জুলাই মাসে (৩৬-সংখ্যক চিঠি দ্র.) জানিয়েছিলেন অক্সফোর্ড থেকে যে-বৃত্তি নিয়ে দেশে ফিরছেন তার কর্মকেন্দ্র হবে লাহোরে। পরবর্তী তিন বছর

লাহোরেই তাঁকে কাটাতে হয়েছিলো, এবং লাহোরে থাকতেই তাঁর প্রথম দুখানি কবিতার বই কলকাতার 'ভারতী ভবন' থেকে নিজের খরচে ছাপা হয়েছিলো। আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম যুগে কোনো প্রকাশকের খরচায় আধুনিক কবিতার বই ছাপানো ছিলো নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার।

৫ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন উপাচার্য ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। অমিয় চক্রবর্তীকে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকের কাজ দেবার সুপারিশ ক'রে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই তাঁকে চিঠি লিখেছিলেন। ২৯ মার্চে অমিয় চক্রবর্তীকে অক্সফোর্ডের ঠিকানায় লেখা কবির চিঠিতে আছে : 'প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকের পদ যদি তোমার ভাগ্যে জোটে তবে আমাদের ভাগ্যেও সেটা স্পৃহনীয় হবে।' ('চিঠিপত্র' ১১শ, ৯১)। কিন্তু তিনি চেষ্টা করলেও আপাতত কোনো ফল হয়নি, এমনই কঠিন ছিলো এদেশে তখন উপযুক্ত কোনো অধ্যাপকের পদ পাওয়া।

## ৪৯

April 13 [1937]

Balliol College
Oxford

শ্রীচরণকমলেষু

আপনার চিঠি এবং ইংরেজি কবিতাটি পেলাম। এটা তর্জমা নয়, নূতন সৃষ্টি— এদেশের মর্ম্মস্থানে পৌঁছবে।[১] *New Statesman*-এ দিলে বোধ হয় আরো ভালো হত : *Spectator* আজকাল একটু পিছনে পড়ে গেছে। আমরাও এখানে নানা জায়গায় ঐ নিয়ে আলোচনা করব ; আফ্রিকাতেও যাতে দুচার জায়গায় পৌঁছয় দেখব। Fraser পড়ে খুব বিচলিত হবেন—ওঁরা প্রায়ই আপনার কথা বলেন। Achimota ছাড়বার পর থেকে এখন Lord Lothian-এর দেওয়া নতুন Educational Settlement—Newbattle Abbey-তে তাঁর শিক্ষাসচিবের কাজ নিয়ে আছেন। তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দেব।[২]

Professor Gilbert & Lady Murray-কে আপনি যদি তাঁদের এই দুঃসহ শোকে সমবেদনা জানিয়ে নিজের হাতে এক লাইন লেখেন তো বড়ো ভালো হয়।[৩] অমন প্রতিভাসম্পন্ন, সুন্দর সহৃদয় যুবক কম দেখেছি Basil Murray-র মতো : Spain-এর বেদনা সহ্য না করতে পেরে Valencia-তে গিয়ে নানারকম সেবার কাজে অসম্ভব পরিশ্রম করছিলেন ; হঠাৎ যখন শরীর ভাঙল, জাহাজে ক'রে Alicante-র অভিমুখে ডাক্তারের পরামর্শের জন্যে ওঁকে নিয়ে যাচ্ছিল, দুদিনের মধ্যে জাহাজেই মারা গেলেন। চারিদিকে অনাহার এবং মারীর হাওয়া, কী একটা উৎকট রোগ ধরেছিল ; দুঃখী, অত্যাচারিত Spanish Government-এর অসহায় নরনারীদের জন্যে প্রাণ দিলেন। এই বয়সে পুত্রশোকে Murray-রা অভিভূত হয়ে পড়েচেন, যদিও এঁরাও সর্ব্বক্ষণ খাটচেন এই যুদ্ধের শান্তির জন্যে, সত্যপ্রচারের নিয়ত চেষ্টায়।

সেখানে সম্প্রতি একজন ভারতীয় গিয়েছিলেন; Madrid-এর University City-র Front Line Trench-এর কাছে যুদ্ধ চলচে, সেখানে Caballero-র সৈন্যবৃন্দের সামনে তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন।[৪] ভারতীয়ের এই বীর্য্য, এই মৈত্রীভাব দেখে ইস্পানী সৈন্যেরা খুসি হল, তাদের মধ্যে একজন তবু ব'লে উঠল— "দেখ, তোমাদেরও তো স্বাধীনতা জয় করতে হবে, কিন্তু এ পথে যেন না হয়।" কঠিন প্রাণ, বর্ম্মাবৃত যোদ্ধার মুখে যুদ্ধের এই নিষ্ফল মিথ্যার আলোচনা শুনে ভারতীয় হঠাৎ অত্যন্ত আশ্চর্য্য এবং বিচলিত হলেন। ইস্পানী সৈন্য জানে যুদ্ধ কাকে বলে, তার চোখে কোনো মোহই নেই। দেশ হোক, যাই হোক, নরহত্যার এই পথ স্বাধীনতার পথ নয় এমন কথা সে বলতে পারল।

স্পেনে আরো একটা আশ্চর্য্য দৈনিক ঘটনা Auden, Spender এদের কাছে শুনেছিলাম—এঁরাও সম্প্রতি Madrid-এ গিয়েছিলেন, আবার যাবেন[৫]। ইস্পানী সৈন্যেরা কম খেয়ে, নিরন্তর দুঃখে যন্ত্রণায় ভুগেও সহজ মানুষভাব হারায়নি—যতদূর পর্য্যন্ত পারে তাদের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী, বোনেরা পাশে পাশে চলেচে; আপাদমস্তক যুদ্ধ সাজ প'রেও পুরুষেরা কোলে শিশুকে তুলে নিচ্চে, কিছুতে ছাড়তে পারচে না। Franco এদেরই উপর পাপের বন্যা বইয়েচে, এরা যুদ্ধ বিগ্রহ চায় না, সহজমানুষ এরা ক্রমে দেশকে সুন্দর ক'রে তুলছিল নূতন যুগের উৎসাহে, এমন সময়ে ফ্যাসিস্টদের উন্মাদ আক্রমণ শুরু হল।

আজ য়ুরোপ জুড়ে মানুষের কী দুঃখ; আমাদেরও তাই। শত্রু যারা তারা ইংরেজ বা এশিয়াবাসী নয়—পৃথিবীতে যারা অন্যায়, রক্তপাতব্যবসা চালাচ্চে তাদের ভাষা এক, তাদের নিশান যে-রঙেরই হোক্ না কেন, একই রঙের। সাধারণ সহজ মানুষ আজ নিপীড়িত, কিন্তু আশার কথা এই যে তারা দেশ কালের ব্যবধান ঘুচিয়ে আপনাদের ঐক্য আবিষ্কার করচে। Auden-এর ভাষায় বলতে গেলে, আশার কথা এই যে "Our separate sorrows are a single hope"—

("We ride a turning globe, we stand on a star,
It has thrust us up together : it is stronger than we :
In it our separate sorrows are a single hope")

(নতুন বই "Look, Stranger !")

আজকে আর ক্রমেই য়ুরোপীয় বা ভারতীয় পাপ, অথবা, কোনো বিশেষ দেশীয় আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা মানতে পারি না—দেশে দেশেই মহামানবের জাগরণ দেখচি, সমস্ত বিষদূষিত সমাজের, রাষ্ট্রের বাধা সত্ত্বেও। এই মহামানবের কথাই আপনি বলেচেন। কম্যুনিষ্টরা অনেকটা কাছে এসেও কিছুতেই সত্যকে পাচ্চে না, কারণ তাদেরও হাতে রক্তাক্ত তলোয়ার, তাদের বুকে হিংসা—যতই উন্নত আদর্শ হোক না কেন তাদের। ব্যক্তিগতভাবে তাদের অনেককে শ্রদ্ধা করতে পারি—সমস্ত মিলে তাদের দেশের মহাচেষ্টাকে সম্মান করি—কিন্তু—। ও পথ নয়। মানুষের প্রাণ আজ বড়ো সন্ত্র হতে

চলেছে ; আজ আবার সময় এসেচে প্রাণেরই মহিমা প্রচার করবার। 'Sanctity of Life'-কে যারা বড়ো করে, তাদের দিকে চেয়ে কম্যুনিস্ট থেকে আরম্ভ ক'রে Fascist পর্য্যন্ত সবাই উচ্চহাস্য করচে—কিন্তু 'Thou Shalt Not Kill'—এই বাণীই বাজুক আমাদের প্রাণে। প্রাণই তো এই মর্ত্ত্যে সত্যের আধার—তাকে উড়িয়ে দিয়ে নৈর্ব্যক্তিক সত্যকে চাইব না। মহাভারতে যে-মরীচিকা দিয়ে অর্জ্জুনের সহজ জাগ্রত বোধকে আচ্ছন্ন করেছিল গীতার সেই বাণী আজ চাই না।[৬] আবার আসুক অহিংস প্রাণের মন্ত্র, প্রেমের প্রাণের মন্ত্র, কোমল করুণ প্রাণের অজেয় বাণী। ভারতবর্ষ থেকেও এই বাণী শুনব। দুঃখে বিষে ভয়ে শতছিন্ন অসহায় নরনারী য়ুরোপ জুড়ে এই প্রাণের নির্ম্মলরূপী শক্তি দেখবে ব'লে প্রার্থনা করচে—আমাদের হতভাগ্য ভারতবর্ষ থেকে মানুষের এই প্রার্থনা এই সঙ্গে মিলবে। নূতন মানবসভ্যতার ভিত্তি তৈরি হবে সম্মিলিত আমাদের বেদনায়, আমাদের নূতন চেষ্টায়। প্রাণকে বাঁচিয়ে তুলব করুণায়, এতে একটুও লজ্জা পাব না। এদেশে নানা ভাবে এই প্রাণসাধনা দেখা দিয়েচে। Aldous Huxley এবং Gerald Heard এই ব্রত প্রচার করবার জন্যে America-য় গিয়েচেন।।[৭]

য়ুরোপ থেকে বিদায় নেবার কাল এগিয়ে আসচে। ভয় করচে দেশে কোনো আশ্রয় পাব কিনা। চাকরির হেরফের বড়োই দুরূহ ব'লে বোধ হয় ; কাজ নিয়ে সর্ব্বক্ষণ পরিশ্রম করতে পারি, কিন্তু কাজের বাহিরে চারিপাশে ঐ সব চক্রচক্রান্তে কী ভাবে চলতে হয় জানি না, জানতেও চাই না। এখন আর শেখবার সময় নেই। অথচ দেশে ফিরে ভালো কাজ না পেলে অনাহারে মরব, নয়ত মিথ্যে সময় নষ্ট হবে। যদি Presidency-র কাজটা পেতাম একটু সত্যিকার চেষ্টা করতাম দেশের সভ্যতার সঙ্গে মিলিয়ে য়ুরোপের সাহিত্য এবং য়ুরোপীয় art-কে যৌগিক ক'রে জানতে, জানাতে। ছাত্রমহলের নূতন উৎসাহে সাধনায় যোগ নিতাম ; এবং কাছে থাকতাম বিশ্বভারতীর, সর্ব্বদা যাতায়াত এবং কর্ম্মের পথে।

এখানে Convocation অবধি আমাকে থাকতে হবে—বই ছাপানোরও কিছু ব্যাপার আছে—তাই দেশে পৌঁছব মে মাসের অন্তে। ইতিমধ্যে এখান থেকেও দেশে কাজ পাওয়ার জন্যে যা কিছু সাধ্যমতো করা সম্ভব তা করতে চাই। মুস্কিল এই যে এ-দেশে প্রার্থীর সম্বন্ধ নিয়ে দাঁড়ালে মানে মরতে হয়—সমানভাবে সামাজিক সম্বন্ধে সকলের সঙ্গে বন্ধুত্বে মিশেচি, সে সম্বন্ধ বদলাতে পারবই না official patronage-এর লোভে। অথচ এখানেও অনেকে বলচেন যাওয়ার আগে ঐ সব চেষ্টা দেখতে। এদের মধ্যে Lothian এবং Butler (R. A.) আমার ব্যক্তিগত বন্ধু—( যদিও ওঁদের সঙ্গে মতামতে প্রায়ই মিল নেই )। তাঁরা আমার বিষয়ে Linlithgow এবং বঙ্গীয় Anderson-কে যুগপৎ লিখেচেন। কিন্তু সে-লেখা সম্পূর্ণ অন্যভাবে ; চাকরির সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই।[৮] —দেশে গেলে তাঁরা একবার নিমন্ত্রণ করবে—এক পেয়ালা চায়ে এবং আলাপ-পরিচয়ে তার আরম্ভ এবং পরিণতি। Non-official যে-সব authorities Oxford-এ আমার কাজ জানেন, তাঁদের কথা আলাদা—তাঁদের কাছে সহজেই বলতে পারি যা ইচ্ছে

দুলাইন লিখে দাও, তা না হলে দেশে আহার জুটবে না। এই রকম দুচারজনে অকৃত্রিম বন্ধুভাবে আমার জন্যে যা লিখে দিয়েচেন তার copy পাঠাই আপনাকে।[৯]

আপনি যদি মনে করেন ভূপতিবাবুর কাছে এগুলি পাঠালে কাজটা পাওয়ার সুবিধে হতে পারে তাহলে আপনার নিজের এক লাইন recommendation সুদ্ধ তাঁকে পাঠালে বিশেষ উপকৃত হব। অনিলবাবুকে লিখচি : তিনি খোঁজ নিয়ে আরও যদি কাউকে এই চিঠিগুলির copy পাঠাতে বলেন আমি এখান থেকে পাঠিয়ে দেব। অপূর্ব্ববাবুর হাতে দেবার জন্যে পরের মেলে চারু দত্ত মহাশয়ের কাছে copy পাঠাতে পারি। আমার বুদ্ধিতে এর চেয়ে বেশি কিছু আসচে না।। (শ্যামাপ্রসাদকে Sadler আলাদা লিখেচেন : আপনি যদি তাঁকে দেখা হলে কিছু বলেন তাহলে আমার কথা তিনি এখন থেকে ভেবে দেখবেন। Vice Chancellor হিসাবে তাঁর কিছু প্রভাব থাকবে মনে হয়।) Fazlul Huq বা অন্যকে আমি চিনিই না।।[১০]

ভারতী সারাভাই আমাদের সত্যি একটু আশ্চর্য্য ক'রে দিয়েচে। যে-সব কবিতা এবং অন্য রচনা ইংরেজিতে লিখে এনেচে দেশ থেকে তা মোটেই নিকৃষ্ট নয়। তার খুব সখ দু-চারজন এদেশী সাহিত্যিকের সঙ্গে পরিচয় হয়—তাই সেদিন আমি লণ্ডনে কবি Spender এবং Vera Brittain-এর সঙ্গে lunch-এ পরিচয় করিয়ে দিলাম।[১১] Book & Wine Restaurant এখন ভারি সুন্দর জায়গা হয়েছে, বিশেষ ক'রে তেতলার continental ঘরটায়—British Museum-এর কাছেও। ভারতী আপনার বই সব বাংলায় যত্ন ক'রে পড়চে; তার ভাই সুহৃদ এবং বৌদি—মণি—তারা লণ্ডনে flat নিয়ে আছে। সবাই আপনাকে প্রণাম জানাতে বল্ল। "Legacy of India" নিশ্চয়ই পেয়েচেন[১২] —Thomas-এর প্রবন্ধ দুটি কী চমৎকার হয়েচে— R.P. Masani-র Caste সম্বন্ধে আলোচনা খুব ভালো। Dr. Ghosh-এর প্রবন্ধ অসহ্য; এমনি লোকটি বেশ, কিন্তু এসব কী মিথ্যে লেখেন ভদ্রলোক। দেশের সঙ্গে নাড়ির যোগ এঁর ছিন্ন হয়ে গেছে। British Empire-এর উপর জর্ম্মাণ Scholar-এর বইটা বেশ হয়েচে—আপনার কথা খুব সুন্দর করে বলেচেন। আপনার কর্ম্মের মূল কথা ঠিক ধরতে পেরেচেন মনে হয়।।

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম আপনি জানুন।

প্রণত
অমিয়

---

**টীকা**

১. "আফ্রিকা" কবিতার ইংরেজি অনুবাদসহ রবীন্দ্রনাথের চিঠির তারিখ ২৯ মার্চ ১৯৩৭, ('চিঠিপত্র' ১১শ, ৯১ দ্র.)। সেই ইংরেজি অনুবাদের কপি অমিয় চক্রবর্তী পাঠিয়ে দেন অন্যান্যদের মধ্যে ফ্রেজার, লর্ড লোথিয়ান, প্রিন্স নিয়াবঙ্গো এবং ইথিওপিয়ার নির্বাসিত সম্রাট হাইলে সেলাসি-কে। সোয়াহিলি ভাষায় অনূদিত হ'য়ে

সে-কবিতা আফ্রিকায় বিতরিত হয়েছিলো। নিজের অনুবাদ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য লিখেছিলেন: 'সে তর্জমার উপর আমার বিশেষ শ্রদ্ধা নেই।' কিছুদিন থেকেই কবিতার অনুবাদ বিষয়ে তাঁর উৎসাহ একেবারেই চ'লে গিয়েছিলো।

২ Lord Lothian এবং Fraser : ৪৪.১ টীকা দ্র.।

৩ Professor Gilbert Murray : ১১.৭ টীকা দ্র.।

Alicante : ভূমধ্যসাগরের উপকূলে স্পেইনের বন্দর।

মারে-র পুত্রশোকে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখেছিলেন: 'I hesitate to intrude upon your great sorrow but I cannot help letting you know that the noble death of your noble-hearted son has very deeply moved me.' (রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ)

৪ ফ্রাঙ্কোর অধীনে ন্যাশ্‌নালিস্ট দল এবং ফ্রানসিস্কো কাবালেরোর ( Caballero ) নেতৃত্বে রিপাব্‌লিকানদের মধ্যে স্পেইনের গৃহযুদ্ধ শুরু হয় ১৯৩৬-এর জুলাই মাসে। ফ্যাসিস্ত ইতালি আর নাট্‌শি জর্মানী থেকে প্রচুর যুদ্ধোপকরণ সাহায্য পেয়েছিলেন জেনারেল ফ্রাঙ্কো। রিপাব্‌লিকানদের জন্যে অল্পস্বল্প সহায়তা এসেছিলো সোভিয়েট রাশিয়া থেকে, আর বিপদের দিনে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো সহায়সম্বলহীন নানাদেশী স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে গড়া International Brigade। ১৯৩৮ সালে কৃষ্ণ মেননকে সঙ্গে নিয়ে জওহরলাল নেহরু এই ব্রিগেডের সঙ্গে কয়েকটা দিন সমরক্ষেত্রে ছিলেন। রিপাবলিকানদের হার হ'লে জওহরলাল ব্রিটেন ও ফ্রান্সের চক্রান্তের নিন্দে ক'রে লিখেছিলেন: 'history long ages hence will remember this infamy and will not forgive them. ...For Spain was not Spain only, but the new world locked in a death struggle with the barbarian hordes of reaction and brutal violence.' ( *China, Spain and the War* দ্র. ) । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাস কয়েক আগেই ফ্রাঙ্কো গৃহযুদ্ধে জয়ী হন, এবং ব্রিটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য বৃহৎ শক্তিবর্গ চটপট ফ্রাঙ্কোর সরকারকেই মেনে নেয়।

৫ প্রভাবশালী নব্য কবি (W. H.) Auden ( ১৯০৭-১৯৭৩ ) ছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। ১৯৩৭ সালে অ্যাম্বুলেন্স চালক হিশেবে অডেন স্পেইনের গৃহযুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবক হয়েছিলেন, বলা বাহুল্য ফ্রাঙ্কোবিরোধী loyalist-দের পক্ষে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে "Spain" নামে তাঁর একটি দীর্ঘকবিতা জন্ম নেয়। স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে ছাপা হয়েছিলো। মহাযুদ্ধের শুরুতেই অডেন দেশত্যাগ ক'রে আমেরিকায় চ'লে যান। পরে ফিরে এসে অক্সফোর্ডে Professor of Poetry পদ পেয়েছিলেন। স্বকীয় কবিজীবনে অডেনের কিছু প্রভাবের কথা অমিয় চক্রবর্তী আমাকে লিখেছিলেন।

Spender—২৭.৫ টীকা দ্র.।

৬ অমিয় চক্রবর্তীর জীবনে ও সাহিত্যে শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধবিরোধী মনোভাব বজায় ছিলো। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে অর্জুনের বিষাদ অবলম্বনে এই চিঠির কিছুকাল পরেই 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় তিনি যুদ্ধবিরোধী একটি বড়ো প্রবন্ধ লেখেন। মহাভারতে ভগবদ্‌গীতার কৃষ্ণ যে-বাণী শুনিয়ে রণে বিমুখ বীর অর্জুনের বিষাদ দূর করেছিলেন সে-বাণী অমিয় চক্রবর্তী গ্রহণ করতে পারেননি। তার চাইতেও তাঁর কাছে বেশি জরুরি মনে হয়েছিলো 'আর্টিস্ট স্বভাবাপন্ন' অর্জুনের মৌলিক সংশয়: 'বিশ্বদর্শনের

বর্ণনার চেয়ে অর্জুনের চোখে দেখা কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রথম দৃষ্টি আমাদের কাছে মূল্যবান। আজ অবধি অর্জুনের প্রশ্ন জেগে রইল, যুগে-যুগে তার উত্তর দেবার চেষ্টা চলেছে।' (প্রবন্ধগ্রন্থ 'সাম্প্রতিক'-এ "শিল্পদৃষ্টি", ১৯৪৮, দ্র.)। এ-বিষয়ে তাঁর উপর গান্ধীজির এবং শান্তিবাদী কোয়েকার সম্প্রদায়ের প্রভাব স্পষ্ট।

৭ Aldous Huxley — ৪১.১ টীকা দ্র.।

Gerald Heard — ৪১.১ টীকা দ্র.।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় শান্তির সমর্থক বহু মার্কিন শিল্পীসাহিত্যিক দেশ ছেড়ে য়ুরোপের অনেক ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দ্বীপে চ'লে এসেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে, উল্টো স্রোতের টানে, য়ুরোপের অনেকে চ'লে যান আমেরিকায়। কেউ-কেউ আশ্রয় নেন সে-দেশে প্রশান্তসাগরের তীরবর্তী রামকৃষ্ণ মিশনে। হাক্সলি, জেরাল্ড হার্ড, ইশারউডের মতো তাঁদের তখনো বিশ্বাস ছিলো যে আমেরিকায় যুদ্ধের ঢেউ পৌঁছবে না।

৮ (Lord) Lothian — ৪৪.১ টীকা দ্র.।

(Rab বা R. A.) Butler — পরে ইংলণ্ডে শ্রমিক দলের আণ্ডার সেক্রেটারি।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম গবর্নর জেনারেলের পুত্র (Lord) Linlithgow (১৮৮৭-১৯৫২) ছিলেন ভারতের সব চাইতে দীর্ঘস্থায়ী ভাইরসয়। বহু বিষয়ে মতবিরোধ সত্ত্বেও এঁর প্রশংসা ক'রে গান্ধীজি লিখেছিলেন : 'He is never equivocal. never leaves you in doubt as to his meaning. He conveys the most unpalatable decision with a calmness and courtesy which, for the moment, make you think you have heardno harsh or hard decision. ...He and I have become friends never to be parted, be the differences between us as great as they can be.'

Anderson — তখনকার বাংলার গবর্নর।

৯ অমিয় চক্রবর্তী যাঁদের সুখ্যাতিপত্র রবীন্দ্রনাথকে পাঠান তাঁদের মধ্যে ছিলেন— স্যর মাইকেল স্যাড্‌লার, গিলবার্ট মারে, নেভিল কগ্‌হিল, সি. এস. লুইস, লাসেলেস অ্যাবারক্রম্বি এবং এড্‌মণ্ড ব্লানডেন। পত্রগুলি রবীন্দ্রভবন সংগ্রহে আছে।

১০ শ্যামাপ্রসাদ— ৪৮.৫ টীকা দ্র.।

Sadler — ১০.৩ টীকা দ্র.।

Fazlul Huq — তখন বাংলার 'প্রধানমন্ত্রী' (এখন যে-পদের নাম 'মুখ্যমন্ত্রী')।

১১ শিল্পপতি অম্বালাল সারাভাই-এর কনিষ্ঠা কন্যা ভারতী সারাভাই (১৯১২— ?) শান্তিনিকেতনে নবকুমার সিং-এর কাছে মণিপুরী নাচ শিখেছিলেন। গুজরাতি এবং ইংরেজি ভাষায় কবিতা ও নাটক লিখে খ্যাতি পেয়েছেন। শান্তিনিকেতনে এসে তিনি প্রতিমাদেবীর কাছেই উঠতেন।

১২ G. T. Garratt -সম্পাদিত *Legacy of India* বইটি Clarendon Press থেকে বেরিয়েছিলো। ভূমিকা লেখেন Marquis of Zetland। এক কপি বিশ্বভারতীতে আছে।

April 20 [1937]

Balliol College
Oxford

শ্রীচরণকমলেষু

Fraser আপনার আফ্রিকা কবিতা প'ড়ে কতদূর বিচলিত হয়েচেন বলা যায় না—তাঁকে পাঠিয়েছিলাম আপনার message সুদ্ধ ; ঐ সময়ে Andrews ছিলেন তাঁর সঙ্গে, সবাই মিলে আপনার কবিতা পড়েচেন।[১] Fraser-এর "Africa & Peace" সংক্রান্তই এই কবিতা লিখতে আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম। তাঁর রচনা যে আপনার একটুও কাজে লেগেচে এতে উনি ধন্য হয়েচেন। Fraser-রা যখন Ceylon-এ ছিলেন তখন আপনি একবার ওঁদের বাড়িতে উঠেছিলেন—Mr & Mrs Fraser এবং ওঁদের ছেলেমেয়েরা তা কখনো ভুলতে পারেন না। তার পর Fraser West Africa-য় গিয়ে Achimota College প্রতিষ্ঠা করলেন—ঐ দুঃখীর দেশে, মারাত্মক জলহাওয়ার দেশে মানুষে প্রকৃতিতে মিলে আফ্রিকার চিরশিশুদের আক্রমণ করেচে, তারি মধ্যে Fraser এবং তাঁর দল নূতন জ্ঞানশক্তির জোরে ওদের মধ্যে বীর্য্য, ঐক্য এবং স্বাধীন ভাব আনলেন। দুরন্ত য়ুরোপীয় রাষ্ট্রশক্তি তাঁকে এবং ঐ বিদ্যায়তনকে কী জ্বালাতন করেচে সে দীর্ঘ কাহিনী। তবু হার মানেননি। ওখানকার কাজ Epic-এর বিষয়,—জওহরলাল সব শুনে Fraser-কে গিয়ে অভিনন্দন করেছিলেন এই দেশে এবং তাঁর বিষয়ে লিখেচেন। এখন বেশি বয়সে Fraser-রা দেশে ফিরে Scotland-এ নূতন বিদ্যায়তনের ভার নিলেন—ওখানেও আফ্রিকাবাসীদের নিমন্ত্রণ করে আনচেন এরি মধ্যে! আপনাকে Fraser খুব ভালো ক'রে চিঠি লিখচেন—উত্তরে আপনি নিজের হাতে ওঁকে লিখলে শুধু উনি নয় সমস্ত Colony-র লোকে তা পড়বে, যত্ন ক'রে রাখবে।[২]

আফ্রিকার বেদনার বুঝি শেষ নেই—ইটালিয়ানরা সম্প্রতি Addis Abbabaয় যেসব কাণ্ড করচে তার পারাপার নেই।[৩] কোথায় সেই বিশ্ব মানুষের চেতনা যেখানে এই নিদারূণ (sic) যন্ত্রণা গিয়ে বাজচে ? যদি বাজে, তবেই হয়ত মানুষ জাগবে। কত দুঃখের মধ্যে দিয়ে মানুষের জাগরণ। কিন্তু এই জাগরণও কি বেশিদিন থাকে ? আবার ঘুম আসে, যুগ যায়, দুঃস্বপ্নের তাণ্ডবের মধ্যে মিথ্যা লেলিহান হয়ে ওঠে। পৃথিবীর ইতিহাসের একটা দিক বড়ো ভয়ঙ্কর—এই বিশ্ব-processএর দিক। জানি processই সব নয়, পটের একদিক মাত্র, তাও দেখচি খণ্ড কালে—যা সব নিয়ে real. সেখানে শান্তি আছে সত্যে বিধৃত হয়ে—কিন্তু পৃথিবীতে যতদিন আছি ইতিহাসের পটে এই নিয়ত পরিবর্ত্তনলীলায় বেদনারঞ্জিত চৈতন্যের ইতিহাস চেয়ে দেখি—দৃষ্টিতে বারে বারে অন্ধকার নামে।[৪]

*Times* থেকে Mussoliniর নির্লজ্জ মানুষধ্বংসের অভিসন্ধির কাহিনীর বিষয়ে Book Review পাঠাচ্ছি এই সঙ্গে ; মূঢ় Di Bono এবং ততোধিক মূঢ় মুসোলিনী ইতিহাস ছাপিয়েচে সগর্ব্বে।[৫] এতে তাদেরই মুখের কথা নিজেরাই মিথ্যে ব'লে

দেখিয়েচে। Diplomacyতে এরা এখনো কাঁচা বললেও যথেষ্ট বলা হয় না—ইংরেজের কাছ থেকে এতদিনেও শিখল না। তবু বলব ইংরেজরা ঠিক এমন কাণ্ড করত না। যদিও অসহায়, পরিত্যক্ত আবিসীনিয়দের পক্ষে অন্য দেশের সমবেদনাবচন সত্য হলেও আজ বড়ো বেশি কার্য্যকরী নয়। আপনার কবিতায় আপনি য়ুরোপের কবিকে ডাক দিয়েচেন—হয়তো এই কবিতার উত্তর এদিক থেকে শুনতে পাবেন।

*Spectator*-এর এ সংখ্যাতেও কবিতা বেরোয়নি—ওরা আপনাকে কী লেখে জানালে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।[৬] ( হয়তো আগামী সপ্তাহে ওরা বার করবে। ) *New Statesman* বা *Time & Tide* বা *London Mercury* ( এখন আবার খুব জেগে উঠচে ) বিশেষ উৎসাহ করে' ছাপাবে।

অজিৎ (sic) লিখেচে আমার কথা আপনি উল্লেখ করছিলেন ; যদি Fazlul Huq এবং শ্যামাপ্রসাদবাবুকে আপনি আমার বিষয়ে দু লাইন এখন লেখেন আমার কাজটা হয়ে যাবে, আমি দেশে গিয়ে বাঁচব। এতদিন বাংলা দেশের বাইরে থাকার পর পাঞ্জাবে গিয়ে বাস করতে হ'লে শুকিয়ে যাবে সমস্ত জীবন—কিন্তু কাজ না পেলে লাহোরের সেই Research Grant এখানকার Vice Chancellor-এর কাছ থেকে নিয়ে যাবো। তিনিই এখন সব ব্যবস্থা করচেন। দুঃখ হচ্চে দেশে পৌঁছব জুনের প্রারম্ভে ; চীন-বিভাগ খোলার উৎসব দেখতে পেলাম না।[৭] —কাগজে একটু আধটু খবর এসে পৌঁছচ্চে, বুঝতে পারচি কী সুন্দর ব্যাপার হল এবং কত বড়ো সাধনার সূচনা। বিশ্বভারতীর প্রাণশক্তি সমস্তরকম বাধা সত্ত্বেও ক্রমাগতই তাকে বৎসরে বৎসরে বিকাশের পথে নিয়ে চলেছে, আশ্চর্য্য হই—চীনাদের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠ যোগ আরো একটা বৃহৎ পরিণতির পালা। জওহরলাল এবং অন্যেরা এসে থাকবেন—এই উৎসব সর্বভারতীয় উৎসব, বাংলার গ্রামে যে আলো জ্বলল তাতে সমস্ত দেশের নবীন চেতনায় আলো লাগল। মনে হচ্চে এতদিনে দেশ বুঝচে। আশ্রমের দিকে মুখ ফিরেচে।

দূর থেকে কল্পনায় মিশিয়ে দেখি, পুরো ছবি ঠিকমতো দেখতে পাই না।

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

অমিয়

পুনশ্চ

অনিলবাবুর জন্যে একটা চিঠি এই সঙ্গে পাঠাই।।[৮]

---

**টীকা**

১ করমায়েসী বা 'occasional' কবিতাও যে স্মরণযোগ্য হ'তে পারে তার দৃষ্টান্ত এই "আফ্রিকা" কবিতা।

২ Fraser—৪৪.১ টীকা দ্র.।

Achimota College —প্রিন্স অব ওয়েলস কলেজ ? ৪৪.১ টীকা দ্র.।

৩ Addis Abbaba —আবিসিনিয়ার (এখনকার ইথিওপিয়ার) রাজধানী। মুসোলিনির বাহিনী এর আগের বছরই আবিসিনিয়া দখল ক'রে নিয়েছিলো। দেশের সম্রাট হাইলে সেলাসি (Haile Selasse, ১৮৯০—?) তখন থেকে পাঁচ বছর কাল ইংল্যাণ্ডে স্বেচ্ছানির্বাসনে ছিলেন। মুক্ত অবিসিনিয়ায় ফেরেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে, ১৯৪১ সালে। ইতালীয় বাহিনী আবিসিনিয়া যুদ্ধে যে মারাত্মক বিষাক্ত গ্যাসের ব্যবহারে দ্বিধা করেনি আজ তা কারো মনে নেই।

৪ আবিসিনিয়া যুদ্ধের ভয়ংকরতা থেকে তাঁর মনে মানুষের ইতিহাস বিষয়ে এই চিন্তার উদয় হয়, পরে তার প্রকাশ হয়েছিলো "ঘুম" নামে একটি যথেষ্ট দুরূহ কবিতায়, যেটি 'একমুঠো' কাব্যগ্রন্থে আছে। অমিয় চক্রবর্তী বিষয়ে 'নবযুগের কাব্য' প্রবন্ধে ('চিঠিপত্র' ১১শ, পরিশিষ্ট দ্র.) রবীন্দ্রনাথ কবিতাটির দীর্ঘ ব্যাখ্যা করেছিলেন : 'বিশ্বকে কবি বিরাট ঘুমের ভূমিকায় দেখছেন। ...অকূল ঘুমের তরঙ্গ-দোলায় দুলতে-দুলতে হাসছেন মহাকাল।' রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যাটি আশা করি কেউ-কেউ লক্ষ করেছেন। [ভূমিকা দ্র.]

৫ লণ্ডনে *Times* পত্রিকার 'মিলিটারি করেসপণ্ডেন্ট' মুসোলিনির ভূমিকা সংবলিত Emilio De Bono-র লেখা *The Conquest of an Empire* বইটির আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন : 'It reveals that the Abyssinians were found to be so anxious to avoid war that in the end the Italians had to force it on them. By these compound admissions Marshall de Bono's book makes British apologists for Italy's action look particularly silly. It also makes the case... deceitful.'

৬ "আফ্রিকা" কবিতার কবিকৃত অনুবাদ লণ্ডনের *Spectator* পত্রিকায় পাঠানো হয়েছিলো। ('চিঠিপত্র' ১১শ, ৯২ দ্র.)

৭ বিশ্বভারতীর চীনা অধ্যাপক তান-উন-শান এবং সুনইয়াৎ সান্‌-এর সহকারী তাই চি তাও-এর বদান্যতায় শান্তিনিকেতনে চীন-ভারত সংস্কৃতি সমিতির ভবনের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৩৭-এর এপ্রিল মাসে সেই 'চীন ভবন' উদ্বোধন করার কথা ছিলো জওহরলালের। অসুস্থ থাকায় তিনি নিজে আসতে না পেরে কন্যা ইন্দিরাকে দিয়ে তাঁর ভাষণ পাঠিয়েছিলেন। উদ্বোধন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : 'Here students and scholars will come from China and live as part of ourselves, sharing our life and letting us share theirs, and by offering their labours in common cause, help in slowly rebuilding the great course of fruitful contact between our peoples that has been interrupted for ten centuries.'

৮ অনিলবাবু— কবির ব্যক্তিগত সচিব অনিলকুমার চন্দ।

## ৫১
### TELEGRAM

6.5.37 Oxford

Tagore
Santiniketan

Wanting advice whether any chance for me Calcutta[১] Pranams.

Amiya

---

টীকা

১ প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকের পদ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা জানতে চাইছেন অক্সফোর্ড থেকে।

## ৫২

May 8th / '37

Balliol College
Oxford

শ্রীচরণকমলেষু,

কলকাতায় আপনার চিঠি মন্ত্রের মতো কাজ করেচে—খবর পেলাম যে প্রেসিডেন্সি কলেজের একটা ভালো কাজ ওঁরা আমার জন্যে রাখতে প্রতিশ্রুত হয়েচেন। কিন্তু আমি কলকাতার কোনো কাজের জন্য আর চেষ্টা করব না। Application তাই পাঠালাম না। দূর থেকে কিছুই বোঝানো সম্ভব নয়—শীঘ্রই দেশে যাচ্চি, তখন জানাবো কেন Spalding Research Fellowship এখান থেকে নেওয়াই ঠিক করলাম। Contract সই করেচি। তিন বছর বেশির ভাগ সময়ই Lahore-এই থাকতে হবে। তার পর আমার যদি বাংলায় স্থান হয় তবে সেখানে আপন জীবন ফিরে পাবো।

এইভাবে মন ঠিক করা সহজ হয়নি—কঠিন পরীক্ষা চলেচে অনেক দিন ধ'রে। এখন অন্তরে শান্তি ফিরে পাচ্চি। এন্ড্রুজ এই কদিন আমার সঙ্গে ছিলেন, তিনি এবং এখানকার Vice Chancellor আমার সঙ্কল্পের অনুমোদন করলেন।

প্রথম মাস তিনেক বাংলাদেশেই থাকব। জুনের মাঝামাঝি যদি আলমোড়ায় থাকেন তাহলে সিমলা থেকে ফেরার পথে একবার আপনার ওখানে যেতে চাই।

এমাসের শেষ পর্য্যন্ত এখানেই আছি। সামনের পথ কিছুই পরিষ্কার দেখতে পারচি না—কী কারণে স্বদেশে গিয়েও নির্ব্বাসন মেনে নিলাম তা চিঠিতে বলা সম্ভব নয়। আজ আপনার আশীর্ব্বাদ কামনা করি।

প্রণত
অমিয়

20th May [1937]

Balliol Coll.
Oxford

Woodbrooke-এ গিয়েছিলাম—পৌঁছেই Harry-র [১] মৃত্যুসংবাদ পেলাম। সেবার কাজে গ্রামে গ্রামে নিরন্তর ব্যস্ত ছিলেন, নিজের শরীরের একটু যত্ন করেননি, হঠাৎ Typhus হয়ে মারা গেলেন। Rebecca মেয়েদের নিয়ে দেশে ফিরে যাবেন।

Harry-র স্মরণে আমাদের আশ্রমে যদি কিছু করা হয় এদেশের বন্ধুরা জানতে পারলে সুখী হবেন।

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন।

প্রণত
অমিয়

---

**টীকা**

১ Harry (Timbres)—৫.৩ টীকা দ্র.।

লীলা মজুমদার তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন : '(সুরুলে) সপরিবারে একতলা এক বাড়িতে থাকতেন, কোয়েকার সম্প্রদায়ের লোক তাঁরা, যতদূর মনে পড়ে সোসাইটি অব ফ্রেণ্ডস কি ঐ ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে এসে আমাদের দেশের দুঃখ দূর করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, টাইফাস ইত্যাদি রোগের বিশেষজ্ঞ। ...তাঁদের অনাবিল স্নেহ, অকুণ্ঠ আতিথেয়তার কথা ভুলবার নয়। সে সময়ে ওসব অঞ্চলে দারুণ ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল। ...ডঃ টিমবার্স ভালো নাচ জানেন, রুশ কস্যাক নাচে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখান। কবি তাঁকে দিশী নাচ শিখিয়েছেন, শাপমোচনে একটি প্রধান ভূমিকায় নামিয়েছেন, নাচছেও সাহেব খুবই ভালো বলতে হয়, তবে বড় বেশি দুম-দুম ধুপ-ধুপ শব্দ হচ্ছে, স্টেজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সকলের মহা ভাবনা।'

এঁর বিষয়ে নেপালচন্দ্র মজুমদার সম্প্রতি বই লিখেছেন—'রবীন্দ্রনাথ ও হ্যারি টিম্বার্স' (১৯৯০)।

## ৫৪

July 1st / '37

HOTEL DU ROY RENÉ
Aix En Provence [১]
(B. Du. R.)
Telephone 3-02

শ্রীচরণকমলেষু,

কাল সন্ধ্যায় জাহাজে উঠ্‌ব—য়ুরোপ থেকে বিদায় নেব। যাওয়ার আগে আমার অজানা এই জায়গায় দুদিন বিশ্রাম করচি—ভিড়ের ধূলি মন থেকে মুছে নেবার জন্যে। গাছের বাতায়নের তলে এই কাফে—সামনে লোক চলেচে; নীচুতে আঙুরের ক্ষেত, ঢালু পাহাড়ের পথে সূর্য্যের আলো পড়েচে; পুরোনো Provence-এর গির্জে এবং বাড়ির ছাদ দেখা যায়। আকাশে অদূর সমুদ্রের হাওয়ার স্পর্শ। য়ুরোপ ছাড়বার আগে এই একটি অপরাহ্ন (sic) পেলাম।

শীঘ্রই শান্তিনিকেতনে গিয়ে আপনাকে প্রণাম করতে পারব। আমার নূতন জীবনের অধ্যায় আরম্ভ হবে।

আশা করি আশ্রমের কল্যাণ চলচে, আপনি ভালো আছেন। রথীবাবু এবং প্রতিমা দেবীকে আমার প্রীতিনমস্কার জানাবেন।

প্রণত
অমিয়

---

টীকা

১ আইক্স্ অঁ প্রভঁস্—দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রান্সে মার্সাই-র উত্তরে সুন্দর শহর। অক্সফোর্ড থেকে ডিগ্রি নিয়ে প্রায় চার বছর পরে দেশে ফিরছেন অমিয় চক্রবর্তী।

## ৫৫

July 16th [1937]

Damascus [১]

Strathaird জাহাজে ২৯শে জুলাই বোম্বাইয়ে পৌঁছব—দেশে নেমেই যদি জানতে পারি আপনি তখন কোথায় থাকবেন তাহলে সেখানে যেতে পারি। যদি P & O জাহাজের ঠিকানায় অনিলবাবু আমাকে একলাইন লেখেন তাহলে বিশেষ রকম উপকৃত হব। Palestine-এ আরব-ইহুদি সমস্যা কঠিন হয়ে উঠচে— কয়েকদিনের জন্যে তার একটু বাহিরে এসে দৃষ্টি পরিষ্কার করে নিচ্চি। Jerusalem-এ ফিরে যাব—আরবদের দিকটা

আরো ভালো বোঝা দরকার—তারা সকল দিক থেকে বন্ধু হারাচ্চে।[২]

এই প্রাচীন সহর ভারি আশ্চর্য্য লাগচে— বহু যুগের নানা রং মিশে এক অদ্ভুৎ (sic) ব্যাপার।

প্রণত
অমিয়

---

**টীকা**

১ জাহাজে ক'রে দেশে ফিরতে-ফিরতে অ.চ. মধ্যপ্রাচ্যের কোথাও নেমে পড়েছিলেন জাহাজ থেকে, দামাস্কাস জেরুসালেম হ'য়ে হয়তো পোর্ট সৈয়দে গিয়ে আবার জাহাজ ধ'রেছিলেন। তখনকার দিনে ঐ একটা মস্ত সুবিধে ছিলো জাহাজে দেশভ্রমণের। জেট্ প্লেনের খাঁচার মধ্যে ঘুমোতে-ঘুমোতে মহাদেশ মহাসাগর পেরোতে হ'তো না। জাহাজে ভ্রমণের পাট এখন উঠে গেছে।

সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাস, হিব্রু জাতির প্রতিষ্ঠাতা আব্রাহামের কালেও বিখ্যাত ছিলো। শোনা যায়, এটি পৃথিবীর প্রাচীনতম শহরের একটি যেখানে কখনো ফাঁক না দিয়ে একাদিক্রমে মানুষ বাস ক'রে আসছে। ইরাক এখান থেকে দূরে নয়।

২ প্যালেস্টাইনের আরব-ইহুদী সমস্যার কথা এলোমেলো ভ্রমণসূত্রে এসে প'ড়েছে ব'লে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন থেকেই এদের জটিল সমস্যা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। সেই সূত্রে অমিয় চক্রবর্তীর উৎসাহ।

নজরুলের কবিতায় মধ্যপ্রাচ্যের প্রসঙ্গ আছে, রবীন্দ্রনাথ একবার আরব বেদুইনের প্রসঙ্গ এনেছেন কবিতায়। পরে একমাত্র অমিয় চক্রবর্তী ছাড়া আর কারো কবিতাতেই মধ্যপ্রাচ্য নেই। প্যালেস্টাইনের ইহুদীর প্রসঙ্গ দেখা যাবে 'অভিজ্ঞানবসন্তে'র "হাইফা" কবিতায়। [ 'ভূমিকা' দ্র.]

## ৫৬

শুক্রবার [১৯৩৭]

[কলকাতা?
অগস্ট-সেপ্টেম্বর?]

শ্রীচরণকমলেষু,

Gilbert Murrayর বইটা পাঠাই—খুব সরস ক'রে লিখেচেন।[১]

কাল সন্ধ্যায় আশ্রমে যাচ্চি। শ্যামাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে অনেক কথা হল। আপনার বাংলা বইয়ের জন্যে উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করচেন। তারই উপর সবাই নির্ভর ক'রে আছেন— আপনাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে বললেন।[২]

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন।

প্রণত
অমিয়

টীকা

১ Gilbert Murray—১১.৭ টীকা দ্র.

২ শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই কলকাতায় অধ্যাপনার সম্ভাবনা বিষয়ে কথা হয়। তিনি কি অমিয় চক্রবর্তীকে রবীন্দ্রনাথের উৎসর্গ সমেত 'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬) বইটি দেখার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন?

## ৫৭

রবিবার
[January 1938]

LAKSHMI MANSIONS[১]
THE MALL
LAHORE, India.

শ্রীচরণকমলেষু,

জাপানে লেখা আপনার চিঠির কপি ডাক্তার দত্তকে দেখিয়েছিলাম—উনি অত্যন্ত বিচলিত হলেন এবং বললেন কয়েক লাইনে আপনি সমস্ত এশিয়ার বেদনা এবং বিশ্বাসকে ভাষা দিয়েছেন।[২] ওঁর আশা এই যে লেখাটি সর্ব্বজনের জন্যে প্রকাশিত হয়। কত করুণা

দিয়ে আপনি জাপানেরই আসল কথা বলেচেন—এই চিঠি প'ড়ে হঠাৎ মনে জেগে ওঠে রাষ্ট্রযন্ত্রে চাপা-পড়া মূর্চ্ছিত জাপানী সমাজের কথা।

এখানে বিশ তারিখে জওহরলাল আসবেন, তাঁকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব রাজনীতির সম্পর্ক বাদ দিয়ে চীন জনসমাজের জন্য সমগ্র ভারতের বিদ্যাকেন্দ্রগুলিতে আমরা কী করতে পারি। আমরা দিতে পারি সামান্য অর্থসাহায্য, আমাদের ব্যথিত চিত্তের শ্রদ্ধা—কিন্তু আজকের দিনে এরও মূল্য কম নয়।[১] ইথিয়োপিয়ার সম্রাট দুঃখ করেছিলেন বহুদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ থেকে বড়োরকম বাণী তাঁদের কাছে পৌঁছয়নি চরম যন্ত্রণার কালে—মহাত্মাজি প্রকাশ্যে কিছু বলতে চাননি— একটা সময় ছিল যখন ভারতবর্ষ থেকে ঐরকম বাণী এসে পৌঁছলে ওঁদের কিছু সহায়তা হত। আপনার কবিতা যখন বেরোলো আফ্রিকা সম্বন্ধে তখন আপনার নিজের রচিত ইংরেজি তর্জ্জমা তাঁর হাতে দিয়েছিলাম তিনি শান্তি পেয়েছিলেন। শুধু তাই নয় উগাণ্ডার রাজকুমার আমাদের বন্ধু নীয়া বঙ্গো আপনার রচনাটি সমগ্র আফ্রিকার বান্টু এবং সোয়াহিলীভাষী আফ্রিকানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।[১] আমার মনে হয়েছিল, যখন অনেক কিছুই খবরের কাগজের কালিছাপায় কালো হয়ে মিলিয়ে যাবে তখন এই কবিতা আফ্রিকা এবং ইথিয়োপিয়ার নবজাগ্রত মানুষসমাজে নূতন হয়ে জ্বলতে থাকবে। আজকের চীনদেশব্যাপী দুঃখের দিনে ভারতবর্ষ যে-ভাবে জেগেচে তার পিছনে আমাদের চিত্তবৃত্তি শুধু নয় কল্যাণবুদ্ধিনিয়ন্ত্রিত সংঘচেষ্টার উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে—কংগ্রেস আপনার নাম এবং দামকে সামনে রেখে সমস্ত ভারত জুড়ে মঙ্গলচেষ্টার ব্যবস্থা করেচে। যে-পৃথিবীতে বেঁচে আছি তার চরম গতি সম্বন্ধে বিশ্বাস ফিরে পাই যখন এইরকম করুণার মূর্ত্তি হঠাৎ দেখা দেয় শত কালিমার মধ্যেই।

অসীমের অভিমুখে চলমান এই বিশ্বের তাৎপর্য্যের কথা আপনি লিখেচেন—বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের আলোয় তাকে দেখবার কথা। চিরদিনই আপনার কাব্যে কল্পনার সত্য জ্ঞানের তথ্য অপরূপ হ'য়ে উঠেছে—তাতে কত সুর লেগেচে, দুপুর বিকেলের আলো পড়েচে —স্বচ্ছ আকাশের প্রাচীনতা এসে মিলেচে অনন্ত নূতনের আনন্দে। আজ আপনার বিজ্ঞানের বইয়ে সেই সৃষ্টি পেলাম অন্য দিক থেকে।[১]

"আমার জগতে" আপনি কবির ধ্যান দিয়ে বিজ্ঞানকে যাচাই করেছিলেন ; আজকে নববিজ্ঞানের আয়তন হতে আপনি কবির জগৎকে কাছে এনেছেন। মনে হয় নূতন কবিতাগুলিতে বিশিষ্ট সুরের মধ্যে আজকের এই দিক-পরিবর্ত্তনের কথা আছে। আশা করচি 'প্রান্তিক' বইখানি যখন পাবো তাতে এই সন্ধানের পথে এগিয়ে যেতে পারব। পশ্চিম পৃথিবীতে আজ যা খুঁজচে তার উত্তর আছে আপনার কবিতায়—ঠিক রকম তর্জ্জমা হ'লে ওরা বুঝবে।[১]

কবি ইকবালের একটি বই আপনাকে পাঠালাম। এঁকে ব্যক্তিগত ভাবে বড়োই ভালো লাগে। জীবনে বহু ভুল করেচেন, শাস্তি পেয়েচেন ভয়ানক ; এখন বিচার করতে চান না বিশ্বকে, একটি মাধুর্য্য আছে এঁর যথার্থ বিনয়নম্র আচরণে। সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীরী

পণ্ডিতবংশের বুদ্ধি এবং শ্রেষ্ঠ ইসলামি আভিজাত্য একজায়গায় মিশেচে। কিন্তু শরীরের অসহায় অবস্থায় ইনি পরের উপর একান্ত নির্ভরশীল— বেঁচে আছেন ছোটো মুসলমানদের মুখ চেয়ে। এতে এঁর চিরদিনের খর্ব্বতা ঘটেছে—মুসলিম লীগের হাওয়ায় কাব্য শুকিয়ে একরকমের ফরমাসী ইসলামী ফুল তৈরি হচ্চে। মতামত আমাদের সঙ্গে প্রায় কোথাও একটু মেলে না। কিন্তু এও জানি উনি যাকে ইসলামী বলচেন তা ওঁর একান্ত দূরের কল্পনায় গড়া প্রতীক—অনেক খৃষ্টানও এইভাবে খৃষ্টান ইতিহাসের একটি কল্পমূর্ত্তিকে সমস্ত সত্যের একমাত্র পরিচয়রূপে পূজা করে থাকেন। দৃষ্টিতে অন্ধপ্রায়, চলৎশক্তিরহিত, কথা বলার শক্তিও প্রায় গেছে, এই অবস্থায় মনের একটি অস্বাভাবিক সংকীর্ণ উগ্রতার মধ্যে রচনার তৃপ্তি পান। বইখানিতে যথেষ্ট গভীর দৃষ্টির সঙ্গে এই মনোবৃত্তির মিশোল দেখতে পাই। অথচ, ব্যবহারে, ব্যক্তিগত যে-কোনো আচরণে উনি একাকী সহজ মানুষ।[৭]

পঞ্জাবের কবি ভাই বীরসিং অতি আশ্চর্য্য দরদী লোক। অমৃতসরে উনি একটি বড়ো সাধনার কেন্দ্রস্থল—'গুরুজী' ব'লে উনি যে-ভজনের গান গেয়ে ওঠেন তার ব্যাকুলতায় কাব্যপ্রকাশের মাধুর্য্য এসে লাগে। শিখ মেয়েদের মধ্যে যে আশ্চর্য্য সুন্দর জাগরণ এসেচে তার অনেকটা ওঁরই জন্যে। অথচ উনি প্রান্তবাসী কবি এবং সাধক।[৮] এখানকার হিন্দুদের দশা বাংলারই মতো—কোনোদিকেই পেরে উঠচে না অথচ বুদ্ধিও আছে গর্ব্বও আছে। আমি চেষ্টা করচি মধ্য এশিয়ার দিকে আরো [...] এখান থেকে বামিয়ান হেরাট ছাড়িয়ে [...] [৯] ধারে দাঁড়ালে মানুষজাতির আরেকটা ছবি দেখতে পাব কিন্তু তার আগে একবার বাংলায় যাওয়া দরকার। এখনো ভেবে পাচ্চি না কী ক'রে হবে।

প্রণত
অমিয়

সেমন্তী আপনার ছবি-চিঠি পেয়ে অবধি সে-বিষয়ে কিছু বলে না, ওর ছোট একটা বাক্সে সেটা আছে, প্রায়ই মধ্যে মধ্যে দেখে আবার রেখে দেয়। আমাদের সঙ্গেও আলোচনা করে না। কী একটা ওর স্বতন্ত্র জীবনের ভিত্তি ঐখানে আছে আমরাও জানি না। শান্তিনিকেতন ওর কাছে একান্ত আপন অথচ নীরব একটি জীবন—সমস্ত পাতা ফুল, তাল গাছ, মাঠ, আশ্রমের ঘণ্টা, শ্রীভবনের মেয়েদের ধোপাবাড়ির কাপড় এলে আনন্দ, গান, নাচ সব মিশে ওর কী একটা স্বপ্নের মতো হয়ে আছে। অথচ এখানেও অনেক শিখচে এবং বড়ো হয়ে উঠচে। কিন্তু এখানকার স্কুলে বা সমাজে ওর ঠিক আপন বোধ নেই দেখতে পাই।[১০]

---

**টীকা**

১ অক্সফোর্ড থেকে দেশে ফিরে কর্মস্থল লাহোর থেকে এটি রবীন্দ্রনাথকে লেখা প্রথম চিঠি। লাহোরে আমেরিকান মেথডিস্টদের ফরমান ক্রিশ্চিয়ান কলেজে ১৯৩৭ থেকে

১৯৪০ পর্যন্ত অবৈতনিক প্রফেসর ছিলেন। প্রধান কাজ ছিলো অক্সফোর্ডের বৃত্তির শর্ত অনুযায়ী গবেষণা করা। (৩৬.৭ টীকা দ্র.)। লাহোরের ম্যাল-এ লক্ষ্মী ম্যান্‌শনস্‌ ছিলো পরবর্তী তিন বছরের স্থায়ী ঠিকানা।

তখনকার লেখা নতুন কবিতায় লাহোর এবং উত্তর ভারতের অনেক অভিজ্ঞতা এসে মিশেছে, 'একমুঠো' এবং 'খসড়া' পড়লেই বোঝা যায়।

২ জানুয়ারির গোড়ায় পাঠানো পূর্বের এক চিঠির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জাপানকে লেখা পত্রে'র কপি পাঠিয়েছিলেন অমিয় চক্রবর্তীকে। ('চিঠিপত্র' ১১শ, ৯২)। অমিয় চক্রবর্তীর লেখা এই জবাবে 'জাপানে লেখা'-র পরিবর্তে 'জাপানকে লেখা' পড়তে হবে মনে হয়। ১৯৩৬ সাল থেকে জাপানী আক্রমণে হতবল চীনে দুর্দশার অন্ত ছিলো না। কঠিন পীড়া থেকে উঠেই জাপানকে এই বর্বর আচরণের জন্যে ধিক্কার দিয়ে তাঁর চীনে বন্ধুদের কবি লিখেছিলেন: 'I who have many friends feel grievously hurt that the brave people of Japan should be misled by their rulers into betraying the best ideals of the East and that we who should be loving them, should now invoke their defeat that they may wake to their wrong.' (*Visva-Bharati News*. October, 1937)। অমিয় চক্রবর্তী নিশ্চয়ই এই চিঠির কথাই বলছেন।

৩ বিপদের দিনে পাশে গিয়ে দাঁড়াবেন ব'লে জওহরলাল যুদ্ধে বিধ্বস্ত চীনে যান ১৯৩৯-এর অগস্ট মাসে।

৪ মুসোলিনির আবিসিনিয়া আক্রমণের সময় লেখা "আফ্রিকা" কবিতার উল্লেখ করছেন। (৪৫.১ ও ৪৬.১ টীকা দ্র.)

৫ জ্যোতির্বিজ্ঞান ও প্রাণবিজ্ঞান নিয়ে কবির লেখা আশ্চর্য বই 'বিশ্বপরিচয়' (১৯৩৭)।

৬ 'প্রান্তিক'ও প্রকাশিত হয় ১৯৩৭-এ। সদ্য-সদ্য মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার প্রচণ্ড অভিজ্ঞতা ছায়া ফেলেছে এই গ্রন্থের অনেক কবিতায়।

৭ কবি ইক্‌বালের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর পরিচয় ঘটে লাহোরে থাকার সময়। 'সাম্প্রতিক' (১৯৬৩) নামে ছাপা তাঁর একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থে দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ আছে ইক্‌বাল বিষয়ে: 'যুগ সংকটের কবি ইকবাল' ও 'ইকবাল কাব্যের নতুন প্রসঙ্গ'। ব্যক্তিগতভাবে ইক্‌বালকে জেনে তাঁর মনে হয়েছিলো—'একেবারে ভারতীয় এবং আধুনিক তাঁর চিন্তার সৌন্দর্য।... দামাস্কুস-কাইরো থেকে পঞ্জাব পর্যন্ত পারসিক উর্দু ভাষায় লোকের মন নাড়িয়েছেন।... কেমব্রিজের ইনি মেধাবী পণ্ডিত; এঁর মতো চোস্ত ইংরেজি গদ্য কম ভারতীয় লিখেছেন।'

৮ হিন্দু-শিখ-ইসলামের উৎকর্ষজাত বৈচিত্র্য রক্ষা ক'রেও ভারতীয় ঐক্য সাধনাকে যাঁরা নবযুগে উত্তীর্ণ করতে চেয়েছেন তাঁদের মধ্যে পঞ্জাবের ভাই বীরসিং (১৮৭২-?) ছিলেন অগ্রগণ্য ধর্মসাধক এবং মনস্বী কবি। এঁর বিষয়ে বাংলা ভাষায় অমিয় চক্রবর্তী ছাড়া আর কারো লেখা আছে ব'লে মনে হয় না। ('সাম্প্রতিক' দ্র.)

৯ এই অংশ কীটদষ্ট, পড়া যায় না।

১০ অমিয় চক্রবর্তীর কন্যা সেমন্তীকে ছবি-আঁকা-চিঠি পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'সেমন্তীকে কিছুকাল আগে একখানা চিঠি পাঠিয়েছিলুম। সেই চিঠিতে তার সঙ্গে ছবির পাল্লা দিয়েছি—এ প্রতিযোগিতায় আমার জিৎ হবার কোনো সম্ভাবনা নেই —তবু স্পর্দ্ধা ক'রে চেষ্টা করেছি।' ('চিঠিপত্র' ১১শ, ৯২)। সেমন্তী নামটি কবির দেওয়া।

২১ জানুয়ারি [১৯৩৮]

LAKSHMI MANSIONS
THE MALL
LAHORE, INDIA

শ্রীচরণকমলেষু,

রথীবাবুর চিঠিতে সব খবর পেলাম। ঠিক সময়েই Educational Commissioner Sargent-এর সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা হয়েছিল।[১] আমার তো দৃঢ় বিশ্বাস Sargent উৎসাহিত হবেন এবং India Govt.-এর কাছ থেকেও grant-এর ব্যবস্থা করবেন। রথীবাবুর কথামতো তাঁকে লিখলাম—Oxford এবং নানা বন্ধুর সূত্রে তাঁর উপরে দাবী আছে, হয়তো এই সময়ে কাজে লাগাতে পারব।

ভারতী আশ্রমে পৌঁছে থাকবে—Eliotকে তার কবিতা পাঠিয়েছিলাম, খুবই প্রশংসা ক'রে লিখেচেন।[২] আজকাল ইংরেজ publisherরা বিশেষ বিশেষ সাহিত্যিক দলের পৃষ্ঠপোষক— ভারতীর কবিতা কোনো দলে পড়চে না ব'লে Faber বা Hogarth Press আগ্রহ সত্ত্বেও ছাপতে পারচে না। হয়তো Macmillanরা নেবে—যদি Daniel Macmillanকে বলা যায়—তারা কোনো দলের নয়।

*London Mercury*-তে পাগলের রচনার উত্তর Andrews দিলে ভালো হয়—ইংরেজ অথচ ভিতর থেকে শান্তিনিকেতন অনুষ্ঠানকে জানেন এমন লোকের লেখা দরকার। Ranald Newson কে তা জানলে Scott James তাঁর কাগজে কখনো ছাপতেন না, আশ্রমের বিশেষ বন্ধু এই ব'লে পরিচয় দেওয়াতে লেখাটা বেরিয়েচে।[৩] যাই হোক, ঐ প্রবন্ধ প'ড়ে লেখকের প্রতি সবাই দয়া প্রকাশ করচে : ওটা একটা হাসির জিনিষ হয়েচে।

আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন।

—অমিয়

---

**টীকা**

১ অক্সফোর্ডের স্নাতক এবং শিক্ষা পদ্ধতির বিষয়ে বিশিষ্ট ভাবুক (Sir John Philip) Sargent (১৮৮৮-১৯৭২) স্বাধীনতার ঠিক পূর্বে এবং পরেও কিছুদিন (১৯৩৮-১৯৪৮) ভারতে সরকারি শিক্ষাবিভাগের কমিশনার এবং উপদেষ্টা ছিলেন। এদেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

২ ভারতী (সারাভাই)—৪৯.১১ টীকা দ্র.। *Visva-Bharati Quarterly*-তে (Vol.4) E. E. Speight এঁর লেখা ইংরেজি কবিতার আলোচনা করেছিলেন।

৩ কমবয়সী ছোটো মানের ইংরেজ কবি Ranald Newson ১৯৩৪ সালে কিছুদিন শান্তিনিকেতনে ইংরেজি পড়াতেন। গভীর একটি নৈরাশ্যবোধ ছিলো তাঁর মধ্যে, তাই রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অচঞ্চল আশার সুর তাঁর শুধু বিরক্তি উদ্রেক করতো,

যদিও আশ্রমের প্রাকৃতিক শোভা তাঁর প্রিয় ছিলো। দেশে ফিরে গিয়ে ১৯৩৫ সালে হঠাৎ আ... ত্যা করেন। পরে এঁর অপ্রকাশিত কিছু কবিতা এঁর ভাই আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কৃষ্ণ কৃপালনী কবিতাগুলি লেখকের পরিচিতি সহ *Visva-Bharati Quarterly*-তে (II. 3-4) ছাপিয়ে দেন। *Winter Pastoral & Other Poems. Sapho* প্রভৃতি কিছু কবিতার বই লিখেছিলেন।

## ৫৯

৯ই ফেব্রুয়ারি [১৯৩৮]

LAKSHMI MANSIONS
THE MALL
LAHORE. INDIA

শ্রীচরণকমলেষু,

হারাপ্পায় গিয়েছিলাম—সেখানে আপনার চিঠিতে আঁকা দিনযাপনের রৌদ্রেলেখা ছবি আমার কাছে অর্থে ভ'রে উঠল।[১] কত যুগের প্রাচীন দিন তার ভাঙা খেলনা, নামের অচেনা অক্ষর ফেলে রেখে দিয়ে গেছে, সরু ইটের সারি ঢাকা ফাটলে বিলুপ্ত সমাজের চিহ্ন (sic) খুঁড়ে বার ক'রচে প্রত্নতাত্ত্বিক। অথচ যে-দিন যাবার নয়, তাদের কালের সেই দিনের মালা অশ্রুতে হাসিতে মিলে আমাদের মনের মধ্যে জাগল—যা দেখলাম তার মধ্যে কালের পরিমিতি নেই। কি আশ্চর্য্য কাজ-করা প্রাক-সুমেরীয় মূর্ত্তি, গহনা, ধুলোর স্তরে পড়ে আছে ; সুন্দর মাটির বাসনে নিভৃত সংসারের সুর লেগে রয়েচে। পঞ্জাবের নিস্তব্ধ দুপুর। ধূসর মাঠের ধারে কচি সবুজের ফালি। ক্যানালের জল পেয়ে গাছে মানুষে শর্ষে যবের ক্ষেতে বসতি পেতেচে। নূতন বাঁধা গ্রামখণ্ডগুলিতে মানুষের নূতন আশা পর্য্যবসিত। যারা এসেচে শিখ, হিন্দু, মুসলমান চাষী তাদের মুখ প্রসন্ন, কাজের সমবায়ে বাহিরের বিরোধ এসে পৌঁছয়নি। প্রাচীন মাটিকে প্রাণ দিয়েচে যে যথার্থ বিজ্ঞানবুদ্ধি তার সঙ্গে এদের কল্যাণের যোগ। দূরকালের দিনের সঙ্গে মিলেচে আজকের দিন—Grecian Urn-এ যে একটি চিরন্তন দিন ফুটে উঠেচে এ সেই চিরন্তন দিন। এরি কথা আপনি চিঠিতে বলেচেন। মানুষের অলক্ষ্য চেতনায় গাঁথা সোনার প্রহর আকাশে দেখা দিল। একান্ত বেদনা পেলাম যখন এরি মধ্যে আমাদের ঐতিহাসিক অভিযানের দলপতি ডাক্তার ফাব্রি এই পরিপূর্ণ বোধকে ভেঙে দিলেন।[২] বিজ্ঞানের এই আরেক মূর্ত্তি। জানার অভাব নেই, কিন্তু খণ্ড-খবরের ঝুড়িতে বোধনের সামগ্রী ধরা পড়ে না। শ্রদ্ধাহীন বুদ্ধির গর্ব্বে ইনি মহেঞ্জদরোর যুগের খেলনা, মূর্ত্তি তুলে ধ'রে অনেক তথ্য জানালেন, কিন্তু বললেন "barbaric"। তারা ধুলোর মধ্য থেকে উত্তর দেবার চেষ্টা করল না। ভারতবর্ষের মাটিতে বলেই তারা আরো হল সভ্যতার বহির্ভূত। আকাশের আলোক খানিকখনের জন্যে কঙ্কালে ভ'রে উঠল। মৃত্যুকে দেখলাম বাধার রূপে—উগ্র বুদ্ধির মধ্যে দিয়ে। বিজ্ঞানের

যে-দিক আজ কঙ্কালের স্তূপ জড় করচে পৃথিবী জুড়ে তার ঝোড়ো আলোয় দিগন্ত অবধি বিঘ্ন ঘটালো। হাঙ্গেরিয়ান জ্ঞানীর কথাও ক্রমে বিলুপ্ত হল—আমরা পথিকের দল এগিয়ে চল্‌লাম। পথের ধারে ভগ্নস্তূপের অনতিদূরে গ্রামের ছেলে জিয়ল গাছের চারা লাগাচ্চে। শিখেরা সযত্নে একটি নূতন গুরুদোয়ারা বানাচ্চে যাতে তীর্থযাত্রী বিশ্রাম পায়; সর্ব্বজাতের আমরা তাদের অভ্যর্থনায় পাথরে-বাঁধানো ক্ষুদ্র জলাশয়ের ধারে বস্‌লাম বিরল মন্দিরের আয়তনে। আসবার সময় মনে হল একটি পরিপূর্ণ দিন কেটেচে।

আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন।

প্রণত

শ্রীঅমিয়

---

**টীকা**

১ ইরাবতীর দক্ষিণ তীরে, বর্তমানে পাকিস্তানের ম'টগোমারি জেলায় অবস্থিত হারাপ্পার মাটি খুঁড়ে খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার বছরের প্রচীন সিন্ধুসভ্যতার ভগ্নশেষ বেরিয়েছিলো এর কিছুদিন আগে। লাহোরে বাসকালে অমিয় চক্রবর্তী উত্তর ভারত ও সংলগ্ন ভূখণ্ডে ঘুরে বেড়িয়ে প্রাচীনকালের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিষয়ে নিবিষ্টভাবে অত্যন্ত প্রত্যক্ষ জানার সুযোগ ক'রে নিয়েছিলেন। ১৯৪২ সালে কবিতাভবন-প্রকাশিত 'মাটির দেয়াল' পুস্তিকায় "হারাপ্পা" কবিতার সঙ্গে এ-চিঠির অভিজ্ঞতার মিল আছে।

উল্লিখিত 'চিঠিতে আঁকা দিনযাপনের রৌদ্রেলেখা ছবি' রবীন্দ্রনাথ পাঠিয়েছিলেন ১৯৩৮-এর ১ ফেব্রুয়ারি: 'নিজের দিকে তাকিয়ে ভাবচি, দিনের পাওনা দিন আমাকে দিয়ে যাচ্চে, তার প্রয়াস নেই, তার বোঝা নেই, তার দাম নেই যেমন আমার বাগানের বাতাবীনেবুর গাছে যে রোদ ঝিলমিলিয়ে উঠচে তার কোনো দাম নেই।' ('চিঠিপত্র' ১১শ, ৯৪)

২ হাঙ্গেরির সংস্কৃতবিদ এবং শিল্পকর্মের সমঝদার পণ্ডিত চার্লস্ লুইস্ ফাব্রি ১৯৩৪ সালে একবার শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন।

## ৬০

১৭ই ফেব্রুয়ারি [১৯৩৮]

Principal's Office
Khalsa College, Amritsar

শ্রীচরণকমলেষু,

এখানে আমরা সবাই এসেচি দুদিনের জন্যে—বক্তৃতার কাজে, তা ছাড়া অমৃতসরের এই বিদ্যায়তনে থাক্‌তে চেয়েছিলাম। এটা শিখদের রাজত্ব বিশেষ;

বহুবিস্তৃত মাঠ, বাগান, সৌধের সারি নিয়ে খালসা কলেজ। ক্রমেই বেড়ে চলচে। নিজেদের যব ধানের ক্ষেত, শস্যাগার, গোশালা, ফল ফুল তরকারীর আয়োজন। প্রাচীন গাছের ছায়ায় কলেজের ছেলেরা পড়চে, খেলার, বিজ্ঞানচর্চ্চার আধুনিক ব্যবস্থা—অধ্যক্ষ যোধ সিং রিসর্চ্চের দিকটাও গ'ড়ে তুলেছেন। আমি এঁদের বলচি শিখদের তরফ থেকে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যোগ স্থাপন করা উচিত। কথাটা ওঁর মনে লেগেচে। আজ ডাক্তার ভাটনাগার এখানে আসচেন—ইনি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের Dean of Instruction. বিজ্ঞান বিভাগের বাহিরেও এঁর প্রতিপত্তি।[১] এঁরা সকলে মিলে যদি এই সময়ে জাতীয় বিদ্যাকেন্দ্রগুলির মধ্যে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন তাহলে আসন্ন দুর্য্যোগের দিনে ভারতবর্ষে অনেক মার সহ্য হবে। শিখরা এ-কথা বুঝচেন, যদিও সাম্প্রদায়িকতায় এঁরা কারো চেয়ে কম নন। সংখ্যায় কম ব'লে কংগ্রেসের সঙ্গে মেলা ছাড়া উপায় নেই; আকালিরা যথার্থই সাম্যতন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত। সৌভাগ্যের কথা, রাষ্ট্রিক বুদ্ধির বাহিরেও সভ্যতার ভিত্তি রচনার কাজে শিখদের দায়িত্ব জেগেচে—শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রসঙ্গ তাই এখন ওঁদের কাছে আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠেচে।

ভাই বীর সিং যথার্থ কবি, বিশিষ্ট একটি সুর আছে তাঁর কথায়, লেখায়। নকল বন্ধু পুরান্ সিং এঁর অনেক ক্ষতি ক'রে গিয়েচেন।[২] তাঁর মৃত্যুর পরে একথা এঁরা বুঝেচেন। পুরান্ সিং-এর রচনা সহ্য করতে পারি না। ভাই বীর সিং-এর বড়ো কবিতাগুলির কিছু অংশ অন্যের সাহায্যে গুরুমুখী থেকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করব। কাল আমরা তাঁর বাগানবাড়িতে গিয়ে সময় কাটালাম, সৌম্য সুন্দর তাঁর ব্যবহার কোথাও কোনো লুকোনো ছুরি নেই যা ইকবালের বাক্যেও দেখা দেয়—অথচ এঁরও বুদ্ধির ধার আছে। এখন ইনি ছোটো কবিতা ছাড়া বড়ো বিশেষ লেখেন না—অনেকটা আপনার স্ফুলিঙ্গের ধরনের। পরশু দিন কোনো ভক্ত ওঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল—"poetic inspiration"এর অর্থ কী? উনি যা লিখে দিলেন তা এই—

মেঘ ঘনায় নীচ থেকে উপরে।
দূর আকাশে তার গতি।
আর ভাষা?
অজানিত মেঘের বুকে চমকায় দামিনী
চকিত আলোকে দেখে সে নিজেকে,
দীপ্ত হয় পৃথিবীতে।।

আরো দুটি ছোটো কবিতার নমুনা দিই—যদিও এগুলি বাছাই করা নয়, হঠাৎ-লেখা ভাবের টুকরো।

"আমরা ফুল, সৌরভের দোকান খুলেচি—
ভিড় ক'রে আসবে লোক, খুসি হয়ে ফিরে যাবে।
তুমি চাও ছিঁড়তে কুসুম, মুহূর্ত্তের অধিকারে সর্ব্বস্ব হারাতে,

হাতের মুঠোয় পুরতে কালো-করা পাপড়ি—
গন্ধের দাক্ষিণ্যে আনতে হঠাৎ আবসান।
মুক্ত অরণ্যের ভাণ্ডারে তোমার আনন্দ নেই।”

*

“চোখ দিতেন বিশ্বকর্ম্মা যদি খুলির উপর দিকে,
চাইতাম আকাশে, পাখীর মতো।
চোখ পেয়েচি কপালের নীচুতে,
বিধিনির্দ্দেশে বাঁধা আমি মাটির দৃষ্টিতে।”

“চোখ আছে বটে কপালের নীচুতে,
সঙ্গে আছে বিধিদত্ত ঘাড়,
ইচ্ছেমতো চোখকে নীচু উঁচু চালাবার জন্যে।
বিধিনির্দ্দেশে দেখার-দৃষ্টি নেই,
মানুষের ইচ্ছায় আছে চোখের অধিকার আকাশে মাটিতে।”

এখনো জানি না যথার্থ কাব্যের আঙ্গিকে গড়া এঁর রচনা কী রকমের। ভালো লাগে যে এঁর গান, দোঁহা, ছোটো কবিতা গ্রামের লোকে তুলে নিয়েচে—শিখ সমাজের উপর থেকে নীচে, সর্ব্বত্র তাদের আনাগোনা। এখানে এসে আবার দেখলাম শিখদের বীর্য্যের একটা দিকে শক্তির মাধুর্য্য আছে—নম্রতা আছে, মুসলমানদের আভিজাত্যে যে একটি বড়ো জগতের দরাজ ভাব দেখা যায় তা নয়, অথচ ভারি সুন্দর। অরণ্যের বড়ো গাছ নয়, সঙ্কীর্ণ মাটিতে উঠেচে দৃঢ়, দীর্ঘ তরু—ভারতবর্ষের এক প্রান্তে।

শ্যামাপ্রসাদবাবু লিখেচেন আপনার চিঠি পেয়ে সিণ্ডিকেটে জানাচ্চেন, কী ঠিক হয় পরে খবর দেবেন।[৩]

আপনি আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

প্রণত
অমিয়

---

**টীকা**

১ ডাক্তার ভাটনাগার ছিলেন লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ও রাসায়নিক গবেষণাগারগুলির অধিকর্তা (১৯২৪-১৯৪০)।

২ ভাই বীরসিং-এর অনুগামী প্রাচীনপন্থী ধ্যানী শিখ কবি ও গদ্যলেখক 'নকল বন্ধু' পুরাণসিং প্রথমে ইংরেজিতে, পরে ভাই বীরসিং- এর প্রেরণায় মাতৃভাষায়, কবিতা লিখেছেন। 'ভাই বীরসিং' প্রবন্ধের পাদটীকায় অমিয় চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন : 'এই সাধক-কবির পরিচয় তাঁর ইংরেজি গ্রন্থ *Nargas* এবং *Sisters of the*

*Spinning Wheel*-এর রচনাসংগ্রহে পাওয়া যাবে।... পুরাণসিং-কে গভীর জ্ঞানী বা সুন্দরস্রষ্টা বলে মনে করি না, কিন্তু তিনি বহির্বিশ্বের কাছে শিখ সাহিত্য পৌঁছে দিয়েছেন এটা তাঁর বড়ো কৃতিত্ব'। ('সাম্প্রতিক', পৃ. ১৩৮)

৩ ঠিক কী ঘটেছিলো জানা নেই, কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকের পদটি তাঁকে দেওয়া হয়নি। তা নিয়ে সাতিশয় বিরক্তি প্রকাশ ক'রে রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীকে লিখেছিলেন : 'বুদ্ধিমান বাংলার পরিচয় যথেষ্ট পেয়েছ—আর না হলেও চলবে। পাকা বুদ্ধির ঠেলায় জাতটাকে ফুটির মতো ফাটিয়ে তুলেছে,এইবার পচবার সময় এলো—সেই রঙই ধরেছে। এখানে কেউ কারো চেয়ে কম নয়, অথচ নিজেদের শ্রেষ্ঠতা যথার্থভাবে প্রমাণ করতে না পেরে সংসারে কেবলি হটে যাচ্চে, তাই গাঁজিয়ে উঠচে ঝাঁজিয়ে উঠছে কুৎসা-গ্লানি, প্রতিহত অহঙ্কারের তীব্র জ্বালা । নিন্দার বাজারদর অত্যন্ত চড়ে গেছে।' ('চিঠিপত্র' ১১শ, ৯২)। আপাতত প্রেসিডেন্সির বদলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার ক্ষীণ একটা সম্ভবনা দেখা দেয়। হয়তো সেই প্রসঙ্গেই শ্যামাপ্রসাদের চিঠি।

## ৬১

১২ই মার্চ [১৯৩৮]

LAKSHMI MANSIONS
THE MALL
LAHORE. INDIA

শ্রীচরণকমলেষু

য়ুরোপে তো অন্ধকার ঘনিয়ে এল—ঠিক সময়েই *Manchester Guardian* থেকে আপনার কথাগুলি এদেশেও পৌঁছল। কিন্তু অনেকেই দুঃখ করচেন Reuter যেরকম সংক্ষিপ্তভাবে দেশের কাগজে সারাংশ পাঠিয়েচে তাতে আপনার পুরো কথা বোঝা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। M. G. থেকে উদ্ধৃত সমস্ত লেখাটাই যাতে বেরোয় তার ব্যবস্থা করা দরকার। এ বিষয়ে অনিলবাবু যদি কলকাতার কাগজঅলাদের জানান, বা পরের সংখ্যা *V.B. News*-এ সব লেখাটা তুলে দেন তাহলে আমরা সবাই উপকৃত হব।[১]

প্রাচীনকালের বিষয়ে আপনার চিঠি সঙ্গে ক'রে তক্ষশিলায় গিয়েছিলাম।[২] রাওলপিণ্ডি ছাড়িয়ে পাহাড়ে-ঘেরা উপত্যকায় এই বিরাট সহরের ভগ্নাবশেষ দূর পর্য্যন্ত মাটি থেকে বেরিয়েচে। হারাপ্পার চেয়ে তক্ষশিলার চিহ্ন মহাকাল আরো কিছু যত্ন ক'রে বাঁচিয়েচে —ওখানকার সভ্যতার পতনও হয়েছিল দেরিতে। আধুনিক তক্ষশিলা মনোরম জায়গা —সেখানে থাকবার সুন্দর ব্যবস্থা। সমস্ত পঞ্জাবে অমন আয়োজন আর কোথাও নেই বিশিষ্ট অতিথিদের জন্যে। অগণ্য ফুলে ভরা বাগান—আমরা ছিলাম বাদাম ফুলের সময়ে, তার মধ্যে Marshall আশ্চর্য্য Museum এবং Archaeological Rest House তৈরি ক'রে গেছেন ।[৩] সম্পূর্ণ নির্জ্জনতার মধ্যে স্বপ্নের মতো মনে হয় জায়গাটি—

শরীর মনের পক্ষে এমন শান্তির তীর্থ কমই আছে। ওখানকার Curator বাঙালী—তিনি বারম্বার বলছিলেন কোনোবার এই অঞ্চলে এলে আপনি যদি ওখানে একবার যান। পেশোয়ার যাবার পথে ট্রেন কাছেই থামে। তাঁর নিমন্ত্রণ জানিয়ে রাখি।

Huen Tsang এসে বিদ্যাপীঠের প্রান্তে যে ঘর নিয়েছিলেন তার চারিদিক ঘিরে আজ শর্ষে ফুলের ক্ষেত ছেয়ে গেছে।[৪] হলদে আলোয় চোখ ডুবে যায়; পাহাড়ের নানারকম নীলের সঙ্গে আকাশ মিশে গেছে; দূরে আবটাবাদ গিরিশৃঙ্গে বরফ জমে আছে। সেদিন পর্য্যন্ত ঐখানেই মধ্য এশিয়ার সূচনা ব'লে লোকে মানত। দূর আকাশে যেন চীন দেশের আহ্বান জেগে রয়েচে—ভারতবর্ষ এবং চীনের পথ চিরদিনের পথিককে ডাক দিয়ে যায়। তখনকার পথিক এই ডাক শুনেছিলেন। যুরোপ হতে গ্রীক রাষ্ট্রিকতা অতিক্রম ক'রেই গ্রীক মহাসভ্যতা এসে মিলেছিল। প্রতিবেশী ইরানের কারিগর, জ্ঞানব্যবসায়ী তক্ষশিলায় এসেছিলেন। যথার্থ মহাভারতের সেই যুগ। তক্ষশিলার জোলিয়ান পাহাড়ের তলে আজো মূর্ত্তি বেরোচ্চে তাতে তিনচার সভ্যতার মৈত্রী দেখা যায় ভাবের রেখার অপূর্ব্ব মিলনে। মারীর অগ্নি জ্বলে উঠ্‌চে পশ্চিমে পূর্বে—সম্পূর্ণ দৃষ্টি হারাবার আগে উত্তরভারতের প্রান্তে মানবের স্নিগ্ধ মহিমার ছবি দেখে নিতে চাই।

রথীবাবুর জন্যে ব্রহ্মচারির চিঠিখানা পাঠালাম—ছেলেটির সহজ এবং সুন্দর ব্যবহারে ইংলণ্ডে অনেকেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। উপযুক্ত কাজের ক্ষেত্র না পেলে দেশে ফিরে তার সমস্ত উৎসাহ নিভে যাবে। জানি না আশ্রমকে কেন্দ্র ক'রে গ্রামগুলিতে মনোবৃত্তান্ত সংগ্রহ করবার কাজে তাকে নামানো যায় কিনা।[৫]

*Quarterly*তে Aronson-এর লেখাটি খুব ভালো লাগল।[৬] ওঁর রচনায় বিশেষ একটি জাগ্রত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই রকম আরো যদি লেখেন তো বেশ হয়। এইমাত্র *Quarterly* পেয়ে পড়ছিলাম।

হৈমন্তী সেমন্তী আপনাকে তাদের প্রণাম জানাচ্চে। চণ্ডালিকা চিত্রাঙ্গদা অভিনয়ের কথা শুনে তাদের মন উতলা হয়ে উঠেচে। বাংলার বসন্ত উৎসব থেকে কত দূরে আমরা রয়ে গেছি।

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

অমিয়

---

**টীকা**

১ ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকায় ১৯৩৮-এর ১০ মার্চের সংখ্যায় যুরোপের ভবিষ্যৎ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'If you ask my personal opinion, I hardly imagine that the catastrophe can now be avoided. Since the only event in which all the powers of Europe are engaged with furious and frenzied zeal, seems to be that of paving the path for mutual annihilation.' তাঁর মতো আরো অনেকেরই তখন এই আশঙ্কা হয়েছিলো যে যুরোপে যুদ্ধ অনিবার্য। শেষ পর্যন্ত সে-যুদ্ধ শুরু হ'লো আরো দেড় বছর পরে,

১৯৩৯-এর ৩ সেপ্টেম্বর। *Visva-Bharati News*-এ (এপ্রিল ১৯৩৮) রবীন্দ্রনাথের চিঠিটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছিলো।

২ উল্লিখিত 'প্রাচীন কাল' বিষয়ের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'মহেঞ্জোদারোর ভগ্নশেষের থেকে সব অবান্তর বাদ পড়ে গেছে, তার ইঙ্গিতগুলির মধ্যে কেবল এই সহজ কথাটুকু পাই যে, মানুষ সেদিনও বেঁচে ছিল।' ('চিঠিপত্র' ১১শ, ৯৫)

৩ গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ (John Hubert) Marshall (১৮৭৮-১৯৫৮) দীর্ঘকাল ভারতের সরকারি প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অধিকর্তা ছিলেন। এঁর সময়েই সাঁচী, নালন্দা, সারনাথ প্রভৃতি ঐতিহাসিক স্থানে উৎখননের কাজ হয়। মহেঞ্জোদরোতে এঁরই সহকর্মী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীন সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করলে তার গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে মার্শাল সেখানেও উৎখননের ব্যবস্থা করেন। এইসব আবিষ্কারের ফলে ভারত-ইতিহাসের পরিজ্ঞাত সময়সীমা বহু সহস্র বছর পিছিয়ে যায়। তিনখণ্ডে সমাপ্ত তাঁর বিশাল গ্রন্থ *Mohenjodaro and the Indus Civilization* প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৩১ সালে।

৪ মহারাজ হর্ষবর্ধনের কালে মহাযানপন্থী বৌদ্ধ ভিক্ষু পর্যটক হুয়েন সাং (য়ুয়েন চাং, য়ুয়ান চোয়াং? ৬০০-৬৬৪) উনত্রিশ বছর বয়সে চীন থেকে পদব্রজে ভারতে এসে পৌঁছেছিলেন। দীর্ঘ ষোলো বছর কাল উত্তর-দক্ষিণে সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ ক'রে দেশে ফেরেন ৬৪৫ সালে। নালন্দায় আচার্য শীলভদ্রের কাছে পাঁচ বছর অধ্যয়ন করেছিলেন। বহু বৌদ্ধগ্রন্থের তিনি চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর অত্যাশ্চর্য ভারত পর্যটন বৃত্তান্ত বিশ্বের বন্দনা পেয়েছে।

৫ এদেশীয় যুবক (সুখেনলাল) ব্রহ্মচারী তাঁর পরিবারের আদেশ লঙ্ঘন ক'রে লণ্ডনে গিয়েছিলেন মনোবিদ্যায় গবেষণা করতে। মনোবিজ্ঞানের ডিগ্রি নিয়ে ১৯৩৮-এর মার্চ মাসে অমিয় চক্রবর্তীকে চিঠি লেখেন যাতে দেশে ফিরে বেকার অবস্থায়, পারিবারিক বিরূপতার মধ্যে বিপদে পড়তে না হয়। অমিয় চক্রবর্তীর সহায়তায় শ্রীনিকেতনে যোগ দিয়ে একসময় তিনি তারকচন্দ্র ধরের গড়া ব্রতীবালকদলে ব্রতচারী নৃত্য শেখাতেন। পরে কোথায় গেলেন জানা যায় না। তবে বিশ্বভারতীর 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' সিরিজে এঁর লেখা পুস্তিকা (সংখ্যা ৫৯ : 'শিশুর মন') প্রকাশিত হয়েছে।

৬ জর্মান-ইহুদী পণ্ডিত (Dr. Alex) Aronson ( জন্ম ১৯১২-) ১৯৩৭ সালে বিশ্বভারতীর শিক্ষাভবনে ইংরেজি পড়াতে আসেন। ১৯৩৮-এর ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল সংখ্যা *Visva-Bharati Quarterly*-তে 'Contemporary French Poetry'নামে তাঁর এক প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিলো। অমিয় চক্রবর্তী এই প্রবন্ধের উল্লেখ করছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শত্রুদেশের লোক গণ্য ক'রে ইংরেজ সরকার তাঁকে বন্দী ক'রে রাখেন। বিশ্বভারতীর চেষ্টায় কারামুক্ত হ'য়ে আবার তিনি শিক্ষকতার কাজে ফিরে এসেছিলেন। অমিয় চক্রবর্তীর ভূমিকাসহ আরন্‌সনের লেখা *Rabindranath through Western Eyes* (১৯৪৩) একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ: 'not about Tagore, ...but about the West, its reaction to a great poet who had come to them from the East, the Western response to

India at that time...' (Aronson in a letter to Martin Kämpchen. See Kämpchen. *Rabindranath Tagore and Germany*. 1992)। কিছুদিন আগে ঋদ্ধি থেকে আরনসনের বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয়েছে।

বৃদ্ধ বয়সে এখন থাকেন ইজরায়েলে। কবির মৃত্যুর পরে বিশ্বভারতী ছেড়ে যান ১৯৪৪ সালে, পরের দুবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি পড়িয়েছিলেন।

## ৬২

এপ্রিল ২০ [১৯৩৮] মণ্ডী

শ্রীচরণকমলেষু

কাংগ্রা গিরি গ্রামে আমরা ঘুরচি[১]—আপনার কাছ থেকে নববর্ষের আশীর্ব্বাদ পেলাম। এবারে আপনার জন্মোৎসব আগেই হল—আমাদের মনে উৎসব বাঁধা ২৫শে বৈশাখের সঙ্গে।

এখানে হাওয়ায় ফুলে বসন্তের রঙ ছড়িয়েছে—কী সুন্দর এই দেশ! আপনার চিঠিতে যে নিত্যকালের কথা আছে তার সঙ্গে এখানকার অরণ্য মাধুর্য্যের সুর মেলে—কতখানি শক্তি কাংগ্রার স্নিগ্ধ বনভূমির কোলে ছবিতে, রঙীন পোষাকে, পুরুষ মেয়ের নম্র শোভন মুখশ্রীতে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। এখনো চারিদিকে সেই হাওয়াই ছড়িয়ে আছে। মণ্ডী রাজধানীতে বাংলা দেশের সুর শিবালয়ে, কুটীর শিল্পে, লোকের নামে কত কালের ইতিহাস আশ্রয় ক'রে রয়েচে—এখানকার রাজাকেও খুব ভালো লাগল আমাদের। অনাড়ম্বর সৌজন্যশ্রীর মধ্যে এখানে বাঙালীত্ব যেটুকু দেখতে পাই তা বিশুদ্ধ বাঙালী অথচ এখানকার নির্জ্জনতায় বিশিষ্ট রূপ নিয়েচে। প্রধানমন্ত্রী বাঙালী— তিনিও এরাজ্যে যথার্থ সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখবার কাজে রাজার সঙ্গে যোগ দিয়েচেন। কাংগ্রা থেকে দূরে এসে পড়েচি, সেখানে ফেরবার আগে এখান থেকে দুর্গম বৌদ্ধমন্দির দেখতে যাব রিয়ালশরে—সেখানে সরোবরের প্রান্তে প্রাচীন ধর্ম্মতীর্থে তিব্বতী, চৈন, তুর্কীস্থানের যাত্রী আসেন। কুলু এবং সেখান থেকে Roerich-এর আশ্রম দেখতে নাগর-এ যাব।[২] অদ্ভুৎ (sic) তাঁর কীর্ত্তিকলাপ, সেখানকার রহস্য কিছু চোখে দেখতে চাই।

কখনো ভুলব না মণ্ডীর রাজার নিজস্ব সম্পত্তি আশ্চর্য্য কাংগ্রা-ছবির ঐশ্বর্য্যের কথা। এরকম সংগ্রহ আর কোথাও নেই। খুবই যত্নে রেখেচেন কিন্তু বহু শত সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাংগ্রা চিত্র কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা ক্ষুদ্র রাজ্যবিশেষে আবদ্ধ থাকা উচিত নয়। তাঁকে এ কথা বলেচি। তিনি যোগ্য চিত্রসমালোচকের হাতে কিছু ছবি একত্র reproduction-এর ব্যবস্থাভার এবং সে-বিষয়ে সমালোচনা যোগ ক'রে বই ছাপানোর কাজ দিতে রাজি আছেন। কিন্তু একাধারে যথার্থ দরদী এবং সুলেখক কারো সন্ধান তিনি পাননি। শান্তিনিকেতন আশ্রম থেকে এই ভার নিয়ে কেউ কি আসতে পারেন না? তাঁকে এখানে

এসে কিছুকাল থাকতে হবে এবং পরিশ্রম ক'রে বহুশত অপূর্ব্ব ছবির মধ্যে থেকে চয়ন ক'রে ঐতিহাসিক জ্ঞানের ভূমিকা দিয়ে তা বইয়ের উপযুক্ত ক'রে উপস্থিত করতে হবে।[৩] লাহোরে ফিরে গিয়ে এ বিষয়ে আমি আবার লিখব।

*Ends & Means* আপনার ভালো লেগেচে একথা জানলে য়ুরোপের নূতন কালের কত লোক গভীর উৎসাহ পাবেন—আপনি যদি ইংরেজিতে দুচার কথাও লেখেন তাহলে কীরকম ভালো হত আমাদের সকলের পক্ষে। কালিম্পঙ থেকে ইংরেজি পত্রআকারে আপনার আনন্দ প্রকাশ ক'রে জানালে যুদ্ধবাষ্পবিষাক্ত পৃথিবীর মানুষ আশার বাণী শুনবে।[৪] আমাদের দেশে কংগ্রেসের কাজের ভিতর দিয়ে এই বাণী বহু গ্রামে কল্যাণ আনচে। নানাস্থানে ঘুরতে গিয়ে যেখানেই নূতনকালের মঙ্গলচিহ্ন দেখতে পাই তাতে কংগ্রেসের হাত রয়েচে। হৈমন্তীর এবং আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন।

অমিয়

---

**টীকা**

১ মণ্ডী/কাংগ্রা—জলন্ধরের পূর্বে তিব্বতের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত কাংগ্রা রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী ছিলো নাগরকোট। সেই থেকে নাগর। ভারতের পাহাড়ী চিত্রকলার মধ্যে কাংড়ার অঙ্কনশৈলীতে বিশিষ্টতা আছে। কবে একসময় এই পাহাড়ী রাজ্যে বাঙালি সংস্কৃতির একটি আশ্রয় স্থাপিত হয়েছিলো। এখনো আছে কিনা জানি না।

২ কুলু উপত্যকায় নাগরে রয়েছে শিল্পী রোয়েরিখ-এর 'উরস্বতী রিসার্চ ইনস্টিটিউট'। রুশ নিসর্গচিত্রশিল্পী (Nikolay Konstantinovich) Roerich (১৮৭৪-১৯৪৭) রাশিয়াতে একসময় ব্যালেমঞ্চের দৃশ্যপট আঁকতেন। রুশবিপ্লবের সময় স্বেচ্ছানির্বাসন মেনে দেশত্যাগ করেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁর পত্রালাপের শুরু হয় ১৯২০ সাল থেকে। চিঠিপত্র রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। কবিকে প্রথম চিঠি লেখেন লণ্ডন থেকে : 'You bring into contemporary life that lofty spiritual joy which gives strength to the seekers of a radiant future.'। ন্যু ইয়র্কে স্থাপিত Roerich Museum-এর একটি কক্ষ রবীন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গিত হয়েছিলো। বিশ্বভারতীর কলাভবনসংগ্রহে এই শিল্পীর আঁকা কিছু ছবি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। অনেক বেশি ছবি আছে কেরালায় ত্রিবান্দ্রমের আর্ট মিউজিয়ামে। ভারতবর্ষেই রোয়েরিখের মৃত্যু হয়।

৩ কাংগ্রা রাজদরবারে গিয়ে কাংগ্রা শৈলীর চিত্রাদির ভার নেবার মতো কাউকে শান্তিনিকেতন থেকে পাঠানো সম্ভব হয়েছিলো ব'লে মনে হয় না।

৪ অলডাস হাক্সলির লেখা *Ends and Means* (১৯৩৮)-এর কপি খুব সম্ভব অমিয় চক্রবর্তী কবিকে এর অল্প কিছুদিন আগে পাঠিয়েছিলেন, এবং লেখককে তাঁর মন্তব্য জানাবার এই অনুরোধ আসার আগেই ৩ মার্চ তারিখে হাক্সলি-কে কবি ক্যালিফোর্নিয়ার ঠিকানায় লিখেছিলেন : 'I have just finished reading your latest book, *Ends and Means*, and am very greatly impressed. It has induced me to send you a book of mine named *Man* in which

I have tried to give my interpretation of what I consideras the purest ideal of religion taught in the Upanishads. It is likely that you will find passages in this book analogous to your own tendency of thoughts.' *Man* পুস্তিকাটি অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত কবির বক্তৃতামালা। পুস্তিকাটি পৌঁছনোর আগেই হাক্সলি জবাবে লেখেন : I am very much looking forward to reading it. Meanwhile I would like to tell you how greatly I appreciate your kind words about my book.' এ ছাড়া হাক্সলির আর কোনো চিঠি রবীন্দ্রভবন সংগ্রহে নেই।

*Ends and Means*-এর যে কপিটি রক্ষিত আছে সেটি কবিকে মার্জারি সাইক্‌স-এর পাঠানো উপহার।

## ৬৩

৮ই মে [১৯৩৮]

LAKSHMI MANSIONS
THE MALL
LAHORE, INDIA

শ্রীচরণকমলেষু

Danish কবিদার্শনিক Keirkegaard-এর বইটা পাঠালাম—য়ুরোপে হঠাৎ ওঁর রচনা নিয়ে উৎসাহ জেগেচে।[১] ডায়েরির কিছু অংশ এবং কাব্য সম্বন্ধে Kierkegaard-এর মন্তব্য খুব ভালো লাগল।

Roerich-এর ওখানে গিয়েছিলাম—আশ্চর্য্য জায়গায় আছেন। চারিদিকে বরফের পাহাড়, স্তব্ধ অরণ্য ; ওঁদের বাড়ির ভিতরে আগাগোড়া কারুসজ্জিত। দাস দাসীও রাশিয়ান। আধুনিক রাশিয়াকে গভীর শ্রদ্ধা করেন। ছবির ধ্যানে এবং রচনায় Roerich পরিবার নিযুক্ত—সকাল থেকে সন্ধ্যা অসম্ভব পরিশ্রম করচেন হিমগিরির অন্তরের মূর্ত্তি বারেবারে আঁকবার কাজে। ওঁদের পাহাড়ে পেয়েচে—তিব্বতী হিমালয় পাহাড়ের রহস্য নিয়ে ওঁদের বিরাম নেই। এক ছেলে কুলু উপত্যকায় ওষধি এবং পাহাড়ি ফলমূলের তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে য়ুরোপে জানাবার কাজে ব্যস্ত—তিনিও ছবি আঁকেন। Mrs Roerich ছবির রাজ্যে দ্রষ্টা, তন্ময় হয়ে আছেন, তা ছাড়া উনি ধ্যানে পূর্ব ও পরকালের ছবিও দেখেন। ওঁর কথা শুনে কী ভাবব ঠিক করতে পারলাম না। পৃথিবী থেকে দূরে ওঁরা এমন একটি অলৌকিক রাজ্যে বাস করেন এবং গিরিদেবদেবীদের সঙ্গে মানুষের স্বপ্ন মিলিয়ে সত্যকে পেতে চান যে বাহিরের কারো পক্ষে ঐ পারিবারিক চৈতন্যলোকে প্রবেশ করা শক্ত। ওঁরা পরস্পর একে অন্যের স্বপ্ন সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন। কী সুন্দর ক'রে পাহাড়ে ছোট রাজ্য রচনা করেচেন এতে শ্রদ্ধা হয়।

ওখান থেকে তিব্বত-লাহুলের পথে আমরা মনালীতে গিয়েছিলাম। জায়গাটি অপূর্ব্ব মনোরম। সব মিলিয়ে কুলু উপত্যকা আমাদের কাংগ্রার চেয়েও বিচিত্র সুন্দর

মনে হল। পূজোর সময় কুলুর বড়ো মেলায় কোনোবার যাবো—তখন দূর দূরান্ত থেকে পাহাড়ি শিল্পকাজ নাচগান ওখানে আসে। কাংগ্রায় মানুষের মুখের সৌন্দর্য্য চমকিয়ে দেয় —ছবির ধারা আজো মানুষের জীবনের ভিতর দিয়ে বইচে। আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন নানা গ্রামের মন্দির থেকে দেবদেবীরা দোলনায় চেপে মণ্ডীতে চলেচেন, মানুষেরা পুতুল-খেলায় মত্ত। বাঁশি বাজচে, ঢাক ঢোলের অনুরণনে গিরিঅরণ্য কেঁপে উঠচে। এই শোভাযাত্রা যেমন পুরাকালের ছবিতে ভরা, তেমনি গ্রামের সাধারণ জীবনের ফাটলেও চোখের মুখের ব্যবহারের মাধুর্য্য ছবির মতন চোখে পড়ল।

কাশ্মীরে আমরা যেতাম কিন্তু শীঘ্র বাংলা দেশে ফিরব কারণ পুরীতে মা'র অসুখ বেড়েচে। বর্ষা নামলে একবার আশ্রমে যেতে চাই।

আপনি আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন।

প্রণত
অমিয়

---

**টীকা**

১ (Soren) Kierkegaard (১৮১৩-১৮৫৫) খ্রিস্টিয় গোঁড়ামির ঘোর বিরোধী দার্শনিক এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রবর্তিত অস্তিবাদী দর্শনের আদিগুরু। এঁর লেখা *Either Or* বইটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ এঁর কোনো বই পড়েছিলেন ব'লে জানা যায় না।

## ৬৪

21 May [1938]

LAKSHMI MANSIONS
THE MALL
LAHORE, INDIA

শ্রীচরণকমলেষু,

সেমন্তীকে লেখা আপনার ছবি চিঠি পেয়ে আমাদের কীরকম আনন্দ চলেচে বলতে পারি না।

কৃপালানী আর বুড়ি [১] আসায় একদিন চমৎকার কাটল—শান্তিনিকেতনের কত কথা শুনলাম। খুব আশা ক'রে রয়েচি বৃষ্টি নামলে আমরা আশ্রমে ফিরব। পাঞ্জাবের আগুন আর সহ্য হয় না।—এদিকে অনেক সুন্দর পাহাড় আছে, কিন্তু বাংলা দেশেই যেতে চাই।

Greek translationsগুলির মধ্যে অনেক ভালো তর্জ্জমা আছে—Euripedes-এর কবিতাগুলি মনকে নাড়া দেয়। Macneice-এর অনুবাদ ভারি আশ্চর্য্য—আধুনিক কবিদের মধ্যে ওঁর নাম বেড়ে চলেছে। নিতান্ত ছেলেমানুষ। ওঁর "Earth Compels" বেরোলেই পাঠাব।[২]

Mrs Seligman-এর "Asoka" বইটা বোধ হয় মন্দ হবে না—বৌদ্ধ আবহাওয়া ঠিকমতো উপলব্ধি করবার জন্যে উনি বহু সাধনা করেচেন। আপনি ওঁকে দুএক লাইন লিখে দিলে ওঁর সাধনা সার্থক হবে।[৩]

Macnicol-এর বইয়ের জন্যে যে ভূমিকা লিখেচেন তা প'ড়ে চমৎকৃত হলাম —সমস্ত বিষয়টি উজ্জ্বল হয়ে উঠেচে।[৪] Macnicol একদিকে উগ্র খৃষ্টান—ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে অদ্ভুৎ (sic) বক্তৃতা দিয়ে থাকেন—কিন্তু "Hindu Scriptures" বইখানিতে তর্জ্জমাগুলি উপভোগ্য হয়েচে—এবং আপনার ভূমিকাসুদ্ধ Everyman Series-এ বেরোনোয় বিশেষ ভালো হল। (ভূমিকার শেষ লাইনে "many" কথাটা ভুলে দুবার ছাপা হয়েচে ("many many")—ওদের দেশেও ছাপার ভুল বাদ যায় না) উপনিষদের কবির কথা বলেচেন —"The same wonder and poetry are there, but deepened and widened by the calm of meditation" ...কথাগুলি কত গভীরে গিয়ে মনকে নাড়া দেয় বলতে পারি না। ভারতীয় সাধনাকে কয়েকটি ছত্রে আপনি এই ভূমিকায় সকলের কাছে এনেচেন। বইখানি পেয়ে অবধি বারে বারে পড়ে দেখচি।

*Quarterly* চমৎকার হয়েচে—গগনেন্দ্রনাথের বিষয়ে রথীবাবুর প্রবন্ধটি সবচেয়ে ভালো লাগল।[৫]

প্রণত অমিয়

---

টীকা

১ কৃষ্ণ এবং নন্দিতা কৃপালানী।

২ অক্সফোর্ডে দর্শন ও classics-এর স্নাতক, নবীন ইংরেজ কবি Louis MacNeice (১৯০৭-১৯৬৩)-এর কোনো গ্রীক অনুবাদ বিশ্বভারতীতে রক্ষিত হয়নি। *The Earth Compels* (১৯৩৮) এবং *Autumn Journal* (১৯৩৯) বই দুটিও নেই।

৩ Mrs Seligman—২২.৭ টীকা দ্র.। ইচ্ছে ছিলো না, তবু রবীন্দ্রনাথ এঁর বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। অক্সফোর্ড থেকে রাধাকৃষ্ণানও কবিকে এ-জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

৪ (Dr Nicol) Macnicol-এর লেখা *Hindu Scriptures* বইটি Everyman সিরিজে ১৯৩৮ সালে বেরোয়। এই সিরিজের সম্পাদক Ernest Rhys ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বন্ধুস্থানীয়। রীজ-এর একান্ত আগ্রহেই রবীন্দ্রনাথকে ভূমিকাটি লিখতে হয়, কিন্তু বইয়ের সব অনুবাদ তাঁর পছন্দ হয়নি। অমিয় চক্রবর্তীকে চিঠির উত্তরে লিখেছেন: 'ম্যাকনিকলের ঈশোপনিষদের তর্জমা আমার ভালো লাগলো না। ঐ উপনিষদটি আমার সব চেয়ে প্রিয়— ওর মধ্যে তত্ত্বের গভীরতা আশ্চর্য গভীর। কিন্তু অনুবাদক এর অন্তরে প্রবেশ করতে পারেননি।' ('চিঠিপত্র' ১১শ. ৯৭)

৫ *Visva-Bharati Quarterly*-র ৪র্থ বর্ষ (১৯৩৮) ১ম সংখ্যায় রথীন্দ্রনাথের লেখা এই 'Cousin Gaganendranath' প্রবন্ধটি উৎকৃষ্ট।

June 6. [1938]

Aruni [১]
Sea Beach
Puri (Orissa)

## Confidential

শ্রীচরণকমলেষু,

মাংপুতে আপনাকে Physicist-দের বিষয়ে বই পাঠিয়েচি।[২]

বাংলা দেশে এসে একটা কারণে মন খারাপ হয়ে যায়—যেমন আমাদের জোলো মাটিতে আগাছা কচু পাতা তেজিয়ে ওঠে তেমনি দেখচি বছরে বছরে অরবিন্দয়ানার উদ্ধত আত্মবিলাসী ধার্ম্মিকতা ঘরে ঘরে, বিশেষ করে মেয়েদের মহলে ছড়িয়ে যাচ্ছে। বলাবাহুল্য, সংস্কৃতের সঙ্গে কারো পরিচয় নেই, অথচ অরবিন্দ গীতা সম্বন্ধে কী বলেচেন তাই নিয়ে গর্ব্বিত বচন বিনিময় চলচে : বেদ উপনিষদকে পণ্ডিচেরীর আরকের সঙ্গে মিশিয়ে এঁরা আস্ফালনের সামগ্রী করে তুলেচেন। ঘরে অন্ন নেই, কর্ম্মক্ষেত্রে শূন্যতা, তার সঙ্গে নকল আধ্যাত্মিকতার দলীয় নেশা হতভাগ্য বাঙালীর অতিবুদ্ধিকে বাড়িয়ে তুলল। কঠিন পাঞ্জাবী কাশ্মীরী যদি সন্ন্যাসের টানে পড়ে তো একেবারে হিমালয়ের কোলে গিয়ে সব ছেড়ে বসে থাকে—এ নিয়ে সূক্ষ্ম সাংঘাতিক পত্রবিনিময়, আধুনিক আলোচনার অভ্যাস তাদের নেই। বাঙালীর বাষ্পাকুল ঈর্ষাজর্জ্জরিত গুরুপূজার নূতন সংস্করণ ওখানে পাওয়াই যায় না। প্রত্যেকবারেই এসে দেখি যক্ষ্মারোগের মতো বাংলা পরিবারে শ্রীঅরবিন্দের চিঠিপূজা এবং জ্ঞানবিচারহীন যৌগিক প্রক্রিয়ার বাচনিক উপাসনা বেড়ে চলেচে—অথচ যে-সব পুরুষ শ্রীঅরবিন্দ উবাচ বলে ধর্ম্মের লাঠি চালনা করেন তাঁরা বেশীর ভাগ সময়ে সস্তা সিনেমা, দ্বিতীয় শ্রেণীর গানবাজনা, অপরিচ্ছন্নতা এবং মদ্যপান পর্য্যন্ত নানা ব্যসনে নিযুক্ত। য়ুরোপীয় জ্ঞানবুদ্ধিকে এঁরা অপরিসীম অশ্রদ্ধা করেন—করুন—সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো ছেঁড়া য়ুরোপীয় cult মিশিয়ে ভারতবর্ষের দৃঢ় শ্রদ্ধেয় সংস্কারগুলিকে এঁরা অদ্ভুৎ (sic) আকার দিয়ে নূতনত্ব জাহির করেন। যদি শান্তভাবে এতটুকু বিচারের কথা বলা যায় অমনি পণ্ডিচেরি থেকে শিষ্যদল শাসিয়ে চিঠি পাঠান—কোথা থেকে এই সব খবর ওখানে যায় এবং আলোচনা জমে ওঠে বোঝা অসাধ্য—স্বয়ং গুরু সবই জানেন এবং সম্মতি দেন আক্রমণের পিছনে থেকে। যদি অপঘাতে মরি আঘাতটাকেই মেনে নেব, পণ্ডিচেরি থেকে অলক্ষ্য বিষবাণ ওঁরা প্রেরণ করেচেন ব'লে অন্তিমদশা এল এমনতরো আধ্যাত্মিক সান্ত্বনা যেন কোনো দিনই না লাভ হয়। এরকম "Spiritual" গুণ্ডামি কী করে বুদ্ধিমান লোকে মেনে নিতে পারে ভেবেই পাই না—অত্যন্ত বেদনার সঙ্গেই দেখচি আমাদের আশেপাশে অনেকের মধ্যে উত্তেজনা অশান্তি উগ্র হয়ে উঠচে। এই কি শান্তি মন্ত্র? ভারতীয়? মানবসংসারের বরণীয়?

এর সঙ্গে আছে দিলীপবাবুকে কেন্দ্র ক'রে বাঙালী মেয়েদের আত্মবিস্মৃত

প্রগল্‌ভতা[৩]। তাঁর সুকণ্ঠ অনেকের প্রিয়,— দুর্ভাগ্যক্রমে ওঁর গানে যথার্থ সঙ্গীতের গভীরতা কখনো পাইনি,—কিন্তু নবীন সন্ন্যাসী-সাজা পণ্ডিচেরির প্রতিনিধিরূপে উনি যে-ভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকেন তার মধ্যে সত্য নেই, কল্যাণ নেই, আর্টের সাধনা নেই।

আমি নিতান্তই বাহিরের লোক, অতিথি, আজ বাদে কাল বাংলা দেশ ছেড়ে বাহিরে ঘুরব—যা বলতে চাই তার মধ্যে ব্যক্তিগত অভিসন্ধি কিছু নেই ব'লেই জানি।

"Mother Worship"ও অশোভন হয়ে উঠেচে। শ্রীঅরবিন্দ এক ভক্তকে নিজ হাতে লিখেছেন "In all doubts and depression ...say ... I belong to the Divine ... I am a child of immortality chosen by Sri Aurobindo and Mother... This is what I mean by faithfulness to the Light and the Call"। সঙ্গে সঙ্গে আশ্রম এবং আশ্রমের বাহিরে হাম্বারব দ্বিগুণিত হয়ে উঠল। শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং যদি এই সব কথা বলেন এবং এই মনোভাব বিস্তার করেন তাহলে আর কী বলব।

Essays on the Gita-য় অনেক খুবই আশ্চর্য্য জিনিষ আছে, অথচ তাতেও কতখানি মানসিক শৈথিল্য এবং ভ্রমাত্মক বাক্যবিস্তার স্থান পেয়েছে পূর্বের চিঠিতে সেই কথা জানিয়েছি।[৪]

খুবই সম্ভব শীঘ্রই চীনদেশে যাব[৫]—ওখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কী ভাবে শিক্ষক ছাত্ররা কাজ চালাচ্ছেন—যুদ্ধ যেখানে চলচে তার বাহিরে—তা জান্‌বার জন্যে ইংলণ্ড থেকে দুজনকে পাঠানো হয়েচে। আমাকে তাঁরা যোগ দিতে বলেচেন। কিছু করতে পারি না, বেদনায় মন শতছিন্ন হয়ে থাকে, যদি চীনদেশে চিরমানুষের কিছু পরিচয় এই দুর্দিনেও নিয়ে আসতে পারি হয়তো জীবনে তা কাজে লাগবে। যে দৃষ্টি আপনি আমাদের কাছে দিয়েছেন তার কিছু যেন চোখে নিয়ে চলতে শিখি। বাংলা দেশে আজ আমাদের দৃষ্টি দুর্বলের মত্ততায় আচ্ছন্ন হয়ে এল।

প্রণত

অমিয়

• copied by A. K. Chanda

---

**টীকা**

১ 'আরুণি' ছিলো পুরীর সমুদ্রতীরে অ.চ.দের নিজেদের বাড়ির নাম। ১৯৪৮ সালে বিক্রি হ'য়ে যায়।

২ দেশ থেকে বিদেশ থেকে অজস্র বই এসেছে রবীন্দ্রনাথের কাছে। নিজেও অর্ডার দিয়ে বহু বই আনিয়েছেন। ইচ্ছে করলেই তালিকা তৈরি করা যায়। কিন্তু এই সংগ্রহের অধিকাংশ বই কোথায় চ'লে গেছে কেউ জানে না। বিশ্বভারতীর কোনো গ্রন্থাগারে নেই। অমিয় চক্রবর্তীর পাঠানো বইয়ের দুই-তৃতীয়াংশ খোঁজ ক'রে পাওয়া যায়নি।

৩ দিলীপবাবু—দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র, লেখক এবং সুকণ্ঠ গায়ক দিলীপকুমার রায়।

সন্ন্যাসী হ'য়ে অরবিন্দ আশ্রমে চ'লে গিয়েছিলেন।

৪ *Essays on the Gita* শ্রীঅরবিন্দর বিখ্যাত রচনা। অমিয় চক্রবর্তী এ-বই বিষয়ে পূর্বে যদি কবিকে কিছু লিখে থাকেন—রক্ষা পায়নি।

৫ যাওয়া হয়নি চীনদেশে, আগে বা পরেও কখনো গেছেন ব'লে জানা যায় না।

## ৬৬

শুক্রবার [ জুলাই ১৯৩৮ ? ]

Lakshmi Mansions
The Mall
Lahore, India

শ্রীচরণকমলেষু

আপনি মংপু গেছেন মনে করে সেখানে বই পাঠালাম—কাগজে দেখচি আপনি আশ্রমে ফিরেচেন। Hogben লিখেচেন Reason সম্বন্ধে ; Dunne -এর নূতন বই Immortality বিষয়ে,[১] হয়তো আগেই আপনার হাতে পৌঁছেচে। তবু পাঠালাম। মংপু ঘুরে আসবে।

এখানে আমরা অনেকখানি অনাত্মীয়তার মধ্যে এসে পৌছেচি—তিনজনেই আছি নির্ব্বাসনে। চারিদিকে ধূলো উড়চে।

আপনার নূতন কবিতা পড়বার জন্যে মন উৎসুক হয়ে আছে।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী—

প্রণত
অমিয়

---

টীকা

১ (Lancelot) Hogben (১৮৯৫-১৯৭৫) ছিলেন ইংরেজ বিজ্ঞানী ও লেখক। অমিয় চক্রবর্তী বোধ করি এঁর লেখা *Retreat from Reason* (১৯৩৬) বইখানি পাঠিয়েছিলেন কবিকে।

Inmortality বিষয়ে বইটির লেখক (John Williams) Dunne (১৮৭৫-১৯৪৯) ছিলেন Royal Aeronautical Society-র Fellow। প্রথম ব্রিটিশ যুদ্ধবিমানের নকশাটি এঁরই করা, যদিও সেইসঙ্গে তিনি ছিলেন দার্শনিক ভাবুক লেখক। চিঠিতে উল্লিখিত বইটির নাম *The New Immortality* (১৯৩৮)।

দুটির একটি বইও বিশ্বভারতীতে রক্ষিত নেই।

11 December [১৯৩৮] Landi Kotal [১]

শ্রীচরণকমলেষু

প্যালেস্টাইনের আরব-য়িহুদি সমস্যার বিষয়ে আপনি যা বলেচেন তা সকলের খুব মনে লেগেচে। এদিককার ব্যাপারও ঐ ধরণের, তাই লোকে আপনার কথা নিয়ে ভাবচে। এই মিলিটারি অঞ্চলেও এখন আগেকার দিন নেই, মনুষ্যত্বের হাওয়া পাহাড় পেরিয়ে এসে পৌঁছচ্চে ভারতবর্ষ থেকে। ভাগ্যক্রমে এই প্রদেশের গভর্নর কানিংহাম লোকটি ভালো—ইনি যা সব বলছিলেন একদিন আপনাকে বলব—আবদুল গফর খাঁর অসামান্য চারিত্র-শক্তি তাঁকে স্পর্শ করেচে—খুদাই খিদমদ্‌গার সংঘ যে কী আশ্চর্য্য ব্যাপার তা বর্ণনা করতে পারব না।[২] মীরা বেন এখন এঁদের সঙ্গে এসে কাজ করচেন—উটসনসাইএ দেখা হল।[৩] গভর্নর এ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা দূরে থাকুক, ভিতরে ভিতরে খুব খুসি হয়েচেন। আফ্রিদি-মাসুদ-মোহ্‌মন্দ যারা অরণ্য শৈলচারী স্বাধীনতায় অভ্যস্ত, তাদের কেবল মাত্র পশুবলের দ্বারা দাসত্বে বাঁধবার শক্তি নেই কোনো বিদেশীরাজের তা এরা বুঝেচে এবং মিলিটারির অনেকেই আমাদের কাছে স্বীকার করেচে। মহাত্মাজির বাণী মন্ত্রের মতো এসে পৌঁছচ্চে ; তিনি নিজে আসায়, না-বুঝেও এরা বুঝেচে তাঁর কাজের মধ্যে উত্তর আছে, বোমাবারুদে নেই। এ সব কথা স্পষ্টই আলোচনা চলচে তাই এখান থেকে পাঠানো চিঠিতে এর উল্লেখ করায় বিপদ নেই।

ভাগ্যক্রমে নানা জায়গায় ঘোরবার অনুমতি পেয়েচি—অনেক জায়গায় মে মাসে আবার এসে যাব। তখন চিত্রালে যেতে চাই। এখন কোহাট প্রভৃতি ঘুরে ফিরব।

আফগান-ভারত সীমান্তে দাঁড়িয়ে অগণিত পাহাড় প্রহরী দেখলাম—দূরে শুভ্র তুষারমণ্ডিত হিন্দুকুশ। বামিয়ান পর্য্যন্ত ভারতেরই ঐ পাহাড় চলে গেছে—এক কালে ভারতবর্ষের অন্তর্গত ছিল আফগানী ঐ অঞ্চল আমাদের বৃহৎ সভ্যতার কালে। আশ্চর্য্য লাগে যে এদিকের বৌদ্ধমন্দিরচূড়া ছিল তখনকার শক্তির পরিচয়—একটিও দুর্গ তাঁরা বানাননি অথচ দেশ ছিল তাঁদের। বাবর প্রভৃতিরা যে-সব দুর্গ বানিয়েছিল পরে তাকে গুঁড়ো ক'রে বা তারই উপরে ইংরেজের দুর্গ জেগে আছে এই পাহাড়ে পাহাড়ে—জয়ের গৌরবে নয়, ভয়ের প্রতীক হয়ে। এতদিন পরে ভারতবর্ষ থেকে আবার নূতন অভয়ের চেতনা খাইবার পেরিয়ে ছড়িয়ে চলেচে। তারই নেই দুর্গ।

বহুদিন বাংলার কাগজপত্র পড়িনি। উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করচি 'খসড়া' সম্বন্ধে আপনি কিছু লিখবেন। বলেছিলেন ঐ বইকে উপলক্ষ্য ক'রে কিছু বলবেন—বিজ্ঞান-জ্বালা অধ্যাত্মশক্তিও কাব্যে দেখা দিতে বাধা নেই এই নিয়ে আপনার দুচার কথা পেলে আমাদের নূতন একটি কল্পনার দ্বার খুলবে।[৪] আপনার আশীর্বাদ আমি চাই ; জানি বইয়ে যা বলতে চেয়েও পারিনি শক্তির অভাবে, তা আপনি আমাদের বোঝাবেন। আমাদের সাহিত্য চণ্ডীমণ্ডপ থেকে বেরিয়ে সস্তা ফিরিঙ্গি হোটেল, এবং প্রবৃত্তিঘূর্ণিত পশ্চিমী রচনার গণ্ডিতে পৌঁছলে গৌরব নেই। য়ুরোপের যে হাওয়া মুক্তির, তার সঙ্গে ভারতীয় হাওয়ার

মিল হতে বাধা নেই আকাশে—এই কথা আফগান-ভারতীয় উর্দ্ধ (sic) পাহাড়ে এসে মনে লাগল।

আমাদের তিন জনের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

প্রণত

অমিয়

---

টীকা

১ অক্সফোর্ডের হ'য়ে নতুন গবেষণার কাজ অবলম্বন ক'রে অমিয় চক্রবর্তী তখনকার উত্তর-পশ্চিম ভারত সীমান্তে এবং সীমান্ত পেরিয়ে কোথায়-কোথায় গিয়েছিলেন তার লেখাজোখা নেই। মানসিক প্রস্তুতি ছিলো ব'লে এক যাত্রাতেই তাঁর পক্ষে বহুবিধ ফল লাভ করা সম্ভবপর হয়েছে।

লান্ডি কোটাল—খাইবার পাস্-এর উচ্চতম এলাকা, প্রধান একটি বাণিজ্যকেন্দ্র।

২ আরব-ইহুদী সমস্যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০ সালে ন্যু ইয়র্কের এক ইহুদী পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে মধ্যপ্রাচ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং বোঝাপড়া না করতে পারলে এ-সমস্যার কোনো সমাধান নেই। লণ্ডনে ব'সে (এখন হ'লে হয়তো বলতেন আটলান্টিকের ওপারে ব'সে) সমস্যা মেটানো যাবে না। তখনকার ভারতের, এখনকার পাকিস্তানের, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বিষয়েও একই কথা সত্য। ইংরেজরা সমস্যা দূর করতে চেষ্টা করছিলেন অস্ত্রের জোরে। পারেননি। শেষ পর্যন্ত সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফ্‌ফর খানের খুদাইখিদ্‌মদ্‌গার বা খোদার সেবকবৃন্দের অহিংস সেবাকর্মের মধ্য দিয়ে অবস্থার খানিক উন্নতি হয়। বন্দুকের টিপ যাদের অব্যর্থ ছিলো, হিংসা ত্যাগ ক'রে ইংরেজ প্রতিপক্ষের কাছে তারা আরো দুর্দম্য হ'য়ে উঠেছিলো।

৩ উচ্চবংশীয় ইংরেজ অ্যাডমিরালের কন্যা ম্যাডলিন শ্লেড গান্ধীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে তাঁর কর্মে অংশ নিতে সবরমতী আশ্রমে চ'লে আসেন, এবং একটা পুরো জীবন ভারতবর্ষের সেবায় কাটিয়ে যান। এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বহুবার জেলে গেছেন। কন্যাজ্ঞানে গান্ধীজি প্রথমে তাঁকে মীরা বাই, পরে মীরা বেন ব'লে ডাকতেন।

৪ প্রথম কবিতার বই 'খসড়া' (১৯৩৮) নিজব্যয়ে অমিয় চক্রবর্তী শান্তিনিকেতন প্রেস থেকে ছাপিয়েছিলেন ১৩৪৫-এর আশ্বিনে। উৎসর্গ করেন পত্নী হৈমন্তী দেবীকে। এসব কবিতা রবীন্দ্রনাথের কেমন লাগে তা জানার জন্যে অধৈর্য হ'য়ে ওঠা স্বাভাবিক। পূর্বে রচিত অমিয় চক্রবর্তীর যে সব গান ও কবিতা একদা কবির ভালো লেগেছিলো তাদের সঙ্গে 'খসড়া'-র কবিতার একেবারেই কোনো মিল ছিলো না। তাছাড়া প্রতিবন্ধক হ'য়ে উঠেছিলো এই সব কবিতার অনভ্যস্ত ভাষা। চিঠির উত্তরে কবি লিখেছিলেন : 'জানবার ভাষাতেই যদি তালা লাগানো থাকে তাহলে হতাশ হয়ে এই সাহিত্য-লীলাটাকেই দোষ দিই কিংবা নিজের অদৃষ্টকে।' ('চিঠিপত্র' ১১শ, ১০০)। কবিতাগুলির আরো একটা বৈশিষ্ট্য ছিলো তাদের বিজ্ঞান-মনস্কতা। ১৯২৫ সালে হ্যাভেলক্ এলিস যে প্রশ্ন তুলেছিলেন সে-তর্কের তখনো কোনো সমাধান হয়নি। (অমিয় চক্রবর্তীর ৩-সংখ্যক চিঠি, ৩.১ টীকা ও সম্পাদকের ভূমিকা দ্র.)।

৭ই পৌষ [১৯৩৮]

LAKSHMI MANSIONS
THE MALL
LAHORE, INDIA

গুরুদেব আমার প্রণাম ।
প্রণতা হৈমন্তী [১]

শ্রীচরণকমলেষু

৭ই পৌষ আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। আশ্রমের উৎসবের সঙ্গে আমাদের সমস্ত মন জড়িয়ে রয়েচে।

এবারকার প্রবাসীতে আপনার অপূর্ব্ব সুন্দর কবিতা পড়লাম।[২] মনে হয় নূতন আর একটি কবিতার বই বেরোবার সময় হয়েচে।

প্রান্ত প্রদেশের সীমান্ত থেকে আপনাকে লিখেছিলাম, বোধ হয় চিঠি পৌঁছয়নি। দিনে দুইলক্ষ টাকা খরচ ক'রে আধুনিক সভ্যতা মানুষ মারায় নিযুক্ত—পাহাড়ে পাহাড়ে ভয়, এবং বেদনার দুঃসহ চেহারা ভুলতে পারা যায় না। কাবুল অবধি যাব, এবং ক্রমে সমস্ত প্রান্তপ্রদেশের মানবিক সমস্যা কিছু বোঝবার চেষ্টা করব। মিলিটারি এবং পোলিটিকাল বিভাগও নিষ্ফলতার বোঝায় অস্থির হয়ে উঠেচে ; সকলে মিলে এখন ব্যাপারটাকে বেরোবার রাস্তার দিকে নেবার চেষ্টা করা দরকার।[২] ঐ নিদারুণ শৈলদেশে একটি মহাপুরুষ জেগে আছেন—খাঁ আবদুল গাফর খাঁ—খালি হাতে নির্ভয়ে তিনি মানুষকে জাগিয়েচেন। তাঁর খুদাই খিদমদ্‌গারের দল সেবার মন্ত্রে রুক্ষ্ম (sic) মাটিতে সবুজ প্রাণকে বার ক'রে এনেচে। বীর্য্যের এমনতর নিরহঙ্কারী হিংসাহীন মহৎ রূপ সহজে দেখা যায় না পৃথিবীর ইতিহাসে। কর্ম্মের পরম্পরায় এঁদের জীবনের দান থেকে যাবেই, যদিও এঁদের উপরেই শাসক সম্প্রদায়ের আক্রোশ। কিছুতেই এসব কথা ভুলতে পারচি না।

আমার ইংরেজি বই পাঠিয়েচি—আধুনিক যুদ্ধের প্রসঙ্গ যাতে আছে সেই অংশ আগে বের করেচে।[৩]

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী

অমিয়

---

**টীকা**

১ হৈমন্তীদেবীর বাংলা হস্তাক্ষর খুব সুন্দর হ'য়ে উঠেছিলো। কামাক্ষীপ্রসাদদের 'রংমশাল' পত্রিকায় একসময় এঁর বেশ কিছু চমৎকার বাংলা লেখা ছাপা হয়। অনায়াসে ছোটো একটি বই হ'তে পারতো। এখনো হ'তে পারে।

২ কবিতাটি 'প্রবাসী'-তে (অগ্রহায়ণ ১৩৪৫) প্রকাশিত "প্রায়শ্চিত্ত" ('উপর আকাশে

সাজানো তড়িৎ আলো') যেটি পরে 'নবজাতক'-এর (১৯৪০) মধ্যে যায়।

৩ ইংরেজি বইটি খুব সম্ভব অক্সফোর্ডের গবেষণাগ্রন্থ *The Dynast and the Post-War Age in Poetry* (১৯৩৮) যেটি অক্সফোর্ড ইউনিভর্সিটি প্রেস থেকে ছাপা হয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথের হাতে দাগ দেওয়া কপিটি রবীন্দ্রভবনে আছে। এ-চিঠি পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীকে কবি জানান : 'তোমার বই পেয়ে দুচার পাতা পড়বার সময় পেয়েছি—বুঝেছি রীতিমতো ভালো বই হ'য়েছে। এল্‌মহার্স্ট পড়তে নিয়েছে তার পড়া হ'য়ে যাওয়ার অপেক্ষা করছি।' ('চিঠিপত্র' ১১শ, ১০১)।

## ৬৯

৩১ ডিসেম্বর [১৯৩৮]

LAKSHMI MANSIONS
THE MALL,
LAHORE, India

শ্রীচরণকমলেষু

আজ আপনার চিঠি পেলাম, খুকুর জন্যে ছবিও এসেচে—আমরা আনন্দ করছিলাম এমন সময় প্রশান্তবাবু ও রাণী দেবীও এলেন, সবাই দেখে খুসি হয়ে উঠলেন।[১] নূতন গানগুলির খবর পেয়ে মন উৎসুক হয়ে ওঠে। নূতন কবিতা হয়েচে, গদ্যরচনাও—পড়বার জন্যে আশ্রমে চলে যেতে চাই অথচ কলকাতার বক্তৃতার দিন এখনো ঠিক করল না, এইখানেই বাঁধা থাকতে হচ্চে।[২]

সায়ান্স কংগ্রেস খুব হৈ চৈ ক'রে সুরু হচ্ছে : ভালো লাগে সমস্ত ভারতবর্ষ থেকে লোক এসেচেন। বাঙালী আর মাদ্রাজিই বেশি। অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণও এই সুযোগে কিছু জানতে বুঝতে চায়, তার ব্যবস্থাও হচ্চে। মোটের উপর ব্যাপারটা সব দিক থেকেই মনকে জাগাবে।

Macneice-এর বই আপনাকে পাঠাই।[৩] শেষের অংশে কিছু নূতন আভাস আছে—কাঁচা লেখার মধ্যেও দীপ্তি পাওয়া যায়। এঁর কিছু কবিতা খুবই ভালো লাগে। আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন।

প্রণত
অমিয়

---

টীকা

১ প্রশান্তচন্দ্র ও রানী মহলানবিশ। ৪৬.৫ টীকা দ্র.

২ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ইংরেজি কাব্যের উপর অমিয় চক্রবর্তীকে কয়েকটি বক্তৃতা করতে বলা হয়েছিলো। বোধ করি অধ্যাপকের পদটি তাঁকে দেওয়া চলবে

কিনা সেটা যাচাই করা ছিলো উদ্দেশ্য। বক্তৃতাগুলি পরে *Visva-Bharati Quarterly*-তে ছাপা হয়। কলকাতার কোনো প্রকাশক বই ক'রেও ছাপিয়েছিলেন।

৩ বইটি *The Earth Compels*, এই বছরেই ছাপা। কপিটি নিখোঁজ হয়েছে।

৭০

Faletti's Hotel
Lahore

15th February [১৯৩৯]

শ্রীচরণকমলেষু

Day Lewis-এর [১] কবিতাটি পাঠাতে ভুলেছিলাম : আধুনিক ভয়ের কথা আধুনিক ভাষায় বলেচেন অথচ কবিতা হয়েচে। আপনার নিশ্চয় ভালো লাগবে।

**Behold The Swan**

Behold the swan
Riding at her image, anchored there
Complacent, a water-lily upon
The ornamental water :
Queen of the mute October air,
She broods in that unbroken
Reverie of reed and water.

How from the stricken
Pool she hoists and flurries,
And passes overhead
In hoarse, expressive flight :
Her wings beat hard
On the vibrant air : unhurried
The threat and pulse of wings, the throat
Levelled towards the horizon, see—
They are prophecy.

Ezra Pound সুস্থ অবস্থায় যে "hard Sophoclean light"-এর কথা বলেছিলেন আধুনিক দুচারটে কবিতার শব্দ-সংহতি এবং ঘন ভাবে তা ফুটে উঠচে। কিন্তু য়ুরোপীয় কাব্যে Yeats সবার উপরে। এরকম কবিতার তুলনা নেই—

"My fiftieth year had come and gone,
I sat, a solitary man,

In a crowded London shop,
An open book and empty cup
On the marble table-top.

While on the shop and street I gazed
My body of a sudden blazed;
And twenty minutes more or less
It seemed, so great my happiness,
That I was blessed and could bless.[২]

প্রণত
অমিয়

---

টীকা

১ (C) Day Lewis—৩৫.৪ টীকা দ্র.

২ 'Vacillation' কবিতার এটি ৪র্থ অংশ, ১৯৩২ সালে লেখা, *The Winding Stairs* (১৯৩৩) গ্রন্থে আছে।

## ৭১

বৃহস্পতিবার [মার্চ ১৯৩৯]

Gurukul University,
P. O. Gurukul Kangra
Dt. Saharanpur.
Rly. Station Hardwar (E.I. Rly.)

শ্রীচরণকমলেষু

এখানে[১] এসে খুব ভালো লাগচে যদিও অনেক বিষয়েই এঁদের মতবিশ্বাস গ্রহণ করা অসম্ভব। কিন্তু কী সুন্দর আত্মসম্ভ্রম এবং পরিচ্ছন্ন কর্ম্মবিধি—মানুষের সেবার দিকটাও এঁরা বড়ো ক'রে গ্রহণ করেচেন। দেখে ভালো লাগে যে হরিদ্বারের মন্দিরপাড়ার মধ্যে থেকেও এঁরা মূর্ত্তি জাতবিচারকে অবজ্ঞা ভরে ঠেলে ফেলেচেন—আহারে এবং বৈদিক মন্ত্রাভ্যাসেও সকল জাতকে মিলিয়েচেন। এখানে থাকলে প্রাচীন ভারতের একটা দিক চোখে পড়ে যা কল্পনায় ধ্যানে নূতন রস দেয় ;—গঙ্গার স্বচ্ছ ধারার দুপাশে শান্তি এবং সৌন্দর্য্য, শুভ্র দেয়াল এবং চূড়া, সর্ব্বভারতের কত যাত্রীর সমাবেশ। এই গঙ্গাই ঘোলা হতে হতে নেমে গেছে। এখানে হিমালয়, সূর্য্য, এবং গঙ্গাকে মিলিয়ে গুরুকুলের মন্ত্রচিহ্ন বানানো হয়েচে—তার কিছু সার্থকতা আছে। ঋষিকেশের (sic) উঁচু পাহাড়ের উপরে বহুকালের একটি দৃষ্টি আজো মানুষকে টানে—যেদিক দিয়ে কৈলাশ মানসসরোবরের পথ গেছে সেইখানে দাঁড়িয়ে এই কথা খুব মনে হচ্ছিল। অথচ দূরের

এই টানকে সহজ ক'রে অন্তরে মানতে পারে কজন—লক্ষ লক্ষ যাত্রী অন্ধভাবে পাহাড় পার হচ্চে, বরফে মরচে কতকাল ধ'রে।

এখানে আলোচনা সেরে আলিগড়ে যাচ্চি—সেখান থেকে নিমন্ত্রণ পেয়ে সুবিধা হল, পরে পরে ভারতের দুই পিঠ দেখতে পাব। সেখানে ত্রিশূলের জায়গায় বাঁকা চাঁদ—যে-চাঁদকে এ যুগের রণরঙ্গের কাস্তে-দেবতা ব'লে অনেকে বর্ণনা করচেন।[২] উত্তর ভারতের মুসলমান সভ্যতা মনকে খুব নাড়া দেয়—এবারেও দিল্লীতে এক প্রাচীন পরিবার কত আপন মনে হল। যদি আলিগড়ে নূতনযুগের মুসলমান যুবকেরা সাম্প্রদায়িক বৃদ্ধদের হাত থেকে শিক্ষিত সমাজকে উদ্ধার করতে পারেন তাহলে আমরা এক হয়ে এগোতে পারি। হয়ত নূতন সোশ্যালিজ্‌ম-এর শক্তি এদের মধ্য থেকেই জাগবে।

ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়, হরিদ্বারে আলিগড়ে দিল্লীতে কাশীতে ভারতের টুকরো খুঁজে বেড়াই—কোনোখানেই তাদের এক ক'রে পাই না শান্তিনিকেতনে ছাড়া। ডুন স্কুল তো এবারে দেখলাম—ওদের চেষ্টা খুবই ভালো—ছোটখাটো Dartington Hall—Elmhirst-কে ওঁরা খুব মানেন—কিন্তু এখনো ভারতবর্ষের মাটিতে শিকড় পৌঁছয়নি।[৩] যথার্থ প্রাণ নিয়ে কতদিনে আশ্রমের অনুষ্ঠান গড়ে উঠল—এর পিছনে কতখানি সত্যের পরিচয় আছে তা শান্তিনিকেতনের বাহিরে গিয়ে বারেবারে নানাদিক থেকে আজ বুঝতে পারি। ডুন স্কুলেও যা কাজ হচ্চে তার প্রধান অংশ শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের করা—সুধীর খাস্তগির শিল্পবিভাগের কর্ত্তা। বামন শিরোধকরও সঙ্গীত বিভাগে ভালো কাজ করচেন।[৪] ডুন স্কুলের ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষেরাও "জনগণমন"কে বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক এবং স্বাজাতিক গান ব'লে গ্রহণ ক'রে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েচেন। অধ্যক্ষ Foot লোকটি বেশ চমৎকার—কিন্তু বিদ্যালয়টি এখনও ভারতের বাহিরে বাস করচে। ধনীর সন্তানগুলির অত্যন্ত সভ্য ব্যস্ততার পর গুরুকুলের গরীব ছাত্রগুলির সহৃদয় সহজ সেবার জীবন মনকে কতকখানি তৃপ্তি দিল বলতে পারি না।

দূরে দূরে ঘুরচি—অনেক দিন আপনার নূতন লেখা পড়িনি। 'নব-জাতকে'র কথা প্রায়ই মনে হয়, উৎসুক হয় জানতে বইখানি ছাপা হয়ে গেছে কিনা, কীরকম দেখতে হয়েচে, কী ভূমিকা লিখেচেন। এই কবিতার বইটিতে বিভিন্ন রচনা আধুনিক মানুষের সুখদুঃখের যে-সুতোয় বাঁধা হয়েচে তা সম্পূর্ণই নূতন এবং তার বিশেষ একটি পরিচয় দেশের লোকের জানতে হবে।[৫]

প্রণত
অমিয়

---

টীকা

১ সনতারিখ এবং ডাকছাপ দেওয়া খামটিও যদি রক্ষিত না থাকে তাহ'লে চিঠির সঠিক সময় নির্ণয় করা কঠিন। এক ঐ 'নবজাতক' গ্রন্থের উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায় যে চিঠিটি ১৯৪০-এর এপ্রিল-মে-র আগে লেখা। কত আগে, বলা না গেলেও

ভয়ানক কিছু ক্ষতি নেই। অমৃতসর, লাহোর, আলিগড় হ'য়ে গুরুকুলে গেছেন ভেবে হয়তো ধরা যায় চিঠিটি ১৯৩৯ সালের মার্চ-এপ্রিলে লেখা।

২ দিনেশ দাস ১৩৪৫ সনের শারদীয় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় "কাস্তে" নামে একটি কবিতা লিখে কাস্তে-কবি নামে বিখ্যাত হ'য়ে গিয়েছিলেন। সেই কবিতারই স্মরণযোগ্য পঙক্তি 'এ যুগের চাঁদ হ'লো কাস্তে'। পরের বছর বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায় ঐ পঙক্তি অবলম্বনে এক সঙ্গে দুটি কবিতা ছাপা হয়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে-র লেখা। 'কবিতা ১৩৪৩-৪৮' নামে দিনেশ দাসের প্রথম কাব্যগ্রন্থে কবিতাটি আছে। গ্রন্থের আলোচনা ক'রে বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন : 'আরো চাই।' অমিয় চক্রবর্তীর এ-চিঠিতেও এই কবিতার ব্যবহার লক্ষণীয়।

৩ দুন স্কুলের প্রতিষ্ঠা ১৯৩৫ সালে। এই বিদ্যালয়ের এর চাইতে ভালো বর্ণনা হয় না।

৪ শান্তিনিকেতনের কলাভবনে নন্দলাল বসুর প্রথম দিককার ছাত্র শিল্পী ভাস্কর সুধীর খাস্তগীর (১৯০৭-১৯৭৪) স্কুল প্রতিষ্ঠার বছর থেকেই দুন স্কুলের কলাবিভাগে যোগ দেন। বিভাগের তিনিই প্রধান ছিলেন। ১৯৫৬ সাল থেকে লক্ষ্মৌ চারুকলা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হন। তাঁর শিল্পকর্মের নিদর্শন বেশির ভাগ রয়েছে বাংলার বাইরে। শান্তিনিকেতনের বাড়িতেও তাঁর অসংখ্য কাজ লোকচক্ষুর অগোচরে রয়েছে। ধারাবাহিকভাবে 'প্রবাসী'তে ছাপা (১৯৭০) শিল্পীর আত্মকথা তাঁর কন্যা শ্যামলী তান 'আমার এ পথ' নামে সম্প্রতি (১৯৯৪) গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন।

বম্বাই সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের এক অনুষ্ঠানে গিয়ে আঠেরো বছর বয়স্ক মারাঠী যুবক বামন শীরোডকারের (১৯০৭-১৯৫৪, শিরোধ্‌কর?) গান শুনে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে শীরোডকার, পারিবারিক বাধা না মেনে, ১৯২২ সালে বিশ্বভারতীতে এসে যোগ দেন। বারো বছর আশ্রমে থেকে এখানকার ভাবধারা তিনি সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করতে পেরেছিলেন। সুধীর খাস্তগীরের সঙ্গে একই বছরে তিনিও দুন স্কুলে যোগ দেন, সঙ্গীত শিক্ষক হিশেবে। মার্কিন দেশে নিউজার্সিবাসিনী তাঁর কন্যা প্রতিমা রাও এ-তথ্য দিয়েছেন।

৫ চিঠির শেষ বাক্যটি থেকে মনে না হ'য়ে পারে না যে ১৯২৫ সালের হ্যাভেলক্ এলিসীয় মন্তব্য ভিতরে-ভিতরে কাজ ক'রেই চলেছে। 'আধুনিক মানুষের সুখ-দুঃখের সুতোয়' বাঁধা রবীন্দ্রনাথের নতুন কবিতা নিয়ে তাই কনিষ্ঠের উল্লাস। 'নবজাতকে'-র জন্যে কবিতা নির্বাচন ক'রে দিয়েছিলেন অমিয় চক্রবর্তী নিজেই। তাঁকে উপহার পাঠানো বইয়ের কপিতে রবীন্দ্রনাথ লিখে দিয়েছিলেন :

কয়েক মাসের খেয়ালের খেতে
ফসল যা ফলেছিল
তখনো সেদিন গাঁয়ের বাহিরে
ধরণীর কোলে ছিল।
তুমি সঞ্চয় করি
আঁঠি বেঁধে দিয়ে ভরি নিলে খেয়াতরী।
ঘাটে এনে দিলে তারে
ব্যাপারী দলের দ্বারে।
কী পারানি দিয়ে পূরাব তোমার সাধ
আমার দিনের শেষের কড়িতে
লহো এ আশীর্বাদ।

মার্চ ১৪ই [১৯৩৯]

Lakshmi Mansions
The Mall, Lahore

শ্রীচরণকমলেষু

দ্বিতীয় সংস্করণে আরো কিছু যোগ করেচেন, কবিতাটি পূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েচে[১] এর ভিতর দিয়ে মৃত্যুর তত্ত্ব উপলব্ধি করতে চেষ্টা করচি। থাকা এবং না-থাকা যখন চৈতন্যের রহস্যে নিহিত, বৃহৎ গহ্বর নেই মধ্যে, তখন মৃত্যুকে প্রাণ হতে কালান্তরে নিয়ে ভীত হব কেন? একই কালে মৃত্যু রয়েচে কোটি প্রাণের মধ্যে-মধ্যে জানা-অজানার খেলায়—সব মিলে সবাই আছি মানুষ প্রজাপতি সৃষ্টির যত-কিছু। ইহকালের সত্তায় যদি এই, সর্ব্বকালের সত্যেও আমি ভিন্নতায় হারাব না। নানা চৈতন্যে স্তরে স্তরে এক হ'য়ে উঠব থাকা না-থাকায়।

প্রাণের তরঙ্গ এসে লাগে এই কথা ভাবলে। না-চেনার অন্তরেও আপনাকে সম্ভব ক'রে দেখি। অন্য একটি কবিতায় বলেছিলেন সাঁকোর কথা—ঘরের নানা সামগ্রী মিলে সেই ডিজাইনের কবিতায়—অগণ্য রঙীন সাঁকোয় পারাপার চলচে।[২] প্রাণের তীরে তীরে কত সংসার, তাতে ফুল, তাতে প্রজাপতি, আনন্দিত কবিতার মুহূর্ত্তগুলি চলেচে যাত্রী।

তারই সঙ্গে কবিতায় প্রশ্ন রয়েচে—সব মিলে কে এই আমি? চয়ন করচে চৈতন্যের দীপ্তি, জ্বালচে আমার আলো? বলা হয়েচে, জানা-আমির সঙ্গে সে এক নয়। আমার অজানিত আমির ব্যবহারে লাগল আমার জীবন, অন্তরে সৃষ্ট হচ্চে আমার আপন। প্রজাপতিকে না দেখেও তার ডানার রং দেখি, তার সত্তার আভাস পাই—আমার চোখের ভিতর থেকে আপন-আমি তাকে চিনতে থাকে। অনাত্ম যা তারই মধ্য হতে সবচেয়ে বড়ো অস্তিত্বের আভাস এল।

কিন্তু কবিতাকে বিশ্লেষণ ক'রে ফুরোয় না—জলের যে গভীর-মধ্য হতে কবিতা জেগেচে সেখানে মন ডুবে যায় চৈতন্য পায় পদ্মকে।

*Death Takes a Holiday* নাট্য ট্রেনে আসবার পথে পড়লাম—আপনার কেমন লাগে জানতে উৎসুক বোধ হল তাই পাঠাচ্চি।[৩] স্টেজের যোগ্য করবার জন্যে মৃত্যুকে মানুষের মুখোষ পরে নামাতে হয়েচে কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কে সহসা প্রতীকের ছায়া সরে যায়—মৃত্যু কথা কইতে থাকে। অদ্ভুত এই নাটক। কিছু ভাববার জিনিষ রয়েচে। বড়ো অক্ষরে ছাপা ভালো সংস্করণ খুঁজলাম, কোথাও পেলাম না।

বেগম শা নওয়াজের সঙ্গে দেখা হয়—গভীর তাঁর অনুরাগ আপনার প্রতি।[৪] এঁর সাহচর্য্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছ থেকে বিশ্বভারতীর জন্যে কিছু পাওয়া যাবে—এই বিরোধের দিনে ওঁদের সমাজে আপনার বাণী আরো ছড়াতে পারবে। কিছুদিন হল ওঁর স্বামী মারা গেছেন। উনি কর্ম্মে নেমেচেন, পলিটিকসে মতের খুবই অমিল হবে কিন্তু সেবার কাজ দেখে শ্রদ্ধা হয়। ওঁকে আপনি চিঠি লিখলে খুব ভালো হত—বিশ্বভারতীর কাগজপত্র আমি ওঁকে দিয়েচি। চিঠির মোটামুটি একটা খসড়া ক'রে পাঠালাম—

কথাবার্তায় যা জেনেচি তাতে মনে হয় ঐ ধরণের দুচারলাইন পেলে বিশেষ উপকৃত হবেন।

এখানকার মুসলমান সমাজে খুবই আশ্চর্য্য লোক হঠাৎ দেখতে পাই। তাঁরা ভারতবর্ষের আপন অথচ বিশেষ একটি আভিজাত্য দিয়েচেন দেশকে। সীমান্ত প্রদেশে আজ আবদুল গফর খাঁ-এর কল্যাণে ইসলাম ধর্ম আমাদের আত্মীয়তায় বদ্ধ। উত্তর ভারত থেকে বিদায় নেবার পথে রামপুর হয়ে যেতে চাই—ইকবাল বলেছিলেন সেখানে যেতে।

কাল দিল্লীতে যাব—দিন সাতেক থাকব 15 York Road, New Delhi-তে। জাম সাহেব এবারে Chancellor, তাঁকে দিয়েই Chamber of Princes-এ বলাবার চেষ্টা করব আশ্রমের সর্ব্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে—যেন কিছু দক্ষিণা দেন।[১]

প্রজাপতির কবিতা মন জুড়ে রয়েচে—বারেবারে নূতন ইসারা মনে জাগচে। কাব্যসৃষ্টিকে যাঁরা কেবলমাত্র বুদ্ধি দিয়ে দেখেন ইসারা দিয়ে খোঁজেন না, সুর শোনেন না তাঁরা কতদূর বঞ্চিত এইরকমের কবিতা পড়লে বুঝতে পারি। মূলক রাজ আনন্দ্-এর নূতন পত্রিকায়[২] ধূর্জটীবাবু, সুধীনবাবু কেবলই তর্কের দিক থেকে আশ্চর্য্য সৃষ্টির পৃথিবীকে দেখেচেন, আপনার লেখার কিছু ভুল বিচার করেচেন। ভাববার মতো রচনা, পড়ে প্রশংসা করি কিন্তু য়ুরোপের যে-দৃষ্টি ওঁরা দিতে চেয়েচেন তার থেকে দরদটুকুই বাদ পড়েচে।

আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন।

প্রণত
অমিয়

---

**টীকা**

১ 'দ্বিতীয় সংস্করণ' কোনো বইয়ের নয়, "প্রজাপতি" নামে কবিতার ('সকালে উঠেই দেখি'), আজকাল যাকে বলা হয় 'পাঠান্তর'—তাই। রবীন্দ্রনাথই 'সংস্করণ' কথাটা এ-প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন। ('চিঠিপত্র' ১১শ, ১০৯)। কবিতাটি পরে 'নবজাতকে' যায়।

আধুনিক প্রকরণে মাঝে-মাঝে রবীন্দ্রনাথ তখন আঁটোসাঁটো কঠিন কবিতা লিখছেন। অক্সফোর্ডে থাকতে Spender-এর নাম ক'রে এই ধরনের 'ভাবের ঘনীভূত মাধুর্যে ভরা কবিতা'র দাবি জানিয়েছিলেন অমিয় চক্রবর্তী। (৪৪-সংখ্যক চিঠি দ্র.)। "প্রজাপতি" কবিতার প্রথম 'সংস্করণ' বা পাঠ অমিয় চক্রবর্তীকে পাঠিয়ে (৮ মার্চ ১৯৩৯) চিঠিতে কবিতারই ছাঁদে সাজিয়ে লিখেছিলেন : 'জিনিসটা কি বেশি শুকনো/এবং মেটাফিজিক্যাল হয়েছে।/যা অনুভব করি, বা অনুমান করি/ তা সবটা বলতে পারিনি।' অমিয় চক্রবর্তী চিঠির উত্তরে কবিতাটিকে আর একটু বদল করার অপ্রকট ইঙ্গিত করছেন কিনা বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এসব বিষয়ে তাঁর খুবই ঠারে ঠোরে কথা চলতো। 'নবজাতকে' আছে কবিতাটির তৃতীয়

'সংস্করণ' যার শেষ দিকে আরো কিছু বদল দেখা যায়।

২ কবিতাটি কয়েক মাস আগে 'প্রবাসী'-তে (কার্তিক ১৩৪৫) বেরিয়েছিলো "জানা-অজানা" নামে ('এই ঘরে আগে পাছে/বোবা কালা বস্তু যত আছে') ইংরেজিতে যাকে বলে 'design in the carpet'—খুব কাছে থেকে দেখলে মনে হয় নিতান্তই এলোমেলো অসংলগ্ন রঙ-রেখার বিস্তার, অথচ আসলে যার মধ্যে সুচিন্তিত সংগতি আছে—সেই চিত্রকল্পের ব্যবহার আছে কবিতায় : 'কার্পেটের ডিজাইন / স্পষ্টভাষা বলেছিল একদিন'।

৩ এটি নিশ্চয়ই ইতালীয় নাট্যকার Alberto Casella-র (১৮৯১-?) ১৯২৩ সালে লেখা নাটক। ১৯৩৪-এ এই নাটক অবলম্বনে একটি মার্কিনি ফিল্মও তৈরি হয়েছিলো—'Death Takes a Holiday'। এখনো কদাচিৎ মার্কিন দেশের টেলিভিশনে দেখানো হয়।

৪ সমাজসেবার জন্যে বেগম শানওয়াজকে একদা সম্মানিত করা হ'য়েছিলো, 'প্রবাসী' পত্রিকায় এঁর ছবিও ছাপা হয়, কিন্তু তদতিরিক্ত তথ্য কিছু পাওয়া যায় না—সেটা লজ্জাকর। কোনো পাঠক হয়তো সহায়তা করবেন।

৫ নবনগরের মহারাজা শ্রী রণজিৎ সিংজী বিভাজী (১৮৭২-১৯৩৩) জামসাহেব নামে পরিচিত ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমেদাবাদের গৃহে এঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয়। ইনি ছিলেন খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড়, যাঁর নামে 'রঞ্জি ট্রফি'-র খেলা হয় প্রতিবছর । বিশ্বভারতীতে এঁর দান আছে।

৬ মুলক্ রাজ আনন্দ (১৯০৫-) নিজেও মনে করতে পারলেন না ১৯৩৯ সালে বা তার কাছাকাছি সময়ে কোন্ পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করতেন যেখানে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে লিখেছিলেন।

## ৭৩

March 16 [১৯৩৯]

Muslim University
Aligarh

শ্রীচরণকমলেষু

একটা ছোটো ইংরেজি বই পাঠাই—আমার মনে হচ্ছিল বিশ্বভারতী লোকশিক্ষার বইগুলি এমনি আকারে ছাপালে সস্তায় সুন্দর দেখাত। নমুনা স্বরূপে পাঠালাম। Shakespeareএর গানগুলি বেশ লাগে।

এখানে খুব উৎসুকভাবে সময় যাচ্চে—অনেক শিখচি, জানচি। আমার খুবই নতুন লাগচে। জিনিষটা খুব বড়ো হয়ে উঠেচে সন্দেহ নেই, অনেক ভালো কর্ম্মীও এসেচেন। সকাল থেকে রাত লোকজনের সঙ্গে আলোচনা চলচে—নানা বিভাগে ঘুরে বেড়াচ্চি। কাল পর্য্যন্ত মেয়াদ।

এখানে প্রবাসী পাইনি—কাশীতে পাব সেই আশায় রয়েচি। রামগড়েও যেতে চাই। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

প্রণত

অমিয়

গুরুকুলের আচার্য্য অভয় দেব-জি আপনাকে তাঁর প্রণাম জানিয়েচেন।

## ৭৪

২৩ মার্চ [১৯৩৯]

15 York Road
New Delhi

শ্রীরচণকমলেষু

আজ এখানে আপনার চিঠি পেলাম,[১] কীরকম দিন কাটল বলতে পারি না। চিঠির আকারে সাহিত্যের এমন একটি রূপ সৃজিত হয়ে উঠেচে যার তুলনা কোথাও নেই। কাব্য, ডায়েরি এবং গদ্য প্রবন্ধের আলো এসে পড়ে অথচ চিঠির বিশেষত্ব একটুও কমেনি —যাঁরা বলেন এই জাতীয় রচনা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হলেও চিঠি নয় তাঁদের সঙ্গে কিছুতেই এক মত হতে পারি না। পরশু লাহোরে ফিরে গিয়ে এই চিঠির প্রসঙ্গে কিছু লিখতে চাই।

Viceroy বলেচেন বিশ্বভারতীর কথা তাঁর মনে রইল[২]—এখনকার আন্দোলিত ঘটনা একটু শান্ত হলে এ নিয়ে ভাববেন, যাতে কিছু করা যায়। তাঁর Political adviser Sir Bertrand Glancy-র সঙ্গে States আন্দোলন নিয়ে দেখা করতে বললেন, সেই সঙ্গে বিশ্বভারতী সম্বন্ধে তাঁর ইচ্ছার কথা বলতে পারব তাই জানালেন। জিনিষটা সহজে থামতে দেব না।[৩]

রামপুরের নবাব প্রতিশ্রুতি দিয়েচেন সাহায্য করবেন,—তাঁর প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে বেশ পরিচয় হয়েচে, তাঁর সঙ্গে কথা আছে যখন শিমলায় যাব ব্যাপারটাকে পাকা ক'রে তোলা যাবে। তখন আশ্রমে জানাব যাতে ঠিকরকম ব্যবস্থা হয়। আরো নানা জায়গায় চেষ্টা এগোচ্চে।[৪]

মহাত্মাজি রাজকোট ব্যাপারের দেরি নিয়ে একটু অস্থির হয়ে উঠেচেন—ইচ্ছে ক'রে ওরা রাজকোটে কাগজপত্র আটকে রেখেচে যাতে Gwyer-এর বিচার দিতে দেরি হয়। আমার উপর মহাত্মাজি ভার দিয়েচেন Glancy-কে তাড়া দেবার জন্যে।

Jinnah যে এত দূর অপ্রকৃতিস্থ মানুষ তা জানতাম না, এবারে কথাবার্ত্তা চলচে

—ভারতে মুসলমান রাজ্য তিনি বানাবেনই এবং সে জন্যে মুসলীম সৈন্য, frontier, সবই তিনি চান। মাদ্রাজ এবং অন্য অঞ্চলের মুসলমান minority-কে বাধ্য করবেন migrate ক'রে উত্তর ভারতে আসতে। East Bengal হবে আলাদা Muslim State; বড়ো block হবে কাশ্মীর, পঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ, উত্তর সীমান্তের দেশগুলি। কাল আবার ডেকেচেন "Muslim Juridical philosophy" এবং ধর্মের "immutable law" বোঝাবেন ব'লে। ভক্তিভরে শুনব।[৫]

আমার প্রণাম জানবেন।

প্রণত

অমিয়

---

টীকা

১ সমসাময়িক নানাবিধ গুরুতর বিষয় একত্র ক'রে রবীন্দ্রনাথের লেখা এই আশ্চর্য চিঠিটি ('চিঠিপত্র' ১১শ, ১১০) প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই 'প্রবাসী'তে (বৈশাখ ১৩৪৬) ছাপা হয়। মুদ্রিত আকারেই সেটি ১২ পৃষ্ঠা দীর্ঘ। এ-ধরনের রচনাকে ঠিক 'চিঠি' বলা যায় কিনা, নাকি সেটি বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীকে মনে রেখে লেখা গুরুতর প্রবন্ধ, তা নিয়ে বিতর্ক হওয়া অসম্ভব নয়। এবং সেই সম্ভাব্য তর্কে পত্রপ্রাপকের মতটা এখানে স্পষ্ট হ'য়েই প্রকাশ পেয়েছে। এই তর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেও যোগ দিয়েছিলেন। দেখা যাবে চিঠিপত্র ১১শ খণ্ডের ১১১-সংখ্যক চিঠিতে। 'প্রবাসী'-তে আগের বছর চৈত্র সংখ্যা থেকেই 'পত্রালাপ' নাম দিয়ে 'ডাক্তার অমিয় চক্রবর্তী'-কে লেখা রবীন্দ্রনাথের কিছু-কিছু চিঠি ছাপা শুরু হয়েছিলো। বিশ্বভারতী থেকে 'চিঠিপত্র' সিরিজ প্রকাশের তখন পর্যন্ত কোনো পরিকল্পনা ছিলো ব'লে মনে হয় না। অমিয় চক্রবর্তী ভেবেছিলেন বিশ্বের বিচিত্র বিষয়ে অন্তত তাঁকে লেখা কবির চিঠিগুলি এক সময় হয়তো বই ক'রে ছাপা হবে। হয়েওছে, অন্তত অধিকাংশ চিঠি, তবে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পরে, ১৯৭৪ সালে, এবং কোনো পত্রপরিচিতি ছাড়াই। উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক রচনা হিশেবে তার মূল্যও অপরিসীম, পাঠক ঠিকই রস পাবেন। কিন্তু চিঠি তো কবিতা নয়। সহায়ক পত্রপরিচিতি তাই নিতান্ত দরকার।

২ তখন Viceroy ছিলেন লর্ড লিন্‌লিথগো। (৪৯.৮ টীকা দ্র.)

৩ নতুন ভারতশাসন আইনে ভারতবাসীর হাতে স্বাধিকারের যেটুকু ছিঁটেফোঁটা পৌঁচেছিলো, দেশীয় রাজ্যের প্রজারা তা থেকেও বঞ্চিত ছিলো। স্বাধিকারের দাবিতে বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যে তাই এসময় সত্যাগ্রহ শুরু হয়। রাজকোটের ঠাকুরসাহেব Reforms Committee বসিয়ে তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছুটা অধিকার প্রজাদের দেবেন ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়েও কার্যত সে-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। প্রতিবাদে ৩ মার্চ (১৯৩৯) থেকে মহাত্মাজীর অনশন শুরু হয়। ভাইসরয় ৬ মার্চ তারিখে ভারতের প্রধান বিচারপতি স্যর মরিস গয়্যারকে রাজকোট বিষয়ে বিচার বিবেচনা ক'রে তাঁর রায় দিতে বলেন। রায় যাতে শীঘ্র না বেরোয় তার জন্যে সব রকম চক্রান্ত করতে রাজকোটের ব্রিটিশ রেসিডেন্ট Gibson ত্রুটি করেননি। তবু স্যর

মরিসের রায় গিয়েছিলো মামলার বাদী কংগ্রেস প্রতিনিধি সর্দার প্যাটেলেরই সপক্ষে। গান্ধীজি অনশন ত্যাগ ক'রে দিল্লি ফিরে যান ১৫ মার্চ।

অমিয় চক্রবর্তীর লেখা এ-সময়কার চিঠি কয়টি এই পরিপ্রেক্ষিতে পড়া দরকার। অনশনের সময় তিনি উপস্থিত থাকেননি, কিন্তু রাজকোটের মামলা ফয়সালার ব্যাপারে তাঁরও, দেখা যাবে, কিছু করণীয় ছিলো।

৪ নানাসূত্রে বিশ্বভারতীর জন্যে কিছু অর্থসংগ্রহের চেষ্টা চলছিলো সে-সময়।

৫ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যারিস্টার Mohammed Ali Jinnah (১৮৭৬-১৯৪৮) ছিলেন ১৯২০ সাল থেকে মুসলিম লীগের সভাপতি। ১৯৪০-এ লীগের লাহোর-অধিবেশনে পাকিস্তান দাবির প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। কখন তাঁর সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর পরিচয় হয়েছিলো, এবং কী সূত্রে জিন্নার সঙ্গে দিল্লিতে তাঁর সাক্ষাৎ হয় তা জানা যায় না। তবে, দেখা যাচ্ছে, গুরুতর রাজনৈতিক বিষয় নিয়েও আলোচনা হওয়ার মতো সম্পর্ক তাঁদের মধ্যে ছিলো।

## ৭৫

[২৫ মার্চ ১৯৩৯?] রবিবার

Birla House
Albuquerque Road,
New Delhi

শ্রীচরণকমলেষু

সন্ধ্যা উপাসনার সময়ে এখানে কাটালাম। মহাত্মাজি এলাহাবাদ ভ্রমণে নিরতিশয় ক্লান্ত হয়ে ফিরেচেন।[১] খাটে শুয়েছিলেন ম্লান আলোয়, ভজন হল বীণার সঙ্গে, নিরালা ঘরে দুচারজন এসেছিলেন, বাহিরের আকাশ ভরা সন্ধ্যার তারা। পলিটিক্‌সের ধুলোঝড়ের মধ্যে মহাত্মাজি গভীর স্নিগ্ধতা বহন করচেন—কাগজওয়ালারা এই দিকটা দেখতে পান না। কত বড় একটি সত্যের মর্য্যাদা এইখানে, কত বড় ক্ষমা, কী গভীর ঔদার্য্য, সত্যের কঠিনতা।

ওঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে কদিন ধ'রে কথা চলচে—সকালে আসি যখন লোকের ভিড় নেই। কত সহজ সশ্রদ্ধ মনে মানুষের সমস্যাকে দেখেন। আশ্রমের কথায় ওঁর মন ভ'রে ওঠে—অনেকদিন থেকে ওখানে গিয়ে আপনার কাছে নিভৃতে কিছু সময় কাটাবার জন্যে তৃষিত আছেন কাজের জঞ্জালে পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। বললাম আমাদের সকলেরই মনে একটু দুঃখ আছে অনেকদিন তিনি শান্তিনিকেতনে আসেননি। এবারে কিছুদিন পরে কলকাতা যাবার পালায় একবার ওখানে থেকে আসবার কথা ভাবচেন—মহাদেবও বলছিলেন তাঁদের সকলেরই বহুকালের ইচ্ছা যেন তাই হয়।[২]

মৃত্যুলোকের বিষয়ে মহাত্মাজি নূতন পথে ভাবচেন—প্রাণকে মনে করচেন কর্ম্মের

সত্য, মৃত্যু তারই মধ্যে মধ্যে বারেবারে কর্ম্মের শান্তি। সবকে মেলাবার দৃষ্টি প্রাচীন সংস্কৃতে এবং আপনার লেখায় পেয়েচেন ওঁর এতে আনন্দ—তার পিছনে দেখতে পান অগণ্য ভারতীয় গ্রামবাসীদের নীরব সাক্ষ্য।

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

অমিয়

---

**টীকা**

১ তারিখ না থাকলেও মনে হয় চিঠিটি ৭৬-সংখ্যক পরের চিঠির (লাহোর থেকে ৩০ মার্চে লেখা) আগের সপ্তাহে লেখা। আবুল কালাম আজাদ অসুস্থ শুনে, রাজকোট সংক্রান্ত অনশনের পর, দিল্লী থেকে গান্ধীজি একদিনের জন্যে এলাহাবাদে তাঁকে দেখতে যান। পরদিন ২৫ মার্চেই ফিরে আসেন। দিল্লীতে মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেছিলেন তারও আগে।

২ পরবর্তী ৭৭.৫ টীকা দ্র.

## ৭৬

৩০ মার্চ ১৯৩৯[০]

Lakshmi Mansions
The Mall, Lahore

শ্রীচরণকমলেষু

আমাদের দেশে এখন সত্য কথা বলা অসম্ভব হয়ে উঠচে—গুরু কিম্বা গুরুর দল ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। অনাহারিক আধ্যাত্মিকতার বিরুদ্ধে লিখে মহাত্মাজির দলের অনেককে চটিয়েচি[১] কিন্তু মহাত্মাজি নিজে রাগ করেননি। তার কারণ তিনি অনেক কাজ করেন অন্তরের বেগে। তাতে ভুল থাকতে পারে কিন্তু ফাঁকি নেই—জ্ঞানের দিক থেকে আমরা প্রতিবাদ করতে বাধ্য কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে শ্রদ্ধা না দিয়ে পারি না। উনি সে কথা বোঝেন এবং আমাদের কথা সহ্য করেন।

লেখাটা অতি সামান্য তবু সাহস ক'রে আপনাকে পাঠালাম। সমস্ত ভারতবর্ষে এবং খৃষ্টান মণ্ডলীতে fasting-এর বিচিত্র ব্যাখ্যা চলেচে—শরীর-তত্ত্বে এবং পরমার্থে মিলিয়ে এমন জটলা হয়েচে বলা যায় না। এক এক সময়ে মনে দ্বিধা হয় সুবিচার করচি কিনা কিন্তু তবু চেষ্টা করে মাথা পরিষ্কার রাখতে চাই। এখনকার কালের জন্যে না হোক্ ভবিষ্যৎকালের জন্যে সমস্ত জিনিষটার বিষয়ে আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই—কোনোখানে বাংলায় লেখা থেকে যাক যাতে পরবর্তী মানুষ জানতে পারে এমনতরো অলৌকিক তত্ত্বালোচনার কালে কীভাবে আপনি দেখেছিলেন। শরীরকে অত্যাচার করার

ধৰ্ম্ম আমাদের দেশে ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের শ্রেষ্ঠ ধৰ্ম্মধারায় তা স্থান পায়নি। ওদিকে খৃষ্টান-ধর্ম্মের মূলেই আছে Original Sin—দেহ সেই পাপকে বহন ক'রে এসেচে। সুতরাং ওদের থিওলজিতে দেহনিগ্রহকে বড়ো স্থান দিয়েচে যদিও পাশ্চাত্য ধার্ম্মিক মুখে যাই বলুক কাজে তা স্বীকার করেনি। জুডাইজম্-এর ভূত আজ পর্য্যন্ত খৃষ্টান ধৰ্ম্মশাস্ত্রে চেপে রয়েচে—মহাত্মাজি অনাহার দ্বারা সেই ভূতকে ভারতবর্ষে এনেচেন। তার সঙ্গে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞাকে মিলিয়েছেন। যোগাযোগ এতই বিচিত্র যে কেউ বুঝতে পারচে না এবং সেই কারণে যুক্তি বাড়াচ্চে।

বিরলাদের বহুলক্ষটাকার মন্দির দেখে হতাশ্চর্য্য হয়েচি। এতবড়ো বহুমূল্য মূঢ়তা জীবনে দেখিনি—মূৰ্ত্তিপূজা কতদূর উগ্র এবং অসুন্দর হয়ে আস্ফালন করতে পারে তার প্রমাণ। এন্ড্রুজের সঙ্গে গিয়েছিলাম—কুৎসিত রঙচঙে ছবি (কোন্ এক মণি রায় নামক বাঙালী অজন্তা ভঙ্গীর অধম সংস্করণে মাড়োয়ারি মনোহারিত্বে মিলিয়ে এঁকেচেন) এবং উৎকট পাথরমূর্ত্তি মন্দিরের আগাগোড়া ছড়ানো। মুহূর্ত্তের জন্যে বুঝতে পারলাম মুসলমানেরা কী দিতে এসেচে এই দেশে—এন্ড্রুজ আমার কথা মান্‌লেন। মহাত্মাজি যদি দোতলায় উঠে রক্তাক্ত সুরাসুরের দ্বন্দ্বছবি মন্দিরের গায়ে দেখতেন তাহলে ব্যবসায়ীর সৌধকে ধর্ম্মস্থান বলতে তাঁর উৎসাহ হত না। উনি দ্বারের কাছে বিশ্রাম ক'রে উদ্বোধন পর্ব সারলেন এবং চিরদিনের মতো ওঁর নাম জড়িয়ে গেল ১৯৩৯ সালের হিন্দুত্বের সঙ্গে।[২] জওহরলালকে সেদিন বল্‌লাম ; তিনি বল্‌লেন ঐ মন্দিরে তিনি যাননি, কোনোদিন যাবেন না। কিন্তু ওঁরাও খুলে কথা বলতে নারাজ। ফলে দেশ জুড়ে আজ আবার ধর্ম্মের আদিমতা আধুনিক হয়ে উঠ্‌চে লক্ষ টাকার বণিকদের কৃপায়। বুদ্ধের মন্দিরে বুদ্ধকে বানিয়েচে নিজেরই মুখ এবং মনের ছাপে—আর্টিস্ট কে তা জানি না। দেখে মনে হয় ধূর্ত্ত কোন্ দোকানদার চোখ বুঁজে (sic) ব'সে আছেন—মূর্ত্তিকর শুনচি মাড়োয়ার নিবাসী। গাঁদা ফুলের মালা দিয়ে বুদ্ধদেবকে চাপা দিয়েচে। মাথাটা শরীরের পরিমাণে ভীষণ ছোটো হয়ে গেছে বলে ক্ষতিপূরণ হিসাবে বলচে কয়েকমাস পরে একটা গোল চক্র উপরে বসিয়ে দেব। কত টাকার পাথর কিনবে তার হিসাব শোনা গেল। লক্ষ লক্ষ লোক দুবেলা ঐ মন্দিরদুটিতে ভিড় করচে এবং হীন প্রতিমা, নিকৃষ্ট ছবির পায়ে অর্ঘ্য দিয়ে হিন্দুত্ব লাভ করচে। পাণ্ডার আমদানি হতে দেরি হবে না, এখন তকমা-ধারী দারোয়ান এবং দুচারটি ভীত পূজারীর প্রাদুর্ভাব।

লক্ষটাকার মন্দিরকে গ্রাহ্য করি না কিন্তু এই সব ব্যাপারের পিছনে যে তত্ত্ব আত্মজাহির করচে তাকে ভয় পাই।

বুর্জোয়া এবং প্রোলিটেরিয়েট সাহিত্যবিচার সম্বন্ধে আপনার চিঠিখানি এখনি বেরোনা দরকার। সৃষ্টির মূল্য টিকিটের রং দেখে ঠিক করা হচ্চে।[৩] য়ুরোপে অনিবার্য্য কারণে একান্ত পোলিটিকাল চেতনা ঠেলে উঠেচে, হয়তো কিছু পরিমাণে আমাদের দেশেও একই বৃত্তি জাগবেই কিন্তু আমাদের বিচারে দেশীয় জীবনের সঙ্গে এখনো যোগস্থাপন হল না, আমাদের ইতিহাসের ভূমিকা নেই ব'লে রাষ্ট্রিকমূল্য সাহিত্যে ঠিক

ভাবে প্রবেশ করেনি, কোথাও তার গভীর প্রবর্ত্তনা দেখতে পাই না। Stephen Spender একবার আমাকে বলেছিলেন—"I really don't know about political art, but whatever engages the deepest life of a people is subject for a people's art, I suppose politics does engage our emotional life so we cant help politics from influencing our art"। এর মধ্যে যে-তত্ত্বটুকু স্বীকার করি তার প্রসঙ্গ emotional ; emotionএর ধর্ম্ম এই যে তা emotional context-কে art-এ টেনে আনে। কিন্তু আমাদের নূতন কবিদের লেখায় Politics বা Propaganda-র emotional context কোথায়? আপনার ছোটগল্পে সেই বাংলা গ্রামের context আছে—আপনিই এসে পড়েচে, বাজার, হাট, মেলা, গ্রাম্য থিয়েটার, গরীব পোস্টমাস্টার বেদনার টানে, দৃষ্টির টানে। আমাদের কাব্যে কোথায় বাংলা দেশ, কোথায় বৃহৎ ব্যাপক জনসংঘের জীবন ; রাজনৈতিক সংগ্রামের বড়ো দিকও তো কোথাও আঁকা পড়ল না যেমন আঁকা পড়েচে য়ুরোপীয় সাহিত্যে। মনে করা যায় জওহরলাল যদি কবিতা লিখতে পারতেন তাহলে পোলিটিকাল কবিতা জাতীয় কিছু একটা তৈরি হত যা Stephen Spender, Auden-এর লেখার সগোত্র। আমরা পাশ্চাত্য বচন আওড়াচ্চি—"বুর্জোয়া", "প্রোলিটেরিয়ট" আর্ট—কেননা এদেশের জওহরলালেরা কবিতা লেখেন না, তা ছাড়া জওহরলালের সংখ্যা একের বেশি নয়।

আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

প্রণত

অমিয়

---

**টীকা**

১ কয়েক সপ্তাহ পূর্বেই রাজকোটের ব্যাপার নিয়ে গান্ধীজি আর একবার অনশন করেছেন। রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে অনশন করার যৌক্তিকতা নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। 'হরিজন' পত্রিকায় গান্ধীজি নিজেও সে-বিষয়ে লিখে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেন। গান্ধীজির প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও অমিয় চক্রবর্তী লিখিতভাবে এ-ধরনের 'অনাহারিক আধ্যাত্মিকতার' বিরোধিতা করেছিলেন।'Ethics of Fasting' নামক প্রবন্ধে লিখেছিলেন : 'Obviously, defiance of the body which is the basis of earthly life, liberates heroism for great deeds. Collective suffering, enforced by saintly men, has also produced great results. We must, however, find out whether these particular beliefs, and interpretation of spiritual universe that such beliefs offer. are acceptable to us today. Are there other and better means of obtaining desired end?'... Sinfulness of man's physical existence, and the technique of self immolation— are these compatible with our spiritual outlook? ...In studying the ethics of fasting we may not be swayed by theories of exceptions and be overwhelmed by Gandhiji's greatness, His experimenting with truth needs universal standards'.

'চিঠিপত্র' ১১শ খণ্ড দেখলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে কবি এ-বিষয়ে মৌন ছিলেন, অমিয় চক্রবর্তীর প্রশ্নের কোনো জবাব দেননি। আসলে চিঠির উত্তরে তিনি খুবই স্পষ্টভাবে অনশন-বাহুল্যের প্রতি তাঁর বিরূপতার কথা জানিয়েছিলেন। ৩ এপ্রিল তারিখে রবীন্দ্রনাথ উত্তরে লেখেন : 'মহাত্মাজি মাঝে মাঝে যদি চিত্তশোধনের জন্য এই কৃচ্ছ্রসাধনা করতেন তাহলে সেটা ভারতীয় প্রথার সঙ্গে মিলত।... মহাত্মাজি যখন রাষ্ট্রিক উদ্দেশ্য নিয়ে মাঝে মাঝে অনশনব্রত গ্রহণ করেন তখন সমস্ত দেশ উৎকণ্ঠিত হ'য়ে ওঠে, এতে তাঁর আত্মার কী উৎকর্ষ সাধন হয় আমি বুঝতেই পারিনে—বরঞ্চ ফল উল্টো হবারই কথা।... গান্ধীজির এই অদ্ভুত আচরণের সঙ্গে সঙ্গে এই আত্মপীড়নমূলক ছেলেমানুষী আব্দার দেশে ছড়িয়ে গেছে।' ('রবীন্দ্রজীবনী' ৪, পৃ. ১৭৭ দ্র.)। কোনো কারণে রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিটি ১১শ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

২ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের আগ্রহে, বিড়লাদের অর্থানুকূল্যে, দিল্লীতে লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির এবং বুদ্ধবিহার নির্মিত হয়। সব জাতির, সব ধর্মের লোকের জন্যে মন্দির দুটি অবারিতদ্বার হবে জেনে গান্ধীজি মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করতে সম্মত হন। অবশ্য ভিড়ের জন্যে তিনিও মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করতে পারেননি। এবং ভিতরকার শিল্পকর্মাদি চাক্ষুষ দেখতেও পারেননি। দ্বার থেকেই দ্বারোদ্‌ঘাটন ক'রে তিনি প্রস্থান করেন। (২৫ মার্চের আগে।)

৩ হোক নাট্‌শি, হোক মার্ক্সবাদী—যে-কোনো দলীয় সাহিত্য-বিচারে যে-ধরনের জাতমানা রীতির প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ সেটা কখনো সহ্য করতে পারেননি। এ-বিষয়ে ১৭ মার্চে লেখা তাঁর দীর্ঘ চিঠির এক জায়গায় আছে : 'ডিক্টেটরি বুদ্ধি যতই গরম হয়ে ওঠে ততই একেশ্বর নেতারা ভুলে যায় যে বিধাতার অন্যমনস্কতায় তারা সর্বজ্ঞ হ'য়ে জন্মায়নি। মানুষকে চালনা করার নেশা এমনি-ভাবে পেয়ে বসে যে সকল বিষয়েই মানুষকে নাকে দড়ি দিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে উগ্র ভাবে উদ্যত হ'য়ে থাকে।... পাশ্চাত্য ডিক্টেটররা কেবল রাষ্ট্রিক ব্যাপারে নয়, সামাজিক বিধানে নয়, সাহিত্যে আর্টেও আপন শাসন রুদ্ররীতিতে প্রচার করছে।' চিঠিটি 'প্রবাসী'র (বৈশাখ ১৩৪৬) 'পত্রালাপ' পর্যায়ে বেরিয়েছিলো। ('চিঠিপত্র' ১১শ, ১১০ দ্র.)।

## ৭৭

12th April [1939]

LAKSHMI MANSIONS
THE MALL
LAHORE, INDIA

শ্রীচরণকমলেষু

"পারস্য ভ্রমণ" ইংরেজিতে তর্জ্জমা করতে চাই। বাংলার বাহিরে প্রায় কেউ জানেন না, আপনি কী লিখেছিলেন, অনেকেই প্রশ্ন করেন। ইরাণী হাওয়া আমাদের বিরোধের

উপর দিয়ে ব'য়ে গেলে ভালো হবে ; তা ছাড়া পত্রগুলি ছবিতে ভরা, ঘটনায় পরিপূর্ণ —ভ্রমণবৃত্তান্তের স্বাদ হয়তো তর্জ্জমায় কিছু রক্ষা করা যাবে।[১] এইভাবে আপনার Travel Notes একত্র হতে পারবে—জাভা, জাপান হয়েছে, এখন পশ্চিমযাত্রী এবং পূর্বেকার য়ুরোপ ভ্রমণসাহিত্য বাকি।

তর্জ্জমা খানিক এগোলেই কৃপালানীর কাছ পাঠিয়ে দেবো—আগামী সংখ্যার জন্যে। ছুটিতে আরো কিছু কাজ হাতে নিতে চাই—সাহিত্যের পথে এবং নূতন প্রবন্ধের আলোচনার ইংরেজি হওয়া দরকার। দুইবোন-এর অনুবাদ সুধীনবাবু নিজে করেন তো বেশ হয়—আনন্দ-এর পত্রিকায় প'ড়ে মনে হল ওঁর কলমে ইংরাজি সহজে আসে।[২]

ভারতীয় রাজনীতি কুটিলতায় জড়িত—কংগ্রেসের কর্ম্মী অনেকেই স্বদেশী আঁধিতে আক্রান্ত। বাংলাদেশ থেকে উত্তর দেবার যোগ্য চারিত্রশক্তিমান নেতার অভাব ; হয়তো অন্য প্রদেশ থেকে নূতন দল দেখা দেবে। ত্রিপুরীর পূর্ব্বাপর ব্যাপারে সুভাষবাবুর সঙ্গে অনেকাংশে আমাদের মনের যোগ ছিল কিন্তু উনি শরীরে মনে এতই অসুস্থ, অহমিকারোগে কাতর এবং উদ্ধত যে ওঁকে নিয়ে চলে না। বাঙালীর হ'য়ে লজ্জিত হই ওঁর তাগাতাবিজ-মাদুলির বন্দনায় এবং *Modern Review*-এর সমস্ত প্রবন্ধে আত্ম-সমালোচনার একান্ত অভাবে। পৃথিবীসুদ্ধ সকলে দোষী, ওঁর যে একটুও স্খলন বা ভ্রান্তি হ'তে পারে তার কোথাও জায়গা নেই। তাছাড়া মহাত্মাজিকে উনি সম্পূর্ণ ভুল বুঝেচেন। মানুষ যে কেবল ডিপ্লমাসি ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে তা সুভাষবাবুর জ্ঞানবিশ্বাসের অগম্য—মহাত্মাজিকেও উনি নিজের স্বভাবের অনুযায়ী দলপতি বানিয়েচেন। মহাত্মাজির চতুর্দ্দিকে নানা জাতীয় কর্ম্মী জড় হন, তাঁদের মধ্যে দলীয় চক্রান্তের অভাব নেই কিন্তু সবচেয়ে বিষম ভয় তাঁদের মহাত্মাজিকে। সত্যের স্খলন হয়েচে জানতে পারলে যে-কোনো মুহূর্ত্তে যে-কোনো প্রাদেশিক নেতাকে মহাত্মাজি ত্যাগ করতে দ্বিধা করবেন না —সকলের সমক্ষে আশ্রমবাসীকে বিচার করতে তাঁর কুণ্ঠা নেই। মধ্যযুগের অদ্ভুত অসঙ্গতি ওঁর আচারে ব্যবহারে আছে কিন্তু উনি সুভাষবাবু কল্পিত ঈর্ষাপরায়ণ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রনেতা নন—চারিত্রশক্তির জোরে উনি ভারতবর্ষের শ্রদ্ধা পেয়েচেন বুদ্ধির জোরে নয়, চাতুরীর দ্বারা তো নয়ই। মহাত্মাজি আজ কী ভাবে বল্লভ ভাই পন্থ, রাজগোপালাচারীকে পরীক্ষা করচেন তার তথ্য একদিন প্রকাশ হবে। এই সব নেতার দোষ থাকতে পারে কিন্তু এঁরাও দেশের মঙ্গলকাজ প্রভূত পরিমাণে করেচেন এবং করচেন—সুভাষবাবু প্রেসিডেন্ট হয়েচেন ব'লে তাঁর এক কথায় এঁদের ডুবিয়ে দেবেন কেন মহাত্মাজি? এঁদেরও ত্যাগ করতে মহাত্মাজিই পারেন তাঁর ব্যক্তিগত প্রীতিকে জয় ক'রে—কিন্তু তার জন্যে যে-পরিমাণ কারণ থাকা দরকার তা এখনো মহাত্মাজি পাননি। কঠিনভাবে উনি ত্রিপুরীর সমস্ত ব্যাপারের অনুসন্ধানে নেমেচেন এবং সেই প্রসঙ্গে সমস্ত আরামবিশ্রাম ত্যাগ ক'রে অনবরত কত দলিল চিঠি লিখচেন জেরা আলোচনা করচেন তার ইতিহাস বাংলা দেশে পৌঁছয়নি। জওহরলাল সর্ব্বান্তঃকরণে এবং সম্পূর্ণ সত্যবিশ্বাসের যোগেই মহাত্মাজির দিকে—সুভাষবাবুকে হারাবেন বা জেতাবেন এদিক থেকে তিনিও ভাবচেন

না। হয়তো এঁদের ভুল হ'তে পারে কিন্তু সত্য কেবল সুভাষবাবুর দিকে একথাও বিশ্বাস হয় না।[৩]

বাংলা দেশে নেতার অভাবের কথা আপনি লিখেচেন তাই এই কথা মনে হল। মহাত্মাজি সত্যনিষ্ঠ এবং তাঁর সহকর্ম্মী অনেকেরই আত্মহীন সেবার শক্তি দেখে বিস্মিত হ'তে হয়—বাঙালী "Leftist"রা বিদেশী বাক্য মুখস্থ করার জোরে এঁদের অস্বীকার করলে সত্যকেও দূরে ঠেলা হবে। অথচ আমরা গুরু মানি না, কারো অন্ধ স্তব করব না; মহাত্মাজির ত্রুটির মধ্যে স্তব-প্রিয়তার প্রশস্ত স্থান নেই। কঠিন করে এবিষয়ে তাঁকে বলেও "Leftist"-এর দল মনে মনে এ কথা জানে। উনি বেঁচে থাকতে ওঁর সহযোগে যেটুকু করা চলত বাংলা দেশে সুভাষবাবু তা করবেন না কেবলমাত্র মত বা নীতির প্রভেদের জন্য নয়, অবিশ্বাসের জন্য, অহিংসার প্রতি আন্তরিক উপহাসের প্রেরণায়। শ্রদ্ধেয়কে অতিবুদ্ধির দ্বারা আমরা ছোট ক'রে নিশ্চিন্ত হই। বাংলার যে সুন্দর শাশ্বত রূপ তা শান্তিনিকেতনে ছাড়া কোথাও ঠিক দেখতে পাই না।

শান্তিনিকেতনের কথা বলাতে মহাত্মাজির চোখ তৃষিত হ'য়ে উঠল—মহাদেব[৪] আমাকে চিঠি লিখেচেন যে শরীর মনের নিদারুণ পরীক্ষার পরে এবং রাজনীতির অশেষ নির্ম্মম দাবীর মধ্যে মহাত্মাজি ওখানে একবার কিছুক্ষণও আশ্রমবাসী সকলের সঙ্গে এবং আপনার কাছে থাকবার আশায় উৎসুক হয়েচেন। আমাকে জানতে বলেচেন আপনার এতে সুবিধে হবে কিনা। এপ্রিল মাসের শেষাশেষি যেতে পারতেন। আপনাকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েচি। উত্তর পেলে মহাদেবকে জানাব। এবং তখনই মহাত্মাজি আপনাকে টেলিগ্রাম বা চিঠি পাঠাবেন। আশ্রমের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে মহাত্মাজির গভীর শ্রদ্ধা এবং প্রেমের যোগ—জীবনের শেষ কালে উনি এই যোগটিকে অন্তরে নিবিড়ভাবে অনুভব ক'রে যেতে চান। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনো প্রসঙ্গ নেই—শুধু আশ্রমে আপনাকে পেতে চান, কলকাতায় বা অন্যত্র ক্ষণকালের জন্য এবং অপরিচিত আবহাওয়ায় পেয়ে তৃপ্ত হননি।[৫] এর পরে উনি বাংলা দেশে বা অন্যত্র ঘোরাঘুরি বন্ধ ক'রে গ্রামের অন্তরালে আরো একান্তভাবে নিবিষ্ট হবেন। কিছু লেখার কাজও হাতে নিচ্চেন —শান্তির প্রতিষ্ঠাকল্পে মানুষের সমাজে কীভাবে কর্ম্মকে মানতে হবে, সংঘ গড়তে হবে সেবার আদর্শে—তাই নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা হ'তে লিখে যেতে চান।

"Family Reunion" আপনার কেমন লাগে জানতে উৎসুক থাকব। মনে হল Eliot তাঁর কল্পনার উপযুক্ত বিষয় অবতারণা করেননি—তবু স্থানে স্থানে ভাববার নূতন তত্ত্ব আছে। এবং আবার সেই অপেক্ষা—হয় অলৌকিক প্রাণের, নয় নির্ব্বাণের। কিছুই যে করা যেতে পারে অদৃষ্টচক্রে বাঁধা হয়ে, এলিয়টের ক্যাথলিক ধর্ম্মজগতে তার উদ্দেশ নেই। সূক্ষ্ম সচেতনতায় তিনি আধুনিক, কিন্তু সৃষ্টির বীর্য্যে তিনি ইতিহাসের পথে যাত্রী নন, "Original Sin"এর "ancient penance" নিয়ে ব্যস্ত। চলতি-কথার speech rhythm-এ কঠিন তত্ত্বকে সহজে বলবার শক্তি তাঁর বেড়েচে মনে হল—poetic drama-র সত্যকার নূতন ভাষা তৈরি হ'য়ে উঠচে। Blank verse একে বলা চলে না

অথচ গদ্যও নয়—মনে হয় Free verse-এর শ্রেষ্ঠ পরিণতি এইখানে। "Chorus" জিনিষটা বাংলা নাটিকায় নূতন প্রেরণায় দেখা দিচ্চে না কেন প্রশ্ন জাগে।[৬] বাংলা দেশে নাটক নেই বললেই চলে—সবক্ষেত্রে অনুকরণ দেখা দিল, আপনার নাটকের অনুকরণ পর্য্যন্ত করবার শক্তি কারো হল না। ঘন সংহত রসের চেয়ে তরুণ বাক্যলহরী আমাদের সহজে আসে—যখন আধুনিকেরা জোর ক'রে দুরূহ ঘনিষ্ঠ রচনা তৈরি করেন গীতিকবিতায় তখন সচেষ্টতা প্রকাশ পায়। Auden, বা Eliot-এর নাটিকার স্থান আমাদের সাহিত্যে আছে—সাময়িক প্রসঙ্গ নিয়েও হাস্যোজ্জ্বল বা দার্শনিকতা-ছোঁওয়া ছোটো ছোটো নাটিকা দেখা দিলে বেশ হত।[৭]

আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

প্রণত

অমিয়

---

**টীকা**

২ আনন্দ্—মুল্‌ক রাজ আনন্দ, ৭১.৬ টীকা দ্র.।

সুধীনবাবু—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

৩ আসন্ন মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে, স্বাধীনতার জন্যে প্রয়োজন হ'লে কংগ্রেস অহিংস আন্দোলনের পথ ত্যাগ করবে কিনা তা নিয়ে গুরুতর মতপার্থক্য দেখা দেয়। কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনে, গান্ধীজি ও অহিংসাপন্থীদের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও, সামাজতন্ত্রীদলের সমর্থনে সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হ'লে সংকট তীব্রতর হয়। কবি এ-বিষয়ে নীরব ছিলেন না। এই প্রথম তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে ঘোষণা করলেন : 'আজকেকার এই গোলমালের মধ্যে আমার মন আঁকড়ে ধ'রে আছে বাংলাকে' এবং স্বীকার করলেন, 'আজ আমি জানি বাংলা দেশের জননায়কের প্রধান পদ সুভাষচন্দ্রের।' 'কংগ্রেস' নামে এই সুদীর্ঘ চিঠিটি 'প্রবাসী' পত্রিকায় (১৩৪৬ আষাঢ়) ছাপা হয়। কবির সঙ্গে এ-বিষয়ে অমিয় চক্রবর্তী একেবারেই একমত হ'তে পারেননি।

৪ মহাদেব—মহাদেব দেশাই (১৮৯২-১৯৪২) যিনি তাঁর পঁচিশ বছর বয়েস থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত গান্ধীজির ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন।

৫ গান্ধীজি এ-সময় শান্তিনিকেতনে কবির কাছে একবার আসার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন সেকথা জানিয়ে এই চিঠি লেখা ছাড়াও অমিয় চক্রবর্তী একটি তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রভবনসংগ্রহে সেটি আছে। মনে হয় না যে রবীন্দ্রনাথ বার্তা পেয়েও নীরব থেকেছেন, জবাব দেননি। অথচ 'চিঠিপত্র' ১১শ খণ্ডে এ-সংক্রান্ত কোনো উল্লেখ নেই।

৬ Eliot-এর নতুন নাটক *Family Reunion* (১৯৩৯) হাতে পেয়ে তক্ষুনি প'ড়ে ফেলেন রবীন্দ্রনাথ, এবং ৮মের চিঠিতে অমিয় চক্রবর্তীকে জানান : '*Family Reunion* বইখানি গভীর ভাবে ভালো লেগেছে। যদি মনস্থির করতে পারি পরে তোমাকে কিছু লিখব।' পরে আর হ'য়ে ওঠেনি। পাঠানো বইটিও বিশ্বভারতীর সংগ্রহে নেই।

৭ বহুকাল পরে অমিয় চক্রবর্তী নিজেই এরকম একটি 'হেঁয়ালিনাট্য' লিখেছিলেন, 'ঘরে ফেরার দিন' (১৯৬১) কাব্যগ্রন্থে আছে, চার অঙ্কে তেরো পৃষ্ঠার নাটক 'সর্বনাম', বাংলায় হয়তো বলা হবে 'পরীক্ষামূলক নাটক'। এতে উৎকৃষ্ট একটি বাউল গান আছে :

কেউ বা আলো কেউ বা আগুন কেউ বা জল
তোদের নাম কী বল।

নাটিকাটি এখনো কেউ মঞ্চে প্রযোজনার চেষ্টা করেননি।

## ৭৮

(Telegram)

12.4.39 Lahore

Rabindranath Tagore, Santiniketan

Mahatmaji desirous spend sometime Santiniketan with you towards end of April please advise me whether suitable for your programme Pranams.

Amiya

## ৭৯

১৭ এপ্রিল [১৯৩৯]

LAKSH MI MANSIONS
THE MALL
LAHORE. INDIA

শ্রীচরণকমলেষু

"স্বগত" বইখানির বিষয়ে আপনি যা বলেচেন তাতে গদ্যসাহিত্য সম্বন্ধে নূতন ক'রে ভাবতে হল।[১] Art for Art's Sake যাঁরা মানেন তাঁরা technique-বিলাসী : ভাষা বা সুর বা পাথরের টুকরো তাঁদের কাছে সাজানোর সামগ্রী। নির্মাণের আদর্শ টেকনীকের সঙ্গে মিলে গভীরতর সৃষ্টির যে আনন্দ জাগায় তা হতে তাঁরা বঞ্চিত। অথচ আনন্দ যে-পরিমাণে এবং যে-ভাবে সত্য তাতেই অনেকখানি সার্থকতা আছে : মন নিয়ে যাঁরা খেলা ক'রে আনন্দ পান, ভাবকে ভাবনাকে নানা সূত্রে বেঁধে নানা রঙে রাঙিয়ে তৃপ্তি পান তাঁদের হাতেও সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েচে। মানসিক সৃষ্টিবৃত্তি যখন মানসিকতায় গিয়ে ঠেকে তখনই বিপদ। লক্ষ্যে উপলক্ষ্যে মিলিয়ে সৃজনের জাদু—এর কোনোটা একান্ত

হয়ে উঠলে হয় Swinburne-এর বাক্যবিহার নয় Samuel Smiles-এর *Self-Help* আমাদের আক্রমণ করে।[২] আপনি তাই দেখিয়েচেন মনকে technique-এর নেশায় যাঁরা ব্যবহার করেন বিশেষ দেশের এবং কালের মানসিক প্রসঙ্গে মিলিয়ে, তাঁদের সমজদারেরাও ঐ দলের হওয়া চাই—একই প্রসঙ্গের ভূমিকায় তাঁরা মেলেন। আধুনিক সাহিত্যের বেশির ভাগই সাম্প্রতিক আয়োজন এবং উৎসবের আসর বিশেষ কাল, বিশিষ্ট মানসিক অভ্যাসকে অবলম্বন ক'রে টিঁকে (sic) আছে। এরি মধ্যে দু একজনের রচনার ছন্দ জীবনের বৃহৎ গতিকে স্পর্শ ক'রে যুগপ্রাণে স্পন্দিত হয়ে ওঠে কিন্তু সেখানে খেলার সৌখীন আকাশে এবং দিগন্তের যাত্রায় অমিল নেই।

অমিল ঘটে যেখানে স্বগতোক্তি সাহিত্যের দরবারে জ্ঞানের বা আভিজাত্যের টিকিট নিয়ে শ্রেষ্ঠ আসন দাবী করে। সিংহাসনে বসে আছেন মহাকাল, তাঁর বিচার শুনতে গেলে যতক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় এক জীবনে তা কুলোয় না। অথচ বিচার করতেই হয় নিজবুদ্ধিতে এবং ইতিহাসের পূর্ব্বসাক্ষ্যকে মিলিয়ে। বলতেই হয় যেখানে স্বগত মেলেনি বিশ্বগত সত্যের মাধুরীতে সেখানে সৃষ্টির বাণী বড়ো ক'রে জাগল না। আপনি বলেচেন কাব্যে আপনার শ্রেয়োবুদ্ধির দাবীর কথা—Shelley বলেছিলেন passion for reform-এর বিষয়ে—form এবং reform করবার বৃত্তি সৃষ্টির মূলে, এবং reform অর্থে কেবল আকস্মিক যোগাযোগ নয়, আদর্শের যোগ ভাবকে ভাষাকে নিয়ে—আধুনিকেরা এরি নাম দিয়েচেন "Social Conscience"। য়ুরোপীয় সাহিত্যে নব্বইয়ের দল হাতির দাঁতের কেল্লা বানিয়ে স্বগতোক্তিকে একান্ত সুরে জাহির করেছিলেন, তাঁদের রচনাকে আজ গবেষণার সাহায্যে খুঁজে পাওয়া যায়। নব্বইয়ের মাননিক দল কেউ গভীর পাণ্ডিত্যে, কেউ বা স্বপ্নকারুকাজরচনায়, কেউ ভাষাতত্ত্বে বিশেষ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন এবং তাঁদের রচনার মূল্য দিতে আজও বাধা নেই। কিন্তু যে-মন্দির ধর্মসাধনার আদর্শে অনুপ্রাণিত নয়, ইঁট সাজানোর বিলাসেই যার অস্তিত্ব তাতে কারুকাজ থাকে তো প্রশংসা করব, সেখানে গিয়ে পূজা দেবার ভিড় হবে না। বহুমূল্য পাথর ইটালী থেকে এসেচে, জানলার কাচ প্রসিদ্ধ কারখানায় তৈরি, প্রত্নতত্ত্বের বিবিধ ম্যুজিয়ম হতে অলঙ্কার এনে সাজানো হয়েচে সিঁড়ির পাশে দরজার উপরে—এসব মেনেও মন্দিরের স্থান হবে না সারনাথ বা বুরোবুদরের পাশে। আধুনিকেরা কোন্ দেবতার উপাসক তা নিয়ে তর্ক আছে কিন্তু সন্দেহ নেই যে তাঁরা মানবিকতার আকাশে যে মন্দির তুলতে চান তাতে কেবলমাত্র মাননিকতার খেলা নেই। নব্বুই-এর কেল্লাগুলি দিনান্তের ধুলোয় করুণ স্বগতোক্তি ক'রে চলেচে, বড়ো রাস্তার উপর দিয়ে মানুষ যাত্রীরা এগিয়ে যাচ্চেন শুধু মানস-লোকে নয় বিচিত্রবিশ্বসৃষ্টির সন্ধানে।[৩] দুঃসাহসের অন্ত নেই, সমগ্র রাষ্ট্র-সাংঘাতিকতার দুর্যোগে অপরাভূত তাঁরা নূতন ঐক্য-সংসারের ভিত্তি গড়তে চান—বাণীর মাধুরী, ছন্দের কারুকাজ তাঁদের কম নয় কিন্তু সঙ্গত হয়েচে জীবনের আঙ্গিক সাধনা আদর্শরচনার বীর্য্যে। আমাদের সাহিত্যের তারুণিক দলে সে সুর এসে পৌঁছল না। একদিকে দেশাত্মবোধ, অন্যদিকে অত্যধিক আত্মবোধ—মধ্যে কোনো নূতনযুগের বানানো সাঁকো দেখতে পাওয়া

যাচ্চে না।

চিঠিখানির এক কথায় শুধু আপত্তি জানতে চাই— প্রমথবাবুকে সুধীনবাবুর সঙ্গে ব্র্যাকেট-বন্দী করা যায় না। মনের বড়ো বড়ো পাথরের চাপে প্রমথবাবুর গদ্য কখনো চাপা পড়েনি— পাণ্ডিত্য তাঁর কম নয়, বরঞ্চ অনেক বেশি এবং সুসঙ্গত কিন্তু প্রথম হতেই স্বচ্ছ সহজ প্রবল তাঁর বাক্যের ধারা। এবং মাননিকতার নেশার চেয়েও সাহিত্যকে সমাজকে reason-এর আলোয় সুস্পষ্ট ক'রে দেখা, দেখানোর প্রয়াসেই তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযান, অত্যাচারিতের প্রতি উচ্চ কৃপা না ক'রে তার দাবীকে শ্রদ্ধা করবার বৃত্তি তিনি জাগিয়েছিলেন। সবুজপত্রে প্রাণের সবুজ রং ছিল, পরিচয়ে অত্যন্ত বুদ্ধির পরিচয়, প্রাণের নয়।[৪] প্রমথবাবুর হাস্যে করুণা ছিল, বাক্যে ছিল আন্তরিক সহজ আভিজাত্য এবং তাঁর কয়েকটি গল্প প্রাণের রসে সরস। কোথাও যদি এই কথাটার উল্লেখ থাকে আপনার চিঠিতে তাহলে প্রমথবাবুর প্রতি সুবিচার হয়। আজ তাঁর অবসানের বেলা, শক্তির আগুন গেছে নিবে কিন্তু প্রমথবাবুর মননপ্রতিভা স্বগত সাধনাকে অতিক্রম করেছিল। সুধীনবাবুর লেখা প'ড়ে আনন্দ পাই কিন্তু কোথায় একটু অভাব থেকে যায় —এই অভাব কেবল সৃষ্টির ক্ষেত্রে নয়, মনের এবং বিচারশক্তিরও অভাব। জ্ঞানের প্রসন্নতা নেই এঁদের রচনায় যা উপভোগ করেচি বীরবলের এবং প্রমথ চৌধুরীর খরধার শ্রেষ্ঠ রচনায়। সঙ্গের cutting প'ড়ে মনে হল পরিচয়ের লেখক ইংরেজিতে তাঁদের বিশেষ মনের পরিচয় দিয়েচেন।[৫]

আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন।

প্রণত

অমিয়

---

**টীকা**

১ তীক্ষ্ণ ভাষায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিতর্কের আর-একটি দৃষ্টান্ত এই চিঠিখানি।

প্রধানত 'পরিচয়' পত্রিকার জন্যে লেখা আধুনিক বাংলা ও য়ুরোপীয় সাহিত্যের আলোচনা-সংগ্রহ 'স্বগত' (১৯৩৮) সুধীন্দ্রনাথ দত্তর প্রথম প্রবন্ধের বই। য়ুরোপীয় সাহিত্য সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলি নিয়ে, পরিমার্জনার পর, দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়েছিলো উনিশ বছর পরে, ১৯৫৭ সালে। প্রতিটি শব্দ ধ'রে পরিশোধন করার সময় নিজের লেখা বিষয়ে সুধীন্দ্রনাথ কৌতুক ক'রে বলেছিলেন : 'লোকে বলে আমার লেখা বোঝা যায় না। দোষ দেবো কী ক'রে? এখন দেখছি আমি নিজেও অনেক জায়গা বুঝতে পারিনে!'

অমিয় চক্রবর্তীকে চিঠির আকারে লিখলেও সেই দীর্ঘ চিঠিখানিকে 'স্বগত'-র কবিকৃত রিভিউ বললে অন্যায় হয় না। সুধীন্দ্রনাথের গ্রন্থটির সবিশেষ সাধুবাদ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, বলেছিলেন : 'তাঁর লেখার কোন্ এক জায়গায় মনে হয়েছিল তিনি 'আর্ট ফর আর্টস সেক্' মতটাকে বুঝি অমান্য করেছেন। যদিচ তাঁর ব্যবহারে তার প্রমাণ পাইনি। তিনি ভাবতে ভালোবাসেন সেই ভালোবাসাটাই তাঁর

দান। আর্টিস্ট্ মাত্রেরই চরম শক্তি, প্রকাশ করবার ভালোবাসায়। গদ্যে সুধীন্দ্রনাথ মননের আর্টিস্ট।... তার একটা পরিচয় পাই ভাষার শব্দের উপরে তাঁর একান্ত অনুরাগে।' সাহিত্য রচনার নিজস্ব আদর্শ হিশেবে রবীন্দ্রনাথ অবাধ কল্পনার আনন্দের সঙ্গে 'শ্রেয়োবুদ্ধির' মিলনের কথা স্বীকার করলেও সুধীন্দ্রনাথের রচনার কলাকৈবল্যকে তিনি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলেন। বাংলা লেখায় তুলনীয় গুণ দেখেছিলেন একমাত্র প্রমথ চৌধুরীর রচনায়, যদিও সে-রচনার অন্তর্গত 'প্রাণের সরস প্রবাহ' সুধীন্দ্রনাথে অনুপস্থিত। অমিয় চক্রবর্তীর কাছে এ-প্রশস্তিকে অতিবাদ ব'লে মনে হয়েছিলো। অন্তত 'প্রবাসী'-তে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬) ছাপার সময় প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের মৌলিক প্রভেদটিকে তিনি আরো খানিক বিস্তারিত করতে রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ জানান। অনুরোধ রক্ষিত হয়নি। ('চিঠিপত্র' ১১শ, ১১১দ্র.)

'প্রবাসী'-র এবং 'চিঠিপত্রে'-র পাঠের মধ্যে একটা অমিল বিশেষ দৃষ্টিকটু। বিষ্ণু দে-র কবিতা বিষয়ে 'প্রবাসী'-তে ছাপা কবির চিঠিতে আরো অনেকটা ছিলো যা 'চিঠিপত্র' থেকে অবলুপ্ত। সে-অংশ পুনরুদ্ধার করা দরকার।

২ 'লক্ষ্য উপলক্ষ্যে'র মিলন ঘটেনি (A. C.) Swinburne (১৮৩৭-১৯০৯) বা Samuel Smiles (১৮১২-১৯০৪)—দুই অসম লেখকের রচনায়। সুইন্‌বার্নে প্রধান ছিলো লক্ষ্য, আর *Self Help* (১৮৫৯) নামক লক্ষ-লক্ষ কপি বিক্রি হওয়া আত্মোন্নতি-বিধায়ক গ্রন্থের স্কটিশ লেখক স্যামুয়েল স্মাইল্‌স-এর লেখায় উপলক্ষ্যই হ'য়ে উঠেছে প্রধান। দুইয়ের মিলন ঘটলে তবেই সাহিত্যের উৎকর্ষ প্রকাশ পায়, সুধীন্দ্রনাথ বিষয়ে এই হচ্ছে অমিয় চক্রবর্তীর বক্তব্য। তাঁর মতে সুধীন্দ্রনাথ সেটা পারেননি।

৩ উনিশ শতকের শেষ পাদে, নব্বুইয়ের যুগবর্তী ইংরেজ 'ডেকাডেণ্ট'-দের অমিয় চক্রবর্তী বলছেন 'নব্বইয়ের দল', ফরাসী ধরনে শিল্পকর্মের আদর্শ হিশেবে যাঁরা Art for Art's sake কথাটার প্রবর্তন করেছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ কথাটার বাংলা তর্জমা করেন 'কলাকৈবল্যবাদ'। শিল্পকর্মের অম্বিষ্ট সেখানে লোকহিতৈষা নয়, আনন্দ সৃষ্টি। এ-আদর্শকে পুরো না মানলেও কখনোই রবীন্দ্রনাথ তাকে এক কথায় খারিজ ক'রে দেননি।

৪ বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের বিন্যাস এবং পারিপাট্যসাধনের ক্ষেত্রে দুটি স্মরণীয় পত্রিকা হচ্ছে—'সবুজপত্র' (১৩২১-২৯, ১৩৩২-৩৪) এবং 'পরিচয়' (যত দিন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকের পরিচালনায় ছিলো)। প্রথমটির সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী, প্রথম সিরিজে দ্বিতীয়টির সম্পাদনা করতেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

৫ কর্তিকাটি রবীন্দ্রভবনসংগ্রহে নেই।

## ৮০

১৯ এপ্রিল [১৯৩৯]

Lakshmi Mansions
The Mall, Lahore

শ্রীচরণকমলেষু

এই অঞ্চলের বাঙালী সকলে মিলে লাহোরে আপনার জন্মোৎসব করচি—সকলে আমাকে ধরেচেন এই উৎসবে আপনার কাছ থেকে নূতন কবিতা চাই। মেয়েদের ইচ্ছা জানিয়েচেন বাংলা দেশকে উদ্দেশ ক'রে কিছু বলেন—প্রবাসী বাঙালীর বিশেষ সম্পদ হবে। প্রবাসে গিয়ে দূরের চোখে আপনি বাংলার কথা চিঠিতে লিখেচেন—কবিতায় প্রায় নেই। জন্মদিনের উপলক্ষ্যে কবিতা পেলে কীরকম আনন্দ আর উৎসাহ হবে বলতে পারি না।[১]

আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

প্রণত

অমিয়

পুনশ্চ : আধুনিকদের উত্তরে কিছু বলেচি—Tribune থেকে পাঠালাম।[২]

---

টীকা

১ চিঠির উত্তরে পুরী থেকে "প্রবাসী" নামে 'নতুন' একটি কবিতা পাঠিয়েছিলেন কবি ('হে প্রবাসী / আমি কবি যে বাণীর প্রসাদ প্রত্যাশী')। চিঠিতে লিখেছিলেন : 'আমায় নতুন কবিতা লিখতে ফরমাস করেছ কিন্তু ক্লান্ত শরীর মনে নতুনের স্ফূর্তি হয় না—শুকনো ডালের মজ্জা থেকে ফুল রস পাবে কোথা থেকে।' ('চিঠিপত্র' ১১শ, ১১৪ দ্র.। আসলে চিঠিটির ক্রমিক সংখ্যা হবে ১১১ক কিংবা ১১২।)

২ রবীন্দ্রভবনসংগ্রহে চিঠির সঙ্গে এটি নেই।

## ৮১

(Telegram)

9.5.39. Lahore

Rabindranath Tagore
Circuit House, Puri

Great rejoicing new poem[১] birthday celebrations our pranams.

Amiya Haimanti Semanti

---

টীকা

১ লাহোরে কবির জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁরই লেখা নূতন "প্রবাসী" কবিতাটি পেয়ে।

[মে ১৯৩৯]

Lakshmi Mansions
The Mall, Lahore

শ্রীচরণকমলেষু

"আকাশ-প্রদীপ" আর নূতন কবিতাটি একসঙ্গে আজ পেলাম[১]। এখানে আমাদের উৎসব খুব জমে উঠবে। ( আমাদের অনুরোধ এই অপূর্ব্ব কবিতাটি লাহোরের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়: প্রবাসীতে বেরোনোর সময় এখানকার রবীন্দ্রজয়ন্তীর একটু উল্লেখ থাকলে প্রবাসী বাঙালীদের মন আনন্দিত হবে। )

"আকাশপ্রদীপ" একটুখানি পড়েচি—খুব নূতন একটি সুর লাগচে : পূরবীর ছোঁওয়া রয়েচে অথচ সাম্প্রতিক হাওয়ার ছন্দ।[২] কতকগুলি কবিতার পূর্ব্বাপর নেই— এতই নূতন যে চোখে ধাঁধা লাগে। অনুকরণের বন্যা বইবে কিন্তু কেউই সম্পূর্ণ পৌঁছতে পারবে না। এই কবিতাগুচ্ছকে অবলম্বন ক'রে ইংরেজিতে লিখব— অন্যদেশের সাহিত্যমহলে এর বিস্ময় পৌঁছবেই সন্দেহ নেই যদিও তর্জ্জমায় কতটুকু রাখা যায়।

কয়েকটি নূতন Penguin এবং Pelican পাঠিয়ে দিলাম।

আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন।

প্রণত
অমিয়

আশা করচি বুড়ী আর কৃপালানী[৩] আমাদের সঙ্গে কাশ্মীর ভ্রমণে যোগ দেবেন। তাঁদের খুব অনুরোধ ক'রে লিখেচি—তাহলে বড়ো চমৎকার হয়। এখন কাশ্মীর যাতায়াত, থাকার ব্যবস্থা সুন্দর হয়েচে।

—অ—

---

**টীকা**

১ নতুন কবিতাটি "প্রবাসী" 'আকাশপ্রদীপ' তখন সদ্য প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ।

২ এই 'সাম্প্রতিক হাওয়ার ছন্দ' রবীন্দ্রনাথের তখনকার কিছু কবিতায় অমিয় চক্রবর্তী দেখতে পেয়েছিলেন ব'লেই বোধ করি তাঁকে 'আকাশপ্রদীপ'-এর (১৯৩৯) পরের বই 'নবজাতকে'-র (১৯৪০) কবিতা তাঁকেই রবীন্দ্রনাথ বেছে দিতে বলেছিলেন। আটাত্তর বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি নতুন অধ্যায় শুরু হ'তে চলেছে।

৩ নন্দিতা আর কৃষ্ণ কৃপালানি। বিয়ে হয়েছিলো ১৯৩৬-এ।

৮৩

৮ই জুন [১৯৩৯] বামিয়ান

শ্রীচরণকমলেষু

হিন্দুকুশের তটে আশ্চর্য এই বৌদ্ধ সহরে এসেচি— বহুদিনের বাসনা পূর্ণ হল।[১] চারিদিকে শুভ্র পাহাড়, নীচে শ্যামল উপত্যকা, প্রাচীন পথ ঘুরে চলেচে চীন, ইরান, সোভিয়েট-রাজ্যের সীমায়। যুগের যাত্রীদের দৃষ্টি পড়চে পাথরে-কাটা বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তির দিকে।

ফরাসী পণ্ডিতের দল এদেশে অক্লান্ত কাজ করচেন ; এঁদের সঙ্গে বেগ্রাম—পুরোনো "কপিশ"-এ যাচ্চি। প্রায় তিন হাজার বছরের ভারতীয় কারুকাজ খুঁজে পাওয়া যাচ্চে বেগ্রাম-এ ; হাতির দাঁতের, পাথরের শিল্পসামগ্রী।

এখান থেকে নূতন প্রাচীন ভারত এবং চীন ইরান সোভিয়েটের দৃষ্টি পাওয়া যায়। মনে হয় য়ুরোপের বাহিরে মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ তৈরি হয়ে উঠচে।

এর পরে ঘজনি এবং কান্দাহারে যাব। হিন্দু-মুসলমান এবং প্রান্ত-দেশের ট্রাইবাল সমস্যা নানাদিক থেকে বোঝবার চেষ্টা করচি।

সর্ব্বত্র এখন ফুল ফল এবং স্নিগ্ধ আলোর বসন্তকাল— পাহাড়ে উঠলে য়ুরোপীয় হাওয়া। এদের আতিথ্যের তুলনা নেই। বিদেশী লেগেশন্-গুলিতে মধ্য এশিয়া এবং আফগান রাজ্য বিষয়ে বই এবং তথ্য পাচ্চি।

বহুদিন দেশের খবর পাইনি। কোয়েটা পৌঁছলে আবার যোগ হবে। আপনি এখন কালিম্পঙ বা মংপুতে আছেন কিনা জানি না—শান্তিনিকেতনে আমার প্রণাম পাঠাই।

প্রণত

অমিয়

---

টীকা

১. চারিখর পেরিয়ে কাবুলের অনেকটা উত্তরে বেগ্রাম এবং বামিয়ান। French Archaeological Delegation in Afganistan (DAFA), ১৯৩৬ সাল থেকে এই অঞ্চলের বহুকালের বৌদ্ধসংস্কৃতির সব চিহ্ন মাটি খুঁড়ে বার করছিলেন। প্যারিস থেকে ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত *Diverses recherches archeologiques en Afganistan (1933-1940)* গ্রন্থে সব বিবরণ আছে। দলের নেতৃত্বে ছিলেন প্যারিসের গুইমে (Guimet) মিউজিয়ামের ভু- এবং প্রত্নতাত্ত্বিক অধ্যক্ষ ইয়োশেফ আক্যাঁ (Joseph Hackin, ১৮৮৬-১৯৪১)। তাঁর আমন্ত্রণেই অমিয় চক্রবর্তী বামিয়ানে গিয়েছিলেন ১৯৩৯ সালের জুন মাসে। 'অভিজ্ঞানবসন্ত' কাব্যগ্রন্থে "বামিয়ান" নামে একটি কবিতাও আছে। একদা ঐ বেগ্রামেই প্রতিষ্ঠিত ছিলো কুশাণ যুগের প্রাচীন কপিশ রাজ্য। পরিব্রাজক হুয়েন সাং কপিশরাজ্য দেখেছিলেন। অতীতে ভূমধ্যসাগর ও চীনের মধ্যে রেশম বণিকদের আনাগোনার যে সড়ক ছিলো (silk

route) তারই এক শাখা গিয়েছিলো 'মধ্যপথ' বা বামিয়ান উপত্যকার বুক চিরে। পাথরে কাটা ১৭৩ ফুট উঁচু ভগ্নপ্রায় বুদ্ধমূর্তি এখনো দাঁড়িয়ে আছে, সাম্প্রতিক আফগান গৃহযুদ্ধে যদি না চুরমার হ'য়ে গিয়ে থাকে। উৎখনিত চিত্রে ও ভাস্কর্যে উত্তর ভারতীয় কারিগরির ছাপ সুস্পষ্ট দেখা যায়। কবিতায় ছাড়া গদ্যেও অমিয় চক্রবর্তী বামিয়ানের কথা লিখেছেন।

এর দুবছর পরেই, খুব সম্ভব আততায়ীর হাতে, আক্যাঁ কাবুলেই নিহত হন।

## ৮৪

১০ই জুলাই [১৯৩৯] Gulmarg
Kashmir

শ্রীচরণকমলেষু

মনে হল এই প্রবন্ধ দুটিতে ভাবনার বিশিষ্টতা আছে— আপনার কাছে পাঠাই। দুই পক্ষের সাহিত্যিক তর্ক নূতন সন্ধিস্থলে এসে পৌঁছেচে। আপনার কেমন লাগে জানতে ইচ্ছা করে।[১]

কাল আমরা শ্রীনগর হয়ে শিমলার দিকে রওনা হব। শীঘ্রই আবার শান্তিনিকেতনে পৌঁছব মনে ক'রে সবাই উৎসুক হয়ে আছি। আজ *Modern Review* -এ কংগ্রেস সম্বন্ধে আপনার চিঠিখানি প'ড়ে বিশেষ আনন্দ হল— কী সুন্দর তর্জ্জমা হয়েচে।[২] এই চিঠিখানি সমস্ত দেশকে নাড়া দিয়েচে। আফগানিস্থান থেকে এসে হঠাৎ প্রবাসীতে প'ড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম— সমস্ত দেশের ছবি ফুটে উঠেচে, আধুনিক রাষ্ট্রজগতের পটভূমিকায় ভারতের বিভিন্নমুখী গতিবেগ স্পষ্ট হয়ে উঠল। পরশু শিমলা থেকে লিখব। Eliot-এর বই সম্বন্ধে একখানি চিঠি আমার পাওনা আছে।[৩] নূতন কবিতার বিষয়ে আপনার কাছ থেকে লেখার দাবী জানাই। এখানে দেওদার অরণ্যের ভিতর দিয়ে বরফের রেখা দেখা যায় ; বাগানে ফুলের উপর সোনার রোদ্দুর পড়েচে। আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন।

প্রণত
অমিয়

---

**টীকা**

১ মনে হয় 'প্রবন্ধ দুটি' আসলে 'স্পেন্ডর ও ফর্স্টরের দুটি চটি বই', (E. M.) Forster (১৮৭৯-১৯৭০)-এর *What I Believe* (১৯৩৯), (Stephen) Spender-এর *Forward from Liberalism* (১৯৩৭), পেয়েই প'ড়ে ফেলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'সাহিত্যিক তর্কে'র বিষয় হচ্ছে— সাহিত্যে সামাজিক চেতনার স্থান। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য : 'আমার নিজের মত এই যে আমরা অর্থনীতি বা ধর্মনীতিতে

যে দলেরই লোক হই আমাদের সেই দলাদলি যে সাহিত্যকে বিশেষ ছাঁদে গ'ড়ে তুলবেই এমন কোনো কথা নেই।... আমার মনটা হয়তো সোশিয়ালিস্ট, আমার কর্মক্ষেত্রে তা ভিতর থেকে প্রকাশ পেতেও পারে কিন্তু উর্কশী কবিতাকে সে স্পর্শও করে না। শালের কাঠ এবং শালের মঞ্জরীর প্রকাশ স্বতন্ত্র। মার্কসিজ্‌মের ছোঁয়াচ যদি কারো কবিতায় লাগে, অর্থাৎ কাব্যের জাত রেখে লাগে, তাহ'লে আপত্তির কথা নেই, কিন্তু যদি নাই লাগে তাহলে কি জাত তুলে গাল দেওয়া শোভা পায়?' ('চিঠিপত্র' ১১শ, ১১৬)। শালের কাঠ ও শালের মঞ্জরীর প্রসঙ্গ পরে আবার দেখা যাবে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এ-বিষয়েও পুরোপুরি মিল ছিলো না অমিয় চক্রবর্তীর।

২ মে মাসে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিটি 'প্রবাসী'-তে (আষাঢ় ১৩৪৬) বেরোয় 'কংগ্রেস' নামে। জুলাই মাসের (১৯৩৯) *Modern Review*-তে তার অনুবাদ করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩ রবীন্দ্রনাথের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও Eliot-এর নাটক *Family Reunion* বিষয়ে লেখা শেষ পর্যন্ত হ'য়ে ওঠেনি।

## ৮৫

শনিবার [১১জুলাই ১৯৩৯]

Blarney,
Summer Hill
Simla

শ্রীচরণকমলেষু

কংগ্রেস সম্বন্ধে আপনি আমাকে যে-চিঠি লিখেছিলেন তাই নিয়ে এ অঞ্চলে খুব আন্দোলন চলেচে। *Tribune*-এর Editorial পাঠাই। ইংরেজ অঞ্চলেও আলোচনা উঠেচে ; এখানে তার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি শুনতে পাই।[১]

সুভাষবাবু একটু বাড়াবাড়ি করচেন মনে হয়— ক্রমে সকলের বিশ্বাস হারাচ্চেন। বাংলার হয়ে তিনি প্রভূত উপকার করতে পারতেন— সেই কথাই আপনি চিঠিতে বলেছিলেন—— কিন্তু ওঁর বিশ্বাস উনি ভারতের মুসোলিনী হবেন ভাঙনের পথ বেয়ে। সকলেই ওঁর দিকে থাকতাম যদি কংগ্রেসের বিশেষ এক প্রাচীন দলের প্রভুত্ব হতে দেশকে মুক্তি দেবার কাজে লাগতেন, কিন্তু এখন মুগুর চালাচ্চেন সমস্ত কংগ্রেসের উপর।[২]

ওদিকে সমুদ্রপারে ক্রমেই অন্ধকার জটিল হয়ে উঠচে—ভারতবর্ষের ইংরেজ সরকার এখন নানাভাবে এ দেশের মনরক্ষার চেষ্টা করচেন। শিমলার কুয়াশা ঢাকা হাওয়া ঘনতর হয়ে উঠেচে য়ুরোপীয় যুদ্ধের ভয়ে—সর্ব্বক্ষণ তারে বেতারে লাটসাহেব এবং

তাঁর কর্ম্মচারীরা লন্ডনের সঙ্গে খবর আদানপ্রদান করচেন। এরা যেমন ক'রে হয় মধ্য এশিয়া এবং ভারতবর্ষকে খুসি রাখবার পথ খুঁজচে। এই সময়ে কংগ্রেসের এক হয়ে চল্‌বার কথা। মহাত্মাজির সঙ্কল্প ছিল ছোটো জিনিষে ইংরেজ-রাজের সঙ্গে বিপদ এড়িয়ে সময় বুঝে সমস্ত কংগ্রেসের চাপ ওদের উপরে আনা। বড়ো রকমের সংগ্রামের জন্যে দেশকে বেঁধে তুলচেন। এমন সময় গৃহবিবাদকে বিশ্বময় জাহির করা সুবুদ্ধির কথা নয়। কিন্তু বিবাদ যখন ঘরে রয়েচে তখন তাকে চাপা দেওয়া যায় না—চারিদিকে ঘরে বাহিরে ঝড় উঠবে ভারতবর্ষে; পৃথিবীর মানুষ-সমাজ একই সঙ্গে কলির সন্ধ্যাকালে প্রবেশ করবে।

ভারতবর্ষের সঙ্গে পশ্চিমের তফাৎ এই যে দুর্দ্দিনেও ওখানকার মননশীলেরা হার স্বীকার করেন না—সাহিত্যে মুক্তবাণী জ্ব'লে ওঠে। আমাদের সাহিত্যে বাণী নিস্তব্ধ অথবা বিকারগ্রস্ত। আপনার চিঠি-প্রবন্ধে দেশের ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েচে, তার চাপা-পড়া মন উর্দ্ধে উঠেচে তাই চিঠিখানি এমন ক'রে ভারতবর্ষময় ছড়াচ্চে। কিন্তু আর কোথাও আমাদের সাহিত্যে বিশ্বভূমিকার পরিচয় নেই ক্ষুব্ধ বেদনায়। এবারকার "কবিতা" এবং "পরিচয়" প'ড়ে হতাশ্বাস হয়েচি। আফগান মুলুকের মরুনির্ব্বাসনের পর তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে বাংলার পত্রিকা খুলেছিলাম—এক বিন্দু পানীয়ের সন্ধান পেলাম না, কেবল নোনা জল।[৩]

"Autumn Journal" আপনাকে পাঠাচ্চি—অনেক স্থলে কাঁচা লেখা। কিন্তু এর মধ্যে যে বীর্য্যের সুর আছে তা না স্বীকার ক'রে উপায় কী?[৪] য়ুরোপে এবং বিশেষ ক'রে রাশিয়ায় এই বীর্য্য মানুষের সমাজে মরেনি, আরো জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠচে। অন্য দেশেও —চীনে, ভারতবর্ষে এই আত্মার বেগ জাগলে নূতন সভ্যতা গড়ে উঠত জিয়োগ্রাফির বেড়া লঙ্ঘন ক'রে। তাই কেবলই খুঁজি বাংলার বাণীতে সেই মুক্তিসন্ধানী বিশ্বমুখী নির্ম্মল সতেজ আত্মার। সরস যার পরিচয়, বিশ্বাস যার অনির্ব্বাণ দীপ্তিময়। এই সময়ে কলকাতার গলির ছোট কথা শুনতে ভালো লাগে না বা গোলদিঘির ক্ষুদ্র পলিটিকস।

চমৎকৃত হতে হয় রাশিয়ার নূতন সৃষ্টিবেগের পরিচয় পেয়ে মধ্য এশিয়ার পথে। আফগান Oxus-এর এপার থেকে ওদের নূতন খবর যা নিয়ে এসেচি তাতে সমস্ত মন চঞ্চলিত হয়ে উঠেচে। অথচ এসব বিষয়ে এখনো সব কথা বলার পথ বন্ধ আমাদের দেশে।[৫]

হয়তো শীঘ্রই মরুময় সমগ্র মধ্য এশিয়ায় ওরা জলধারা আনবে—বালির তলে নোনা জলের সন্ধান পেয়েচে তাকে শীতের দিনে জমিয়ে পানীয় জলে পরিণত করবার উপায় বেরোচ্চে। কতদিকে ওরা প্রাণকে প্রয়োগ করচে। এদিকে বেলুচিস্থানের মরা পাহাড় এবং মুমূর্ষু মানুষের দিকে চেয়ে যখন নতুন চেষ্টার কথা বলা যায় তখন ইংরেজ রাজের একমাত্র উত্তর—"উপায় নেই"। উপায় আছে কেবল ঐ অঞ্চলে বোমা ছোঁড়বার। এবং মক্রান্ থেকে Zaidan এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত পর্য্যন্ত ব্রিটিশ সৈন্যের জন্যে কোটি টাকা খরচ ক'রে মরণাপন্ন বেলুচি-ব্রাহুই-পাঠানদের বুকের উপর পাথরের কেল্লা বসাবার—এসব

বিষয়ে উপায়ের অভাব নেই। কেননা দরিদ্র ভারতবর্ষের লক্ষ কোটি নির্জ্জীবেরা মরেও মরে না, তাদের শোষণ করা চলে মানুষ মারবার কল এবং কেল্লা বানানোর জন্যে।

Oxus-এর ওপারে মরুভূমিতে ট্রাম চল্‌চে, সহর উঠচে, গ্রামে বিদ্যুৎ আলো জ্বলচে—বোখারা সমরখন্দে যারা বাস করে তারা আমাদেরই "Tribal Population"-এর মতো। অথচ কোটি টাকা খরচ ক'রে মানুষ না মেরে তারা মানুষকে বাঁচাবে পণ করেচে। সামান্য অর্থ এবং অনেকখানি শুভবুদ্ধির প্রয়োগ চলচে। এই শিমলায় এলে হতাশ হতে হয়। আপনার আশীর্ব্বাদী চিঠি পাব তার আশায় রয়েচি।

প্রণত
অমিয়

অনেকদিন আপনার কোনো নূতন কবিতা দেখিনি—নিশ্চয়ই এর মধ্যে কিছু জমে উঠেচে। এখানে ব'সে দুচারটি কবিতা পড়বার জন্যে মনে খুব লোভ জাগচে। সুধীরবাবু যদি কপি ক'রে পাঠান।[৩] ২৫শে জুলাই নাগাদ আশ্রমে যেতে চাই।

অমিয়

---

**টীকা**

১ এ-বছরেরই ২০ মে তারিখে লেখা যে-চিঠি 'কংগ্রেস' শিরোনামে 'প্রবাসী'-তে (আষাঢ় ১৩৪৬) ছাপা হয়েছিলো, পরে সেটি প্রবন্ধ আকারে 'কালান্তর' দ্বিতীয় সংস্করণে যায়।

*Tribune*-এর কর্তিকাটি চিঠির সঙ্গে রক্ষিত হয়নি।

২ যে-প্রত্যাশা নিয়ে সুভাষচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ 'জননায়ক' ব'লে অভ্যর্থনা করেছিলেন তার যৌক্তিকতা মেনে নিয়েও অমিয় চক্রবর্তী প্রশ্ন তুলেছেন— ত্রিপুরীর পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্র সেই প্রত্যাশা পূরণের পথেই যাচ্ছেন কিনা। এটা কোনো ভিন্ন জমিতে দাঁড়িয়ে তর্ক করা নয়, সমপক্ষীয় তাঁদের মধ্যে এই মতভেদ তাই কখনও মালিন্য সৃষ্টি করেনি। অন্য নানা বিষয়েও উভয়ের মতপার্থক্য এই শ্রেণীতে পড়ে। সুভাষচন্দ্র বিষয়ে অমিয় চক্রবর্তীর চিঠি পেয়ে কবি লেখেন: 'যখন কংগ্রেস সম্বন্ধে তোমাকে চিঠি লিখেছিলুম বর্তমান সংকট তখনো উপস্থিত হয়নি। ... শরীরমন যদি অনুকূল হয় তবে উপস্থিত সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করে সংবাদপত্রে সর্বজ্ঞদের গোচর করে লিখব ।' ('চিঠিপত্র' ১১শ, ১১৬ দ্র.)

৩ সামাজিক বা জাগতিক চেতনার লক্ষণ যদি রচনায় না থাকে, ক্ষুব্ধ বেদনায় তার মধ্যে লেখকের 'বিশ্বভূমিকার পরিচয়' যদি না পাওয়া যায়, সাহিত্য তাহ'লে পর্যবসিত হয় শৌখিনতায়—অক্সফোর্ড-প্রত্যাবৃত্ত অমিয় চক্রবর্তীর সেটাই ছিলো সাহিত্যচিন্তা। বুদ্ধদেব বসু বা সুধীন্দ্রনাথ দত্তর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুতা থাকলেও সাহিত্যের লক্ষ্য বিষয়ে তাঁদের মধ্যে আন্তরিক প্রভেদ এই কারণে শেষ পর্যন্ত বজায় ছিলো। কিন্তু মার্কসপন্থীদের হাতে 'পরিচয়' পত্রিকা চ'লে যাওয়ার পরে অমিয়

চক্রবর্তী কি বেশি সুখী হয়েছিলেন? জানি না।

এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব ছিলো অনেক বেশি উদার। কবিতার জাত মারা না গেলে 'শালের কাঠে'ও তাঁর আপত্তি ছিলো না বটে, কিন্তু তাঁর যে নিবিষ্ট লক্ষ্য ছিলো 'শালের মঞ্জরী'-র প্রতি তাতে কোনো সন্দেহ করা যায় না।

৪ ইংরেজ নতুন কবিদের মধ্যে এ-সময় Louis MacNieceএর (১৯০৭-১৯৬৪) প্রতি অ.চ.-র সমধিক আগ্রহ দেখা যায় । *Autumn Journal* বেরিয়েছিলো এই বছরেই।

৫ পামীর মালভূমিতে উত্থিত হ'য়ে Oxus বা অমুদরিয়া নদী সোভিয়েট রাশিয়ার আরল হ্রদে গিয়ে পড়েছে। বামিয়ান ভ্রমণের সময় অমিয় চক্রবর্তী খুব সম্ভব আফগানিস্তান-সোভিয়েট রাশিয়ার সীমান্ত বরাবর চ'লে গিয়েছিলেন।

৬ সুধীরবাবু ( কবি সুধীর কর ), কবির 'সুধীর বাঙাল', তাঁর চিঠিপত্র এবং রচনাদির অনুলিপি রক্ষা করতেন।

## ৮৬

Blarney<br>Summer Hill<br>Simla

July 26 [1939]

শ্রীচরণকমলেষু

লাহোর থেকে আপনার চিঠি আর কবিতা এসেচে— এ বাড়ির সবাই আমরা তাই নিয়ে সকাল কাটালাম।[১] কবিতা দুটি একবার দুবার প'ড়ে তৃপ্তি হয় না—এর মধ্যে গল্পে, ভাবনায়, মাধুর্য্যে নূতন রস সৃষ্টি হয়েচে। কাব্যের শ্রেষ্ঠলোকে যে শালের মঞ্জরী দুলে ওঠে তার সন্ধান আমরা হারাতে বসেচি ; শালের কাঠের বিচার ক'রে নানাবিধ সাহিত্যিক জিনিষ তৈরি হয়ে উঠচে। যেখানে গান, যেখানে বাণী সেখানে তর্কের অতীত অভাবনীয় উপলব্ধির আনন্দলোক—তার থেকে আধুনিকেরা অনেকটা পরিমাণে বঞ্চিত। মঞ্জরিত সৃষ্টিরস কখনো বা দেখা দেয়, কিন্তু কাঠের কারুকাজ চতুর্দ্দিকে অভিনব পারদর্শিতার পরিচয় দিচ্চে—তাতে অন্য স্তরের সাহিত্যিক সার্থকতা অনুভব করি। আপনার সাহিত্যে চিরন্তন এবং আধুনিক দুয়েরই বিচিত্র প্রকাশ—শালবীথিকার আলোছায়ায় সৌরভ এবং শ্যামলতার সমারোহ চলেচে, শাল-কাঠের সুন্দর আসনেও বসবার নিমন্ত্রণ। স্পেন্ডর এবং ফর্স্টরের সম্পর্কে আপনি যা 'বলেচেন তাতে আর্ট এবং সমাজনীতির মূলতত্ত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেচে। *Autumn Journal* প্রভৃতি আধুনিক কাব্যে "ব্যবহারিক সাহিত্য" কতদূর সার্থকতা পেয়েচে—এদের চেষ্টার মূল্য আর্টের দিক থেকে কতখানি তা আপনার কাছ থেকে কোনো সময়ে আরো জানতে পেলে অনেক তর্কের অবসান হত।[২] আপনি বলেচেন Socialism আপনার চিন্তার রাজ্যে বড়ো আসন পেয়েচে—গ্রামের কাজে, শিক্ষায়, শ্রীনিকেতনে তার আরেক পরিচয়—আপনার কাব্যে তার প্রভাব কী ভাবে

পৌঁছেচে তার বিচার সম্পূর্ণ সাহিত্যগত না হলেও আজকের দিনে তা বিশেষ চিত্তাকর্ষক হবে। এ বিচার বাহির থেকে অনেকেই করবে, ভবিষ্যতেও এই নিয়ে তর্ক চলবেই, আপনার কী মনে হয়, জানলে দৃষ্টি আমাদের স্পষ্ট হত।[৩]

কাল এখান থেকে চলে যাচ্চি—আমরা কাশীতে কয়েকদিন থাকব। খবর পেলাম আশ্রমে এখন দিন পনেরোর মতো অতিথির আধিক্য, জায়গা নেই—১৩ই আগস্টের পর পুরীর দিক থেকে ঘুরে আসবার চেষ্টা করব। কৃপালানীকে আজ এ বিষয়ে লিখচি। মাদ্রাজের দিকে সেপ্টেম্বরে যেতে হচ্চে কিন্তু তেমন ইচ্ছা হয় না।

মণ্ডির রাজার সঙ্গে এখানে দেখাশোনা হয়—মনে করেছিলাম তিনি হাজারের চেয়ে বেশি দিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনকে। দেখলাম এ নিয়ে তিনি লজ্জিত কেননা আমাকে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাতে এর চেয়ে অনেকটা বেশি কথা ছিল। এঁর কাছ থেকে বিশ্বভারতীর জন্য ভবিষ্যতে ভালোরকম অর্থ পাওয়া যাবে—একবার আশ্রমে এঁকে এবং রাণী সাহেবাকে নিয়ে যাওয়া দরকার। রাণীর নিজের অর্থ আছে—তিনি রাজপিপলার রাজার কন্যা, বিবাহের সময় স্বতন্ত্র দান পেয়েছিলেন—আশ্রমের উপর তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা।

এবারকার প্রবাসীর কবিতায় বাংলা ঘরের জীবনের ভিতরকার ছবি আঁকা পড়েচে, —এখনি আমরা পড়লাম।[৪] সামান্যের এতখানি বিচিত্র ভূমিকা কত রঙে বর্ণনায় একটি কবিতায় ধরা পড়ল, এরি সঙ্গে আপনার এখনকার দৃষ্টির দূরতা। মনে হয় এই দূরত্বের বিশেষ একটি সুর বাজচে যা "বলাকা"র কবিতায় বা তার পরবর্ত্তী অন্য রচনাতেও নেই।

আমাদের সকলের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

প্রণত
অমিয়

---

টীকা

১ 'শালের কাঠ' 'শালের মঞ্জরী'-র উল্লেখ দেখে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের এ-চিঠিটি নিশ্চয়ই ১৬ জুলাই তারিখ লেখা, মংপু থেকে নেমে শ্রীনিকেতনে ব'সে ('চিঠিপত্র' ১১শ, ১১৬)। কিন্তু কোন্ দুটি নতুন কবিতা গিয়েছিলো সেইসঙ্গে যা নিয়ে এতটা উদ্‌বেলিত হয়েছিলেন অমিয় চক্রবর্ত্তী ? জানতে ইচ্ছে করে। জুনে, না জুলাইতে লেখা? হ'তে পারে 'নবজাতকে'র অন্তর্গত "সাড়ে নটা" বা "শেষ হিসাব", হ'তে পারে 'সানাই' গ্রন্থের অন্তর্গত "স্মৃতির ভূমিকা", "মানসী" বা "পরিচয়"। এর মধ্যে চারটি লেখা হয়েছিলো ৮ থেকে ১১ জুনের মধ্যে আর ১৬ জুলাইয়ের আগে লেখা আছে একটি। এর মধ্যে যে-কোনো দুটি হওয়া অসম্ভব নয়, তবে নিশ্চয় ক'রে বলা কঠিন।

২ 'ব্যবহারিক সাহিত্য', যা-দিয়ে পাঠককে ঈঙ্গিত কোনো কর্মে উত্তেজিত বা প্রণোদিত করা যায়, সে-বিষয়ে পরবর্ত্তী কোনো চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের কোনো মন্তব্য দেখা যায় না।

৩ নিজের কাব্যে সোস্যালিজমের প্রভাব বিষয়েও কবিকে দিয়ে কিছু কবুল করাতে পারা যায়নি।

৪ খুব সম্ভব 'প্রবাসী'-তে ১৩৪৬-এর শ্রাবণ সংখ্যায় "এপারে-ওপারে" (রাস্তার ওপারে / বাড়িগুলো ঘেঁষাঘেঁষি সারে সারে) কবিতা, পুরীতে বৈশাখ মাসে লেখা, যাতে 'বাংলা ঘরের জীবনের ভিতরকার ছবি আঁকা পড়েছে'। এ-ধরনের কবিতা রবীন্দ্রনাথ আগে কখনো লেখেননি। পরে 'নবজাতক' গ্রন্থে সংকলিত হয়।

## ৮৭

১২ আগস্ট [1939]

The University
Benares

শ্রীচরণকমলেষু

পৃথিবী জুড়ে ঘন দুৰ্দ্দিন এল, এই সময়ে আমাদের দেশেও ঐক্যশক্তি ভাঙতে বসেচে। কাল জওহরলালের সঙ্গে দিন কাটালাম এলাহাবাদে, তিনি এই বিষয়ে অনেক কথা বল্‌লেন। ভারতবর্ষের বড়ো রূপটি মনে নিয়ে তিনি চীনে যেতে চান : এই সময়ে আপনার রচনার মধ্য দিয়ে দেশের ধ্রুব উপলব্ধি খুঁজে পাবার চেষ্টা করচে৷ বল্‌লেন। শ্যামদেশেও যাবেন।

আধুনিক এশিয়ায় আপনি ভারতবর্ষের বাণী রেখে এসেচেন, আজ চীনে মালয়ে সর্ব্বত্র ইংরেজরা বেশি ক'রে আমাদের সৈন্য চালান ক'রে দিচ্চে ভারতবর্ষের নামে, চীনকে এবং অন্যকে মারবার জন্যে। হত্যা-ব্যবসায়ের গুপ্ত নীতি নির্লজ্জভাবে আবার ধরা প'ড়ে গেল অথচ ভারতবর্ষ অসহায়। এই নিয়ে উনি ভারতের বাহিরে কিছু প্রতিকার ক'রে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে আসবেন, নূতন মৈত্রীর আশা নিয়ে ফিরবেন এই বিশ্বাসে চলেচেন। এই সময়ে তিনি আপনার আশীর্ব্বাদ পেলে মনে গভীর আনন্দ এবং আশ্বাস পাবেন মনে হচ্ছিল।[১] সাতদিন পরে দেশ ছাড়বেন। আমরা পরশু শান্তিনিকেতনে পৌঁছব।

আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

প্রণত
অমিয়

---

টীকা

১ জাপানী আক্রমণে বিধ্বস্ত চীনে জওহরলাল যাচ্ছেন, এ-খবর আগেই পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এবং সঙ্গে-সঙ্গে জওহরলালকে লিখেছিলেন : 'I feel proud that the new spirit of Asia will be represented through you and our best

traditions of Indian humanity find their voice during your contacts with the people of China.... Let Japan take warning not to betray the basis of her civilization which she shares with China and with us in India; far greater than the fearful hurt she is inflicting on China would be the inevitable wrecking of her own humanity which her militarists seem determined to achieve'. ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর সংখ্যা *Visva-Bharati News*এও ছাপা হয়েছিলো।

জওহরলাল চীনের পথে বিমান নিয়েছিলেন কলকাতা বন্দর থেকে। যাত্রার প্রাক্কালে, কবি কলকাতায় আছেন জেনে, জোড়াসাঁকোয় গিয়ে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন (১৯ আগস্ট ১৯৩৯)। এশিয়ার প্রধান সংস্কৃতিগুলির মধ্যে কী ভাবে পারস্পরিক অনুপ্রবেশ ঘটেছে, এবং আজ আবার কেন প্রাচ্য দেশগুলির সঙ্গে ভারতের পরিচয় ঝালিয়ে নেওয়া দরকার—সে-বিষয়ে কবি তখন তাঁকে বুঝিয়ে বলেন।

## ৮৮

[১৯৩৯-এর ১৮ সেপ্টেম্বরের পরে লেখা]

Aruni
• Seaside. Puri

শ্রীচরণকমলেষু

আপনি চীন দেশ দিয়ে যাবার পথে কবিতায় লিখেছিলেন, "ভেবে না পাই কে বাঁচাবে আপন-হানা অন্ধ মানুষেরে"।[১] এই কথা আজ মনে পড়ে। যদি ইচ্ছা ক'রে সত্তাকে অপমান করি, ইতিহাসকে ধূলোয় লুটোই, আপনাকে মারি তাহলে আমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না, এই ভয়ঙ্কর স্বাধীনতা আমার আছে। কিন্তু যতই অপপ্রয়োগ হোক মানুষের স্বাধীনতার, তারই মধ্যে সমস্ত জীবনের চরম মূল্য পাই—অন্তত পক্ষে বিশ্বসৃষ্টিতে ডিক্টেটরিপনা নেই। এটা খোলা পথের দেশ। ভবিষ্যতের তীর বেয়ে পার হবার একটি পথরেখা দেখতে পাই আপনার বাণীতে।

আপনি চিঠিতে "ঝড়ের খেয়ার" কথা লিখেচেন—দুঃখে অপমানে রক্তলাঞ্ছিত দুর্য্যোগের সময় একমাত্র বড়ো সান্ত্বনা পাই মনে ক'রে যে এ আমাদের সকলের পাপ, কারো রক্ষা নেই মুক্তির দায়িত্ব না গ্রহণ ক'রে। হয়তো সে মুক্তি চক্ষে দেখব না, তবু কী আশ্বাসে বীর হৃদয় ত্যাগের দ্বারা, লোভের দ্বারা নয়, সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে মুক্তি খোঁজে সেই কথা ভাবব।

আশা করি এই চিঠিখানি প্রবাসীতে বেরোবে।[২]

হঠাৎ বাড়িতে গুরুতর অসুখের খবর পেয়ে এখানে এসেচি—বাবার হৃদ্‌রোগ হঠাৎ বেড়েচে। একবার পুজোর ছুটির সময় আমি মংপু যাব বিশেষ ইচ্ছে আছে—খবর নেব

সে সময়ে আপনি ওখানে থাকবেন কিনা।

সমুদ্রের ঝড়ে দূর মৃত্যুর সম্মিলিত কান্না পৌঁছয় কিনা মনে প্রশ্ন জাগে। বোধ হয় পৌঁছয় না, তা না হলে মানুষের সংসার মৃত্যুতে ছেয়ে যেত। প্রকৃতির পরম ঔদাসীন্যকে ইচ্ছে হত নিন্দে করতে, এখন মনে হচ্চে, এর অবচেতনময় বৈরাগ্যে প্রাণের বড়ো ভূমিকা আছে। কোটি ঢেউ-এর সংঘর্ষে যে শব্দ তাও অবেদনার। স্তরে স্তরে নিশ্চেতন মঙ্গল মণ্ডলী রয়েচে—এই দিয়ে ক্ষুব্ধ অশান্তিকে শোধন করতে ইচ্ছে হয়।

এবারকার প্রবাসীর কবিতা পড়ে বড়ো আশ্চর্য্য লেগেচে। বহু পারিপার্শ্বিকতার ভিতর দিয়ে কতখানি অভাবের প্রসঙ্গ—অথচ তার গভীরতায় কত শান্তি, ছন্দের সৌন্দর্য্য।[৩]

আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন।

প্রণত

অমিয়

---

**টীকা**

১ কবিতাটি "চিরন্তন" ('এই বিদেশের রাস্তা দিয়ে ধুলোয় আকাশ ঢেকে'), 'পরিশেষ' গ্রন্থে আছে, দূর বিদেশে কোকিলের ডাকে সাড়া দিয়ে লেখা, যখন 'পৃথ্বীব্যাপী মানববিভীষিকা / জ্বালায় মানবলোকালয়ে প্রলয়-বহ্নিশিখা'। লিখেছিলেন ১৯২৭-এর ১৮ অক্টোবর, ঠিক চীন দেশ দিয়ে যাবার পথে নয়, পিনাঙ্-এ ব'সে। কবি তখন দ্বীপময় ভারতের জাভা বালি প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করছিলেন। পিনাঙ্ মালয়ে।

অমিয় চক্রবর্তীর চিঠির উপলক্ষ য়ুরোপে সত্যি-সত্যি যুদ্ধ লাগা, যে-আশঙ্কা তাঁরা অনেক দিন থেকেই করছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় এ-চিঠির দু সপ্তাহ আগে, ৩ সেপ্টেম্বরে।

২ মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে জেনে মংপু থেকে কবি লিখেছিলেন (১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯) : 'যে অঘাসুরকে আমি ঠেকাতে পারিনে এমন কি স্বয়ং চেম্বরলেনের ছাতাও পারে না, কী করব তার মার খেয়ে, ধিক্কার দিতে পারি —বিষবর্ষী শতঘ্নীর প্রচণ্ড গর্জনের কাছে সেটা শোনাবে অত্যন্ত হাস্যকর।' এর পরে 'বলাকা'-র ৩৭-সংখ্যক কবিতা "ঝড়ের খেয়া"-র অংশ তুলে দিয়ে লেখেন : 'আমার যদি কণ্ঠ থাকত তাহলে এই কবিতার সমস্তটা আমি মানববিশ্বের কাছে পড়ে শোনাতুম। এর উপরে একটা কথাও আমার বলবার নেই।' একটু বদল ক'রে 'প্রবাসী'-তে (কার্তিক ১৩৪৬) চিঠিটি বেরিয়েছিলো।

৩ 'প্রবাসী'-র ঐ কার্তিক সংখ্যাতেই মিলছুট ছন্দে লেখা আর-একটি কবিতা ছিলো "পরিচয়" ( বয়স ছিল কাঁচা/ বিদ্যালয়ের মধ্যপথের থেকে/ বার হয়েছি আই.এ-র পালা সেরে।') খানিকটা 'চণ্ডালিকা'-র কাহিনী, আধুনিক জীবনের ছাঁচে ঢালাই করা। পরে যায় 'সানাই' গ্রন্থে।

২৬ সেপ্টেম্বর [১৯৩৯]

Aruni,
Seaside, Puri, Orissa.

শ্রীচরণকমলেষু

আপনার চিঠি[১] পড়ে Yeats-এর দুটো কবিতার কথা মনে পড়ল—যুদ্ধের প্রসঙ্গে লিখেছিলেন। ওঁদের রণমত্ত আধুনিকেরা যুদ্ধের গর্ব্বিত আয়োজন দেখে ভেবেছিলেন বোধ হয় মানবসভ্যতার চরম দিন ইংলন্ডে আসন্ন, এই বুঝি বাইবেলবর্ণিত নূতন আবির্ভাব। কিন্তু Yeats সে-কথা মানেননি—তাঁর কাছে ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের নামে বিপুল নরহত্যার ব্যাপার যন্ত্রবাহিনীর বর্ব্বরতা বলেই মনে হয়েছিল।

**The Second Coming**[২]

Things fall apart ; the centre cannot hold ;
Mere anarchy is loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned ;
The best lack all conviction, while the worst
Are full of passionate intensity.

Surely some revelation is at hand ;
Surely the Second Coming is at hand.
The Second Coming ! Hardly are those words out
When a vast image out of *Spiritus Mundi*
Troubles my sight : somewhere in sands of the desert
A shape with lion body and the head of a man,
A gaze blank and pitiless as the sun,
Is moving its slow thighs, while all about it
Reel shadows of the indignant desert birds.
The darkness drops again ; but now I know
That twenty centuries of stony sleep
Were vexed to nightmare by a rocking cradle,
And what rough beast, its hour come round at last,
Slouches towards Bethlehem to be born?

বৃটিশ নৃসিংহ অবতারের উপাসকেরা এটা প'ড়ে খুসি হননি। আপনার নৈবেদ্যের কবিতায় শ্মশানে যে-জন্তুদের চীৎকারের কথা আছে রণসঙ্গীতবিলাসীরা তাদেরই সগোত্র।[৩] ট্রেঞ্চের দুই পারেই তাদের বাসা— বিশেষ ক'রে দুই পারের ডিপ্লোমাটদের মন্দিরে। আজ পূজাঅর্চ্চনার অধ্যবসায়ে ঢাকতে চায় যে দুইপক্ষেই—এক পক্ষে নয়

—অতি যত্নসাধনায় এই যুদ্ধকে ডেকে আনা হয়েচে। একদিকে ভীত লাঞ্ছিত নির্লজ্জ নাৎসী বর্ব্বরতা যুদ্ধের ভিৎ গাঁথছিল—অন্যদিকে চতুর কপট লুণ্ঠনস্ফীত সাম্রাজ্যশাসকেরা অতি সাবধানে এই যুদ্ধের জন্যে কামনা করছিলেন এবং আজ তা ঘটিয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠেচেন। ওদের সমস্ত রেকর্ডে এ বিষয়ে প্রত্যহ স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্চে। ইম্পীরিয়ল বা অন্য প্রকার যুদ্ধসঙ্গীত লেখবার অনুরোধ পেয়ে Yeats ঠাট্টার সুরে লিখলেন—

**On Being Asked For A War-Poem**

I think it better that in times like these
A poet's mouth be silent, for in truth
We have no gift to set a statesman right :
He has had enough of meddling who can please
A young girl in the indolence of her youth,
Or an old man upon a winter's night.

প্রণত

অমিয়

---

টীকা

১ বিশ্বযুদ্ধ শুরু হ'য়ে গেলে তা নিয়ে আর বিস্ফারিত বাক্যব্যয় করবার মতো মনের অবস্থা রবীন্দ্রনাথের ছিলো না। শুধু অমিয় চক্রবর্তীকে চিঠিতে লিখেছিলেন : 'মনে যে একটা নৈরাশ্য ঘনিয়েছে তার ধাক্কা খেয়ে মনে করি ব্যক্তিগত জীবনের যে স্বাতন্ত্র্য আছে তারি চারদিকে কাব্যের প্যাটারন গেঁথে একাধিপত্য করি মনোজগতে... যদি বলো এই হচ্ছে এসকেপিজ্‌ম— প্রতিবাদ করব না—অঘাসুরকে ঠেকাবার ভঙ্গী করতে পারি যেমন ভঙ্গী করেছিল বকাসুরকে মারবার জন্যে ব্রাহ্মণ গৃহস্থের শিশুপুত্রটি ভাঙা কাঠি হাতে নিয়ে। তার চেয়ে তোমরা যাকে বলো এস্‌কেপিজ্‌ম্ আমার সেই কবিত্বই ভালো।... এরা বলে মীটিং করতে। মীটিঙের কতটুকু পরিধি, কতটুকু প্রাণ, কতটুকু কণ্ঠস্বর? কবি কি খবরের কাগজের প্রতীক।' ('চিঠিপত্র' ১১শ, ১১৬)। 'কাগজে ছাপবার দিকে লক্ষ্য করে' ফলিয়ে লিখে, আরো খানিকটা যোগ ক'রে, চিঠিটি 'প্রবাসী'তে (কার্তিক ১৩৪৬) ছাপা হয়েছিলো।

কথাটা এই যে দুঃখযন্ত্রণার একটা সংগত সীমা পেরিয়ে গেলে প্রতিবাদে গলা চিরে একটা শব্দই শুধু বেরোনো সম্ভব, সেটা হাহাকারের অট্টহাস্য। যুদ্ধবিষয়ে লিখতে বললে Yeats ও একই উত্তর দিয়েছিলেন কবিতায়, তাঁর নিজের মতন ক'রে। পরে অমিয় চক্রবর্তী নিজেও তাই করেছেন, বিচূর্ণিত ভিয়েৎনামের কথা ভেবে, চাতুর্যে ভরা নির্মম ঠাট্টার সুরে লিখেছেন :

এক হাতে ওর গাজর আছে, আরেক হাতে বোমা—
গাধার বাচ্চা চমকে বলে, ওমা। —('অমরাবতী', ১৯৭২)

২ 'The Second Coming' কবিতার যে-ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে সেটা অভিনব।

সেভাবেও হয়তো পড়া যায়। কবিতার প্রথম দু পঙ্‌ক্তি নিশ্চয়ই ইচ্ছে করেই কপি করেননি। Yeats-এর 'rough beast' আর রবীন্দ্রনাথের 'অঘাসুরের' মিলও খুবই চমকপ্রদ। ( অঘাসুর ছিলেন বকাসুর ও পূতনার ভ্রাতা এবং কংসরাজার সেনাপতি ) Yeats-এর দুটি কবিতাই লেখা হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই ফ্রান্সের কাপ্ মার্ত্যাঁয় তাঁর মৃত্যু হয়।

৩ 'নৈবেদ্য'-র ৬৪-সংখ্যক কবিতায় (১৯০১) য়ুরোপে 'শ্মশান কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি গীতি'-র রচয়িতাদের রবীন্দ্রনাথ ধিক্কার দিয়েছিলেন। সেই কবিদের মধ্যে কিপ্‌লিং থাকলেও থাকতে পারেন।

## ৯০

28th Sept. [1939]

Aruni
Seaside, Puri

শ্রীচরণকমলেষু

আপনি গল্প লিখচেন খবর পেয়ে খুব উৎসুক বোধ হচ্চে[১]— যদি সম্ভব হয়ে ওঠে একবার গিয়ে শুনে আসব একান্ত আশা করে রইলাম। দ্বিতীয় চিঠিখানিতে সব কথাই আছে এবং কার্ত্তিকের প্রবাসীতে বেরোলে এই সময়ে সকলের পক্ষে ভলো হবে।[২] সমস্ত য়ুরোপীয় সভ্যতার বর্তমান ধারাকে আপনি দেখিয়েচেন, কোনো পক্ষ হতে নয়, নিরপেক্ষভাবে অথচ গভীর বেদনায়। আমরা হার-জিৎ-এর দিক থেকে দেখি—যেমন ক'রে জীবজন্তুদের লড়াই অনেকে দেখে : এই চিঠি প'ড়ে অনেকের দৃষ্টি শুদ্ধ হবে। এক জায়গায় ইংরেজের জিৎ হোক্ এই কথাটা আছে— জানি না এতে কেউ ভুল বুঝবে কিনা।[৩] জন্তুর মতো হত্যার নেশায় নেমে, বড়ো বা ছোট নাম দিয়ে যারা মানুষ-ধ্বংসের বৈজ্ঞানিক আয়োজন ঘটায় তাদের হারও নয়, জিৎও নয়, দু দলেরই চোখ খুলে যাওয়া দরকার : এই পথে সভ্যতা বাঁচবে না। এই জন্যে কোনো পক্ষের জিৎকেই আমরা ভয় পাই, তাতে সংহারবিধির প্রতিই মানুষের বিশ্বাস পাকা হবে। একবার হত্যাকাণ্ডের পর সবাই মিলে নিপীড়িত দেশের সাংঘাতিক নাৎসীনীতি জাগিয়ে তুললেন, আবার তাকে দমাবার নাম ক'রে পুনর্ব্বার হত্যাকাণ্ডের বিধান। এর শেষ কোথায়। তাই দু'পক্ষ হারে-জিতে এমন একটা জায়গায় পৌঁছক যাতে বৈজ্ঞানিক হত্যার নেশা, তার আয়োজন, তাতে বিশ্বাস, তাই নিয়ে নকল বীরত্ব, গিল্টি-করা ফরমাসী কবিতা, মিথ্যে ছবি, রেডিয়োতে মিথ্যের বন্যা— এসবের প্রতি ধিককার জাগে। কোনো এক পক্ষ ভয়ঙ্কর জিৎলে ধিককারের জায়গায় ঔদ্ধত্য জাগবে এবং তার আবার প্রতিক্রিয়া চলবে। সৌভাগ্যের বিষয়, রাশিয়া নামাতে সেরকম উৎকট জিৎ কোনোদিকেই হবে না যদিও রাশিয়ার রাষ্ট্রবিধি ষড়যন্ত্রে পূর্ণ—তবু অন্য সকলের চেয়ে ভালো। বিলেত থেকে খবর

পাচ্চি ওদের শান্তিকর্ম্মীদের গলা টিপে ধরা হয়েচে—হার জিৎ-এর হাওয়ায় তাঁদের পক্ষে কথা বলাই শক্ত হয়ে উঠেচে। তাঁদের কবিতা প্রবন্ধ শুধু এদেশে নয় স্বদেশেই যাতে ছড়াতে না পারে তার ব্যবস্থা হচ্চে। এ বিষয়ে পরে আরো জানা যাবে। মুক্তি যদি য়ুরোপকে কেউ দিতে পারে বোমা বারুদ ব্যবহার ক'রে সাম্রাজ্যবাদীরা দেবে না— যারা সহজ মানুষ, ইংরেজ জর্ম্মান রাশিয়ান, তারা যদি চরম দুঃখের উন্মাদনায় দৃঢ় সংঘবদ্ধ হতে পারে হয়তো তখন মুক্তির পথ খুলবে। আপনার চিঠিতে যদি এ বিষয়ে এক লাইন থাকত তাহলে সর্ব্বদেশে তার ঢেউ পৌঁছত। এই চিঠিখানি ইংরেজি ক'রে Quarterlyতে বেরোলে তার থেকে সব জায়গায় ছড়াবে—এখন না হলেও এক সময় মানুষ বুঝবে।[৪] রোজ খবরের কাগজে বিষাক্ত হাওয়া আসে, এতখানি সমুদ্রের হাওয়াও মনে হয় সবটা দূর করতে পারে না। অথচ জানি মন ছোট বলেই এত কষ্ট পাই। এখানে অসুখের খবর ভালো—আশা করা যায় এবারে বাবা সেরে উঠবেন। আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

প্রণত অমিয়

---

**টীকা**

১ গল্পটি প্রথমে 'ছোটোগল্প' নামে 'দেশ' পত্রিকায়, পরে খানিকটা বদলিয়ে 'শেষ কথা' নামে 'শনিবারের চিঠি'-তে ছাপা হয়। 'তিন সঙ্গী' (১৯৪০) নামে কবির শেষ ছোটোগল্পের বইতে আছে।

২ 'পত্রালাপ' সিরিজে, পুনর্লিখিত ও সংযোজিত রূপে চিঠিটি 'প্রবাসী'-তেই (কার্তিক ১৩৪৬) বেরিয়েছিলো। ('চিঠিপত্র' ১১শ, ১১৮ দ্র.)

৩ 'এই যুদ্ধে ইংলণ্ড ফ্রান্স জয়ী হোক একান্ত মনে এই কামনা করি। কেননা মানব-ইতিহাসে ফ্যাসিজমের নাৎসিজমের কলঙ্ক প্রলেপ আর সহ্য হয় না।' —এ-অংশ মূল চিঠিতে ছিলো না, প্রবাসীতে ছাপার সময় যোগ করা হয়। লোকে ভুল বুঝবে ভেবে অমিয় চক্রবর্তী আর একটু কিছু যোগ করার প্রস্তাব করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যোগ করেননি।

এর কয়েকদিন আগেই 'যুদ্ধ ও ভারতের কর্তব্য' নামে এক প্রকাশ্য বিবৃতি ছাপা হয়। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া ছিলেন—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, শ্যামাপ্রসাদ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা। বিবৃতিতে ছিলো : 'নিজের দেশের স্বার্থের জন্যেও কোনো ভারতীয় এইরূপ কামনা করিবে না যে, ইংলণ্ড যুদ্ধে পরাজিত হউক। ইংলণ্ড যদি যুদ্ধে হারিয়া যায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পথে বাধা পড়িবে। তখন নূতন বৈদেশিক শাসনের অধীনে ভারতবর্ষের দাসত্বের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইবে। গণতন্ত্ররক্ষাকল্পে স্বাধীন ভারত যাহাতে স্বাধীন ভাবে সর্বপ্রকার সম্ভাব্য সাহায্য করিতে পারে, তজ্জন্য ব্রিটেন জগতের শান্তির খাতিরে ভারতবর্ষে স্বশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সহিত চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব স্থাপনের এই মহা সুযোগ যেন না হারান।' এ-বিষয়ে গান্ধীজির সঙ্গে তাঁদের মতের কোনো ভিন্নতা ছিলো না, যা অমিয় চক্রবর্তীর ছিলো। বিবৃতির বাংলা

ভাষা অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের নয়।

৪ 'Armageddon' নামে চিঠিটির অনুবাদ নবেম্বরের *Modern Review* পত্রিকায় ছাপা হয়। অনুবাদ করেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

## ৯১

October 2, 1939

Aruni
Seaside, Puri

শ্রীচরণকমলেষু,

রামানন্দবাবু লিখেচেন আপনার চিঠির ইংরেজি করতে : তর্জ্জমার শেষ অংশে আপনার আজকের মন্তব্য— নর্ম্মান এঞ্জেল-এর বিষয়ে— যোগ ক'রে দেব।[১]

ইংরেজ people-দের শ্রদ্ধা করি, যেমন করি য়ুরোপীয় অন্য দেশের লোককে —তারা আমাদের আত্মীয়। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারী পোলিটিকাল্ ইংরেজ বা ওলন্দাজ, জর্ম্মান বা ভারতীয় সমানই আমাদের পর। সেখানে পাপ ; মিথ্যের ব্যবসায়ে কে একটু বেশি বা কম তার উনিশ-বিশের হিসেব কেন জানি না অত্যন্ত অলীক মনে হয়। সুতরাং রাষ্ট্রিক চক্রান্তঘটিত নরমেধ ব্যবসায়ে ধর্ম্মের নাম ক'রে তাল ঠুকে ভারতবর্ষ নামবে বা সমবেদনায় বিগলিত হয়ে মহাত্মাজির মতো লণ্ডনের রাষ্ট্রসৌধ ভাঙবার কল্পনাতেই মূর্চ্ছিতপ্রায় হবে— একথা ভাবলে ধিক্কার হয়। ওদের হন্যে ব্যবসায়ে চীনকে বলি দিতে, ভারতকে ধূলোয় ফেল্‌তে একটুও বাধ্‌বে না যেমন বাধেনি হিট্‌লারের পোলন্ড্‌কে পিষতে, মুসোলিনির বাধেনি আবিসীনীয়াকে পুড়োতে। যদি ভারতবর্ষের পক্ষে স্বাধীন কথা বলবার একটুও উপায় থাকে, গলায় ফাঁস না টানে, তাহলে সমস্ত হত্যা নৃশংস পাপের বিরুদ্ধেই বলার দরকার ছিল অথচ মহাত্মাজি তা বলতে পারলেন না।[২]

এমনি ক'রেই শিক্ষা হয় ; নূতন ক'রে বুঝি যে সত্যই বড়ো, কোনো মানুষ, যিনিই হোন্ না কেন তার বিশুদ্ধ বাহন নয়। যাঁর কাছে যা পাই তাতেই ধন্য হব, কিন্তু যাব ফিরে যেটুকু সত্যকে সমগ্রের প্রতিষ্ঠায় জেনেচি সেই সত্যের কাছে। মহাত্মাজি বুদ্ধি দিয়ে জ্ঞানের তপস্যায় সত্যকে খোঁজেননি, তন্ময়তায় হঠাৎ কখনো ছুঁয়েছেন তাই পুণ্যকে পণ্য করতে তাঁর বাধ্‌ল না—যুদ্ধকে একাধারে কাজে লাগানো এবং মৃদু ভর্ৎসনা দ্বারা দুই কূল রক্ষার বিধান দিলেন। বহু দেশের দুঃখজাগ্রত মানুষের উনি কেন্দ্র ছিলেন একনিষ্ঠ শান্তিমন্ত্রের, ঘটনাক্রমে তাঁকে বর্ত্তমান সভ্যতার আহত যন্ত্রপিষ্ট মানুষ প্রতীক ব'লে মেনেছিল ভাবী সভ্যতার অহিংস্র আঙ্গিক বানাবার চেষ্টায়। আজ উনি দাবী করচেন "I have grown from truth to truth' এবং বলচেন, শেষ 'truth' এই যে, "Unless the Allies suffer demoralization; of which there is not the slightest indica-

tion, this war may be used to end all wars...." এই "War to End War"-এর বুলি আজ য়ুরোপের ছেলেবুড়ো সকলের কাছে stock joke। এর মাহাত্ম্য বোঝবার জন্যে ওদের মহাত্মার প্রয়োজন হয়নি, গত যুদ্ধে এমনিই মরতে মরতে বুঝেচে। এবং War যে কীরকম অত্যন্ত Ended হল তার প্রমাণ আজ সর্ব্বত্র। ও-পথে End ব'লে কোনো জিনিষ নেই তা মহাত্মাজির বোঝা উচিত ছিল মনে হয়। Europe-এর যুদ্ধে মরা ঐসব বুলি উনি আজ পুণ্যের গলায় এবং জোর গলায় ভারতবর্ষে বিতরণ করচেন যাতে Viceroy-এর কান পর্য্যন্ত পৌঁছয়। এবং তৎপরে বলচেন "I have the hope that India, distraught though it is with internal dissensions, will play an effective part in ensuring that end"—অর্থাৎ সাদা কথায় আমাদের মানুষদের খামকা পরদেশীদের খুন করবার জন্যে পাঠাতে এবং হাজারে হাজারে জন্তুর মতো মরতে দিতে ওঁর ধর্ম্মে আপত্তি নেই।

কিন্তু চিরন্তন ধর্ম্মের মাহাত্ম্যও উনি রাখতে চান। তাই পাওনার হিসেবে বহু কথা জাহির করে ধার্ম্মিক সুরে বলচেন : সবসুদ্ধ মরা সেই আরো ভালো, অন্তত সে-কথা ব'লে অহিংসতা ভোগ করা যাক্। এমন সব কথা প্রহসনের মতো শোনায় : "The English would (should) die unresistingly and go down to history as heroes of Non-Violence. I would further invite Indians to cooperate with Englishmen in this Godly Martyrdom. It will be an indissoluble partnership drawn up in letters of blood of their own bodies..."অর্থাৎ সবসুদ্ধ মরা এবং সবসুদ্ধ মারার ভিতরে কোনো মধ্যপথ নেই। আমাদের বিশ্বাস ছিল এই মধ্যপথ খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন বলেই ক্ষতবিক্ষত বহুদেশের মানুষ ওঁকে শ্রদ্ধা দিয়েছিল। আজ উনি ভারতবর্ষকে যুদ্ধে নামাবার উৎসাহে মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন।

য়ুরোপকে প্রাণ দিয়ে শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি ব'লেই যন্ত্রণার দিনে ওদের লক্ষ লক্ষ সন্ধানী মানুষ যখন রক্তকাণ্ডের বাহিরে যাবার পথ খুঁজছে তখন ভারতবর্ষকেও শ্মশানের পথে নৃত্য করতে বলাকে এমন ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতকতা ব'লে মনে হয়। জানি কত সহস্র লোক য়ুরোপে আজ আমাদের কাছে তৃতীয় শ্রেণীর যোদ্ধা নয়, যথার্থ বীরের বাণী খুঁজচে। মহাত্মাজির এই আশ্চর্য্য রচনা এবং রাষ্ট্রক্ষেত্রে নবপুণ্যবিলাসের নানা আধুনিক খবর পেয়ে আকণ্ঠ ভ'রে উঠেচে তাই এমন ভাবে অসংযত চিঠি লিখলাম।

আপনি Norman Angell-এর প্রসঙ্গে যা লিখেচেন তাতে দৃষ্টি স্বচ্ছ হ'য়ে যায়। চীনকে পিছন থেকে ছোরা মারবার উদ্যোগ যেমন ঘৃণ্য তেমনি এদের ভারতকে নিয়ে নির্ম্মম প্রহসন। Zetland-এর নির্লজ্জ ধমক খেয়েও আমাদের চোখ খুলবে না।[৩] Forster লিখেচেন ওদের রাষ্ট্র আজ যুদ্ধের ব্যবসায় চালাবার জন্যে সমস্ত পূর্ব্বদেশ এবং Colonyকে "One vast servant's hall" বানাবার উদ্যোগ করচে।[৪] কথাটা খাঁটি এবং Forster-এর মতো লোকই আজও বলতে সাহস পান। কিন্তু Forsterও জানেন না মনীবেরা চাকরের বাড়িতে এসে যুদ্ধের অন্ধকারে কীভাবে দুহাতে ব্যক্তিগত লুঠের ব্যবসা চালাচ্চেন— এটা কি Goering Goebbels-এর টাকা সরিয়ে বড়ো লোক হবার

ব্যবসায়ের চেয়ে কম হেয়? আজকের কাগজ থেকে তুলে দিলাম। এত বেশি জানা জিনিষ যে কাগজে পর্য্যন্ত ছাপিয়েচে—তা ছাড়া war profiteering-এর পিছনে এখানকার ইংরেজরা যা করচেন তা কাগজে বেরোবার উপায় নেই।

[কর্তিকা]

**War Time Appointments**
**Salary Doubled**
Surprise In Simla For Irregular Methods
*(From Our Own Correspondent)*

SIMLA, Sept. 30. The announcement to-day of the appointment of the new Information Officer in the Bureau of Public Information in the Government of India ; contrary to usual practice neither was the post advertised nor has the appointment been made through the Federal Public Service Commission. Besides the surprise caused by such irregular method of appointment criticism is being heard on all sides of the manner in which a number of Government of India officials have been put to new posts created during the emergency who are being paid much higher salaries than they were receiving in their normal posts.

To cite a few instances, a Secretary to the Government of India with a salary of Rs. 4,000 a month has been appointed Director General of Supplies on a salary of Rs. 5,000 a month.

Another Government of India official whose salary was Rs. 3,000 a month has been made Deputy Director General of Supplies with an augmented salary of Rs. 4000 per month.

The post of the Secretary to the Supply Board which carries a monthly salary of Rs. 3,500 has been given to an officer whose ordinary pay was Rs. 2,000 a month. A comparatively Junior I.C.S. official who was drawing a little over 1,000 a month finds his salary suddenly doubled as Controller of Enemy Firms.

এসবের মধ্যে যদি আমরা জড়াই, এবং পক্ষ অপক্ষ বিচার ক'রে ভারতবর্ষকে নরঘাত বৃত্তিতে দীক্ষিত করি, মহিমা এবং মাহাত্ম্য বিশুদ্ধ রাখবার জন্যে—তাহলে ভৃত্যের দেশে আর কী বাঁকি (sic) রইল।

এমন সময়ে ইংরেজ যুবা কবির বেদনা এসে পৌঁছল। কী সাড়া দেবো এর ? MacNeice-এর এই কবিতা, ' অন্তিম বেদনায় উনি বলচেন—

The sunlight on the garden
Hardens and grows cold,
We cannot cage the minute
Within its nets of gold.
When all is told
We cannot hope for pardon.
Our freedom as freelances
Advances towards its ends ;
**The Earth compels, upon it**
Sonnets and birds descend :
And soon, my friend,
We shall have no time for dances.

বলা বাহুল্য, ইনি চাইচেন না যে আমরাও মর্চ্চে-পড়া বেয়নেট নিয়ে রক্তপাতে নামব এবং তাতে ইংলণ্ড বাঁচবে। ওসব চাতুরী ওঁরা ঢের জেনেচেন। এবং তাই শেষ নিভৃতে নিবেদন করচেন—

...And not expecting pardon
Hardened in heart anew,
But glad to have sat under
Thunder and rain with you.
And grateful too
For sunlight on the garden.

আপনার চিঠিতে এই কথা আছে। যে-কেন্দ্রের কথা আপনি লিখেচেন সেখানে ভারতবর্ষকে যুদ্ধে নামাবার নকল বীর্য্য পৌঁছয় না। এবং সেই কেন্দ্রের কথা, ভারতবর্ষের আলোয় ছায়ায় নূতন ক'রে একবার য়ুরোপের লোকেরা শুনতে চেয়েছিলেন।

আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন।

অমিয়

## ঘুম[৬]

ঘুমের আকাশে রাত্রি আসে, দিন, তন্দ্রার উজ্জ্বল সূর্য্যফুল ;
মোহরশ্মিমৃত্তিকায় স্তব্ধ গাছ, শূন্যভাঙা কালের কল্লোল,
পৃথিবী যাত্রিণী কক্ষে স্বপ্ন জ্বালে লক্ষ লক্ষ তারাদল।

চাঁদ ওঠে, ঘুম সন্ধ্যাকোলে। ঘন ঘুম চূর্ণধারা
নদী ; নৃত্য নির্ঝরি' ছোটে অরণ্যগ্রামের সুপ্তিস্বরা,
মহানিদ্রাসমুদ্রের বুকে মেশে। আদিম জলের লাগে সাড়া।

শুভ্র ঘুম তুষার মেরুতে। হিমালয়। মেঘ করে। নীল পদ্ম ঘুমে
নীল শূন্য। ঘুমের গোলাপ রাঙা। হরিদ্রা ঘুমের শর্ষে ফুল ; নামে
মাটি আঁকা ঘুমের বরণ। দিগন্ত বিবর্ণ ঘুমে।

চেতনার শুকতারা, মন, প্রথম উদিছ ভোরে, পাখী ডাকে। মাঠে
গ্রাম ওই। গোরু চরে। পাশে খোড়ো ঘর, ধানের গোলায় আঁটি-
বাঁধা পর্য্যাপ্ত ঘুমের ধন ; মন, মন, সংসার প্রাচীন রৌদ্র ওঠে

প্রাণের আনিছ চিন্তা ; জাগার অস্ফুট ধ্বনি ; তবু ঘন নিদ্রানভে
জীবনের ঘুম ধরণীতে। কে জাগি'। বিশ্বমাতা গণিছ প্রহর, ছবি
দেখিছ ঘুমের হাসি, কান্নায় রঞ্জিত দুঃস্বপনে। কী প্রতীক্ষা তব।

ঘুমের সংঘাত অন্ধবেগে রুক্ষ করে ইতিহাস, তবু ক্ষমা।
দিকে দিকে সৈন্য, রাজা, নিদ্রামত্ত। রাষ্ট্রের চীৎকার। প্রলাপ-দামামা
বাজায় ভীষণ ঘুমে। পারায়ে অসংখ্য মৃত্যুসীমা

আনো খনখগুমালা অমরণ ; বেদনা-চন্দনে ; পরায়েছ। শিশুআঁখি
ছল ছল নবীন তোমার মুখে, প্রেমে ঘুমে যৌবন জাগায় ; হঠাৎ শঙ্খের ডাকে
তীব্র মিলে যায় চৈতন্যের দোলা ; ঘুমে কবিতায় আঁকি,
তোমাকে শোনাতে চাই।।

অমিয় চক্রবর্তী

---

টীকা

১ (স্যর) নর্মান এঞ্জেল—২১.৬ দ্র.
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমালোচনা সংক্রান্ত এঁর এক লেখা থেকে কিছু অংশ অমিয় চক্রবর্তীকে ২০ সেপ্টেম্বরে লেখা চিঠিতে কবি জুড়ে দিয়েছিলেন। ('চিঠিপত্র' ১১শ, ১২০ দ্র.)। কিন্তু চিঠির যে-অনুবাদটি *Modern Review*-তে ছাপা হয়েছিলো (নবেম্বর ১৯৩৯) সেটি সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের করা।

২ বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরদিন ভাইসরয় লিন্‌লিথ্‌গো সিমলায় গান্ধীজির সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকের বিষয়ে গান্ধীজি যে-বিবৃতি দেন তাতে বলেছিলেন ভাইসরয় ভারতের স্বাধীনতার বিষয়ে তাঁকে কোনো আশার কথা শোনাননি যদিও ভাইসরয়কে তিনি খোলাখুলি জানিয়েছিলেন যে যুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের জয়ই তাঁর একান্ত কাম্য। ('হরিজন' পত্রিকা, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ দ্র.)।
শ্রীনিবাস শাস্ত্রী গান্ধীজির এ-বিবৃতির যে-তীব্র সমালোচনা করেন তাও 'হরিজন'-এ ছাপা হয়। সমালোচনার উত্তরে গান্ধীজি যা লিখেছিলেন ('হরিজন', ২৫ সেপ্টেম্বর) তা থেকেই নানা অংশ তুলে দিয়ে সুতীক্ষ্ণ ভাষায় অমিয় চক্রবর্তীও

গান্ধীজির বিবৃতি বিষয়ে তাঁর আপত্তি জানাচ্ছেন। এ-আপত্তির যতটা গান্ধীজি বিষয়ে, প্রকৃতপক্ষে ততটাই রবীন্দ্রনাথ বিষয়েও, কেননা রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির মূল বক্তব্য একই ছিলো। (এর আগেকার চিঠিটি দ্র.)। অন্যপক্ষে অমিয় চক্রবর্তী কিছুতেই মানতে রাজী ছিলেন না যে যুদ্ধে কোনো পক্ষেরই জয় বাঞ্ছনীয়। 'মিত্রপক্ষ' আর হিটলারের জর্মানির মধ্যে কোনোই তারতম্য ছিলো না তাঁর চোখে। কেউ-কেউ, একে হয়তো বলবেন—'রাগী ছোকরার' দৃষ্টিভঙ্গি।

৩ রবীন্দ্রনাথ ও অন্য অনেক প্রবীণেরা নতুন ভারতশাসন বিধানের অন্তর্গত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ( Communal Award ) বিরোধিতা ক'রে এক আবেদন ( memorial ) পাঠিয়েছিলেন। লণ্ডনে ভারত সচিব Zetland (আর্ল অফ রোনাল্ডসে) তার উত্তরে বড়লাট লিন্‌লিথ্‌গোকে লেখেন : "I made it abundantly clear that H.M.'s Government would not propose any alternation of the communal award under the section except with the assent of the communities affected.' (২৫ জুন ১৯৩৬)

অমিয় চক্রবর্তীর মন্তব্য রবীন্দ্রনাথেরও গায়ে লাগার কথা।

৪ (E.M.) Forster — ৮৪.১ দ্র.

৫ (Louis) MacNiece — ৬৪.২ দ্র.

৬ 'Social Conscience' বা সামাজিক বিবেকের লক্ষণ থাকাটা আধুনিক কবিতার একটি জরুরি গুণ ব'লে এক চিঠিতে অমিয় চক্রবর্তী ঘোষণা করেছেন। এই "ঘুম" কবিতায় সে-লক্ষণটি পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। দ্বিতীয় আর একটা বিশ্বযুদ্ধের নির্ঘোষ শুনে রচিত এ-কবিতায় —রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য ধার ক'রে বলা যায়—'বিশ্বকে কবি বিরাট ঘুমের ভূমিকায় দেখছেন'। মানব সভ্যতার ইতিহাসে কোনো অগ্রগতি আছে কিনা এই সন্দেহের কথা আবিসিনীয় যুদ্ধের সময় রবীন্দ্রনাথকে প্রথম তিনি লিখেছিলেন এক গদ্য চিঠিতে। (৫০-সংখ্যক চিঠি ও ৫০.৪ টীকা দ্র.)। এতদিনে সে-চিন্তা কবিতার রূপ নিলো। রবীন্দ্রনাথকেই উৎসর্গ করা তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'একমুঠো'-তে (১৯৩৯) কবিতাটি আছে। কবিতাটি দুরূহ, কিন্তু প'ড়ে রবীন্দ্রনাথের 'খুব ভালো' লেগেছিলো। ('চিঠিপত্র' ১১শ, ১২১)। এ-নিয়ে তিনি চিঠিতে দীর্ঘ আলোচনাও করেছিলেন, এবং পরে "ঘুম" কবিতার মূল প্রশ্নের ভিন্ন উত্তর হিশেবে "রাতের গাড়ি" নামে ('এ প্রাণ, রাতের রেলগাড়ি', ২৮ মার্চ ১৯৪০) একটি কবিতাও লিখেছিলেন। [ভূমিকা দ্র.]

## ৯২

১৮ই অক্টোবর [১৯৩৯]

"Aruni"
Seaside, Puri

শ্রীচরণকমলেষু,

টমসন এসেছেন—রওনা হবার পূর্ব্বে যে চিঠি লিখেছিলেন তা পাঠাই। আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বিশেষ উৎসুক হয়ে আছেন— মাসখানেক ভারতবর্ষে

ভ্রমণকালে একবার আপনার কাছে যেতে চান। এই জন্যেই বিশেষ ক'রে এসেছেন।[১]

টম্‌সন এর পরে জানিয়েছেন তিনি এলাহাবাদ থেকে শীঘ্রই কলকাতায় আসছেন। যদি ওখানে না হয় তাহলে আপনি দুদিনের জন্যে ওঁকে মংপুতে নিমন্ত্রণ ক'রে জানালে বিশেষ ভালো হত মনে হয়। কলকাতায় ওঁর ঠিকানা—

C/o. Rev. A. M. Spencer
16 Sudder Street.
Calcutta.

আমি দুতিনদিনের মধ্যেই কলকাতায় যাচ্ছি টম্‌সনের কাছে। পরে একবার মংপুতে যাব আশা ক'রে রইলাম। যেরকম অন্ধকার ক'রে আসচে তাতে পশ্চিমে এখন রাত্রির পালা চলবে—Oxford-এ ফিরে গিয়ে কোনো ফল হবে মনে হচ্চে না। তাই কলকাতায় কাজ নিয়ে নিভৃতে লেখাপড়ার জীবন কাটাতে ইচ্ছে হয়—প্রায়ই আশ্রমে গিয়ে থাকতে পারব। আজিজুল হক মহাশয়কে আপনি লিখেছেন এতে ওঁরা আমার কথা ভেবে দেখবেন আশা করচি। সাম্প্রদায়িক যুদ্ধে জয়ী হবার চেষ্টাও করব না—যদি ওঁরা একবার পরীক্ষা ক'রে দেখতে রাজি হন তাহলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারব।

মনে হয় ভারতবর্ষে ওরা এবার কঠিন প্রভুত্ব দেখাবে—পরখ করে নিল, বুঝেচে বেকারে-ভরা দেশে যত খুশি লোক ওরা এখন যুদ্ধের জন্যে পাবে ; নেতাদের মধ্যে যেসব বিচ্ছেদ আছে হঠাৎ "স্বাধীনতা"র লোভে তা আরো বাড়িয়ে তুলল্। এখন কাউকে পরামর্শ না ক'রেই ওরা চালাবে এবং বাধা ঘটলে নীরবে সহ্য করবে না। রাষ্ট্রিক দিক দিয়ে ভাবব না—কিন্তু দেশের উপর সমগ্রভাবে এর ফল কী হবে তাই ভাববার কথা। পশ্চিমে সূর্য্যাস্তের একটা পালা এসেচে ব'লে পূর্ব্বকেও কালো মুখোস প'রে নরমেধযজ্ঞে নামাবার নীতিটা অদ্ভুত —আমরা কি আলো জ্বালাবো না? ভারতবর্ষ কোন দিক থেকে নূতন ক'রে আলো দিতে পারে তার পরিচয় আপনার রচনায় পেয়েচি—মানবসভ্যতায় এই যুদ্ধের ভূমিকায় ভারতবর্ষের মানসমূর্ত্তিকে বড়ো ক'রে একবার জানবার ক্ষুধা দেশের অনেকের মনেই জাগচে।[২]

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন।

প্রণত
অমিয়

পুনশ্চ

Art এবং propaganda সম্বন্ধে লেখা দিতে বিরক্ত করায় "কবিতা" পত্রিকার জন্যে এই ছত্র কয়েকটি পদ্যের আকারে পাঠিয়েছিলাম।[৩] আর্টের আগুন জ্বালিয়েই স্যাকরাকে কাজ করতে হয়, সে তো রাষ্ট্রিক সভার লোক নয়। আপনার কাছে এ বিষয়ে একটা চিঠিতে উত্তর পেয়েছিলাম।।

## টীকা

১ (এডোয়ার্ড) টম্‌সনের শেষ উল্লেখ ছিলো ১৯৩৬ সালে লেখা ৪৩-সংখ্যক চিঠিতে। নতুন ভারতশাসন বিধান সম্পর্কিত এঁর লেখা বিবৃতিতে রবীন্দ্রনাথ স্বাক্ষর করতে রাজী না হওয়ায়, খুব সম্ভব রুষ্ট হ'য়ে, আমন্ত্রণ পেয়েও কবির সঙ্গে দেখা না ক'রে সেবার তিনি ফিরে গিয়েছিলেন। তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে খুশি হওয়ার কথা নয়। অমিয় চক্রবর্তীর চিঠিতে টম্‌সনের আসার খবর পেয়েও এবার তিনি নীরব রইলেন। এ-চিঠির জবাবের সবটাই তাই লিখলেন অমিয় চক্রবর্তীর "চেতন স্যাকরা" কবিতাটি বিষয়ে। ('চিঠিপত্র' ১১শ, ১২৩ দ্র.)। টমসন প্রসঙ্গ অনুপস্থিত।

২ যুদ্ধে 'মিত্র'পক্ষের জয় হোক, রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ-ইচ্ছাকে আর ঠেকাতে পারছিলেন না। অমিয় চক্রবর্তীরই জিৎ হ'লো। পরের এক চিঠিতে কবি স্বীকার করলেন : 'যুদ্ধের যখন অবসান হবে তখন শক্তির জয় হবে মৈত্রীর নয়।' কাজেই ইংরেজশক্তি ভারতের কোনো কল্যাণ করবে ভাবাই ভুল। তবে 'আমাদের গতি কী'? —এ-প্রশ্ন তুলে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে কবি এমন একটা আশাব্যঞ্জক উক্তি করলেন যা তিনি আগে, বা পরেও, কখনো করেননি, —লিখলেন, 'বাইরের থেকে আমাদেরকে দেখায় নিঃসহায় তবে আমরা নিঃসহায় নই। আমরা বাস করি যে মানবমণ্ডলীর মধ্যে, তারা সকলেই সাম্রাজ্যলুব্ধ নয়। আমাদেরও আপন ব'লে গণ্য করবে এমন নিস্পৃহ মনুষ্যত্ব কোনো একটা জায়গা থেকে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে।' ('চিঠিপত্র' ১১শ, ১২৪)। কে দাঁড়াবে? রাশিয়া?

৩ 'কবিতা' পত্রিকার কার্তিক, 'বিশেষ পূজা সংখ্যা'-র (১৩৪৬) জন্যে 'পদ্যের আকারে' লেখা ছত্র-কয়েকটির নাম "চেতন স্যাকরা", আধুনিক কালের একটি অতি উৎকৃষ্ট কবিতা, 'আর্টিস্টে'র কী কাজ তাই নিয়ে লেখা,—তার কাজ 'গর্বিত আধবুড়োর উদ্ধত এই গয়না' গড়া। এখন কবিতাটি আছে 'একমুঠো' কাব্যগ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথের লেখা যুদ্ধপ্রাসঙ্গিক সাম্প্রতিক চিঠিতে এ-বিষয়ের উল্লেখ ছিলো। ('চিঠিপত্র' ১১শ, ১১৮)। কবিতাটি প'ড়ে 'রীতিমতো ভালো লেগেছিল' কবির, চিঠিতে সে-কথা জানিয়েছিলেন, পরে চিঠি থেকে নিজেরই মন্তব্য তুলে নিয়েছিলেন 'নবযুগের কাব্য' প্রবন্ধটি লেখার সময় : 'তোমার এই লেখাটি আধুনিক কাব্যের একটি সেরা নিদর্শনরূপে দেখা দিয়েছে।' ('চিঠিপত্র', ১১শ, ১২৩)

'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদক অমিয় চক্রবর্তীর গদ্যপদ্য যে-কোনো লেখা ছাপতে পেলে অতিমাত্রায় সুখী হতেন ঠিকই, কিন্তু সেই সুখের জন্যে সম্ভাব্য লেখককে, বিশেষত অমিয় চক্রবর্তীর মতো তাঁর প্রিয় লেখককে, তিনি 'বিরক্ত'ও করতেন ব'লে কখনো শুনিনি।

## ৯৩

Council of Post-Graduate Teaching in Arts and Science
Asutosh Building
Calcutta

শনিবার, কলিকাতা
[অক্টোবর ১৯৩৯]

Y.M.C.A.
25 Chowringhee Road.

শ্রীচরণকমলেষু,

এখন কলকাতার আবর্ত্তের মধ্যে ঘুরচি—রাজনৈতিক বিষাক্ত ধূলোর ঝড় বইচে, ব্যবসায়ীরা মানুষ-মারার যজ্ঞে কীভাবে টাকা বাড়াবে তার ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত, খবরের কাগজে ধার-করা বানানো খবর ছাপিয়ে "শত্রু"দের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের প্রভুভক্ত ভৃত্যদের উষ্মা (sic) জাগাবার উদ্যোগ চলেচে। এর মধ্যে হঠাৎ আমার বক্তৃতার সময় পড়ল : মারামারি চলচে চতুর্দ্দিকে সেই সময়ে প্রবৃত্তির চীৎকারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শান্ত য়ুরোপের কথা বলতে যাওয়া ব্যর্থ মনে হয়।[১] য়ুরোপের বড়ো বাণী আজ বেতারে জায়গা পায় না—Aldous Huxley প্রমুখ লোকেরা কী ভাবচেন লিখচেন, ওখানকার যথার্থ কবিরা বিশ্ববেদনার কোন্ রূপ কাব্যে প্রকাশ করচেন, তার খবর সম্পূর্ণ চাপা পড়েচে। এতখানি নকলতার মধ্যে দাঁড়িয়ে দুচারটে শান্ত সৌন্দর্যের কথা আধুনিক শ্রেষ্ঠ য়ুরোপের দিক থেকে বলতে চেষ্টা করলাম—অপূর্ব্ববাবু সেদিন সভাপতি হওয়াতে মনে অনেকটা জোর পেয়েছিলাম। আজিজুল হক মহাশয়ও খুব সহৃদয়তা দেখালেন আমার বক্তৃতার সময় —একদিন সভাপতি হলেন।।[২]

Statesman কাগজে এবং অন্যত্র আপনাকে সর্ব্বভারতীয় সভায় যুদ্ধ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক দায়িত্ব নিয়ে সভাপতিত্ব করবার কথা বলচে। কিন্তু আপনি মানুষের যে-ভূমিকা সামনে রেখে কথা বলেচেন তাতো আকস্মিক নয়, রাষ্ট্রিক নয়, যুদ্ধের এ-পক্ষ অপরপক্ষ নিয়ে নয়। আজ আপনার কাছ থেকে সভায় নয়, রচনার মধ্য দিয়ে আমরা ভারতবর্ষের পূর্ণতম মনুষ্যত্বের অধিকার খুঁজে পাব—এই সময়ে আপনি যদি কিছু লেখেন তাহলে আমাদের দৃষ্টি কিছুপরিমাণে স্বচ্ছ হবে, হয়তো আমরা নির্ম্মল মন নিয়ে এত বড়ো বিভীষিকা বেদনার মধ্যে দিয়ে সৎপথে এগোতে পারব।[৩]

সাহিত্যলোকে আমরা অনেকেই সাধনা করি সমস্ত সত্যকে নানাদিক থেকে দেখ্‌বার —দলীয় উন্মাদনার বাহিরে এই সাধনা। য়ুরোপীয় রাষ্ট্র বহু পাপ অন্যায় অবুদ্ধির ফলে গুরুতর সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত—উপস্থিতকালে জর্ম্মানীতেই হয়তো এই রোগের সব চেয়ে উৎকট মূর্ত্তি দেখা দিয়েচে। কিন্তু মানবপ্রেমিকের সাহিত্যিকের কাজ ফুরোয় না রুগীকে গাল দিয়ে বা তাকে মারবার চেষ্টা ক'রে—আগেকার দিনে উন্মাদকে লাঠি মারবার প্রণালী ছিল সর্ব্বত্র, এখন সকলের চেষ্টা উন্মাদের মনে এবং তার পারিপার্শ্বিকে প্রবেশ করে হেতুনির্ণয় যাতে হয়। অথচ যুদ্ধের নেশা বাড়চে—আমাদেরও নকলী নেশা কী পরিমাণে সাহিত্যিক আড্ডায়, খবর কাগজী দপ্তরে, শেয়ার-মার্কেটে এবং বীর বাঙালীর

ঘরে ঘরে গরম হয়ে উঠচে তা দেখে হতাশ্চর্য্য হতে হয়—শান্ত বিচার ক্রমে অসম্ভব হয়ে উঠচে। কংগ্রেস হঠাৎ উগ্র গলায় কিছু না ব'লে সময় নিয়েচেন এবং যেটুকু বলেচেন আদর্শের দিক থেকেই বলেচেন—এতে খুবই ভালো ফল হবে। কিন্তু বাংলায় কংগ্রেসের সংযমটুকুও নেই। কলকাতার চায়ের দোকানে গলির মোড়ে যুদ্ধের উত্তেজক খবর নিয়ে হার-জিতের বাজি চল্‌চে ; Nazi-Spy নামক একটি উৎকট ফিল্মে লোকের ভিড় দেখে ভাবি ঠিক কী জন্যে কোন মন নিয়ে তারা শত্রুতার (sic) স্বাদ ভোগ করতে ছুটচে।

ভারতবাসী বিদেশীদের অবস্থা কী এবং বিশ্বভারতীর অনুষ্ঠানের দিক থেকে কী করা ভালো সেদিন জানতে গিয়েছিলাম। Brunner-দের বরোদায় যাওয়াই ভালো এখানকার Alien Registration Deptএ তাই পরামর্শ দিলেন।[৩] অনিলবাবুকে আমি জানিয়েচি। অবশ্য এঁরা বিশেষ করেই জানালেন যে যদি ঘটনাক্রমে বিদেশী—এমন কি "শত্রু" পক্ষের বিদেশীও—শান্তিনিকেতনে এসে পড়ে তার জন্যে বিশ্বভারতীর কিছুমাত্র ক্ষতি না হয় তা এঁরা দেখবেন।

মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ সম্বন্ধ কী জটিল অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে পাপের দুর্য্যোগে তাই এখন বিশেষ ক'রে মনে হয়। যে-সব বড়ো বড়ো অন্যায় এবং ভ্রান্তির জন্যে সকলেই দায়ী তার সমস্ত ভার কোনো জাতি বা কোনো বিশেষ দুষ্ট মানুষের উপর চাপাতে সবাই ব্যস্ত। সহজ মানুষও এই বিকৃতি গ্রহণ করচে। আগে Satan-এর কল্পনা ক'রে এবং তার ঘাড়ে সকলের পাপ চাপিয়ে লোকে নিশ্চিন্ত হত। Angel-এর দলে আছি মনে ক'রে আশ্বস্ত চিত্তে ধার্ম্মিকেরা অপরাধ করত—এখন বড়ো বড়ো জাতিকে শয়তান বানিয়ে দিয়েই সৎজাতির সমস্ত দায়িত্ব মোচন হচ্চে। অথচ য়ুরোপ যে-শ্মশান তৈরি করতে বসেচে তার উদ্যোগ বহুদিন থেকে পূর্ব্বদেশ পরদেশ পরজাতি লুণ্ঠনের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলছিল। এর ভুক্তভোগী সব দেশেরই জনসাধারণ। আমার প্রণাম জানবেন।

অমিয়

---

টীকা

১ এ-চিঠি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপানো চিঠির কাগজে লেখা। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজ আধুনিক কবিদের উপর অমিয় চক্রবর্তীর কয়েকটি বক্তৃতা হ'য়ে গেলো। ৬৯-সংখ্যক চিঠিতে এই বক্তৃতামালার সম্ভাবনার কথা তিনি লিখেছিলেন। যুদ্ধের মধ্যে 'শান্ত য়ুরোপ' বলতে নিশ্চয়ই কবিতার ও শিল্পের য়ুরোপ বোঝাচ্ছে।

২ অপূর্ব্ববাবু—অপূর্বকুমার চন্দ, তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ। (স্যর) আজিজুল হক—তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

৩ উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ৩০ অক্টোবর থেকে ৫ নবেম্বর পর্যন্ত পাঁচদিন ধ'রে যুদ্ধ-সম্পর্কিত আধুনিক 'পরিস্থিতি'-র উপর অমিয় চক্রবর্তীকে একটি দীর্ঘ চিঠি লেখেন। ('চিঠিপত্র' ১১শ, ১২৪ দ্র.)। 'আমাদের অবস্থা' নামে সেটি 'প্রবাসী'-তে (অগ্রহায়ণ

১৩৪৬), এবং 'The Crisis' নামে তার অনুবাদ *Modern Review*-তে (Dec. 1939) বেরিয়েছিলো। চিঠিতে বলেছিলেন : 'এ-পক্ষেরই হোক আর ও পক্ষেরই হোক জয়কামনা করব কার। জয় যে হিংস্র শক্তির।'

৪ ব্রুনাররা মা-মেয়ে, দুজনেই হাঙ্গেরির শিল্পী, কবির আকর্ষণে শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছেছিলেন। শোনা যায় যে কাঁচা শাকসবজি আর টোম্যাটো খেয়ে সারাদিন খোয়াইতেই ছবি এঁকে, শুয়ে ব'সে দিন কেটে যেতো তাঁদের। হাঙ্গেরি হিটলারবাহিনীর অধিকারে চ'লে গেলে, শত্রুদেশের নাগরিক হিশেবে এঁরা বন্দী হবেন ভেবে শান্তিনিকেতন থেকে এঁদের নেটিভ রাজ্য বরোদায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ঐ এক সুবিধে ছিলো, নেটিভ রাজ্যে গেলে তাঁদের বন্দী হ'তে হয়নি। দুজনে এদেশেই জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন, দেশে আর কোনোদিন ফেরা হয়নি।

বুদ্ধদেব বসুর লেখা 'বিদেশিনী' (১৯৪৩) নামে দীর্ঘ গদ্য কবিতার দুঃখী নায়িকাটি কি এঁদেরই কেউ? কবিতার চেক্ মেয়ে আনা পিফ্‌নিং হয়তো সবটাই কল্পিত চরিত্র। তার ছিলো ভারতীয় প্রাচীন ভাস্কর্যে অগাধ আগ্রহ। যুদ্ধ লাগায় সে-ও আটকা পড়েছিলো এ-দেশে। বুদ্ধদেবের কবিতায় দেশীয় রাজ্যের নাম 'তম্বুরাপুর'। ব্রুনারদের মতো বিদেশীয় আরো অনেককে হয়তো এই রকম বিপদে পড়তে হয়েছিলো। হাঙ্গেরির লেখিকা Rózsa Hajnózy-র (শ্রীমতী গেরমানুস্) উপন্যাস *Fire of Bengal* বইতেও এঁদের কথা আছে। মা-মেয়ে দুজনেই ছিলেন নগ্নজীবন যাপনে বিশ্বাসী (nudist)।

## ৯৪

১৯ নভেম্বর [১৯৩৯] পুরী

শ্রীচরণকমলেষু,

এখানে ব'সে এবারকার প্রবাসীর চিঠি ইংরেজিতে পরিণত ক'রে মডার্ন রিভিয়ুর জন্যে পাঠিয়ে দিয়েচি। ইংরেজি করতে গিয়ে দেখলাম কতদূর কঠিন পরীক্ষা—তিনবার নূতন ক'রে লিখে কোনোমতে ভাবের সম্পূর্ণ রেখা রাখবার চেষ্টা করেচি। এই রচনায় আজকের বিশ্বজোড়া সমস্যার ভিতরকার কথা রয়েচে—যতবার পড়েচি গভীর ক'রে অনুভব করলাম।[১]

সেদিন কলকাতায় লর্ড বিশপ হিন্দুমুসলমান সম্বন্ধে আলোচনা করতে এসেছিলেন। পরে তাঁর কাছে আরো ভালো ক'রে জানলাম কোন দিক থেকে তিনি দেশের হয়ে আপনার কাছ থেকে উত্তর চান। দেখলাম তাঁর প্রশ্ন আমাদের সঙ্গে মেলে। অনেকদিন থেকে আমাদের জানবার ব্যাকুলতা জেগেচে হিন্দুস্থান অর্থাৎ ভারতীয় সভ্যতার সম্পূর্ণ রূপ কী—আজকের দিনে আপনার কাছে শুনব। দেখব আধুনিক মহাভারতের মানসমূর্ত্তি

যার ভিত্তি হিন্দুমুসলমান এবং অন্যান্য সম্প্রদায়কে নিয়ে। হিন্দু কথাটা আজ ছোটো অর্থে ব্যবহার হচ্ছে কিন্তু একটা কোনো কথা তো চাই যাতে ভারতীয় সভ্যতার বিশিষ্টতাকে নির্দ্দেশ করে। হিন্দুয়ানি মানি না, অথচ মুসলমানকে আপন জেনেই বলব ভারতীয় উৎকর্ষধারা বহু যুগের বহু সাধনায় প্রবহমান। মুসলমানেরা ইতিহাসের অনেকটা শেষের দিকে অর্ঘ্য এনেচেন কিন্তু আধার আগেই প্রস্তুত ছিল। সেই বড়ো ভূমিকায় আমাদের পরস্পরের যথার্থ পরিচয়—সেখানে সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ।

এই ভারতবর্ষে আমাদের থাকতে হবে। হয় আলাদা হয়ে, বেড়া তুলে, পরস্পরবিরোধী জন্তুদলের মতো—নয়তো সাম্যবিধায়ক আর্থিক সামাজিক ব্যবস্থায় মিলিত হয়ে। ফ্যাসিস্ট ব্যবস্থা মানুষকে জাতির খাঁচায় বন্দী ক'রে স্বাতন্ত্র্য এবং নির্ব্বিঘ্নতা দিতে চায়—জিন্না প্রভৃতিও তাই মানেন। পাকিস্তানের কথাটা তাই। এই নিয়ে ইকবালের সঙ্গে তর্ক করেচি। তাঁদের ধারণা হিন্দুমুসলমান কখনো এক যোগে থাকবে না যেমন বাঘ ভালুক একত্র থাকে না—ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো কেটে হিন্দুমুসলমানকে গাড়ি ক'রে চালান করতে থাকো। শান্তি হবে। পৃথিবীতে মাইনরিটি সমস্যার অন্য উত্তর সোভিয়েটেরা দিচ্চে তাদের ন্যাশনাল মাইনরিটি ব্যবস্থায় তাতার, ইহুদি, মুসলমান, খৃষ্টান ইত্যাদিকে একই সাম্যবিধানের অন্তর্গত ক'রে। একই জায়গায় পাশাপাশি থাকবে মানুষ—উৎকর্ষের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই। মিলনের ভিত্তি আর্থিক ক্ষেত্রে, সকল প্রকার শক্তির সমবেত সাধনায়। আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মকে তারা ধর্ম্ম বলে মানেনি ; মানুষের ধর্ম্মকে মেনেচে। পারমার্থিক ধর্ম্মসাধনা ব্যক্তিগত, সেখানে তো রাষ্ট্রিক বা সামাজিক কথা ওঠেই না। আমরা সোভিয়েতদের জুলুম-বিধিতে বিশ্বাস করি না—আপনি ওদের বলেছিলেন Tsarist-এর কাছ থেকে ওরা উত্তরাধিকারসূত্রে ঐ মনস্তত্ত্ব পেয়েচে—কিন্তু স্বীকার না ক'রে পারি না যে ওদের চেষ্টায় বৃহৎ মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎবিধান রয়েছে। আমাদের সংস্কৃতি এবং কল্যাণসাধনার সঙ্গে মিলিয়ে নূতন ক'রে নিয়ে বাহিরের জগতের শ্রেষ্ঠ চেষ্টাকে ভারতবর্ষে আনতে হবে।[২] মুসলমান এই ব্যবস্থায় অনেক দিক থেকে আমাদের চেয়ে এগিয়ে আছে কারণ তাদের নিজের সম্প্রদায়ে সাম্যের ভিত্তি দৃঢ়—অন্য সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ঐ নীতিকে আজ বিস্তার ক'রে দিয়ে তারা ভারতে যুক্ত হোক আমাদের সঙ্গে। হিন্দু যদি হিন্দুয়ানি ছেড়ে যথার্থ মহাভারতকে নূতন কালে দেখতে পারে তাহলে মুসলমান আর্ম্মানী চৈনিক বা অন্যের সংযোগ তাদের কাছে কঠিন ব'লে মনে হবে না যেমন মনে হয়নি প্রাচীন ভারতের নানা জাতিকে একত্র করবার সময়ে।

পৃথিবীতে আজ মহাযুদ্ধ চলচে মাইনরিটিকে নিয়ে। দুই দলের ঐ দুই পরীক্ষা উগ্রভাবেই চলচে। মধ্যে থেকে ডিমক্রাসির নাম নিয়ে আরেকটি পক্ষ দুয়ের যুদ্ধে কী লাভ করতে পারেন তার চেষ্টা দেখচেন এবং কিছু পরিমাণে জড়িয়ে পড়েচেন। ভারতবর্ষেও তাঁরা তৃতীয় পক্ষের এই একই লীলা খেলচেন। একথা বিশপ্ বলেননি কিন্তু বোধ হয় তিনি স্বীকার করবেন।

বিশপ্ এবং আমরা অনেকেই আপনার কাছ থেকে সাম্প্রদায়িকতার দ্বন্দ্ববেদনায়

আজ কিছু শুনতে চাই। প্রবাসীতে যে-ধারা চলচে তাতে এই প্রসঙ্গ এখন উঠ্‌লে বোধহয় খুবই সঙ্গত হবে।[৩]

মৈত্রেয়ী-দের সঙ্গে এখানে আজ দেখা হল—তাঁরা কদিনের জন্যে বেড়াতে এসেচেন।

এই বুধবার সকালে শান্তিনিকেতনে পৌঁছব।

আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন।

প্রণত

অমিয়

---

টীকা

১ 'চিঠিপত্র' ১১শ খণ্ডের ১২৪, বিশ্বের সাম্প্রতিক 'পরিস্থিতি' বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ চিঠি, ১৩৪৬-এর অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী'-তে যেটি 'আমাদের অবস্থা' শিরোনামে বেরিয়েছিলো। আগের চিঠির টীকা ৩ দ্র.।

২ পরপর অনেকগুলি জরুরি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে তাঁর অভিমত বলিয়ে নিতে পেরেছিলেন অমিয় চক্রবর্তী, কিন্তু সোভিয়েট পন্থায় ভারতের মাইনরিটি সমস্যার সমাধান সম্ভব কিনা এ-বিষয়ে পারলেন না, কবি নীরব থাকলেন। নাকি ৫ ও ২৭ নবেম্বরের মধ্যে এ-বিষয়ে আরো কোনো চিঠি তিনি লিখেছিলেন, যেটি পরে কোনো কারণে অদৃশ্য হয়েছে? যেমন হয়েছিলো গান্ধীজির অনশন সংক্রান্ত চিঠির বেলায়? ধরে নেওয়া ভালো, কবি কিছু লেখেননি। আগে এক চিঠিতে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন—ইতিহাসের বক্র গতি। পরবর্তী পঞ্চাশ বছরেই শোকাবহ ভাবে প্রমাণ হ'য়ে গেলো—মাইনরিটি বিষয়ে সোভিয়েট সমাধানের ভিত তেমন মজবুত ছিলো না। কিন্তু প্রশ্নটা থেকেই গেলো।

৩ 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'পত্রালাপ' নামে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রধারা।

## ৯৫

সোমবার

[ডাকছাপ ২৭.১১.৩৯]

YMCA

25 Chowringhee

কলিকাতা

শ্রীচরণেষু,

একটা ছোটো কবিতার বই ছাপাব "এক মুঠো" নাম দিয়ে—আপনার নামে উৎসর্গ করতে চাই। উল্টোরকমে লেখা কবিতা কিন্তু আমার বিশ্বাস আপনি পড়ে অসন্তুষ্ট হবেন না। নূতন পরীক্ষার পথে আপনি কখনো কাউকে নিরুৎসাহ করেননি, আধুনিকেরাও এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য। অনেক সমালোচক প্রমাণ করতে চান আধুনিক কবিতা

এখনো কোথাও পৌঁছচ্চে না বলে আপনি এর বিরুদ্ধে কিন্তু তা ঠিক নয়।[১] শনিবারের চিঠিতে অবচেতন নিয়ে বাড়াবাড়িকেই আপনি সহাস্য কবিতায় দেখিয়েচেন—কীরকম উপভোগ্য হয়েচে বলা যায় না—কিন্তু এর থেকে কেউ যদি বলে অবচেতনার রঙে একটা নূতন ধরনের রঞ্জিত কাব্যের স্থান কোথাও নেই এইটে আপনার বক্তব্য তাহলে কখনোই তা মানব না।[২] কারণ আধুনিক ইংরেজি অনেক কবিতা আপনার ভালো লেগেচে এবং তাতে মগ্নচৈতন্যের বর্ণচ্ছটা অভিনব আকারে কিছু কিছু এসে পৌঁছয়নি তা নয়। যা আপাতদৃষ্টিতে অসংলগ্ন তা কোন একান্ত অনুভূতির ঘেরে বা অদ্ভুত অভিজ্ঞতার মণ্ডলে ধরা প'ড়ে গভীরতর সামঞ্জস্য পেয়েচে তা আপনার লিপিকায় এবং অন্যত্র দেখেচি। আপনার অনেক গানে এবং ছবিতে মুক্তির অতীত চৈতন্যের খেলা আছে যার ভঙ্গী নিয়ম-মানা আর্টকে লঙ্ঘন করে নূতন রস দিয়েচে। এর পরীক্ষা নানা ভাবে চলচে কিন্তু অন্তরের গভীর সামঞ্জস্যবোধের অভাবে অনেক সময়েই তা হাস্যকর হয়ে উঠেচে তাকেই আপনি এবারকার ছবিতে এবং ছড়ায় নির্দেশ করেচেন। বাহিরের লোক এ সম্বন্ধে ভুল বুঝচে।

কলকাতা অসহ্য হয়ে উঠচে, শীঘ্রই একবার এখান থেকে আশ্রমে যেতে চাই। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন।

প্রণত

অমিয়

---

**টীকা**

১ 'একমুঠো' (১৯৩৯) অমিয় চক্রবর্তীর দ্বিতীয় কবিতার বই, 'অবচেতনের রঙে একটু নূতন ধরনে রঞ্জিত', উৎসর্গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। সংকোচ ছিলো, কেমন লাগবে কবির। কিন্তু শিল্পে সাহিত্যে অবচেতনের ক্রিয়া বিষয়ে এখন আর দ্বিধান্বিত নন কবি। নিজের চিত্রকলার রীতিপ্রকৃতি জেনে তিনি বরং এ-বিষয়ে আরো একটু আগ্রহী হ'য়ে উঠেছেন। ('চিঠিপত্র' ১১শ, ১২৫ দ্র.)

২ 'শনিবারের চিঠি'-তে (অগ্রহায়ণ ১৩৪৭) ছাপা শিরোনামহীন কবিতাটি ('গলদাচিংড়ি তিংড়িমিংড়ি') কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'ছড়া' (১৯৪১) গ্রন্থে আছে। [ভূমিকা দ্র.]

## ৯৬

রবিবার
[নবেম্বর ১৯৩৯]

২৫, চৌরঙ্গী
কলিকাতা

শ্রীচরণকমলেষু,

আপনি কলকাতায় এলে একবার যেতে চাই, নানা কারণে গভীর দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করচি। চিঠিতে চীনের খবর যা পাচ্চি তাতে স্থির থাকা যায় না, এ সময়ে গিয়ে কী হবে।[১] অথচ চীনের ছাত্র অধ্যাপকেরা একান্ত চান আমরা কেউ কেউ ভারত থেকে গিয়ে ওঁদের সঙ্গে যোগ রাখি।

সব চেয়ে দ্বন্দ্ব মনে জাগে যখন দেখি সমস্তের মধ্যে দিয়ে শান্তি গভীর চেতনায় স্পর্শ করা যায়, অথচ যে-পৃথিবীর সঙ্গে কাজের সম্বন্ধ তার মধ্যে ধ্বংসের নেশা ভয়ঙ্কর বেড়ে উঠচে। এর বাহিরে পালাতেও চাই না।

আপনি এখানে কবে আসবেন কোথায় থাকবেন এক লাইন জানতে পারলে আপনার কাছে যেতে চাই। উপরের ঠিকানায় আমি থাকব।

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই।

প্রণত
অমিয়

---

**টীকা**

১ ৬৫.৫ টীকা দ্র.

## ৯৭

৩রা মার্চ [১৯৪০]

188 Rashbehari Avenue
Ballygunje, Calcutta

শ্রীচরণকমলেষু,

সেদিন মুসলমান সভায় গিয়ে এই কাণ্ড। —খুব ভালো লাগল যে বাঙালী মুসলমান —সাহিত্যিক ছাত্র এবং সাধারণ আপিস-দোকানের কত লোক—বাংলাভাষা ছাড়তে কিছুতেই রাজি নয়। কবি ইক্‌বালের নামে সাহিত্যসভা, সেখানে আমাদের সকলের স্থান, সভাপতি জোর ক'রে রাজনীতি ঢোকাবেন।[১]

এন্ড্রুজ একটু ভালো হলেই একবার আশ্রমে যেতে চাই—নববর্ষ অবধি থাকতে বিশেষ ইচ্ছা, কারণ বহুবৎসর ঐদিনে আশ্রমে থাকিনি।

এখনো এন্ড্রুজের বিপদের অবস্থা কাটেনি।[২]

কদিন রামকৃষ্ণ মিশনের নানাজনের কাছে ঘুরলাম—বেলুড়ে এবং এখানে। ওঁদের বড়ো সভায় মায়াবতী থেকেও কর্তৃপক্ষ এসেচেন। অনেকদিন ধ'রে ওঁদের কাজের ভূমিকা বুঝতে চেয়েচি—কাজটা বড়ো অথচ ভূমিকা অনেকখানি কুসংস্কৃত অন্ধকার এ কথা বরাবরই আশ্চর্য লাগত। কিন্তু দুটোই একত্র থাকে অনেক অনুষ্ঠানে এবং ব্যক্তিগত মনে—যেমন দেখি কুমারস্বামী বিশ্বাস করেন "সতীদাহে" (এবারে *Quarterly*তেও লিখেচেন)।[৩] Edward Thompson-এর সঙ্গে সব বিষয়ে মেলে না কিন্তু কুমারস্বামীর সতীদাহে আধ্যাত্মিক উৎসাহ দেখে তিনি যে তীব্র সমালোচনা লিখেছিলেন তা খুবই ভালো লেগেছিল। বেলুড়ে আছে কালীপূজা, মূর্তিভক্তি এবং মার্কিন প্রেরণায় বিশুদ্ধহিন্দুত্ব। তা ছাড়া নারীজাতিকে ওঁরা বলেন মেয়েমানুষ—"ধর্মের" বাহিরে; অনুকম্পায় আশ্রিত। সমালোচকের নয়, সম্পূর্ণ গ্রহণের হৃদয় নিয়েই যাই, আঘাত নিয়ে ফিরি। তর্ক করতে গেলে ঔদ্ধত্য শোনায় কিন্তু আমরা তো এসব বিষয়ে চুপ করেই থেকেচি। যখন দক্ষিণ সমুদ্রতীর থেকে উত্তর হিমালয় পর্যন্ত ভারতবর্ষে আরেকবার ধর্মের নামে ধার্মিকতার ধ্বজা উঠ্‌ল, বৈজ্ঞানিক হিঁদুয়ানি, বা গর্বিত সংঘবদ্ধ স্পিরিচুয়ালিটি দেখা দিল তখন চুপ ক'রে থাকাই দোষ ব'লে মনে হয়। অথচ এসব নিয়ে তর্ক করতে গভীর অপ্রবৃত্তি হয়। বরঞ্চ হিন্দু মহাসভা ভালো—তারা ধর্মের কথা তোলে না, সোজাসুজি পোলিটিকাল লাঠি তোলে—কিন্তু এই কি ভারতের জাগরণ।

আশা করি মাছিত্বের কবিতা ঠিক সব জায়গায় পৌঁছবে। "কবিতা"য় এবারকার প্রথম রচনাটি সবাইকে চমৎকৃত করেচে।[৪]

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

অমিয়

---

**টীকা**

১ ইকবালকে অমিয় চক্রবর্তী গভীর শ্রদ্ধা করতেন। 'ইকবাল-কাব্যের নতুন প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে লিখেছিলেন: 'সম্প্রদায়ের সম্পত্তি ক'রে রেখে ইকবালকে যাঁরা বিশ্বের বাইরে রাখতে চান তাঁদের দায়িত্ববোধ ক্ষীণ বলতে হবে। কেবলমাত্র যে-কবিতাগুলি সাম্প্রদায়িকতার সমর্থক তারই ব্যাখ্যান শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু যেখানে ইকবাল মুসলমান কি হিন্দু অথবা ভারতীয় নন, তিনি এশিয়ার কবি বললেও যেখানে তাঁর মানবিকতাকে ক্ষুদ্র করা হয় তার তর্জমা কোথায়?' ('সাম্প্রতিক' গ্রন্থ দ্র.)। অনেক পরে প্রকাশিত 'ঘরে ফেরার দিন' (১৯৬১) কাব্যগ্রন্থে 'নয়ামন্দির' কবিতাটি ইকবালের 'অনুসরণে' লেখা।

২ দীনবন্ধু এন্ড্রুজ তখন কলকাতায় হাসপাতালে কঠিন রোগে শয্যাশায়ী। শেষ পর্যন্ত অস্ত্রোপচারেও কোনো ফল হয়নি। ৫ এপ্রিল (১৯৪০) তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়।

৩ দ্বিতীয় সিরিজ *Visva-Bharati Quarterly*-র ৫ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় (ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল ১৯৪০) সমকালীন ইতালীয় দার্শনিক J. Evola-র লেখা *Revolta*

*Contra il Mondo Moderno* (১৯৩৪) গ্রন্থের এক পরিচ্ছেদের অনুবাদ বেরোয়। পরিচ্ছেদের নাম "Uomo E Donna", অনুবাদক Zelta Llamos Coomarswamy। অনূদিত অংশে ভারতের সতীদাহ প্রথা বিষয়ে এই প্রশস্তি ছিলো : '**Sati** was... conceived as the supreme culmination of the relations between the sexes, the absolute relation between them on the plane of truth and superhumanly,' (sic) ( নিশ্চয়ই মুদ্রণপ্রমাদ, হবে 'Superhumanity')। এ এক আধুনিক কালের দার্শনিক 'প্রতিবিপ্লব'ই বটে। A. K. Coomarswami এই অনুবাদের সঙ্গে উপরন্তু একটি সমর্থনসূচক ছোটো ভূমিকা জুড়ে দিয়ে লিখেছিলেন যে ইতালীয় দার্শনিকের এই লেখার মধ্যে রয়েছে 'Clear and uncompromising. and we may add, poignant statement of the principles that are reflected in institutions and ideals, such as that of Sati.'

সম্পাদক অবশ্য পাদটীকায় ব'লে দিয়েছিলেন যে এই ব্যাখ্যা বিশ্বভারতীর পত্রিকা সমর্থন করে না।

৪ 'মাছিত্বে'-র কবিতা "মাছিতত্ত্ব", রচনা-তারিখ ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ভরা রসিকতা। তীরের মুখ কোন্ 'ঠিক জায়গা'-র দিকে তাক করা ছিলো বলা যায় না। ঝট ক'রে যে-নামটি অনেকেরই মনে আসতে পারে, হয়তো সেটাই ঠিক নাম। নির্মম, কিন্তু কবিতাটির সরসতা উপভোগ্য। 'প্রহাসিনী' গ্রন্থে আছে।

'কবিতা' পত্রিকার সংখ্যাটি যদি চৈত্রের হয়, তাতে ছিলো রবীন্দ্রনাথের "বিপ্লব" ('ডমরুতে নটরাজ') নামে কবিতা, পরে 'সানাই'তে গেছে। কিন্তু খবু সম্ভব সংখ্যাটি পৌষের, এতে ছাপা হয়েছিলো "রোম্যান্টিক" নামে কবিতাটি ('আমারে বলে যে ওরা রোম্যান্টিক'), এখন আছে 'নবজাতকে'।

## ৯৮

Aruni
Seaside
Puri.

April 6th. [১৯৪০]

শ্রীচরণকমলেষু,

আপনি যে-ভাবে মৃত্যুকে দেখেচেন সেই দৃষ্টি সামনে রেখে শোকের অতীত স্মিত সুন্দর সর্বদা কল্যাণময় প্রাণের মূর্তি মনে রাখতে চেষ্টা করি—সেই মূর্তি যা আমাদের কাছে সত্যকালের চিরকালের এন্ড্রুজ। কোনো ঘটনাই তাঁকে দূরে নিতে পারে না এই কথা ভাবতে চেষ্টা করি। রোগযন্ত্রণায় পরিবর্তিত চেহারা যেমন তাঁর সত্য চেহারা নয়, তেমনি অভাবের শূন্যতায় তাঁর হারানো কর্মও আমাদের কল্পনামাত্র—যে-কর্মের শুদ্ধতা তিনি সামনে রেখেছিলেন তার ক্রিয়া চলবে। এই কথা ভাবতে চেষ্টা করি কিন্তু মৃত্যুর ঘটনা, বারেবারেই মহান মৃত্যুর স্বরূপকে ঢেকে দেয়।

Operation-এর পূর্বাহ্নে তিনি বারংবার বলেছিলেন—আমি প্রস্তুত, কোনো সংশয়, কোনো দ্বিধা নেই আমার মনে। হঠাৎ আশ্চর্য শক্তি এসেছিল তাঁর মধ্যে—সচরাচর মৃত্যু বা শারীরিক বেদনার প্রসঙ্গে তাঁকে কাতর হতেই দেখেচি। সেই শক্তির শ্রান্ত ক্ষণে বারেবারে তিনি আপনার নাম করেচেন এবং বলেচেন এই দান আপনার কাছ থেকে তিনি পেয়েচেন ভারতবর্ষে, যা পেয়ে প্রথম তাঁর জীবন একেবারে বদলে গেল। অতি সহজ ক'রে এই কথা তিনি বলেছিলেন। বলতে গিয়ে আমি সে-ভাষা রাখতে পারি না। যদি মৃত্যু ঘটে তাহলে যেন তাঁর শেষ মনোভাব আপনাকে জানাই এই তাঁর ইচ্ছা ছিল—তাঁর ইচ্ছামতো ছোট কয়েকলাইন কাগজে দিয়েচি, Operation-এর আগে লিখে নিয়েছিলাম, তিনি বল্‌ছিলেন।[১]

অসামান্য সেবা করেচে নার্স্ এবং একটি নবাগত হিন্দুস্থানী বেয়ারা। যে-ভালোবাসার শক্তিতে সর্বত্র সেবার ইচ্ছা জাগিয়েচেন তাই আজ মনে পড়ে—কত দেশে অদৃশ্য প্রচ্ছন্নভাবে তার ক্ষুদ্র বৃহৎ ক্রিয়া চলবে।

দেশের এবং জাতির কী দায়িত্ব তা জানি না, মনে মনে যে ছোট একটি সৌরভময় দিগন্ত রচনা করে গেছেন তার মাধুর্য জীবনে রাখতে চাই চিরদিন। অকৃত্রিম কল্যাণকারী বন্ধুত্বের সেই দান। অনেক সময়ে মনে হয় এত বড়ো মহার্ঘ জিনিস রাখবার মতো জায়গা কোথায়।

১২ই এপ্রিল রাত্রে আশ্রমে পৌঁছব। সে কদিন সমুদ্রের তীরে এখানে শান্তি পাব —কলকাতা অসহ্য হয়ে উঠল। আশা করি রথীবাবু প্রতিমা দেবী ভালো আছেন, আপনার শরীর ভালো আছে।

আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

অমিয়

---

**টীকা**

১ দীনবন্ধু এন্ড্রুজের মৃত্যুতে (৫ এপ্রিল ১৯৪০) শান্তিনিকেতন মন্দিরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : 'Here in Visva-Bharati, where I have laid the foundation for a world fellowship. it was my privilege to have him as a worker for the cause. That he loved India was the least part of his greatness. He was truely great beacuse he loved humanity. Although we cannot but feel a personal loss involved by his death. we must not lose sight of the fact that his loss is as much to the world as to our asrama.' (রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বাংলায় বলেছিলেন, অনুবাদ অন্য কারো করা।)

দ্বিতীয় অস্ত্রোপচারের পূর্বে এন্ড্রুজের যে-বার্তা রবীন্দ্রনাথের জন্যে অমিয় চক্রবর্তী লিখে নেন তাতে ছিলো : 'Everyday I have been praying the prayer: Thy will Be Done. I have been wonderfully helped in thus keeping **Shanti** by thoughts of Gurudeva and all I have learnt at Santiniketan ; also by Mahatma Gandhi and What I have learnt from him all these past years.' (৩০.৩.৪০)।

## ৯৯

২৫ মে [১৯৪০]

As from
Aruni, Seaside, Puri

শ্রীচরণকমলেষু,

Gwyer কী সুন্দর চিঠি লিখেচেন—এই সঙ্গে পাঠাই। শান্তিনিকেতনে হবে এবং Latin ও সংস্কৃত ব্যবহার হবে এতে তিনি মহা উৎসাহিত। আপনি ইংরেজিতেও বলবেন জেনে তিনি বিশেষ আনন্দিত হয়েচেন। এবং পরিশেষে নিজেও ইংরেজিতে আপনার উত্তরে কিছু বলবার অনুমতি চেয়েছেন। আপনি ইংরেজিতে যা বলবেন তার উপস্থিত মতো খসড়ার এক কপি তাঁকে পাঠিয়ে দিতে পারি। তিনি এখন থেকেই নিজের বক্তব্য লিখে ফেলতে পারবেন।[১]

সমস্ত ব্যাপারটি সুন্দর এবং গম্ভীরভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারবে—বাহিরের লোকের ভিড় তো কেউই চান না। আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষদের নিয়ে মন্ত্র এবং অনুষ্ঠানযোগে যে-ভাবে আপনি করতে চেয়েচেন তাতে জিনিষটা সম্পূর্ণ নূতন এবং স্মরণীয় হবে।

যুদ্ধের এই মরণ-বাঁচনের দিনে মৈত্রীর গভীর নিদর্শনের কথায় Gwyer বিচলিত হয়েচেন। ইংলণ্ডে আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কা ; ভাবাই যায় না এ কীরকম ব্যাপার।

আজ পুরী যাচ্চি— এখানে এখনো ঠিক হতে দেরি আছে। আমাকে তোঁ মুখে খুবই আশ্বাস দিচ্চেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত না দেখে বিশ্বাস নেই। মধ্যে মধ্যে বোধ হয় এখানে যাওয়া আসা করতে হবে।[২]

মৃচ্ছকটিকের বোম্বাই সংস্করণ উৎকৃষ্ট, কিন্তু এখন পাওয়া যাচ্চে না। Ryder-এর পাঠ মিলিয়ে সেটি প্রস্তুত করা হয়েছিল। —দেখি যদি জোগাড় করতে পারি।[৩]

যামিনীবাবুর চিত্রকলা বিষয়ে আপনি আমাকে লিখবেন বলেছিলেন—এই প্রসঙ্গে শিল্পে কোন্‌খানে যথার্থ নূতন পথের সন্ধান এবং tradition মিলিত হয় সেই কথা জানতে ইচ্ছে করে। আজকাল শিল্পে এবং সাহিত্যে "experimentation"-এর নেশা তার মূল উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে দেয়— Science এসে পড়ে। যেমন য়ুরোপীয় abstract art। কিন্তু সরস নূতন ভঙ্গীর কথাই আলাদা।[৪]

আমার প্রণাম জানবেন আর রথীবাবু প্রতিমাদেবীকে নমস্কার দেবেন।

প্রণত
অমিয়

---

টীকা

১ ইতিমধ্যে একটা বড়ো ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় স্থির করেছেন যে তাঁদের চিরাগত রীতি লঙ্ঘন ক'রে, দেশের বাইরে গিয়ে, তাঁদের প্রতিনিধির হাত দিয়ে, কবিকে তাঁরা সম্মানসূচক ডিগ্রিতে ভূষিত করবেন। প্রতিনিধিত্ব করবেন অক্সফোর্ডের বিশিষ্ট স্নাতক, তখনকার ভারতবর্ষের প্রধান

বিচারপতি স্যর মরিস গয়্যার। আটাশ বছর আগে কবি ইয়েট্‌স প্রস্তাব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে English Academy-র সদস্যপদের সম্মান দেবার জন্যে। হয়নি। Fox Srangways অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কবিকে ডি. লিট. খেতাব দিয়ে সম্মান জানানোর প্রস্তাব করেছিলেন। লর্ড কার্জন ও কবি রবার্ট ব্রিজেস বিরোধিতা করায় হ'তে পারেনি। অক্সফোর্ড এবার সেই ত্রুটি সংশোধন করতে চান। ব্যবস্থার কোনো খুঁত রাখতে চাইছিলেন না এঁরা। এ-রকমের অনুষ্ঠানে ঠিক যে-ধরনের গাউন আর টুপি ব্যবহারের চলন আছে, মহাযুদ্ধজনিত বিভ্রাটের মধ্যেও সেই গাউন আর টুপি দ্রুতগামী যুদ্ধের-ডাকের জাহাজে এনে সময়মতো শান্তিনিকেতনে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিলো। অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিপর্বে স্যর মরিস প্রতিটি বিষয় দীর্ঘ-দীর্ঘ চিঠিতে অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে আলোচনা ক'রে নিচ্ছিলেন। এসব চিঠি আছে রবীন্দ্রভবনে। ল্যাটিন ভাষায় নিজের দখলের উপর আস্থা রাখতে পারছিলেন না ব'লে শেষে তিনি ল্যাটিনে অধিক ব্যুৎপন্ন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি (A.G.R.) Henderson-কে ঘোষকের কাজ করতে অনুরোধ করেন। তিনিও ছিলেন অক্সফোর্ডের স্নাতক। ৭ অগস্ট তারিখে শান্তিনিকেতনের সিংহসদনে এই অনুষ্ঠান করা হয়। ল্যাটিনে ঘোষণার পর কবি তাঁর প্রতিভাষণ পাঠ করেন সংস্কৃত ভাষায়। [ভূমিকা দ্র.]

অমিয় চক্রবর্তীর এ-চিঠিতে অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিপর্বের উল্লেখ রয়েছে।

২ 'এখানে'—অর্থাৎ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদপ্রাপ্তির ব্যাপারে।

৩ সংস্কৃত নাটক 'মৃচ্ছকটিক'-এর কী প্রয়োজন হয়েছিলো জানা যায় না কিন্তু বই পেয়েই রবীন্দ্রনাথ লিখে জানিয়েছিলেন: 'এই নাটকে বাস্তবতা আছে কিন্তু বিশ্বাসজনক নাট্যিক অভিব্যক্তি এবং বাঁধন নেই। লেখনী চাষ করচে না আঁচড় কাটচে। ... যা হোক ভালো ক'রে প'ড়ে দেখব।' ('চিঠিপত্র' ১১শ, ১২৭ দ্র.)।

৪ শান্তিনিকেতনে কলাভবনের শিল্পসংগ্রহটি বিরাট, বিশাল। স্থায়ী বড়ো গ্যালারি না-থাকায় সব রকম কাজের নিদর্শন ভালোভাবে প্রদর্শিত হ'তে পারে না। শুনেছি, এই বিপুল বৈভবের মধ্যে যামিনী রায়ের আঁকা কোনো ছবি নেই। আশা করি ভুল শুনেছি। তাঁর আঁকা একটি ছবি অবশ্য আছে রবীন্দ্রভবনে, যার বিষয় রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির সাক্ষাৎকার, ঠিক যামিনী রায় ঘরানার যোগ্য প্রতিনিধিত্ব করে না ছবিটি। অমিয় চক্রবর্তী নিজে যামিনী রায়ের ছবির খুবই সমাদর করতেন। তাই তাঁর নিতান্ত ইচ্ছা ছিলো যে এই যথার্থ 'নূতন ভঙ্গী'-র ছবি বিষয়ে চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ দু কথা লেখেন। কবি সাড়া দেননি। পরে অবশ্য গভীর অনুরাগে ভরা দুটি আশ্চর্য চিঠি যামিনী রায়কে কবি লিখেছিলেন, কিন্তু সে অন্য উপলক্ষে, অমিয় চক্রবর্তীর নির্বন্ধে নয়, এবং যামিনী রায়ের ছবি বিষয়েও নয়।

YMCA
25 Chowringhee
Calcutta

বুধবার
[১৯৪০,
২০ জুনের পর]

শ্রীচরণকমলেষু,

এইমাত্র আপনার চিঠিখানি পেলাম—কাল Millikanকে[১] নিয়ে আপনার ওখানে যাবার উদ্যোগ করছিলাম কিন্তু আগ্রার আকাশে ঠিক এখন Cosmic Ray-র কী এক খোঁজ পাবার সম্ভাবনা তাই শেষ পর্যন্ত উনি সেই উদ্দেশেই তাড়াতাড়ি দৌড় দিলেন। আমেরিকা থেকে এসেচেন যুদ্ধঝড় রাজনীতি উপেক্ষা ক'রে সমুদ্র পেরিয়ে—মাদ্রাজ, পেশোয়ার এবং আগ্রায় Cosmic Ray দেখ্‌বার যোগ্য "Critical attitude"-এর খোঁজ পেয়ে। ওঁর বক্তৃতা শুনে চমৎকৃত হয়েচি— কী সুন্দর ক'রে বোঝালেন সৃষ্টিকাণ্ডের নূতন আবিষ্কৃত একটি দিক। মনে হচ্ছিল নক্ষত্রলোকের আলোক এসে পড়েচে কলকাতার গলির সভায়—সত্যসত্যই যে বিশ্বমণ্ডলের কোনো অজানিত কেন্দ্র হতে সর্বক্ষণ এই পরম তেজ সর্বত্র এসে পৌঁছচ্চে এবং ধ্বংসকে আবার মিলিয়ে তুলচে সেই কথাই তিনি বোঝাচ্ছিলেন। তাঁর একটি বক্তৃতার সারাংশ পাঠালাম।[২]

আপনার সেই দুটি চিঠি পাঠালাম—এই আমার বিশেষ সম্পত্তি আমি অক্ষত আকারে সুবীরবাবুর কাছ থেকে ফেরত চাই। সশরীরে আদায় ক'রে নেব।

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

অমিয়

---

**টীকা**

১ পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কারে (১৯২৩) সম্মানিত মার্কিনী বিজ্ঞানী Robert A. Millikan (১৮৬৮-১৯৫৩) ছিলেন ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটুট অব টেকনোলজি-র (পাসাডেনা) নর্মান্ ব্রিজ পদার্থবিদ্যা গবেষণাগারের ডিরেক্টর। গবেষণার মূল বিষয় ছিলো মহাজাগতিক রশ্মি বা Cosmic Ray। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে আছে *The Electrons* (১৯৩৫) ও *Time, Matter and Values* (১৯৩২)।

নক্ষত্রলোক বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতো অমিয় চক্রবর্তীরও অশেষ কৌতূহল ছিলো। বর্তমান লেখককে এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন : 'আমরা রবীন্দ্রনাথের সহযোগী এবং তাঁর পরবর্তীকালের বাসিন্দারূপে তাঁর তিলতম শক্তি না নিয়েই যৌগিক বিজ্ঞান ও যৌগিক ধ্যানের একটা ব্যক্তিগত সম্বন্ধ জীবনে অনুভব করি —হয়তো এটা গভীরতর চিন্তার অভাব এবং সভ্যতার দূরস্পর্শী দায়িত্ব থেকে পলায়নী বৃত্তি প্রসূত। ...তারাকে কিছু চিনেছি জ্যোতির্লোকের মানচিত্র দেখে—তখনো ক্যালিফোর্নিয়ার Palomar-এ টেলিস্কোপে তারাগুলিকে চঞ্চল অত্যুজ্জ্বল বৃহৎ গোলকের আকারে দেখিনি কিন্তু ধারণায় সেই ভাব কিছু এসেছে শৈশবমনে। কিছুই

যে অবিধৃত উচ্ছৃঙ্খল নয়, ব্যতিক্রমের মধ্যে যথার্থের বিভা রয়েছে এই ছিলো আমার বিজ্ঞান, আমার কবিতার ইন্ধন।'

২ এই সারাংশ চিঠির সংগ্রহে নেই।

'চিঠি দুটি', মনে হয়, ১৯৪০-এর মে এবং ২০ জুন তারিখে লেখা। ('চিঠিপত্র' ১১শ, ১২৭ ও ১২৯ দ্র.)। এই চিঠি দুটির কথাই ২৩ জুন তারিখে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ : 'অমিয়, শেষ চিঠি দুটো তোমাকে যা লিখেছিলুম, অনিল কপি ক'রে প্রবাসীতে পাঠিয়েছে। সে দুটো ছাপবার যোগ্য কিনা আমার সন্দেহ আছে। তোমারও যদি সন্দেহ থাকে তাহলে ছাপতে নিষেধ করে দিয়ো।' দুটো চিঠিই কালিম্পঙ থেকে লেখা। প্রথম চিঠিটি ১৩৪৭-এর আষাঢ়ের 'প্রবাসী'-তে বেরোয়, 'পত্রালাপ' সিরিজে ('চেষ্টা করে দেখচি ইতিহাসে পরে পরে দুটো দারুণ যুদ্ধের তাৎপর্য বুঝে দেখতে')। শ্রাবণ সংখ্যায় বেরোয় য়ুরোপের মহাযুদ্ধ বিষয়ে দ্বিতীয় চিঠিটি, 'দস্তুর সভ্যতা' নামে ('বহুদিন থেকে এদের কারো বা সামনের দিকে প্রকাশ্যে কারো বা কসের দিকে গোপনে দাঁতগুলো কী অস্বাভাবিক রকম বেড়ে চলছিল। আজকের দিনে বড় করে বদন ব্যাদান করতেই ভীষণ ভাবে সেটা প্রকাশ পেল।' এই দাঁতের চিত্রকল্প এই সময়কার কোনো-কোনো কবিতাতেও দেখা যায়।

## ১০১

[১৫ জুনের পর, ১৯৪০]

Aruni
Seaside, Puri

শ্রীচরণকমলেষু,

Roosevelt-কে পাঠানো আপনার কথাগুলি প'ড়ে মনে ধাক্‌কা লাগল, নানাদেশের লোক শক্তি পাবে, আশা করি আমেরিকার লোক যথার্থ দায়িত্ব নিতে নাম্‌বে।[১] য়ুরোপে শান্তি এবং সুবিচার অনিবার্য করবার শক্তি তাদের যথেষ্ট আছে—যুদ্ধে হানাহানি ক'রে সে-শক্তির প্রয়োগ নেই কিন্তু ভীত এবং উগ্র শত্রুপক্ষদের তারা শান্তিব্যবস্থার কক্ষে যোগ দিতে বাধ্য করতে পারে। বাধ্য করতে পারে যদি সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গেও আমেরিকা মৈত্রী এবং পরামর্শ করতে রাজি হয়। নরহত্যায় নেমে বীর্য দেখাতে গেলে পাপেরই ঘূর্ণাবর্ত বাড়বে এবং ফলও অবশ্যই হবে না। আমেরিকা যুদ্ধে জড়ালে ওদিকে জাপান ও সোভিয়েটের জটিল বিরুদ্ধতা এবং সুবিধের পথ খুল্‌বে। খুনের স্রোত ফুল্‌বে। আপনার আহ্বান যুদ্ধের আহ্বান নয়, পাপপ্রলয় থামাবার জন্য প্রকৃষ্ট বুদ্ধিকে আহ্বান —এই বুঝেচি।

বিশ্বের অনিবার্য নিয়মবিধির দেয়ালে মাথা ঠুকলে ব্যক্তি এবং জাতি রেগে ওঠে। কার্যকারণ সংঘ ফল মাঝ-রাস্তায় প্রার্থনা এবং আর্তনাদে থামাবার চেষ্টা করি।

পাপপরিণামের সমস্ত ব্যবস্থা পাকা ক'রে এবং সেই পাপের চক্রান্তে চাতুরী দেখাতে দেখাতে বলি প্রতিক্রিয়া যেন না ঘটে—আমার বোমাটাই শত্রুর মাথা ফাটাক, তাদের বোমাগুলো আটকে যাক দামী টুপিতে। জয় হোক ভগবানের।

প্রশ্ন জাগেই। পুরোনো অভ্যস্ত অন্যায়ের স্তূপকে নূতন উগ্র ভীষণ অন্যায়-ঝড়ে উড়োনো পুড়োনোর ব্যবস্থা দেখলে মনে হয় এরকম উপায়ে প্রতিকার কেন? প্রকৃতির পাড়ায় ঝড়ে-বজ্রে এই ব্যাপার আছে, জন্তুদের মধ্যেও ;—মানুষের সংসারে এরকম আঙ্কিক, অবেদন, অমোঘ, ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া মন মানতে চায় না। মানুষ যে প্রকৃতি এবং জৈবিক রাজ্যেও জড়িত এবং সমস্ত বিধানের সঙ্গে আত্মিক সত্যকে জেনে এবং জয়ী ক'রেই তার মুক্তি সম্ভব তা মানতে গেলে সাধনার দরকার। *Nationalism* বইয়ে এই কথাই বলেছিলেন। রাজ্য-সাম্রাজ্যস্ফীত বাক্যবিলাসী জাতেরা যদি সহজে ছাড়া পেত তাহলে ভগবানে অশ্রদ্ধা করতাম অথবা গির্জের ঘণ্টা বাঁচাতাম (sic) ধর্মের জন্যে নয়, মিলিটবিব আদেশে। পাপব্যবসায়ের ক্ষেত্র অনাক্রান্ত এবং নিরাপদ হয়ে থাকলেই জগৎব্যাপার প্রতিকারহীন অন্যায়ের আড়ত হত—কোনো আশা থাকত না। বর্বর অন্যায় দিয়ে বর্বর অন্যায়কে কতকাংশে ঠেকানো, এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার স্রোতকে অন্ততপক্ষে সচল এবং পরিবর্তনশীল করবার বিধি ভালো লাগে না, কিন্তু এতে তবু মনে আশা হয় মানুষ ঠেকে শিখবে। দেখা যায় ঠেকেও শিখতে চায় না, মরণ অবস্থাতেও পরের সম্পত্তি দাঁতে আটকে রাখে হন্যে রাষ্ট্রগুলি। এই অবস্থায় আমেরিকার মতো অপেক্ষাকৃত অনাসক্ত জাতি কিছু কাজ করতে পারে। কেবল খুনোখুনির অস্ত্র জুগিয়ে বা ব্যবসা ক'রে, বা নিজেরাও শ্মশানমত্তদের দলে নেমে মুণ্ডপাতের ব্রত নিয়ে নয়, ঠেকে-শেখা দৃষ্টি এবং শক্তি নিয়ে।

কী আশ্চর্য কবিতা হয়েচে এবারকার প্রবাসীতে "অভিশাপ"। যাদের আপনি ডাকচেন তারা হত্যাচতুর নয় তারা তপস্বী, মুক্তিকামী। Roosevelt-কে পাঠানো message যদি কোনো লোক ভুল বোঝে তা হলে তার এই কবিতা পড়া দরকার—

বীভৎস তাণ্ডবে
এ পাপ-যুগের অন্ত হবে,
মানব তপস্বী-বেশে,
চিতাভস্ম-শয্যাতলে এসে
নবসৃষ্টি ধ্যানের আসনে
  স্থান লবে নিরাসক্ত মনে।[২]

এখানে নবজাতকের ডাক ; মেশিন-গান ডাকচে না মেশিন-গান চালককে—

আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান।।

জর্মনীকে এবং অন্যকেও হারানোর মন্ত্র এইখানে।

একটা প্রশ্ন করতে চাই। সমষ্টিগত ভূমিকায় দুঃখের তত্ত্বকে বুঝি কিন্তু সেই তো সব নয়। মানুষ তো শুধু সমষ্টির একজন নয়। নির্দোষ অসহায় ব্যক্তিগত আমি-তুমির

দল, যারা পিষ্ট হচ্চে, যাদের ক্ষেত পুড়চে, যারা ক্ষেত পোড়াতে বাধ্য হয়ে মরচে, তাদের বেদনা কোন আকাশে পৌঁছয়। তারা তো জানল না কী জন্যে দুঃখ, সব দেশেরই তারা, কোনো পক্ষেরই দোষ তাদের লাগেনি। হার-জিত-এর মধ্যে তারা নেই— তাদের সব দেশেই হার কারণ যুদ্ধ ব্যাপারটাই প্রকাণ্ড হার। কোন বিধাতা গ্রহণ করচেন তাদের কান্না।

প্রকাণ্ড আকাশ জুড়ে ভাগ্য পরিবর্তনের পালা মনে হচ্চে যেন সাম্নের সমুদ্রের উপর আজ অপরাহ্ণের ঐ ঘনায়মান ঝড়। একে মানতে রাজি আছি কিন্তু কোথাও শুনতে চাই ঘরের মঙ্গল শঙ্খ।

আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

আশীর্বাদাকাঙ্ক্ষী

অমিয়

---

**টীকা**

১ এই চিঠি লেখার সময়েও য়ুরোপের যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধ হ'য়ে ওঠেনি, আমেরিকা তখনো সে-যুদ্ধ থেকে দূরে ছিলো। প্যারিসের পতনের পর মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ বিষয়ে বিষম উদ্বিগ্ন হ'য়ে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে একটি ব্যাকুল তারবার্তা পাঠান, কালিম্পঙ থেকে, ১৯৪০-এর ১৫ জুন। বার্তায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে 'last refuge of the spiritual man' হিশেবে বর্ণনা ক'রে আসন্ন সর্বনাশ থেকে বিশ্বকে বাঁচাবার জন্যে সে-দেশের মহামান্য রাষ্ট্রীয় প্রধানের কাছে আবেদন করা হয় : '...All our individual problems of politics today have merged into one supreme world politics which, I believe, is seeking the help of the United States of America as the last refuge of the spiritual man, and these few lines of mine merely convey my hope, even if unnecessary, that she will not fail in her mission to stand against this universal disaster that appears so imminent.' মানবজাতির ভরসাস্থলের প্রেসিডেন্ট এই বার্তার এমন-কি প্রাপ্তি সংবাদও দেননি। (এর বছর খানেক আগে গান্ধীজিও আবোটাবাদ থেকে, 'Dear Friend' সম্বোধন ক'রে লেখা এক চিঠিতে, পৃথিবীতে বর্বরযুগ ফিরিয়ে না-আনার জন্যে স্বয়ং হিটলারের কাছে আবেদন করেছিলেন : '...It is quite clear that you are today the one person in the world who can prevent a war which may reduce humanity to the savage state. Must you pay that price for an object however worthy it may appear to you to be? Will you listen to the appeal of one who has deliberately shunned the method of war not without considerable success? Any way I anticipate your forgiveness, if I have erred in writing to you'। ভারত সরকার সে-চিঠিকে অবশ্য আবোটাবাদ থেকে বেশি দূর অগ্রসর হ'তে দেননি। যদি দিতেন, তাহ'লেও কি হিটলার মহামান্য রুজভেল্টের চাইতে ভিন্ন ব্যবহার করতেন?)

অমিয় চক্রবর্তীর আশঙ্কা ছিলো যুক্তরাষ্ট্রের কাছে প্রেরিত কবির বার্তাকে হয়তো গণ্য করা হবে যুদ্ধকে, আমেরিকার সহায়তায়, আরো ব্যাপক ক'রে তোলার

আহ্বান ব'লে। 'প্রতিকারহীন অন্যায়ের আড়ত' সাম্রাজ্য শোষকের দল বিনা শাস্তিতে 'সহজে ছাড়া পেয়ে যাক'—এই সম্ভাবনার কথাও তিনি স্বীকার করতে পারছিলেন না। এ-বিষয়ে কবির সঙ্গে তাঁর মতের অনৈক্য আগেও এক চিঠিতে প্রকাশ পেয়েছে।

২ কালিম্পঙে লেখা "অভিশাপ" ('রক্তমাখা দন্তপঙ্‌ক্তি হিংস্র সভ্যতার') কবিতাটি ১৩৪৭-এর আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী'-তে বেরিয়েছিলো। পরে যায় 'জন্মদিনে' (১৯৪১) কাব্যগ্রন্থে, যেখানে কবিতাটির শিরোনাম নেই, সংখ্যা আছে—২১।

## ১০২

July 27 [১৯৪০]

YMCA
25 Chowringhee
Calcutta

শ্রীচরণকমলেষু,

বাংলাদেশ ছেড়ে চল্‌লাম—এখানে যে-ভাবে দিন কেটেচে, যেরকম ব্যবহার পেয়েচি তাতে আর থাকা সম্ভব নয়। এঁরা বারেবারে আশ্বাস দিয়েচেন, বসিয়ে রেখেচেন, অথচ যেমন ক'রে হোক্ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ হতে আমাকে বঞ্চিত করার বহুব্যাপী চেষ্টা চলেচে। আজ নির্বাচন সমিতির আরেকটা সভা হয়েছিল—শেষটায় আমাকে নিতে হয় এই ভয়ে কাউকেই নির্বাচন করা হল না।[১]

এর পিছনে অনেক কাহিনী আছে যেসব ভুলতেই চাই। এখানে অসম্মানে অনাহারে থাকতে হত তার চেয়ে উত্তর ভারতে জায়গা খুঁজে নেব। সেখানে আমার প্রতিষ্ঠা হয়েচে, আমাকে তারা নেবে।

চিরদিনের মতো বাংলার বাহিরে কাজ নিয়ে বসতে হবে এর বেদনা চাপ্‌তে পারি না। কিন্তু অভিমান ক'রে ফল নেই। হয়তো নির্বাসনের হাওয়ায় আরো ভালো কাজ করতে পারব।

এ চিঠি ছিঁড়ে ফেলবেন—আমি কাউকেই কিছু জানাব না। ৭ই আগস্ট শ্যামাপ্রসাদবাবু রাধাকৃষ্ণ ওখানে যাবেন তাঁদের সঙ্গে হয়তো আপনার কথা হবে। ঐ সময়ে আশ্রমে থাক্‌তে পারলাম না এ দুঃখ রয়ে গেল ; উৎসব দেখ্‌তে কতদূর উৎসুক ছিলাম। সংসারে নিজের জায়গা খুঁজে পেলে আবার লিখব।

ইতিমধ্যে Gwyer-এর চিঠি এলেই হৈমন্তী পাঠিয়ে দেবে।

আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

আশীর্বাদাকাঙ্ক্ষী
প্রণত
অমিয়

টীকা

১ অতি অপ্রত্যাশিত এই চিঠি। অক্সফোর্ডের বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানের তখন মাত্রই কয়েকদিন বাকি। তার প্রস্তুতিপর্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন অমিয় চক্রবর্তী। আকস্মিক যে-ঘটনার চাপে অনুষ্ঠানে তিনি থাকবেন না ব'লে স্থির করেছেন সেটা জেনে খুবই ক্লিষ্ট হয়েছিলেন কবি। (ভূমিকা দ্র.)

## ১০৩

২৮ সেপ্টেম্বর [১৯৪০]

"Aruni"
Seaside
Puri

শ্রীচরণকমলেষু,

সুধীন দত্তের কাছে কপি ক'রে পাঠিয়ে দিলাম—নীল সোনালি আর বেগ্‌নি সূতোর ছোটো কবিতাটি, কালিম্পঙের ফ্রেমে বাঁধানো। পরিপূর্ণ একটি আকাশ শরতের মাধুর্যে ভরা— জানি না সুর বাদেও গানের সুর কথায় কেমন ক'রে ধরা পড়ে।[১]

এই সময়ে "পত্রালাপের" আরেকটি চিঠির দাবী জানাতে বাধে কিন্তু যামিনী রায় বারেবারে স্মরণ করিয়ে দিচ্চেন। তাঁর ছবির দৃষ্টি সম্বন্ধে আপনার দু'চারটে কথা বেরোলে তিনি ধন্য হন। "Sophisticated" আর "naive" কথা দুটোর বাংলা জানি না কিন্তু ওঁর অদ্ভুত রং আর অদ্ভুত রেখার চ্যাপ্‌টা ছবিতে দু-ই মিলেচে মনে হয়। পাকা হাত এবং অভিজ্ঞ মন অথচ দৃষ্টিতে ছোটো ছেলের, আদিম মানুষের প্রাথমিক বিস্ময় রয়েচে। "পত্রালাপ" বই হয়ে বেরোবার আগে শিল্প এবং সাহিত্যের প্রসঙ্গ আরো কিছু জমা হলে আশ্চর্য বিচিত্র বই হয়[২] —স্বার্থের দিক থেকে আমি বলচি। তা ছাড়া যামিনীবাবুর সঙ্গে আধুনিক কারো ঠিক মেলে না, ওঁর কী একটা নিজস্ব ভঙ্গী আছে তার সাধনায় উনি মরতে প্রস্তুত।

"ছেলেবেলা"র তর্জমা Miss Sykes সত্যই খুব ভালো করেচেন।[৩] তিনি মাদ্রাজ যাবার পথে একদিনের জন্যে আমাদের এখানে আসচেন। কালিম্পঙ যেতে চাই কিন্তু ইতিমধ্যে পাঞ্জাবে একটা কাজের জন্যে লিখেচি— হঠাৎ এখন তারা interviewএর জন্যে ডেকে পাঠাবে। ফাঁড়াটা কেটে গেলে ঠিক জানব কোথায় আছি।[৪]

এতদিনে Oxford থেকে খবর পাচ্চি— আপনাকে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করতে পেরে তারা কতদূর আনন্দিত আর উৎসাহিত হয়েচে তা এই চিঠি থেকে বুঝতে পারা যায়। এইবার আরো একটি ইংরেজি বই আপনার ওদেশে বেরোলে খুব ভালো হত ; হয়তো প্রবন্ধ, কিছু কবিতার তর্জমা, ভ্রমণচিত্র এই দিয়ে ছোটো Journal-

এর মতো বই— যাতে আধুনিক কালের ভূমিকা রয়ে গেছে। অনেকদিন কোনো বই বেরোয়নি।

আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন।

প্রণত
অমিয়

---

টীকা

১ অমিয় চক্রবর্তী সুধীন (সুধীন্দ্রনাথ) দত্তর কাছে কপি ক'রে পাঠিয়েছিলেন কালিম্পঙে লেখা রবীন্দ্রনাথের কবিতা— 'পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে', পরে যেটি 'জন্মদিনে' গ্রন্থের ১৪-সংখ্যক কবিতা হয়।
কবির শরীর একেবারেই ভালো যাচ্ছিলো না। বিধান রায় আশঙ্কা করেছিলেন 'হঠাৎ একটা অপঘাত ঘটতে পারে।' তবু জোর ক'রে কবি কালিম্পঙে চ'লে যান ১৯ সেপ্টেম্বর। ২৫ সেপ্টেম্বর সেখানে থেকে আশ্চর্য সুন্দর এই কবিতাটি অমিয় চক্রবর্তীকে পাঠিয়ে 'পরিচয়' সম্পাদককে কপি দিতে বলেছিলেন। ঠিক তার পরদিনই বিধান রায়ের আশঙ্কা সত্যি হ'লো, কালিম্পঙে কবি হঠাৎ অচৈতন্য হ'য়ে পড়লেন। পুরীতে ছিলেন ব'লে ২৮ সেপ্টেম্বর অবধি অমিয় চক্রবর্তী জানতে পারেননি। ২৯ তারিখে পাহাড় থেকে নামিয়ে কবিকে কলকাতায় আনা হয়। প্রায় একমাস পরে চেতনা ফিরলে রোগশয্যায় শুয়েই আবার কবিতা লিখতে শুরু করেন। শান্তিনিকেতনে নেওয়া হয় ১৮ নবেম্বর। অসামান্য এক প্রাণশক্তিও ক্রমে নিঃশেষ হ'য়ে আসছিলো।

২ পীড়ার সংবাদ জানতেন না ব'লে 'প্রবাসী'-র 'পত্রালাপ' সিরিজে যামিনী রায় বিষয়ে লেখার জন্যে অমিয় চক্রবর্তী আবার অনুরোধ করছেন কবিকে। 'পত্রালাপ' বই ক'রে ছাপানোর কথা একসময় চাপা প'ড়ে গিয়েছিলো।

৩ ইংরেজ কোয়েকার সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী এবং সমাজকর্মী Miss (Marjoric) Sykes কিছুকাল মাদ্রাজে শিক্ষকতা ক'রে বিশ্বভারতীতে যোগ দেন ১৯৩৯ সালে, এবং একবছরের মধ্যেই যথেষ্ট বাংলা শিখে নিয়ে 'ছেলেবেলা' (১৯৪০) বইটি *My Boyhood Days* (১৯৪০) নামে অনুবাদ করেন। একই বছরে বেরিয়েছিলো বইটির মূল এবং অনুবাদ। 'মুক্তধারা', 'নটীর পূজা' এবং 'চণ্ডালিকা'—এই তিনখানি নাটকেরও তিনি পরে অনুবাদ করেছিলেন। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে ১৯৫০ সালে এই অনূদিত নাটকগুলি *Three Plays* নামে ছাপা হয়। অতি বৃদ্ধবয়সে এখনো তিনি মধ্যপ্রদেশের আদিবাসী গ্রামে সমাজসংস্কারের কাজ ক'রে চলেছেন। তাঁর কর্মক্ষমতা মানব-সমাজের ঈর্ষাযোগ্য। বিশ্বভারতীর দেশিকোত্তম সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন।

৪ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগপত্র, মনে হচ্ছে, অমিয় চক্রবর্তী তখনো পাননি। বাংলার বাইরে কোথাও কাজ খুঁজছিলেন।

৬ নবেম্বর [১৯৪০]

7 Raisina Road
New Delhi

শ্রীচরণকমলেষু

পঞ্জাবের নানা জায়গায় ঘোরবার কালে ট্রেনে ব'সে ল্যাবরেটরি গল্প পড়লাম।[১] মনেও করা যায় না এমন গল্প লেখা যেতে পারে। শুক্‌নো ধূলোর পৃথিবী সম্পূর্ণ মাধুরীতে ভ'রে গেল— ভুলেই গেলাম বাংলার বাহিরে আছি, চতুর্দিকে যুদ্ধ লেগেচে; বুঝতে পারলাম জীবনের সন্ধান কোন্‌খানে। চমৎকৃত কল্পনায়, নিগূঢ় শিল্পে মননে চরিত্রচিত্রে মর্মান্তিক এমন গল্প লেখা হয়নি।

শীঘ্র একবার শান্তিনিকেতনে যাবার আশায় দিন গুনচি।

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

প্রণত

অমিয়

হাটেবাজারে মরীচিকা নিয়ে ব্যবসা চলচে— সেই উপলক্ষে রচিত একটা লেখা পাঠাই।।[২]

**বড়োবাবুর কাছে নিবেদন**

তালিকা প্রস্তুত :

কী কী কেড়ে নিতে পারবে না—
হই না নির্বাসিত কেরাণী।

বাস্তুভিটে পৃথিবীটার সাধারণ অস্তিত্ব,
যার একখণ্ড এই ক্ষুদ্র চাক্‌রের আমিত্ব।
যতদিন বাঁচি, ভোরের আকাশে চোখ জাগানো ;
হাওয়া উঠলে হাওয়া মুখে লাগানো,
কুয়োর ঠাণ্ডা জল, গানের কান, বইয়ের দৃষ্টি,
গ্রীষ্মের দুপুরে বৃষ্টি,
আপন জনকে ভালোবাসা,
বাংলার স্মৃতিসঞ্চিত বাড়ি ফেরার আশা।

তাড়াও সংসার, রাখলাম
বুকে ঢাকলাম
জন্মজন্মান্তরের তৃপ্তি যার যোগ প্রাচীন গাছের ছায়ায়,
তুলসীমণ্ডপে, নদীর পোড়ো দেউলে, আপন ভাষার কণ্ঠের মায়ায়,

থার্ডক্লাশের ট্রেনে যেতে জান্‌লায় চাওয়া,
ধানের মাড়াই, কলা গাছ, পুকুর, খিড়কিপথ ঘাসে ছাওয়া,
মেঘ করেচে, দুপাশে ডোবা, সবুজ পানার ডোবা,
সুন্দর-ফুল কচুরিপানার শঙ্কিত শোভা,
গঙ্গার ভরা জল, ছোটো নদী, গাঁয়ের নিমছায়া তীর
—হায়, এও তো ফেরা-ট্রেনের কথা।
শত শতাব্দীর
তরু-বনশ্রী
নির্জন মনশ্রী
শোনো,— উপস্থিত ফর্দে আরো আমার আছে:
দূর সংসারে এসেচে কাছে
—বাঁচার সার্থকতা।।

---

টীকা

১ 'তিনসঙ্গী'-র (১৯৪০) তিনটির মধ্যে একটি অনবদ্য গল্প 'ল্যাবরেটরি', আনন্দবাজার পত্রিকার পুজোসংখ্যার জন্যে লেখা হয়, শেষ করেছিলেন গুরুতর পীড়ার অল্প কয়েকদিন আগে। ('চিঠিপত্র' ১১শ, ১৩৪ দ্র.)

২ 'হাটে বাজারে' কথাটার মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে একটি চলতি রসিকতার ইঙ্গিত থাকলেও থাকতে পারে। কবিতাটি পরে কবিতাভবনের 'এক পয়সায় একটি' সিরিজে 'মাটির দেয়াল' (১৯৪২) নামের পুস্তিকায় স্থান পায়।

## ১০৫

"Aruni"
Seaside
Puri

Nov 29 [১৯৪০]

শ্রীচরণকমলেষু,

এতদিনে শান্তিনিকেতন আশ্রমে যাব মনে করে আমাদের তিনজনের কীরকম আনন্দ এবং ধন্যতা মনে হচ্চে বলতে পারি না। আমরা সোমবার রাত্রেই পৌঁছব।

সামান্য একটি কবিতা পাঠালাম— জানি না আপনার কেমন লাগবে। আপনার ভালো লাগলে "প্রবাসী"তে দেওয়া যায়।[১]

ছোটো দুটি কবিতা— অসুখের পরে লেখা— অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে প'ড়ে অবধি মন ভ'রে আছে। আশ্চর্য একটি নূতন ভাব সূক্ষ্ম ছন্দে জড়িয়ে রয়েচে— বারেবারে

পড়লে আরো পাওয়া যায়।[২]

আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

অমিয়

---

টীকা

১ চিঠির সুর থেকে অনুমান হয়, ইতিমধ্যে অমিয় চক্রবর্তী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছেন বা শীঘ্র দেবেন।

রবীন্দ্রনাথকে চিঠিতে পাঠানো 'সামান্য' কবিতাটি "তিনপ্রশ্ন", পরে 'অভিজ্ঞান বসন্ত' (১৯৪৩) কাব্যগ্রন্থে গেছে :

রবীন্দ্রনাথ দাঁড়ালেন ন্যুইয়র্কের
ষাটতলা বাড়ির ছায়ায়—
কে উঁচু?—

এইভাবে শুরু হয়েছে কবিতাটি। ১৩৪৭-এর পৌষ সংখ্যা 'প্রবাসী'-তে ছাপা হয়। পত্রিকায় ছাপা এই কবিতার আগের পৃষ্ঠাতেই ছিলো রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি সাম্প্রতিক কবিতা—"অপবাদ" ('আজিকার অরণ্যসভারে'), পাখির গান জীববংশ রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রকৃতির গূঢ় অভিসন্ধিপ্রসূত কিনা সেই প্রসঙ্গে রচিত। গ্রন্থভুক্ত হওয়ার সময় শিরোনাম বাদ যায়। ('রোগশয্যায়', ৩১-সংখ্যক কবিতা দ্র.)।

২ আগের মাসের (অগ্রহায়ণ) 'প্রবাসী'-তে রবীন্দ্রনাথের দুটি ছোটো কবিতা ছাপা হয়েছিলো :

"জপের মালা" ('একা ব'সে আছি হেথায়'), এবং
"ঋণ শোধ" ('অজস্র দিনের আলো'),

দুটিই 'রোগশয্যায়' গ্রন্থে আছে, শিরোনামহীন, যথাক্রমে ৩ আর ৪ সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত। প্রথম কবিতাটি তাঁর রোগমুক্তির পরে লেখা প্রথম কবিতা (৩০ অক্টোবর), চারদিন পরে লেখেন দ্বিতীয় কবিতাটি।

## ১০৬

বুধবার [১৯৪১, এপ্রিল?]

Komala Vilas,
73 Rashbehari Avenue
Calcutta

শ্রীচরণকমলেষু,

"ঐ মহামানব আসে" গানটির ইংরেজি তর্জমা রামানন্দবাবু *Modern Review*-এ দিতে চান— "সভ্যতার সংকটের" শেষে হয়তো খুব ভালোই মানাবে।[১] আমি মোটামুটি একটা অনুবাদ করেছি,—এই সঙ্গে পাঠালাম। আপনি দেখে দিলে ছাপা হতে পারবে। তর্জমাটা এই ভাবে করেছি—

"Supreme Man comes,
Earth's grass shivers with joy
sweeping across the dust.

In the heavens sound the trumpet,
In the world of man the drums of victory are beaten,
The hour has arrived for the Great Birth.
To-day the gates of night's fortress
Crumble into dust—
On the crest of awakening dawn
assurance of new life
proclaims "Fear Not".
The great sky resounds with paeans of victory
To the Coming of Man."

এই গানটিতে প্রকাশিত হয়েচে মানুষের প্রতি আপনার সুগভীর বিশ্বাস যা ব্যক্ত হয়েচে "সভ্যতার সংকটে"র শেষ দিকে। তাই ঐ প্রবন্ধের শেষে এটি যুক্ত হলে ভিতরের তাৎপর্য আরো স্পষ্ট ক'রে লোকে বুঝবে বলে মনে হয়।

"সভ্যতার সংকট" প্রবন্ধের ইংরেজি তর্জমা আপনি একবার একটু দেখে দিলে অন্যান্য মাসিকপত্রে তার যথাযথ রূপ বেরোতে পারবে। রামানন্দবাবু সেই জন্যে অপেক্ষা করচেন বল্‌লেন।

"বৈশাখী"-তে আপনার কবিতা পড়ে সকলে চমৎকৃত হয়েচে— এটি আশ্চর্য নূতন ধরনের রচনা এবং এর নিহিতার্থ মনকে বিচলিত করে। ছন্দের সঙ্গীতেও সকলেই দেখচি মুগ্ধ হয়েচে।[২]

প্রণত

অমিয়

---

**টীকা**

১ ১৩৪৮-এর নববর্ষ উৎসবের জন্যে রচিত গান 'ঐ মহামানব আসে'। 'সভ্যতার সংকট' কবির জীবৎকালে অনুষ্ঠিত শেষ জন্মোৎসবের ভাষণ, শান্তিনিকেতনে উদয়নের বারান্দায় পড়া হয়। কবি উপস্থিত ছিলেন কিন্তু নিজে পড়ার শক্তি ছিলো না। পাঠ করেন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন।

২ কবিতাভবনের গ্রীষ্ম বার্ষিকী 'বৈশাখী'-র প্রথম সম্পাদক ছিলেন তিনজন— বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক কবিতাভবন। প্রথম সংখ্যায় (১৩৪৮) প্রকাশিত হয়েছিলো, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১ সালে রচিত, রবীন্দ্রনাথের কবিতা "অপরিসমাপ্ত" ('বহু জন্মদিনে গাঁথা আমার জীবনে')। পরে 'জন্মদিনে' গ্রন্থে শিরোনামহীন দ্বিতীয় কবিতা হিশেবে ছাপা হয়।

'বৈশাখী'-র এ-সংখ্যায় অমিয় চক্রবর্তীরও তিনটি কবিতা ছিলো : "পার্থিব", "খোলা চোখেই" ও "বিলম্বিত", তিনটিই পরের বছর 'মাটির দেয়াল' পুস্তিকায় যায়। "পার্থিব" ("বিশুদ্ধ একজন নলিনীচন্দ্র পাকড়াশি,/মাছ, বা ন্যাংড়া আম,/আধুনিক

কৃষ্ণ বাজায় ফ্লুটের বাঁশি,/সবই বাস্তব—') কবিতাটির মানে কী তা নিয়ে বিশিষ্ট বাঙালি লেখিকা লীলা মজুমদার কোনো এক ঘরোয়া সাহিত্যসভায় অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে তর্ক তুলেছিলেন, কোনো জবাব পাননি। অমিয় চক্রবর্তী দুঃখ পেয়েছিলেন।

## ১০৭

৬ই মে, পুরী।। [১৯৪১]

As from :
C/o Professor Somnath Maitra
Dewan Villa,
Nandan Kanan
Chittagong

শ্রীচরণকমলেষু,

"ধূলি" কবিতাটি অতি অপূর্ব লাগল।[১] কিন্তু জন্মদিন উপলক্ষ্যে এটা পড়লে এর অন্তর্নিহিত বেদনা সকলকে বাজবে এবং আপনার বাণীর মূরতি নির্জন প্রাঙ্গণে আবার ধূলি হয়ে যাবে এ কথা কেউই মানবে না। সমস্ত পরিবর্তনের অতীত যে-শান্তির দৃষ্টি দিয়ে আপনি ধ্বংসের কথা বলেচেন তা সকলে বুঝবে না, দুঃখটাই অনুভব করবে। সুতরাং আরো একটি কবিতা আমরা চাই।

চট্টগ্রামে ৯ই মে পৌঁছব—সুধীরবাবুকে ঠিকানা পাঠাচ্ছি।[২]

"সভ্যতার সঙ্কট" বাংলা এবং ইংরেজি পেয়েচি[৩] —এভাবে বার ক'রে খুব ভালো হল। নূতন ক'রে সমস্তটা দেখ্‌তে পেলাম।

আপনার প্রথম প্রকাশিত বই "কবি-কাহিনী"তে কয়েকটি অতি আশ্চর্য জিনিস পেয়েচি যার সঙ্গে আপনার আজকের দৃষ্টির যোগ আছে।[৪] এর উপর যা লিখেচি তা আপনাকে শীঘ্রই একবার দেখাতে চাই।

চট্টগ্রামে খুব বড়োরকম ক'রে আপনার জন্মোৎসব হচ্চে— ওঁদের উৎসাহ আমাদেরও সকলকে সেখানে টেনে নিয়ে যাচ্চে। সেখানে থেকে আপনাকে লিখব।

আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন।

প্রণত
অমিয়

---

টীকা

১ অমিয় চক্রবর্তীর সেজোমামা সোমনাথ মৈত্র তখন চট্টগ্রামে সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ। প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে, কবির আশীবছর পূর্তি উপলক্ষে, চট্টগ্রামে একটি বড়ো অনুষ্ঠান হয়। অমিয় চক্রবর্তীর নির্বন্ধে সে-অনুষ্ঠানে পাঠ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ "ধূলি" নামে যে-কবিতাটি লিখে দেন ('বাণীর মুরতি গড়ি'), কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত "শেষ লেখা" (১৯৪১) গ্রন্থের সেটি ৯-সংখ্যক কবিতা। মহাকাল

মানুষের সব দর্প চূর্ণ করে, শুধু শিল্পকর্মের ধ্বংস নেই—বিশ্বের বহু কবি তা নিয়ে গৌরব করেছেন। "ধূলি" কবিতাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলে। অসীম ধৈর্যে একদিন যে-বাণীর মূর্তি গড়া হয়, আবার একদিন তা 'বিশ্বব্যাপী ধূসর সম্মানে' পঙ্গু আবর্জনা মাত্র হ'য়ে যায় :

পদাঘাতে পদাঘাতে জীর্ণ অপমানে
শান্তি পায় শেষে
আবার ধূলিতে যবে মেশে।

২ সুধীরবাবু—সুধীর কর।

৩ বিতরণের জন্যে জন্মদিনের ভাষণ 'সভ্যতার সংকট' বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই ছাপা হয়েছিলো।

৪ কবির সতেরো বছর বয়সে লেখা 'কবিকাহিনী'-র (১৮৭৮) চরিত্র, এক বৃদ্ধ কবি, কাহিনীর চতুর্থ সর্গে হিমালয়কে সম্বোধন ক'রে বলছেন, যুগ-যুগ ধ'রে মনুষ্যজগতের রক্তপাত, অত্যাচার, পাপ, কোলাহল দেখে 'সর্বাঙ্গ তোমার গিরি উঠেনি শিহরি'?

'কোটি কোটি মানবের শান্তি স্বাধীনতা
রক্তময় পদাঘাতে দিতেছে ভাঙ্গিয়া,
তবুও মানুষ বলি গর্ব করে তারা,
তবু তারা সভ্য বলি করে অহঙ্কার।...

জীবনের প্রান্তে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথের নিজের যে মনোভাব ছিলো তার সঙ্গে তাঁর তরুণবয়সে কল্পিত বৃদ্ধ কবির মনোভাবের মিল অবশ্যই লক্ষ করা যায়। 'সাম্প্রতিক' গ্রন্থে 'রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি' নামে এক প্রবন্ধেও এই মিলের কথা অমিয় চক্রবর্তী বলেছেন। প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন।

## ১০৮

May 14 [১৯৪১]

Dewan Villa
Nondan Kanan
Chittagong

শ্রীচরণকমলেষু,

এখানে এসে আমরা আশ্চর্য হয়েচি[১]—আপনার জন্মদিনে কী সুন্দর অনুষ্ঠান হল বলা যায় না। যেমন গৃহসজ্জা, তেমনি সঙ্গীত ও সাহিত্যালোচনায় যথার্থ নৈপুণ্য এবং গভীর উৎসাহের পরিচয় পেলাম। দেখ্‌চি এখানে অনেকেই আপনার রচনা অনুশীলন ক'রে পড়েচেন এবং ভেবেচেন। এঁদের আতিথ্য যেমন সুন্দর তেমনি সহজ।

শান্তি এসে খুব ভালো হয়েছে,[২] তার গানই উৎসবকে সবচেয়ে সমৃদ্ধ করেছিল, আপনার নূতন গান সকলে মন্ত্রবৎ শুন্‌ল। উর্ব্বশী, হে নিরুপমা এবং কৃষ্ণকলি এই তিনটি "কবিতার গান" সকলের কী রকম ভালো লেগেচে তা এঁরা ভাষায় প্রকাশ করতে পারচেন না।

"ধূলি"র কবিতাটি সকলকে গভীর স্পর্শ করেচে—উৎসবের কেন্দ্রস্থলে ছিল আপনার আশীর্বাদী কবিতা। "জন্মদিন" কবিতাটি এসে পৌঁছল, এমন আশাতীত আনন্দের দান জন্মোৎসবকে উজ্জ্বল ক'রে তুলল। এখনও সকলে এই কথা আলোচনা করচেন এবং কবিতা দুটি "প্রবাসী"-তে বেরোলে সবাই একান্ত উৎসুক হয়ে পড়বেন।

আপনার বিশ্বদৃষ্টি সম্বন্ধে অনেকে এখানে আলোচনা করছিলেন—দেখলাম একটা জিনিস সকলের মনে পরিষ্কার হয়নি। Cosmic বিশ্ব—যার সঙ্গে মানব সত্যের যোগ অনেকটা অবান্তর মনে হয়— তার মিল কোথায় জীবনদেবতা, অর্থাৎ মানবের ভগবানের সঙ্গে? গীতাঞ্জলি এবং পূর্বেকার রচনায় cosmic ঈশ্বরের কথা আছে— এখনকার রচনায় নরদেবতার কথাই মূল সুরের স্থান নিয়েচে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিধাতা এবং মানুষের দেবতার যোগ সম্বন্ধে দেখচি অনেকে আপনার রচনা পড়ে গভীর ক'রে ভাবচেন। আমার লেখাটা কোনো সময়ে আপনার চোখে পড়লে গভীর সার্থকতা অনুভব করব—এই সঙ্গে পাঠালাম।[৩]

আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন।

প্রণত
অমিয়

---

টীকা

১ 'এখানে' অর্থাৎ চট্টগ্রামে।
২ শান্তি— শান্তিদেব ঘোষ, রবীন্দ্রসংগীতের প্রখ্যাত গায়ক, শান্তিনিকেতনে বাস করেন।
৩ 'আমার লেখাটা'-ই ১০৭/৪ টীকায় উল্লিখিত 'রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি' প্রবন্ধ, চট্টগ্রামের অনুষ্ঠানে অমিয় চক্রবর্তী পাঠ করেন, এবং রবীন্দ্রনাথকে কপি পাঠিয়ে দেন। 'গীতাঞ্জলি'-র পর থেকে cosmic ঈশ্বরের চাইতে নরদেবতার কথাই রবীন্দ্রনাথের রচনায় 'মূল সুরের স্থান নিয়েছে'— এটিই ছিলো অমিয় চক্রবর্তীর বলবার কথা। পরে আরো অনেকে এ-কথা বলেছেন।

পত্রাবলীর এখানেই শেষ। এর সপ্তাহ তিনেক পরে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা ('চিঠিপত্র' ১১শ, ১৩৭ দ্র.) রবীন্দ্রনাথের শেষ চিঠি :

কল্যাণীয়
অনেকদিন তোমার চিঠির প্রতীক্ষায় ছিলুম। ঠিক করেছিলুম অসুখবিসুখে জড়িয়ে আছ। আমারো সেই দশা। অনেকদিন চিঠি লিখতে পারিনি, চিঠি প্রত্যাশা করাও অন্যায়। অদৃষ্টের এই অকরুণতার দিনে মাঝে মাঝে দুটো একটা টুকরো খবর পেলেও মন খুশি থাকে।

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ

২২শে শ্রাবণের বেশি দিন তখন বাকি ছিলো না।।